বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সুবর্ণরেখা · ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড · কলকাতা ৯

BANGALIR RASHTRACHINTA

RAMMOHUN THEKE MANABENDRANATH

by

Sourendramohan Gangopadhyaya

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৮

প্রকাশক : শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার

সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস

ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৮ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯

আঠারো টাকা

সমানধর্মা বন্ধুবর্গের উদ্দেশে

গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে যাঁরা সমাজবিপ্লব-সাধনার
অঙ্গীভূত বলে মনে করেন

নিবেদন

শিক্ষা বা অন্য কোনো সূত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিধিবদ্ধ পাঠগ্রহণের সুযোগ বর্তমান লেখকের ঘটে নি। উক্ত বিষয়ের প্রতি লেখকের অনুরাগ শুধুমাত্রই কৌতূহলী পাঠক হিসেবে। বর্তমান গ্রন্থটিকে সেই দীর্ঘ-লালিত অনুরক্তির সামান্য নিদর্শন বলা যেতে পারে— তদতিরিক্ত কিছু নয়। অনেক বন্ধুর মতে, কারো কোনো বিষয় প'ড়ে ভাল লেগে থাকলে, সে-বিষয়ে নিজের মতো ক'রে লেখার অধিকার তাঁর নিশ্চয় আছে, নাই-বা হলেন তিনি বিশেষজ্ঞ।

ভারতের একাধিক ভাষার তুলনায় বাংলায় গ্রন্থ-উৎপাদনের পরিমাণ কম; বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অবস্থাটা আরও নৈরাশ্যজনক। বাংলায় প্রকাশিত বইয়ের অধিকাংশই হল সাহিত্য বিষয়ক। অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশিত বাংলা বই প্রধানত পাঠ্যপুস্তক-ঘেঁষা। আর অনেক বিষয়ের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তির উপযোগী বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। নিজের প্রিয় ও পঠিত এই বিষয়টিকে বাংলা ভাষায় আমারই মতো কৌতূহলী পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার লোভেই এ-বই রচিত— বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য নয়। তবু এ-বইয়ের যাঁরা সম্ভাব্য পাঠক, রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে অন্তত প্রাথমিক পরিচয় তাঁদের আছে— এটুকু আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে-সব বই পড়ানো হয়ে থাকে তা প্রথমত ইংরেজি ভাষায় লিখিত, তদুপরি তাতে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের সম্যক পরিচয়দানের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। মিল, বেনথাম বা গ্রীনের মতো রাষ্ট্রদার্শনিক এদেশে না জন্মালেও ভারতের বহু মনীষী যে উক্ত বিষয়ে গভীর তত্ত্বগত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা মূলত পশ্চিমী প্রভাবে বিকশিত। তাকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা না গেলেও, বিশ্বের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ভাণ্ডারে ভারতের নিজস্ব কিছু মৌলিক অবদান যে আছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমেই স্বীকার্য, এ-বইয়ে ভারতের তো নয়ই, বাংলাদেশেরও সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যায় নি। কেবল বারো জন বাঙালী মনীষীর প্রসঙ্গ এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত মনীষীবৃন্দের প্রত্যেকের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এক-একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয় হওয়া সম্ভব— কাজেই এক্ষেত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গ্রন্থের মুখবন্ধে ও প্রতিটি পরিচ্ছেদে প্রাসঙ্গিকভাবে দেশের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও ঘটনার ধারা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে; বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তার ধারাবাহিক আলোচনা করা হয় নি।

বইটিতে মৌলিক বিশ্লেষণ ও গবেষণার কোনো দাবি যে নেই সে-কথা সজ্জন পাঠককে স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি। বহু পণ্ডিত ও গবেষক এ-বিষয়ে উল্লেখ-

যোগ্য কাজ পূর্বেই সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু সে-সমস্ত রচনার অধিকাংশই ইংরেজিতে লিখিত এবং এক-একটি কালপর্বে সীমাবদ্ধ; বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজও কেউ করেন নি। বর্তমান গ্রন্থের উপযোগিতা যদি কিছু থেকে থাকে, তবে সেদিক থেকেই।

গ্রন্থ প্রণয়নকালে পূর্বসূরিদের রচনা থেকে গৃহীত সবিশেষ সাহায্যের উল্লেখ সাধ্যমতো প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। যে-কয়েকটি বই আগাগোড়া আমার দিগ্‌দর্শিকাস্বরূপ কাজ করেছে এখানে তাদের পুনরুল্লেখ বোধ হয় বাহুল্য হবে না। বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'নবযুগের বাংলা', মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'সায়েন্টিফিক পলিটিক্স', বিশ্বনাথ বর্মার 'মডার্ন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট্' এবং বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত 'হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট্: ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ'— এই কটি গ্রন্থের নিকট বর্তমান লেখকের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার্য।

গ্রন্থটি রচনার সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র ও তাঁর দীর্ঘকালের সহচর শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল এবং সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ পরামর্শদান করেন। নিজের নানা অসুবিধা উপেক্ষা করে বইটির সুনিপুণ সম্পাদনা ও সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠবসাধনে সহায়তা করেছেন শ্রীবিমান সিংহ। শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার বইটি প্রকাশের ঝুঁকি নেবার অনেক আগে থেকেই বিষয়টির পরিকল্পনায় সাহায্য করেন। তাঁর পুরাতন পুস্তক বিভাগ থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্রিকাদি অবাধে ব্যবহারেরও সুযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর সহকর্মী শ্রীঅজিতকুমার দাশ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনায় সহায়তা করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীকৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট সংকলন করে দিয়েছেন নিউ আলিপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুচিত্রা ঘোষ।

এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

রাজনীতি বিষয়টি কারো-কারো কাছে অরুচিকর বলে বিবেচিত হয়। তাঁদের দৃষ্টিতে রাজনীতি নিছক দলাদলি ও নির্বাচনের রেষারেষি ছাড়া আর কিছু নয়, কাজেই তা দুর্নীতি, মিথ্যাচার প্রভৃতি নোংরামিতে ভরা। একদেশদর্শী এই দৃষ্টির প্রধান কারণ হল যথার্থ রাজনীতি সম্পর্কে লোকের সুস্পষ্ট চেতনার অভাব; দ্বিতীয়ত যাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত তাঁদের মধ্যে আদর্শ ও ব্যাবহারিকতার অসংগতি সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টিকে হেয় করে তুলেছে। আশু কার্যকরতার তাগিদে রাজনীতিকেরা প্রায়শই সত্য ও মিথ্যার মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করেন। যুক্তি ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটায় রাজনীতি মানুষের হৃদয়ে তার আপন স্থান হতে বঞ্চিত।

বস্তুত রাজনীতি বিষয়টি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত। কারণ রাজনীতির কাজ হল রাষ্ট্রের রীতিনীতি ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ; সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবনের সংগতিসাধনই তার লক্ষ্য। রাষ্ট্র সমাজের অঙ্গ; সমাজেই মানুষ বাস করে। সমাজ ছাড়া সভ্য মানুষের জীবন অচল। রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধির ক্রমবিস্তার ও জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার নিবিড় অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেজন্যে বিষয়টির প্রতি নিস্পৃহ ও চেতনা-বিরহিত মনোভাব পরিণামে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই পক্ষে ক্ষতিকর। পেরিক্লেসের কথায়: 'We alone regard a man who takes no interest in public affairs, not as a harmless, but as a useless character, and if few of us are originators, we are all sound judges of a policy'। রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার সাহায্যেই উক্ত বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের ভীতি ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া সম্ভব।

রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি কথাগুলি সমার্থেই ব্যবহৃত হয়; বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগোত্রীয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ যূথবদ্ধ মানুষের আচরণ বা সমাজের সমস্যাদি প্রায় গাণিতিক সূত্রে বিশ্লেষণ করা যায়, যেটা বিজ্ঞানের লক্ষণ। মানুষের আচরণ ও সমাজমনেরও কতকগুলি ধ্রুবক (constant) থাকে যার ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে বিবেচনায় দাবি রাখে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের

সঙ্গে যেহেতু সমাজজীবনের সম্পর্ক নিবিড় সেই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অনস্বীকার্য।

এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই যে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের সমন্বিত রূপই হল দর্শন। ব্যক্তি ও সমাজের গতি ও প্রকৃতির সঠিক পথনির্দেশনাস্বরূপ দর্শন মৌল জীবনাচারের সংহিতা মাত্র। সাধারণ দর্শন যেমন যাবতীয় বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে, তেমনি রাষ্ট্রদর্শন সমাজের বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত জ্ঞানের সংগতি সাধন করে।

বিজ্ঞানের কাজ সব কিছুর বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা— যার সাহায্যে ও সমন্বয়ে দর্শন অর্থ নির্ণয় করে। বিজ্ঞান এক-একটি বিষয়ের খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত করে— দর্শন সেই খণ্ডগুলিকে যুক্ত করে সমগ্রের মৌল মূল্যবত্তা, আদর্শ পরিণতি ইত্যাদির এক চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য নির্দেশ করে। বিজ্ঞান পথ ও প্রণালী দেখায় আর দর্শন জানায় লক্ষ্য ও পরিণতির নিশানা। বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্বের তখনই সার্থকতা যখন তার সাহায্যে মানবিক মঙ্গল সাধিত হয়। দর্শন-বিচ্যুত বিজ্ঞান, তথা জীবন- ও মনুষ্যত্ব-নিরপেক্ষ জ্ঞানের উপকরণ মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাননির্ভর সত্যের উপাদানে দর্শন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে; জীবনকে করে তোলে অর্থপূর্ণ ও আনন্দদায়ক।

উইল ডুরাণ্ট (১৮৮৫–) কৃত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী দর্শনের অঙ্গ হল পাঁচটি: যুক্তিবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা এবং অধিবিদ্যা। রাষ্ট্রবিদ্যা অর্থাৎ রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির সামগ্রিক বিচারে অনুসরণীয় পথের নির্দেশনা ও তার মূল্যায়ন। ইতিহাস, বিশ্বতত্ত্ব, ইত্যাদি স্বভাবতই তার আলোচনার আনুষঙ্গিক বিষয়। রাষ্ট্রদর্শনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতির কাজ। সেজন্যে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাচিন্তা প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অন্তর্গত।

বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রতত্ত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। জ্ঞাতা বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাসচিন্তার প্রকারভেদে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য ভিন্নরূপে দেখেন। কালের গতিতে মানুষের মননশক্তি ও জ্ঞানের সীমানা নিয়তই প্রসারিত হচ্ছে। জ্ঞান ও দর্শনের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। সেজন্যে মানুষের মনের ও সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে রাষ্ট্রচিন্তারও নিরন্তর পরিমার্জনা ও পুনর্গঠন হওয়া স্বাভাবিক।

সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে। প্রাচীন গ্রীসকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি জন্মভূমি বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ভারতেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছিল; অবশ্য স্বতন্ত্র রূপে ও ধারায়। ঠিক আধুনিক অর্থে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে কিছু না থাকলেও সমাজবদ্ধ জীবনে পালনীয় নানা রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার পরিচয় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজ চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল। ছোট ছোট গোষ্ঠীর অধিপতি বা রাজার রাজধর্মে ব্রাহ্মণপুরোহিতেরা সাহায্য করতেন। বৈদিক গ্রন্থাদিতে 'সভা' ও 'সমিতি' কথার উল্লেখ আছে। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে মহাভারতের শান্তিপর্বে (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ১১০০) উন্নততর রাষ্ট্রচিন্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। কালক্রমে জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের রীতিনীতি আরও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার এবং ভারতে গ্রীক অভিযান দেশের রাজনৈতিক চিন্তায় উৎকর্ষসাধন করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৩৪৫-৩০০) এবং মনুসংহিতা (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২০০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বৌদ্ধ যুগে সাধারণতন্ত্র অর্থে 'গণ' কথাটির প্রচলন ছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-চিন্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কামন্দকীয় নীতিসার (ষষ্ঠ শতক?) রচিত হয়েছিল। অগ্নিপুরাণও (নবম শতাব্দী) উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রচিন্তার সাক্ষ্য বহন করে। তৎকালীন রাষ্ট্রচিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক শুক্রনীতিসার গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। অনেকের মতে ত্রয়োদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে পূর্বতন হিন্দু রাষ্ট্রনীতি ইসলামি চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নবরূপ লাভ করে। আকবরের অন্যতম পার্ষদ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী (ষোড়শ শতক) গ্রন্থ ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আধুনিক অর্থে সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তায়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমে সেই চিন্তা কালের যাত্রায় প্রসারিত হয়ে মেকিয়াভেলি, রুশো, হবস, লক, মিল, বেনথাম, কান্ট, হেগেল, মার্কস প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের রচনায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তরালে একদল দেখেছেন ঐশ অভিপ্রায় এবং অপর দল মানুষকেই করেছেন সমাজের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। একদল ব্যক্তিকেই করেছেন যাবতীয় সামাজিক বিধিবিধানের মাপকাঠি; অপরদলের

দৃষ্টিতে মানুষ যূথবদ্ধ জীবনের অধীন ; যৌথ কল্যাণেই ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ ; যৌথ স্বার্থে আত্মস্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দিলে সকলের মঙ্গল সাধিত হবে। ইতিহাস ও সমাজের অন্তরালে একদল মিলন ও সমন্বয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ; অপর-দলের চোখে ইতিহাস দ্বন্দ্বসংঘর্ষে মুখর। উদারতন্ত্রীরা ব্যক্তিমানুষের মুক্তি ও স্বাধীন বিকাশকে বড করে দেখেছেন ; আবার যূথবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীবিশেষের অগ্রাধিকারে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ত জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ভারতে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাবেই হয়েছিল। রামমোহন এদেশে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা করেন। তাঁরই চিন্তার সূত্র ধরে দেশের পরবর্তীকালের চিন্তানায়কেরা পশ্চাৎপদ ভারতকে বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এদেশে ইংরেজ শাসনের সুফল এই যে শতধা বিভক্ত সংস্কারাচ্ছন্ন একটি মধ্যযুগীয় দেশকে তারা আধুনিক প্রশাসনে শুধু যুক্তই করে নি, উপরন্তু এদেশবাসীর মনে পরোক্ষে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চারেও সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শাসনের কুফল ঘটেছিল যে বিদেশী শাসনের বিরোধিতা ক্রমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্বেষ ও আধুনিকতার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের তাৎপর্য কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণেই সীমিত নয়, তাদের আবির্ভাবে দুটি ভিন্ন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ধারার মিলন ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। নবাগত ধারা ছিল প্রাণরসে সজীব ও গতিশীল। অপরদিকে এদেশের ভাবধারা তখন নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল। পশ্চিমী প্রভাবে এদেশের প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ভারতীয় জীবনের রূপান্তর দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। আধুনিক শিক্ষা, শিল্প, পরিবহণ ও পরিশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এক বিচিত্র সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়। নবাগত নবীন ধারাকে দেশের একদল অভ্যর্থনা জানায়, বৃহত্তর অন্যদল সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

উনিশ শতকে বাঙালীর মনন ও সমাজচিত্র বৈচিত্র্যময়। কুসংস্কার, প্রথাপীড়ন ও সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে মুক্তির তাগিদে পশ্চিমী যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার

প্রমুখ সমাজ সংস্কারককে তৎপর থাকতে দেখা যায়। ধর্ম ও সমাজের নব রূপায়ণকল্পে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রভাবে স্বাধীন চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়। তাঁদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতিশীল জীবনদর্শন ও দেশানুরাগ সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমাজপতিদেরও বিরাগ সৃষ্টি করে। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব ছিল প্রবল। ডিরোজিও গোষ্ঠীর উগ্র আচরণ এবং রামমোহন প্রভাবিত তদানীন্তন মডারেটদের মধ্যপন্থী মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রক্ষণশীল তৃতীয় একটি শক্তি মাথা চাড়া দেয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার সঙ্গে বাঙালীর মধ্যযুগীয় মনোভাবের এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। হিন্দু অতীত ও স্বাজাত্যবোধে দৃপ্ত এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিদেশী মূল্যবোধকেও বর্জন করে; দেশের প্রথানুসারী সকল বিষয়কে নির্বিচারে মেনে নেয়। বিদেশের ঠাকুরের চাইতে স্বদেশের কুকুরও বরং ভাল এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল হয়ে ওঠে। এই হিন্দু পুনর্জাগরণকে পরোক্ষে ইন্ধন যুগিয়েছিল এদেশে আগত বিদেশী মিশনারিদের প্রচারতৎপরতা।

ভারতের জাতীয়তাবোধ দুটি সমান্তরাল ধারায় গড়ে ওঠে। প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং পরে ইংরেজের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত আধা-রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ক্রমে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মের সংমিশ্রণ তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামমোহন থেকে গান্ধী অবধি অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও সাধনায় রাজনীতি ধর্মের দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন ধর্মের গরিমায় জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত হয়। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তা ছিল উদার ও সার্বজনীন। তাঁরা বিশেষ কোনো ধর্মের প্রাধান্যে অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে খর্ব করেন নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে চারটি ধারা লক্ষিত হয়: ১. পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শে দেশোন্নয়নের প্রয়াস; ২. গঠনমূলক ও প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন; ৩. হিন্দু অতীতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস; ৪. ভিন্ন আদর্শে ও প্রেরণায় ইসলামি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রয়াস।

অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্যে

কোম্পানির আমল থেকে চার্চিলের সময় অবধি ইংরেজের প্রশাসনিক অভিসন্ধিই মূলত দায়ী। এ-বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন আছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ইংরেজ যে ব্যবহার করেছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু ইংরেজ শাসননীতিই তার একমাত্র উৎস বলে মনে করা একদেশদর্শিতা। বিগত কয়েক শো বছরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচারবিচার ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির যথোচিত উৎস নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদেশী শাসনের গ্লানি ও পরাভব থেকে মুক্তির তাগিদেই আত্মশক্তি ও মর্যাদা অর্জনকল্পে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী প্রেরণার উৎসস্বরূপ হিন্দু অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল। কিন্তু কেন তাঁরা প্রেরণার আশায় প্রাচীন হিন্দুত্বকে ফিরে পেতে চান এবং ক্রমে কেনই বা হিন্দুত্বের চেতনা রাজনীতিতে প্রবল হয়ে ওঠে, সে-প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ইংরেজ কেবল হিন্দুমুসলমানের বিভেদকেই কাজে লাগায় নি; রাজন্যবর্গের ও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিভেদেও ইন্ধন যুগিয়েছিল; ভাষাঘটিত কলহকেও বাদ দেয় নি। কিন্তু কেবল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধই পরিণামে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর তখনকার সংস্কারকদের যাবতীয় প্রয়াস প্রধানত ধর্ম ও সমাজের পুনর্গঠনে নিবদ্ধ ছিল। নতুন আইনকানুনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারসূত্রেই সংস্কারকদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক দেখা দেয়। পশ্চিমী চিন্তার প্রভাবে তাঁরা রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন স্পষ্টই বলেছিলেন যে অধিকতর রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধার জন্যে প্রথমে ধর্মের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। দেশে নবাগত যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী জনচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজেরই প্রভাবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারে উদ্যত হয় নি। পরবর্তীকালে অনুরূপ ভূমিকা দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মতৎপরতায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি প্রতিষ্ঠানকে হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনে তৎপর হতে দেখা যায়। একটি দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্যসমাজ' (১৮৭৫) এবং অপরটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি' (১৮৭৬)। হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনে বাংলা দেশে জাতীয়তার অন্যতম পুরোধা রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ অংশ নিয়েছিলেন; এই ভাবধারারই পরিবর্ধন ঘটে জাতীয়তাবাদী

দল নামে অভিহিত চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের চিন্তায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ফলে অহিন্দু সমাজ বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় সচকিত হয়ে ওঠে। তারাও প্রেরণার স্বতন্ত্র উৎসের সন্ধানী হয়। ইসলামি সংস্কৃতি, ভারতে মুসলমান আমলের ঐতিহ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি থেকে তারা স্বাজাত্যবোধ ও আত্মগৌরবের নিজস্ব উপাদান খুঁজে পায়। মুসলমান শাসনকালে সরকারি উচ্চপদ, সেনাবাহিনী, বিচার ও প্রশাসনে মুসলমানদেরই ছিল একাধিপত্য। ইংরেজ শাসনে তাদের সেই আধিপত্য চলে যায়। নতুন ভাষা, সংস্কৃতি ও শাসন বিধিকে তারা মেনে নিতে পারে নি। নবাগত পশ্চিমী ধারাকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সাদরে গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমী সংস্কৃতির বিরোধী ওয়াহবি আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহের পশ্চাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের ফলে তাদের প্রতি ইংরেজের মন সংশয়িত হয়ে ওঠে। মুসলমানেরা দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। তাদের এই পশ্চাৎপদতা উপলব্ধি করে সার সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৮-১৯০৮) মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র চেতনায় ইংরেজের শিক্ষা ও শাসনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও হিন্দু নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস থেকেও তিনি মুসলমানদের দূরে রাখার প্রয়াসী হন। কংগ্রেস বিরোধী একাধিক সংগঠনও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আমির আলি, নবাব সলিমুল্লা প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর সহায়ক হন। গো-রক্ষা আন্দোলন, হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলন মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাজাত্যবোধকে খুঁচিয়ে তোলে। হিন্দু আধিপত্যের ফলে তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে নি।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে যে-শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক আদর্শ বিস্তার লাভ করেছিল, সে-শ্রেণী ছিল সেখানকার নবোদ্ভূত শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অনাচারের বিকল্প হিসাবে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক উন্নত সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিল; নতুন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এই শ্রেণীর নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সার্থক হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারনীতির পরিপোষক হলেও এই শ্রেণীর মনে বিশ্বজনীনতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদই প্রাধান্য লাভ করে। তাদের জাতীয়তাবাদী প্রবণতা ক্রমে উদারনীতির পরিপন্থীস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী চণ্ডমূর্তি ধারণ করে।

ভারতে ইংরেজ বণিক শ্রেণীর আবির্ভাবে এদেশে এক নতুন বণিক শ্রেণী দেখা দেয়। শেষোক্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে এদেশেও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। বাধা পড়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যনীতির প্রবর্তনে, ফলে এদেশের বণিক শ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। নবোদ্ভূত দেশীয় বণিক শ্রেণীর মোটা অংশ জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়; কারণ সে-সময়ে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করাই ছিল নির্ঝঞ্ঝাট অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিল্পবাণিজ্যে পুঁজি নিয়োগের পরিবর্তে কোম্পানির কাগজ কিংবা সুদি কারবারই বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাই সে-সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক যুগান্তরের সম্ভাবনা বহুকালের মতো পেছিয়ে যায়। রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে দেশের নবজাগরণে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা শিক্ষিত পুঁজিবাদী ইংরেজের আনুকূল্যেই এদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চেয়েছিলেন।

ইউরোপে বণিক শ্রেণীর নেতৃত্বে উদ্ভূত যুগান্তকারী ভাবধারা ইংরেজ শাসন-সূত্রে এদেশে সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই ভাবধারা বহনের ভূমিকা এদেশের যে-শ্রেণী গ্রহণ করেছিল, তারা দেশীয় বণিক শ্রেণী নয়—ইংরেজ শাসন পুষ্ট এক অভিনব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। শহরবাসী জমিদার, ইংরেজ প্রশাসনযন্ত্রে প্রস্তুত ভারতীয় আমলাবর্গ, বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক ভদ্রলোক সম্প্রদায় হিসাবে এই অভিনব মধ্যবিত্ত শ্রেণী দানা বাঁধে। তারাই পাশ্চিমী সংস্কৃতির বাহক ও পরিপোষক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিল না। নতুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে দেশকে নতুন দৃষ্টিতে গড়ে তোলার ক্ষমতা ও চেতনা তাদের ছিল না। বিদেশী শাসনের পক্ষপুটেই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পিছনে মেকলের স্বপ্নকেই তাঁরা সফল করে তোলেন, অর্থাৎ জাতে ভারতীয় হয়েও তারা সংস্কৃতিতে হবে পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন, যাতে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা নির্বাধে চলতে পারে। অভিনব এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দেশের মাটি ও মানুষের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ; পক্ষান্তরে বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে দেশের সামাজিক বিপ্লবসাধনেও তাঁদের চেতনা ও সামর্থ ছিল না। ওয়াহবি আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদির চরিত্র যাই হোক না কেন, সেগুলিকে প্রগতিশীল নেতৃত্বে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের দেখা যায় নি। নীলকর ও জমিদার

শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের প্রতিবাদ বৃহত্তর শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থনের অভাবেই নিষ্ফল হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে উনিশ শতকের ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য তাই সুপরিস্ফুট। এদেশীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রে অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনার অভাব ও ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি ছিল প্রবল। পাশ্চাত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী সামন্ততন্ত্রী অচলায়তন ভেঙে নতুন সমাজ সৃষ্টিতে অগ্রণী হয়েছিল। রাজশক্তি ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য ও মধ্যযুগীয় প্রথাপীড়নের বিরুদ্ধে তারা যুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পন্থা গ্রহণ করে। সেখানকার সামন্তশক্তি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরোধ ছিল স্পষ্ট। এদেশে জমি ও শিল্পের মালিকানা বহুলাংশে একই শ্রেণীর হাতে থাকায় উভয় শ্রেণীর স্বার্থবিরোধ দেখা দেয় নি। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীকালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যতটা সংগ্রামী হয়ে ওঠে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সে-পরিমাণে উৎসাহ দেখায় নি।

একথাও স্মর্তব্য যে নবাগত ভাবধারার সার্থক গ্রহণ ও প্রয়োগে সেদিন উপযুক্ত শ্রেণী গড়ে না ওঠার মূলে অবশ্য ইংরেজ শাসন ও শোষণই ছিল প্রধান কারণ। ভারতীয় নবজাগরণের ভগীরথ ইংরেজই তার শাসন ও শোষণে সেই নবধারাকে রুদ্ধ করে দেয়।

উপরিবর্ণিত শ্রেণীর আশ্রয়েই এদেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধে। দলীয় রাজনীতিরও সূত্রপাত হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। রামমোহনকেই মডারেট নামে পরিচিত ধারার প্রবর্তক বলা যায়, যার আধিপত্য বিশ শতকে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তর কাল অবধি বিস্তৃত। মডারেটদের মধ্যে দুটি মনোভাব দেখা যায়, একটি রক্ষণশীল, অপরটি উদারতন্ত্রী। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁরা সাম্য, সুবিচার ও স্বায়ত্তশাসন চাইতেন। ইংরেজের যুক্তিবাদী, উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রচিন্তার তাঁরা গুণগ্রাহী ছিলেন। রামমোহনের আদর্শে তাঁরা এই মনোভাব পোষণ করতেন যে ইংরেজ শাসনের মধ্যে দিয়েই এদেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন ঘটুক। কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক চেতনা ও ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকদের কাছ থেকে তাঁরা দেশের নানা সুযোগসুবিধা আশা করতেন। এবং দেশবাসীকে সেই দৃষ্টিতেই উৎসাহিত করেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপে ভারতীয়

মডারেটদের দৃষ্টিভঙ্গী হেয় প্রতিপন্ন হত, আবার ব্রিটেনের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিষ্ক্রিয় আচরণে তাঁদের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ত। ইংরেজের দুর্নীতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় মডারেটরা যতই সোচ্চার হয়ে থাকুন না কেন, উগ্র জাতীয়তাবাদীদের প্রচারে তাঁরা দেশবাসীর চোখে বিদেশী প্রভুভক্তরূপে পরিগণিত হতেন। আপাতদৃষ্টিতে চরমপন্থীদের সঙ্গে মডারেটদের বিরোধ থাকলেও মূলত কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয় গোষ্ঠীই চাইতেন ব্রিটেনের আদর্শে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মডারেট ধারার প্রতিপক্ষরূপে বিবেচিত অনেক নেতাই ক্রমে তাতে উৎসাহিত হন। তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন এবং পরবর্তীকালে গান্ধীর মনোভাবকেও এই ধারার অনুবর্তী হতে দেখা যায়। ভারতীয় মডারেটরা স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভাবনায় সচেষ্ট হন নি। এদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা এবং স্বাধীনতার পর সংসদীয় রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের পিছনে সেদিনের মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য। মডারেটদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও ত্রুটিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগসূত্র ছিল না; ফলে তাঁরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে ক্রমে বিদায় নেন। কংগ্রেস দলের প্রথম ত্রিশ বছরের নেতৃত্বে মডারেটদেরই ছিল আধিপত্য।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মোড় ফিরে যায়। আবেগ ও উচ্ছ্বাসসর্বস্ব আধ্যাত্মিকতার উদ্দামতায় তাঁরা পশ্চিমী প্রভাব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করেন। চরমপন্থী ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে তাঁদের প্রভাবে রাজনীতির মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।

জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান অঙ্গ। এবিষয়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শনিকদের বিশেষ প্রভাব আছে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মোটামুটি তিনটি ধারা লক্ষণীয়:

১. মডারেটদের অর্থনৈতিক বিচারভঙ্গী;

২. চরমপন্থীদের মাতৃত্ব ও হিন্দুত্ব প্রত্যয়ে দেশাত্মবোধ;

৩. কিছু সংখ্যক হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান নেতার চিন্তায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রাবল্য।

নরম ও চরমপন্থী কোনো দলেই আকৃষ্ট হতে না পেরে পরবর্তীকালে যাঁরা স্বতন্ত্র তৃতীয় পথের সন্ধান করেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাহ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ

গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে জনচেতনা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বিদেশী প্রশাসনব্যবস্থার সমান্তরাল ধারায় স্বয়ংনির্ভর সামাজিক কাঠামোর সাহায্যে সরকারি ব্যবস্থাকে শক্তিহীন করে তোলার এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী তুলে ধরেন। ধর্মবিদ্বেষ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধেরও তিনি নিন্দা করেন। যুক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবতার আদর্শে তাঁর বিশ্বজনীন রাষ্ট্রদর্শন রচিত।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। নরমপন্থীরা তখন বিলীয়মান আর চরমপন্থী দলও ছত্রভঙ্গ। অতঃপর চরকা, খিলাফৎ, অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য মন্ত্রের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী ক্রমে ভারতীয় রাজনীতির অধিনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের জনজাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ; দেশবাসীর মনে তাঁর ছিল অসীম প্রভাব ; চরিত্রে তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ। কিন্তু দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ, অসংবদ্ধ কর্মপন্থা ও যুক্তিবিরোধী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি দেশের রাজনীতিকে করে তুললেন জটিল ও নিশ্চল। ইহবিমুখ জীবনবোধ ও বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার ফলে তাঁর শত সদিচ্ছা ও প্রভাব সত্ত্বেও তিনি দেশের অনভিপ্রেত গতিকে রোধ করতে পারেন নি। তাঁর অনিচ্ছা উপেক্ষা করে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে ; তাঁর অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রচিন্তাই তার কারণ। তাহলেও তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে অহিংস সত্যাগ্রহের কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও প্রণালীর সামঞ্জস্যচিন্তা, বিকেন্দ্রিত প্রশাসন ও পার্টিবিহীন রাজনীতির প্রত্যয় সমসাময়িক বিশ্বচিন্তার ভাণ্ডারে এক বিশেষ অবদান।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় এদেশের মনীষীরা সবাই পশ্চিমী ভাবধারায় অবগাহন করেন। বেনথাম, মঁতেস্কু প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তায় রামমোহন প্রভাবিত হয়েছিলেন। পেইন, গিবন, হিউম-এর চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় নব্যবঙ্গদলের মনে। বার্ক ও গ্লাডস্টোনের সঙ্গে মাৎসিনিকেও সুরেন্দ্রনাথ আদর্শ জ্ঞান করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র একসময়ে মিল ও কোঁতের চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেগেল ও নীটশের প্রভাব দেখা যায় অরবিন্দের চিন্তায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ইউরোপের বহু মনীষীর অল্পবিস্তর প্রভাব ছিল। চিত্তরঞ্জনকে অনেকে আইরিশ জননেতা পার্নেলের সঙ্গে তুলনা করেন। হেগেল ও মার্কসের দর্শনে সুভাষচন্দ্র অনুপ্রাণিত হন, লেনিন ও মুসোলিনিকে তিনি আদর্শ করেছিলেন। মূলত মার্কসের দর্শনে প্রভাবিত হলেও ইউরোপের বহু চিন্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাঙ্গীকরণ ঘটে মানবেন্দ্রনাথের মনে। রামমোহনের আমল থেকে মানবেন্দ্রনাথের সময় অবধি ইতালি, আমেরিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিপ্লব এদেশের চিন্তাশীল মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বর্তমান শতকের বিশের কোঠায় ইউরোপের দুটি মতবাদ ভারতে প্রভাব বিস্তার করে: একটি কমিউনিজম এবং অপরটি ফ্যাসিজম। রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের কর্মসূচী অনুযায়ী মস্কো থেকে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে কমিউনিজম প্রচারের সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয় মতবাদ ফ্যাসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের সমন্বয়ে তৃতীয় একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেন।

রামমোহনের আমল থেকে পরবর্তী দেড় শতাধিক বছরের মধ্যে দিয়ে এদেশের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা নানা ভাব ও আদর্শে পরিপুষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও চিন্তা ও আদর্শের বিচিত্র ধারায় বহু রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, যুগান্তকারী বিপ্লব এবং বিজ্ঞানের আনুকূল্যে বিশ্বের জনমানসে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপে দীর্ঘকালের সাধনায় রাজনীতি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও মৌলিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তত্ত্বগতভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হলেও অধুনাকালে ভারতেও এবিষয়ে কিছু মৌলিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে।

ভারতীয় চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চিন্তায় ও গবেষণায় তাঁরা রাজনীতিকে একক ও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেন নি, যেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায়। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীর মতে রাজনীতিকে সমাজের অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না, সকল বিষয়ই ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্পৃক্ত। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় যে রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মতৎপরতার সূত্রেই এদেশের রাষ্ট্র-দার্শনিকেরা উক্ত বিষয়ে চর্চা করেছেন। দল ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও রাজনীতিকে স্বাধীন 'অ্যাকাডেমিক' দৃষ্টিতে বিচার ও গবেষণা করার নজির এদেশে খুব অল্পই পাওয়া যায়।

এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এদেশে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত ও বিস্তার হয়েছিল। বিদেশী শাসন এবং দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণের আশায় এদেশের চিন্তানায়কেরা জাতীয় জীবনকে সর্ববিষয়ে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াসী হন। প্রেরণার জন্যে কেউ তাকিয়েছিলেন অতীতের দিকে, আবার কেউ বা আধুনিক ধারায় দেশ গড়তে চেয়েছেন। সেজন্যে এদেশের রাষ্ট্র-

চিন্তা যে-পরিমাণে স্থায়ী তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে প্রাচীন ধারার রোমন্থন ও প্রচারধর্মী। সুদূরপ্রসারী প্রণালীবদ্ধ তাত্ত্বিক উদ্ভাবনার অবকাশ ছিল নিতান্তই সীমিত। আশু প্রয়োজন ও কার্যকারিতার দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পুনর্গঠনের তাগিদে ধর্ম, দর্শন, সমাজ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে রাজনীতি বিবেচিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাচীন গ্রীক আমল থেকেই মোটামুটি একটা আমূল ধারাবাহিকতা লক্ষিত হয়। তাতে তত্ত্ব ও পদ্ধতির বিস্তার ও প্রভেদ ঘটে থাকলেও গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য চিন্তার উৎস। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পারম্পর্য নেই। একটি সাদৃশ্য যা আছে তা-হল সবাই প্রধানত ভারতের সমস্যাকে সামনে রেখেই চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ইংরেজের দুশো বছরের ভারত শাসনকালে নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মপন্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা বিকশিত হয়েছে। তাহলেও বিশ্বের রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে এদেশের তিনটি মৌলিক অবদান অস্বীকার করা যায় না:

১. গান্ধীর সর্বোদয় দর্শন; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার আশ্রয়ে যাবতীয় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ পদ্ধতি।
২. অরবিন্দের 'অতিমানস'-প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ধর্মী আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন মৈত্রীর আদর্শ।
৩. বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের সাহায্যে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ দর্শন।

কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ বাঙালী চিন্তানায়কের মনে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও আধুনিক দৃষ্টিতে এদেশে সমাজতন্ত্রী মনোভাব প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর থেকেই ক্রমশ নানা ধারায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী দৃষ্টিতে গান্ধী বিকেন্দ্রিত প্রশাসনব্যবস্থা ও গ্রামনির্ভর উন্নয়নের ভিত্তিতে এক সমাজবাদী আদর্শ তুলে ধরেন। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ প্রমুখ সমাজতন্ত্রীরা যতটা না মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ও অর্থনৈতিক সাফল্যে উৎসাহিত হন। ভারতীয় কমিউনিস্টরাও ক্রমে সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু তারা দেশবাসীর বস্তুবাদী চেতনা সৃষ্টির পরিবর্তে মানুষের

সাময়িক অভাব ও অসন্তোষগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ভারতে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রী আন্দোলন পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তিসম্মত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক চেতনা ও সর্বভারতীয় একাত্মবোধ উন্মেষিত হয় নি। ভাষা, প্রদেশ, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি নানাবিধ সংকীর্ণতার আশ্রয়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার কোনো ধারাকেই অবলম্বন না করে ভারতে স্বতন্ত্র পার্টির উত্থান তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের ভিতর একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক ও বিরোধীদের সহাবস্থান দলীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক বিচিত্র নিদর্শন।

বলা হয়ে থাকে যে দেশে এখন এক ভাবের সংকট চলেছে। বস্তুত ভাবাদর্শের যত না অভাব আছে, তার চেয়ে উপস্থিত আদর্শের রূপায়ণপ্রয়াসের অভাবই বেশি। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের নামে দেশে সমারোহের অন্ত নেই। কিন্তু লোকের চিন্তায় ও আচরণে উক্ত মনীষীদের প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ। রাজনৈতিক বিষয়ে সচরাচর যে উৎসাহ দেখা যায় তার পিছনে যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তা অপেক্ষা গালভরা আদর্শের বুলি আর গঠনমূলক প্রয়াসের পরিবর্তে বাহ্য-আন্দোলন-সর্বস্ব কাজের উত্তাপই প্রবল।

চারটি সাধারণ নির্বাচন পার হয়ে আসার পরও দেশে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে ওঠে নি। মানুষের স্থায়ী কল্যাণসাধনার পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ সন্ধানী মনোভাব এবং দলের মধ্যে আদর্শ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থের লড়াই বড় হয়ে উঠেছে। মানুষ হয়েছে দলীয় রাজনীতি ও নেতৃত্বের খেলার বস্তু। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। তাই তাদের কাছে রাজনীতি বিষয়টি অরুচিকর হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্যে প্রতিটি মানুষকে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন দল ও নেতাদের ভরসায় না থেকে নিজের স্বাধীন চিন্তা, বস্তুনিষ্ঠ বিচারশক্তি ও বিবেকের সাহায্যে রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

—

এক : ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঐ সময় ইউরোপে দুটি বিপ্লব ঘটে, যার প্রভাব সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। তার একটি রাজনৈতিক ও অপরটি অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক বিপ্লবটি ঘটেছিল ফরাসী দেশে— যার ফলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করে। অর্থনৈতিক বিপ্লবটি সূচিত হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে— এসেছিল শিল্প-বিপ্লব।[১]

বুর্জোয়া (Bourgeois) কথাটি একটি ফরাসী শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নগরবাসী। পূর্বে নগরকে বলা হত 'বুর্' (Bourg); বুর্-এর অধিবাসীরা বুর্জোয়া বলে অভিহিত। বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব হয় ঐসব নগরগুলিতে। ফরাসী দেশে সমুদ্রসদৃশ সামন্ততান্ত্রিক (Feudal) সমাজব্যবস্থায় নগরগুলি ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। ক্রমে ঐ দ্বীপগুলি যেন স্ফীতিলাভ করে সামন্ততান্ত্রিক সমুদ্রকে শুষে নেয়। দ্বীপ, নগর বা বুর্ যাই বলা হোক না কেন তারা শিল্পোন্নয়নে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে ইউরোপে উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মানুষের পরিবর্তে উৎপাদনে যন্ত্রই ক্রমশঃ নিয়োজিত হতে থাকে। মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থারও দ্রুত সম্প্রসারণ হয়। নানাবিধ পেশারও উদ্ভব ঘটে। কৃষিকর্ম ছেড়ে ক্রমে লোকে নগরীর কলকারখানার প্রতি ধাবমান হয়। নগর-জীবনের উন্নত ও আধুনিক উপকরণও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকশিত হতে থাকে। এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নগবাসীরাই বুর্জোয়া নামে পরিচিত। নগরে জীবিকান্বেষণে আগত সাধারণ নির্বিত্ত লোকেরা ক্ষুদে বা পেটি বুর্জোয়া বলে অভিহিত।[২]

বুর্জোয়ারা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। তাদের সঙ্গে সাবেকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারক ও বাহক সামন্ততান্ত্রিকদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। উৎপন্ন পণ্যের পরিবহন ও বাণিজ্যে সামন্ত প্রভুরা নানাভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

নগরগুলি ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ সামন্ত-অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়েই চলত। এদিকে সামন্তদের অধীনে ক্রীতদাসবৎ দায়াবদ্ধ কৃষকেরা (serf) অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নগরের দিকে পলায়নপর হয় ; কর্ম সংস্থান ও উন্নত জীবন তাদের সেদিকে আকর্ষণ করত। ফলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিকদের তুমুল বিরোধ শুরু হয়। প্রবল অত্যাচারী সামন্তদের দমনের প্রয়োজন সবাই অনুভব করে। সামন্তদের দাপটে সারা সমাজই জর্জরিত— সকলেই চায় তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি। বুর্জোয়ারাই সামন্ততন্ত্রীদের উৎপীড়ন সবচেয়ে বেশী অনুভব করে। তারাই সেজন্যে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই বিপ্লবই সংক্ষেপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ইতিহাসের ধারায় এ-বিপ্লব সকল দেশেই অবশ্যম্ভাবী। রামমোহন রায় ভারতে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বোধন করেছিলেন।[৩]

রামমোহন ও জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৯) অনতিকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে হেগেল এবং ভারতে রামমোহন থেকে সর্বাধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার শুরু।

ইংলণ্ডে থাকাকালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে লেখা এক পত্রে[৪] সংক্ষেপে নিজের জীবনকথা প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছিলেন যে ষোল বছর বয়সে তিনি পৌত্ত-লিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক ('হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী') রচনা করায় পিতা ও আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ ঘটে ; ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে দেশপর্যটনে বহির্গত হন ; ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ তিনি ভারত বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। সে সময় তিনি সুদূর তিব্বত পর্যন্ত চলে যান। ইতঃপূর্বে বারো বছর বয়সকালে আরবী ও ফারসী শেখার জন্যে তাঁকে পাটনায় পাঠানো হয়। সেখানে আরবী ভাষায় তিনি ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন এবং আরবীতে কোরান ও সুফী দার্শনিক কবিদের গ্রন্থ পাঠেরও সুযোগ ঘটে। এরপর হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের জন্যে তাঁকে তাঁর পিতা বারাণসীতে পাঠান। সেখান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মন সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকত। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার সম্পর্কে তাঁর মনে তীব্র সংশয় উপস্থিত হয়। প্রথমে ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং পরে হিন্দুধর্মের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মনকে ভিন্ন পথে চালিত করে। ফলে তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচনা ও দেশ ভ্রমণে নির্গত হন।

স্বদেশ ও স্বগৃহে ফিরে আসার পর তিনি প্রাচীন শাস্ত্রচর্চায় রত হন। কিন্তু

কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় তিনি গৃহ হতে বিতাড়িত হন। জীবিকার্জনের জন্যে তিনি রংপুরে কালেক্টর জন ডিগবির অধীনে সেরেস্তাদারের চাকরিতে যোগ দেন। পরে তিনি দেওয়ানীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রংপুরে অবস্থান (১৮০৯-১৮১৪) তাঁর জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পরস্পরের সাহায্যে উভয়ে একত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিদ্যা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। বাইশ বছর বয়স থেকে রামমোহন ইংরেজী শিখতে শুরু করেন। কার্যোপলক্ষে রামমোহন রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। রংপুরে অবস্থানকালে তিনি ইসলাম, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তিনি নানা বিষয় ও শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিতর্কে যোগদান করতেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সহায়তায় তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর অধ্যয়ন করেন।

ডিগবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার ফলে একদিকে রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ ঘটে ও সেইসঙ্গে তাঁর মনে রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত হয়। ডিগবির কাছে বিলাত থেকে বিস্তর পত্রপত্রিকা আসত। সেগুলি থেকে রামমোহন ইউরোপীয় রাজনীতির খবরাখবর সাগ্রহে পাঠ করতেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের সংবাদই তাঁর কাছে তখন সবচেয়ে ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল।[৫]

ইতঃপূর্বে ফারসীতে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' (*A Gift to Deists*) প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি পৌত্তলিকতা ও বিভিন্ন ধর্মের প্রচলিত নানাবিধ মিথ্যাচার ও ভ্রান্তির কুফল দেখিয়েছেন। এই সময়ে প্রকাশিত 'মনাজারাৎ-উল্-আদিয়ান্' নামে তাঁর আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর সার্বভৌম ধর্মচিন্তাও এই সময় অঙ্কুরিত হয়।

১৮১৪ সালে কোম্পানির চাকরি ছেড়ে রামমোহন কলকাতায় চলে আসেন। পরের বছর তিনি 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন; উদ্দেশ্য: আধ্যাত্মিকতার চর্চা ও আলাপ-আলোচনা। আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তাঁকে ঘিরে দেশের গুণী-জ্ঞানীর এক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যুগপৎ শক্তিশালী একটি বিরুদ্ধ পক্ষও যে গড়ে উঠেছিল সেকথাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

একেশ্বরবাদের প্রচারে রামমোহনের নেতৃত্ব সারা দেশের বিদ্বৎসমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কেও তাঁর একটি বিতর্কমূলক গ্রন্থ চাঞ্চল্যের সূত্রপাত করে। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারি মার্শম্যান এবং পরে ডঃ টাইটলারের সঙ্গে তাঁর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচণ্ড মসীযুদ্ধ লেগে যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রচলিত

ত্রিত্ববাদ (Trinitarianism), খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, খ্রীষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি সম্পর্কে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁর বিতণ্ডা চলে। ঐসব তর্কযুদ্ধ রামমোহনের অনুকূল হয়। পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডাম নিজ মত পরিত্যাগ করে রামমোহনের সঙ্গে যুক্ত হন। অ্যাডামকে তাঁর 'ইউনিটারিয়ান মিশন' স্থাপনে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন। তারই রেশ বজায় রেখে পরিশেষে তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন (আগস্ট ১৮২৮)।

রামমোহনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মধর্ম নামে এক নতুন ধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন একটা সম্প্রদায় গড়ে তোলার তাঁর কোনও অভিপ্রায় ছিল না।[৬] উক্ত সভার উপাস্য কি ? উপাসক কে ? এবং উপাসনার প্রণালী কি— এই সম্পর্কে সভার 'ট্রাস্ট ডীড' থেকেই সব কিছু পরিষ্কার জানা যায়। উপাস্য হলেন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বর। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যে-কোনও মানুষ সেখানে উপাসনার অধিকারী। উপাসনাপ্রণালী সম্পর্কে 'ডীড'-এ বলা হয়েছে যে কোনও প্রকার ছবি, প্রতিমূর্তি তথায় ব্যবহৃত হবে না ; নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোনও সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হবে না ; আহারপানাদি হবে না ; কোনও জীব, পদার্থ, মানুষ বা সম্প্রদায়ের উপাস্যকে বক্তৃতা বা সংগীতে শ্রদ্ধা, ঘৃণা বা উল্লেখ করা চলবে না। প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতিকল্পে এবং সর্বসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যে উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। এককথায় সভার উদ্দেশ্য সার্বভৌমিক উপাসনা।[৭]

সমাজসংস্কারকর্মে রামমোহনের ঐতিহাসিক অবদান সুবিদিত। এদেশের নারীসম্প্রদায়কে সামাজিক নিষ্পেষণ থেকে তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত করার প্রয়াসী হন। স্ত্রী-শিক্ষার সুযোগদানের বিষয়ে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁকে যথেষ্টই যত্নবান হতে দেখা গেছে। সহমরণ প্রথা রদের জন্যে রামমোহনের অক্লান্ত প্রয়াস ও দেশব্যাপী আন্দোলনের নেতৃরূপে তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। তবে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানা যায় না।

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তারে রামমোহনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবার

বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্স্টের নিকট লিখিত তাঁর পত্রটি ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।[৮] শিক্ষাবিস্তারের তাগিদে তিনি নানাবিধ গ্রন্থের মধ্যে একটি ভূগোল ও ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। বাংলা গদ্যরচনায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ মনে করা হয়। নানাধরনের কর্মতৎপরতার সুবিধার্থে রামমোহন চতুর্বিধ উপায় অবলম্বন করেন :

১. আলোচনা ও বিতর্কের আয়োজন ;

২. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য পন্থায় শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ;

৩. গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ ;

৪. সভা প্রতিষ্ঠা।[৯]

১৮২১ সালে রামমোহন 'সম্বাদকৌমুদী' ও *Brahmunical Magazine* নামে দুটি পত্রিকার প্রকাশন শুরু করেন। পরের বছর ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' নামে আর একটি পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকা দুটির সাহায্যে তিনি সহমরণ-প্রথা ও অন্যান্য কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালান। ১৮২৩ সালে জন অ্যাডাম নামক জনৈক সিভিলিয়ান অস্থায়ীভাবে গবর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। সমকালীন দেশী ও বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রে সরকারি ক্রিয়া-কলাপের সমালোচনা থাকত বলে জন্ অ্যাডাম চুপিসাড়ে একটি অর্ডিনান্স জারি করেন। সংবাদপত্রের এরূপ স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। কোনও ফল না হওয়ায় বিলাতে সম্রাটের কাছেও এর বিরুদ্ধে এক গণস্বাক্ষরসমন্বিত প্রতিবাদপত্র[১০] প্রেরণ করেন। এবং প্রতিবাদ হিসাবেই তিনি তাঁর 'মীরাৎ'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ১৮৩৫ সালে মেকলের সাহায্যে লর্ড মেটকাফ ঐ প্রেস-আইন উঠিয়ে দিয়ে জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্বদানই রামমোহনের একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর প্রতিটি তৎপরতার পিছনে থাকত সুস্পষ্ট দার্শনিক সমর্থন। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ মন্থন করে তিনি সর্বপ্রকার কুপ্রথা ও ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজদর্শন ও বিজ্ঞান তিনি নিষ্ঠাসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ চিন্তা এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে বৈশিষ্ট্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

স্বনামে ও বেনামে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় রচিত রামমোহনের মোট গ্রন্থসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। কমপক্ষে আশিটি গ্রন্থের মধ্যে ৩১টি বাংলা ও ৪৬টি ইংরেজী। তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি ইংলণ্ড

ও আমেরিকায় প্রকাশিত। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা যে-সব গ্রন্থ অথবা পুস্তিকায় পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮টি।* এলাহাবাদের পাণিনি কার্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী রচনাবলী (১৩১২ বঙ্গাব্দ) ছাড়াও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত সংস্করণে (১৮৮৫-৮৭) ও কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ থেকে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী রচনাবলীতে (১৯৪৫-৫১) এই লেখাগুলি পাওয়া যায়।[১১]

ইউরোপ ভ্রমণের তাঁর এক দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল। এ-সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন: 'এই সময়ে ইউরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দল বৃদ্ধি হয় সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।'[১২] তাঁর এই সমুদ্রযাত্রাই তৎকালে এক মস্ত বৈপ্লবিক কাজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে আধুনিককালে তিনিই প্রথম এক সাংস্কৃতিক সেতু নির্মাণ করেন।

দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলমের দৌত্যকার্যে তাঁর ইউরোপ যাত্রার সুযোগ ঘটে। নইলে সুযোগ আর হয়ত পেতেন না, কারণ ইদানীং আর্থিক অবস্থা তাঁর বিশেষ অনুকূল ছিল না। বিলাত যাত্রার কারণ হিসাবে তিনি বলেন:

> 'পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসীগণের প্রতি গবর্নমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকবিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্মচারী-দিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।'[১৩]

---

* 1. Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance (1822); 2. Petitions against the Press Regulation to the Supreme Court and to the King in Council (1823); 3. A Letter to Lord Amherst on English Education (1823); 4. Final Appeal to the Christian Public (1823); 5. Brief Sketch of the Ancient and Modern Boundaries and History of India (1832); 6. Questions and Answers on the Judicial and Revenue Systems of India,... (1832); 7. Remarks on Settlement in India by Europeans (1831); 8. Speeches and Letters.

বিলাত যাত্রার পূর্বেই রামমোহনের নাম ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিলাতে পৌছনর পর তিনি সেখানকার বিদ্বৎসমাজে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। উইলিয়াম রস্কো, জেরেমি বেনথাম প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। বিভিন্ন বিষয়ে সেইসব চিন্তানায়কদের সঙ্গে তিনি গভীর আলোচনা ও বিতর্কে যোগ দিতেন। সমাজতন্ত্রবাদের আদিগুরুরূপে অভিহিত রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তাঁর এক প্রচণ্ড বিতর্ক হয়। ঐসময় রামমোহনের সম্মানার্থে লণ্ডনের ইউনিটারিয়ানরা এক মহাসভার আয়োজন করেন। লিভারপুল ও লণ্ডনে তাঁকে জনসংবর্ধনা জানানো হয়।

হাউস অব কমন্স নিয়োজিত এক কমিটির কাছে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা ও রাজস্ব সম্পর্কে তিনি তিনটি স্মারকপত্র পেশ করেন। চতুর্থ উইলিয়ামের অভিষেক অনুষ্ঠানে রামমোহনকে বৈদেশিক রাজদূতের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু বক্তৃতা ও বিবৃতিদান করেন। সহমরণ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আনীত একটি আবেদন তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে পার্লামেণ্টে নাকচ হয়ে যায়। কোম্পানির আসন্ন নতুন সনদে রামমোহন ভারতীয়দের সুবিধার্থে যে-সব সুপারিশ করেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই অনুমোদন লাভ করে।

ইতিমধ্যে তিনি বিপ্লবের পুণ্যপীঠ ফরাসীদেশ পর্যটনে যান। সেখানেও তিনি যথেষ্ট সংবর্ধনা ও রাজসম্মান অর্জন করেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রামমোহনকে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু সে-অনুরোধ রক্ষার পূর্বেই ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

দুই : ধর্মচিন্তা

সুফী ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে রামমোহন পাটনায় আরবী ও ফারসী শিক্ষাকালে ইসলামী ভাবধারায় অবগাহন করেন। মূল কোরান থেকে শুরু করে ইসলাম ধর্মের আচার-বিচার সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থ তথা অন্যূন ৬৩টি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে জ্ঞানসঞ্চয় করেন। মনে করা হয় যে এই সময়ে মুসলমান ইউনিটারিয়ান

চিন্তার প্রভাবেই উত্তরকালে তাঁর মনে একেশ্বরবাদের আদর্শ ঘনীভূত হয়। ইসলামের মূল ধর্মাদর্শচ্যুতি এবং পরবর্তীকালে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথা নিপুণভাবে দেখানোর ফলে তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলবী' আখ্যা দেওয়া হয়।

এরপর বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকালে তিনি হিন্দুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করেন এবং বিশেষ করে স্মৃতি ও উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ঔপনিষদ একেশ্বরবাদ তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। পরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিষ্কর্ষও তাঁর অন্তরে অনুপ্রবেশ করে।

কর্মজীবনে তিনি খ্রীষ্টধর্ম অধ্যয়নের এক বিরাট সুযোগ পান। হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় সমগ্র বাইবেল ছাড়াও ইহুদী ও পার্শী ধর্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ তথা সেমিটিক সংস্কৃতিধারার সম্যক পরিচয় লাভ করেন। খ্রীষ্ট ধর্মের মূলশাস্ত্র বহির্ভূত আচার, অনুষ্ঠান ও চিন্তা সম্পর্কে সমালোচনা করায় তাঁর সঙ্গে পাদ্রীদের বিরোধ দেখা দেয়। এরপর তিনি তুলনামূলক ধর্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। পশ্চিমী সংস্কৃতির অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও শিল্পোন্নয়ন এবং যুক্তিনির্ভর চিন্তাচর্চা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি শুধুমাত্র ধর্মদর্শনের বাতবিতণ্ডায় আবদ্ধ না থেকে সামাজিক আচারানুষ্ঠানের বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও সংস্কারকর্মে মনোনিবেশ করেন। আইন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্বে গভীর অধ্যয়ন তাঁকে সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারে উদ্বুদ্ধ করে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন:

> 'জীবনকে সতেজ, কর্মকে সার্থক এবং ধর্মকে ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার আর অন্যদিকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।'[১৪]

তাঁর কাছে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না; দুটিকেই তিনি মনুষ্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে জ্ঞান করতেন।

জীবনব্যাপী তিনি বহুদেবত্ব ও পৌত্তলিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অশাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ধর্মের অপব্যাখ্যাশ্রয়ী কদর্য লোকাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। মানুষকে তিনি চারটি দিক থেকে বিচার করেছেন: ১. প্রতারক; ২. প্রতারিত; ৩. প্রতারক ও প্রতারিত; এবং ৪. প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়। কুসংস্কারের ঐতিহাসিক কারণের পরিবর্তে তিনি মনস্তাত্ত্বিক কারণ দর্শিয়েছেন। তবে সকল কিছুর মধ্যে তিনি সৃষ্টিকর্তা মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বস্বীকার করতেন। তাঁর মতে সকল ধর্মেরই মূলে সেই জগৎকর্তার অবস্থিতি স্বীকৃত।

রামমোহন বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার গ্রন্থের এবং তলবকার (কেন), ঈশা, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য— এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচার করেন। এই প্রচেষ্টার সম্ভাব্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন যে দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজা ঐকাজে উদ্যোগী হন। ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করাই রাজার শাস্ত্রপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৫]

শংকরের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি সংশয়ী ছিলেন। তাঁর ব্রহ্মপ্রত্যয়ে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই স্বীকৃত— সত্তা একাধারে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত। বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয়ে উদ্ভূত মায়ারূপে প্রতিভাত সগুণ ব্রহ্ম জীবের অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই ফল। অনাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া মায়ারই বিক্ষেপণ, তথা অবিদ্যায় আচ্ছন্ন জীবের দৃষ্টিতে পরম সত্তা বিশ্বের আবরণে অবগুণ্ঠিত— যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের অধ্যাস। মায়াময় এই জগৎ জীবের নিকট স্বাধীন ও সত্যরূপে প্রতিভাত। চিৎ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাব পরিস্ফুট। এও জীবের ভ্রমমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে অদ্বয় উপলব্ধি ঘটলে জীবের দৃষ্টি হতে মায়া অপসারিত হয়। এই ব্যাখ্যায় বিশ্বপ্রপঞ্চ, জীব ও মায়ার সঙ্গে সর্বময় সগুণ ব্রহ্মের সম্পর্ক দেখা যায়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম মায়ার অতীত। জাগতিক দুঃখ ও বেদনা তথা মায়ার বন্ধন ও সংগতির উর্ধ্বেই ব্রহ্ম বিরাজ করেন। কাজেই অদ্বয় পরম ব্রহ্ম নির্গুণই। সগুণ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি পারমার্থিক নয়। জীবের জন্যে ও তারই মধ্যে এই আপেক্ষিক অস্তিত্ববত্তা ততক্ষণই বিদ্যমান যতক্ষণ না জীবের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটছে এবং সত্তার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়ে যতক্ষণ না তার মোক্ষলাভ হচ্ছে। সেজন্যে জীবকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম ঈশ্বরেরই সৃষ্টি এবং মানুষকে সেই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। মানবাত্মা পরমেশ্বরের সঙ্গে লীন হয়ে যায় যখন অদ্বয়ের অনুভূতি বা জ্ঞানের প্রস্ফুরণ ঘটে। সেই জ্ঞান কেবল পরিচিন্তন বা উপলব্ধির দ্বারা অর্জিত হয় না। চাই উপাসনা ও সমাধির মধ্যে দিয়ে চিত্তের পরিশোধন এবং ধ্যান ও যোগক্রিয়ায় উদ্ভাসিত হৃদয়।[১৬]

ধ্যান ও উপাসনায় গুরুত্ব দিলেও মোক্ষলাভের পূর্বে নিষ্কাম কর্মকেও রামমোহন সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞাতার কাছে নিষ্কাম কর্ম ও অকর্ম, আশ্রম ও অনাশ্রম উভয় পথই তিনি দেখিয়েছেন। জীবাত্মা ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পরিমিশ্রণ লক্ষণীয়।[১৭]

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্মের যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে রামমোহন এক

সমন্বয়কারী ঐকমত্যের সন্ধান পান। সকল ধর্মেরই মূল আদর্শ মানবপ্রীতি, সত্যের সন্ধান, সদাচার ও জগৎকর্তার উপাসনা। কিন্তু ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও জলবায়ু-সম্পৃক্ত কারণে তাদের আচার ও অনুষ্ঠান, প্রতীক ও পদ্ধতি ভিন্ন। এবং মূল ধর্মাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সবাই পরবর্তীকালে নানা সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

রামমোহন সর্বধর্মমতাবলম্বীদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াসী হন। প্রচার করেন তাঁর সার্বভৌমিক ধর্মীয় মতবাদ। কিন্তু কোনও ধর্মের বৈশিষ্ট্যকেই তিনি আঘাত করতে চান নি। কিংবা বিভিন্ন ধর্মের অবলুপ্তি বা তাদের একীভূত করতে চান নি। ফলে দেশের সকল পাদ্রী, পণ্ডিত ও মৌলবীরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামিকে খর্ব করার জন্যে সেইসব ধর্মের মূল আদর্শ সমূহ তুলে ধরা। সে বিষয়ে তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন :

১. বিভিন্ন ধর্মের মূল আদর্শের বিচ্যুতি ঘটায় উদ্ভূত কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ, সংঘাত ও বৈরিতার নিরসন।

২. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বীয় মত ও পথে জীবন নির্বাহ করবেন। সেগুলির অবলুপ্তি বা পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তি ঘটবে না। কিন্তু তাঁরা পারস্পরিক সংযোগ, একাত্মবোধ, সহিষ্ণুতা ও সাহচর্যের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে এক মহামানবজাতি গঠনে সহায়ক হবেন।

৩. ধর্মীয় 'অথরিটি' যেক্ষেত্রে মানুষের আহারবিহার, বিবাহ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অহেতুক উৎপীড়নের কারণ হিসাবে বিবেচিত সেখানে মানুষকে 'greatest good of the greatest number'-এর নীতিতে মুক্তি দিতে হবে। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী মানুষকে দিতে হবে চিন্তার পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা। সার্বজনীন মঙ্গলের দৃষ্টিতে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে ধর্মই সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। সমাজ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অভিব্যক্ত দিব্য সত্য ও স্বীয় ধর্মমত বজায়ের অধিকার সাপেক্ষ হিন্দুর 'স্মৃতিশাস্ত্র', ইসলামের 'শরিয়ৎ' ও খ্রীষ্টধর্মের 'ক্যানন'-গুলির সমন্বয়ে সর্ববাদীসম্মত এক সার্বভৌম বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।[১৮]

তিন : রাষ্ট্রদর্শন

রামমোহনকে আধুনিক ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদার্শনিক বলা যায়। শুধু আধুনিক যুগই বা কেন—মধ্যযুগেও যখন ভারতে দর্শনচিন্তার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় তখনও রাষ্ট্রদর্শন বা তত্ত্বে বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হত না। কারণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ কোনও সুবাদ ছিল না; ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পরিশীলিত জনমতেরও কোনও প্রশ্ন ও প্রয়োজন ছিল না—রাষ্ট্রনীতি ছিল শাসনকর্তাদেরই একচেটিয়া বিষয়। জনজীবনে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজেরই ছিল প্রাধান্য। ছোট ছোট জনপদগুলির অস্তিত্ব ছিল স্বায়ত্তশাসিত ও পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। এদেশের মানুষ তাই নিষ্কুণ্ঠচিত্তে ইংরেজদের স্বাগত জানিয়েছিল। ইংরেজরা এখানে যতই শোষণ ও অত্যাচার করে থাকুক্ না কেন তারা দেশটিকে ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করে সুশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে সুসংবদ্ধ করে তোলে। ক্রমে জাতীয়তাবাদের ভূমিকে তারাই করে তোলে উর্বর। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের গতিহীন ধারার সঙ্গে স্রোতস্বিনী আধুনিকতার সংযোগ সাধন করে। প্রসঙ্গত মার্কসের একটি উক্তি স্মর্তব্য :

> 'England, it is true, is causing a social revolution in Hindostan, was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution.'[১৯]

রামমোহনের রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রণালী ছিল আরোহী (Inductive)—অর্থাৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিষ্ঠিত; সাধারণভাবে পূর্বচিন্তিত সিদ্ধান্ত এবং জ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে অবরোহী (deductive) পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কোনও রাষ্ট্রতত্ত্ব তিনি রচনা করেন নি। নানা সূত্রে লিখিত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, স্মারকলিপি অথবা বক্তৃতায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করেছেন।[২০]

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে বেনথাম ও মনটেস্কুর চিন্তাই তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। মনটেস্কুর প্রভাবেই শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ

(Separation of Powers) এবং আইনের শাসন (Rule of Law) প্রতীতি তাঁর বহু লেখায় পাওয়া যায়। বেনথামের প্রভাবেই তিনি প্রকৃতিদত্ত অধিকার প্রত্যয় মানতেন না। এবং সেই প্রভাবেই তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথক-ভাবে দেখতেন। তিনি সামাজিক ও ফৌজদারী আইনকানুন প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন এবং স্বীয় নীতি বিবৃত করেন। তাঁর সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় বেনথামের হিতবাদী (Utilitarian) প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে বেনথামের সঙ্গে একটা বিষয়ে তাঁর পার্থক্য ছিল এই যে বেনথাম মনে করতেন যে দুনিয়ার সব জাতই দেশ, কাল, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে মূলতঃ একই ধারায় গঠিত—যে-কোনও দেশের মানুষকেই একই আইন দ্বারা চালিত করা যায়। পক্ষান্তরে রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বের সকল মানুষের জীবন একই ধাঁচের আইনে চলতে পারে না; প্রত্যেক দেশেরই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে আইন-কানুন রচিত হওয়া উচিত। আইনের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি বিরোধী মত আছে। একদল মনে করেন আইন ধর্ম ও সমাজের ক্রমবিবর্তনে স্বাভাবিকভাবে ও স্বতঃই প্রচলিত হয়। এই দলের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্যাভিগনি ও মেইন। পক্ষান্তরে অন্যদল মনে করেন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশে বিচার বা ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে আইন উদ্ভূত হয়। এদলের প্রধান সমর্থক ছিলেন অস্টিন। প্রথমোক্ত দল শেষোক্ত মতকে অস্বীকার করেন নি। তবে তাঁরা মনে করতেন যে প্রচলিত রীতিনীতি বা আইনকানুনকে সার্বভৌম শক্তি বা সংস্থা অনুমোদন বা পরিমার্জন করে থাকেন। তবে সব সময়েই তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। রামমোহন প্রথমোক্ত প্রতীতির সমর্থন করেন :

> 'In every country, rules determining the rights of succe-ssion to and alienation of property first originated in the conventional choice of the people, or in the discretion of the highest authority, secular or spiritual, and those rules have been subsequently established by the common usage of the country, and confirmed by judicial proceedings'.[২১]

সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীনের আইন প্রণয়নের অধিকারকে রামমোহনও অস্বীকার করেন নি। তবে মানুষের দীর্ঘদিনের প্রচলিত কোনও বিধিব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করে স্মৃতিকার বা আইনসভার কোনও কিছু করা অনুচিত বলে তিনি মনে করতেন। যুক্তিনির্ভর চিন্তা ও জনকল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি আইনের মানদণ্ড করেন। সেজন্যে তিনি একথাও বলেছেন :

'But I am satisfied that an unjust precedent and practice, even of longer standing, cannot be considered as the standard of justice by an enlightened government'.[২২]

আগেই বলা হয়েছে যে রামমোহন নীতি (morality) ও আইনকে পৃথক-ভাবে দেখেন। অনেক দৃষ্টান্ত[২৩] দিয়ে দেখিয়েছেন যে আইন বহু ক্ষেত্রেই নীতি-মুখীন হয় না এবং স্থান, কাল, অবস্থা, প্রয়োজন ও কার্যকরিতার দিক থেকে সম্ভবও নয়। কথাটা উঠেছিল বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' প্রথার নৈতিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে। প্রস্তাব উঠেছিল যে ঐ-প্রথা অনুযায়ী পিতার সন্তানসন্ততিদের বঞ্চিত করে সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করার অধিকারকে নৈতিক দিক থেকে বে-আইনী করা হোক। রামমোহন তখন ঐসব নজির দেখিয়ে বলেন যে অকল্যাণকর অনেক আইন যেখানে যেকারণে বলবৎ আছে ঠিক সেইদিক থেকেই 'দায়ভাগ' প্রথা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। এখানে রামমোহনের সঙ্গে হিতবাদী বেনথামের মতভেদ সুপরিস্ফুট।

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আইন ও সংবিধান সম্পর্কে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন সংবিধান বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনের চিন্তা তাঁকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।[২৪]

রামমোহনের বিলাত যাত্রার পিছনে একটি প্রধান কারণ ছিল যে তার অনতিকাল পরে ভারতের প্রশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও কোম্পানির চার্টার নূতনীকরণের সিদ্ধান্ত হবে বলে ঠিক ছিল। ভারতে প্রযোজ্য আইনকে তৎকালে 'রেগুলেশন' বলা হত। ঐ-সব রেগুলেশন ছিল তিন ধরনের :

১. প্রথম পর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম এলাকার (কলকাতা) প্রয়োজনে রুলস, রেগুলেশন্স এবং অর্ডিনান্স এখানকার কর্তৃপক্ষ স্থির করতেন ও সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে সেগুলি তারপর টাঙানো থাকত। দুমাসের মধ্যে সেগুলির বিরুদ্ধে কারো কিছু বক্তব্য বা আবেদন থাকলে তা বিবেচিত হত। রাজার অনুমোদন নিয়ে সেগুলি তারপর কার্যে পরিণত হোত।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতার বহির্ভূত এলাকার জন্যে যেসব রুলস-রেগুলেশন সরকার প্রস্তুত করতেন সেগুলি বিলাতের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন অথবা নাকচ করে দিতেন।

৩. তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের রেগুলেশনগুলি ছিল কর নির্ধারণ সম্পর্কে। এক্ষেত্রে

কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ও বোর্ড অব কমিশনার্সের অনুমোদন লাগত। এইসব নিয়মকানুনকে আরও সহজ ও সরল করার জন্যে নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি বিভিন্ন ব্যক্তির পরামর্শ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। সেই সাক্ষ্যদানের জন্যে রামমোহন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ভারতের প্রশাসন সম্পর্কে দুটি মত ছিল। একদল বলতেন যে ভারতীয় প্রশাসন ভারতে অবস্থিত একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক হওয়া ভাল। অপর দলের অভিমত ছিল এই যে ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধীনেই অধিক কল্যাণকর হবে। রামমোহন শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য তাঁর চিন্তা ও যুক্তি অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।[২৫]

রামমোহন বেনথামের প্রভাবেই এই মত পোষণ করতেন যে আইন ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সার্বভৌম শক্তির উপর বর্তায়। ভারতে গবর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা সীমিত। রাজা ও পার্লামেণ্টের ক্ষমতাই চূড়ান্ত। তাই তিনি সরাসরি পার্লামেণ্টের অধীনে থাকা পছন্দ করতেন। তার সমর্থনে অনেক যুক্তিই তিনি দর্শিয়েছিলেন: পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, সেখানকার জনসাধারণের মনে ভারতের প্রতি দরদ পার্লামেণ্টেই প্রতিফলিত হতে পারে। এছাড়া আইন প্রণয়নকারী (legislative) এবং আইনপ্রয়োগকারী (executive) পৃথক থাকা কাম্য।[২৬] সেজন্যে আইন প্রয়োগকারী ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ আমলাদের উপর আইন রচনার ক্ষমতাদান পরিণামে ক্ষতিকর হবে বলে তিনি মনে করতেন। এদেশে প্রেরিত আমলাদের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি ও আক্রোশ আইন রচনার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুবেই। যেমন—অ্যাডামের প্রেস অর্ডিনান্স। কাজেই আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের উপরই ন্যস্ত থাকা সমীচীন। ভারতে কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব এবং শাসনও অবশ্য তিনি চান নি। তবে প্রশাসনের সুবিধার্থে তত্ত্বাবধান ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ও বোর্ড অব কণ্ট্রোলের যুগপৎ অস্তিত্বের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন—যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচার না ঘটে। একথা রামমোহন অনুভব করতেন যে সুদূর ইংলণ্ড থেকে ভারতের প্রশাসনে প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাবহেতু নানা অসুবিধা দেখা দেবে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কে আইন রচনা সম্পর্কে তিনি তিনটি অভিমত জানিয়েছিলেন:

১. সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। দেশোপযোগী কল্যাণকর আইন

প্রবর্তনের সুবিধার্থে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকরিতার দিক থেকে চারটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন :

ক. দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে জনসাধারণের মতামত সরকারের নিকট গোচরীভূত করার সুবিধা এবং সরকারের দিক থেকেও জনমত নির্ণয় করার পক্ষে সংবাদপত্রই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে জনমত সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না।

খ. জনসাধারণ তাদের অসন্তোষ সংবাদপত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করে তার প্রতিকার চাইবে। কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশের কোনও মাধ্যম না থাকলে সেগুলির সুরাহা হবে না। ফলে বিক্ষোভ দেখা দেবে।

গ. ভারতে সরকার জনসাধারণের উপর কোনও উৎপীড়ন সৃষ্টি করলে এখানকার অধিবাসীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা অনায়াসেই ইংলণ্ডের অধিবাসীদের গোচরীভূত করতে সক্ষম হবে।

ঘ. কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের পক্ষেও এক মস্ত সুবিধা থাকবে যে তাঁরাও আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় জনমনের প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন।

২. দ্বিতীয় পন্থা স্বরূপ রামমোহন বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কমিটি বা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন। কমিটি বা কমিশনের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের অভিমত দ্রুত ও প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবেন। এর সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা সরকারের উদ্যোগে সংবাদপত্র প্রকাশন। শেষেরটিকে রামমোহন গুরুত্ব দেন, কারণ তাতে জটিলতা ও ব্যয়বাহুল্য কম।

৩. ভারতের জন্যে পার্লামেন্টের কল্যাণকর আইন প্রস্তুতির প্রয়োজনে জনমত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তৃতীয় যে পন্থাটি তিনি সুপারিশ করেছিলেন সেটি হোল এদেশের বনেদী, বিদ্বান ও বিত্তবানদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মতামত জানার ব্যবস্থা। রামমোহন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে সরকারকে প্রশাসন সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ নিতে সুপারিশ করেন। ঐসব ব্যক্তির মতামতসহ খসড়া আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্যে ভারত সরকারের প্রেরণ করা উচিত।[২৭]

রামমোহনের এইসব মতামত ও সুপারিশ প্রকারান্তরে দাঁড়ায় এই যে আইনের খসড়া তৈরি করবেন ভারত সরকার ; সেগুলি সম্পর্কে মতামত জানানো ও সমালোচনার অধিকারই কেবল ভারতীয়দের থাকবে ; আইনকে চূড়ান্তভাবে

বিধিবদ্ধ করবেন বিলাতের পার্লামেন্ট। রামমোহনের এই মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। নইলে যে-মানুষ অন্যান্য দেশের নিয়মতান্ত্রিক উন্নতি দেখলে উল্লসিত হতেন তিনি কি স্বদেশের জন্যে তা চাইতেন না? বাস্তব দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন যে এদেশের জনগণ অশিক্ষায় আচ্ছন্ন, দেশাত্মবোধের চিহ্ন অপরিস্ফুট; দেশ বিদেশীদের করতলগত; এমতাবস্থায় সরকারী আমলাদের উপর নিয়মতন্ত্রের ভাগ্যভবিষ্যৎ ন্যস্ত থাকলে স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই হবে আধিপত্য। তাতে মনোনীত মুষ্টিমেয় ভারতীয় প্রতিনিধিরা হবেন ঠুঁটো জগন্নাথ। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকাই তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

১৮৩৩ সালে কমন্স সভায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদেয় চার্টার সংশোধিত ও গৃহীত হয়। তার আগে ভারতীয় প্রশাসনের আনুপূর্বিক পর্যালোচনার সময় সিলেক্ট কমিটি প্রশাসন, রাজস্ব, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে রামমোহনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। রামমোহনের আশঙ্কা ছিল যে এদেশে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হলে আমলাতান্ত্রিক বিচার বিভাগ তার উপর খবরদারি করবে। তাই তিনি আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসনকে স্বতন্ত্র করতে চান।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগের তিনি তীব্র আপত্তি জানান[২৮] এবং চুক্তিবদ্ধ চাকরিতে অন্যূন বাইশ বছর বয়সের লোকদের নিয়োগ করাই ছিল তাঁর অভিমত। কমিটিতে একটি কথায় তিনি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন যে বিচারকালে ব্যবহৃত ভাষা বিচারাধীন ব্যক্তিদের নিকট অবোধ্য হওয়াটা অবিচারের নামান্তর। আদালতের খবর প্রকাশের উপযুক্ত কোনও সংবাদপত্রও নেই। বরঞ্চ পঞ্চায়েতের সাহায্যে জুরিগণের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালন সাধারণের পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও উকিলদের নিয়ে জুরি গঠন করা উচিত। ভারতের মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানকার ফৌজদারী আইন পৃথকভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং সেটা হওয়া দরকার সরল, সোজা ও সহজবোধ্য। শাসক ও শাসিতদের সুবিধার্থে তিনি বিচার পদ্ধতির সংস্কার দাবি করেন। ১৮২৭ সালে প্রবর্তিত জুরি আইনে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ফুটে ওঠে। তাতে কোনও খ্রীষ্টানকে হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী জুরি বিচার করতে পারতেন না। ১৮২৯ সালে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্লামেন্টের নিকট একটি স্মারকপত্র পাঠানো হয়। রামমোহন ছিলেন সেই আন্দোলনকারীদের প্রধান প্রবক্তা।

মুক্তির প্রত্যয়

মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় রামমোহন বিশ্বাস করতেন। তাঁর অধিকারতত্ত্ব ভারতীয় ভাবধারার সামাজিক ও সার্বজনীন কল্যাণ-প্রত্যয়েই দানা বাঁধে। অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সহজাত অধিকারের সমর্থনের সঙ্গেই তিনি সমাজসংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতিগত অধিকারের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক মানবিক কল্যাণই ছিল তাঁর কাম্য, মূলতঃ তিনি ছিলেন মুক্তির পূজারী। তিনি লিখেছেন:

> 'If mankind are brought into existence, and by nature formed to enjoy the comforts of society and the pleasure of an improved mind, they may be justified in opposing any system, religious, domestic or political, which inimical to the happiness of society or calculated to debase the human intellect.'[২৯]

সৃজনী সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশ ও মুক্তির তিনি ছিলেন উদ্‌গাতা; সকলকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অর্জনে উৎসাহ দিতেন। অযৌক্তিকতা ও কুসংস্কারের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন। ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তির সঙ্গেই জাতীয় মুক্তির চেতনাও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামকে লিখিত এক পত্রে তিনি ইউরোপীয় ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তির অনিবার্যতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন।[৩০] গ্রীক ও নিয়পলিটানদের মুক্তির সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দিত করেন। ১৮২০ সালে নেপল্‌সে স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংবাদে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামমোহন কলকাতায় এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ফরাসী বিপ্লবেরও তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন রামমোহনের আমলে অচিন্তনীয় ছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিস্পৃহ। শিক্ষিত ও সচেতন সম্প্রদায়ও তখন দানা বাঁধে নি। লোকের মনে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার বিভীষিকা বিরাজ করত। তাদের তখন একমাত্র কাম্য ছিল সুবিচার এবং জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। ইংরেজদের আসার পর থেকেই লোকে এই নিরাপত্তার আস্বাদ পায়। তাই মানুষ নির্বিশেষে সবার কাছেই ইংরেজরা ছিল শান্তির দূত। মুক্তি অর্থে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক এবং

নানাবিধ উৎপীড়ন থেকে নিস্তার। রামমোহনের কাছে মুক্তির প্রত্যয় ছিল তদুপরি আরও গভীর ও ব্যাপক। সে-চিন্তায় জাতি, সম্প্রদায় ও দেশের কোনও সীমানা ছিল না। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি সকল দেশের বিভিন্ন চরিত্রের মুক্তিসংগ্রামকে তিনি শুভেচ্ছা জানাতেন। পশ্চিমী দেশগুলির গণ-তান্ত্রিক মুক্তি একদিন ভারতের শৃঙ্খলমোচন করবে বলে তাঁর আশা ছিল। আন্তর্জাতিকতা ও জাতিসংঘের চিন্তাও রামমোহনের মনে অঙ্কুরিত হয়।

দেশ যেখানে পরাধীন সেখানে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রত্যাশা অলীক। দেশের চরম দুর্গতি ও অরাজকতা দৃষ্টে রামমোহন ইংরেজদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ভারত বেশ কিছু লাভ করেছে— বিশেষ করে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। শিবপ্রসাদ শর্মার নামে লিখিত প্রবন্ধেও তিনি ঐ কথা বলেন। পরমেশ্বরকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান এই বলে :

> '...for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happi- ness, as well as free enquiry into liberty and religious subjects, among those nations to which that influence extends...'[৩১]

রামমোহন বিলাতে সম্রাটের কাছে এক আর্জিতে বলেছিলেন যে মোগল-যুগে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানরা যেসব সুযোগসুবিধা ও অধিকার পেত তা যেন ইংরেজ আমলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেজন্যে তিনি বেশ কিছু সুপারিশও করেছিলেন।

যে-মানুষকে নবভারতের পথপ্রদর্শক বলা হয় এবং যিনি অন্যান্য দেশের মুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন—সেই মানুষই যখন এদেশে ইংরেজ-শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন তখন কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রামমোহন দেশকে ভালবাসতেন। নবীন ভারতের তিনি প্রথম স্থপতি। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁকে পুরোধারূপে স্বীকৃতি দিতে অনেকেই নারাজ। তাঁদের মতে— শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতি যখন ইংরেজদের বিতাড়নে কৃতসংকল্প সে-সময়ে তিনি ইংরেজদের আবাহন জানিয়েছেন।[৩২]

রামমোহনের সমর্থনে ঐ সময়ের রাজনীতি ও সমাজচিত্রের সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিখ ও মারাঠাদের সংগ্রাম ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও আধিপত্যের শেষ বিস্তার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়— মরিয়া হয়ে তারা অস্তিত্ব ও আত্মরক্ষার চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তির শেষ পরাজয় ঘটে সিপাহি বিদ্রোহে (১৮৫৭)। তার মধ্যে না ছিল জাতীয় আবেগ, না কোনও গণমুক্তির আদর্শ[৩৩]। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সেই সামন্ততান্ত্রিক শক্তির মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রামমোহন যে সমর্থন করবেন না সেকথা সহজেই অনুমেয়। তিনি বাক্‌সর্বস্ব রাজনীতির পরিণাম সম্পর্কেও নিশ্চয় সচেতন ছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে তার কোনও পরিচয় বা অনুকূল পরিবেশ ছিল না। রামমোহন চেয়েছিলেন অন্ধকারে নিমজ্জিত মুমূর্ষু জনমনকে উদ্‌ভাসিত করতে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের পুনরুজ্জীবনের তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন— সেদিক থেকে তাঁকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক মডারেট বলা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা যে একদিন আসবে সে-প্রত্যয় তাঁর ছিল। দেশের গঠনমূলক অভ্যুন্নতির সুবিধার্থেই তিনি ইংরেজদের আবাহন জানান। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তীব্র সমালোচনা করতে তিনি পিছপাও হন নি। তিনি এদেশে অত্যাচারী ইংরেজের পরিবর্তে সদয়, শিক্ষিত ও ধনী ইংরেজদের বসবাস চেয়েছিলেন— যাতে প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা এদেশে শিল্পবিপ্লব সাধিত হতে পারে। কিন্তু এদেশ থেকে মুনাফা চালান দেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। ইংরেজদের **Benevolent Despotism**-এর প্রথম কথাটিকে তিনি আবাহন করেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকে রামমোহন যে-গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ১৮২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নিকট লিখিত এক আর্জিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুরের যুক্ত স্বাক্ষরসহ রামমোহন মুদ্রণের স্বাধীনতা দাবি করেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক আর্জিপত্রটিকে অনেকে মিলটনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা'-র সঙ্গে তুলনা করেন। মিলটন আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে মননের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অর্থাৎ মতামত প্রকাশের সর্ববিধ মাধ্যমের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।

সেদিক থেকে রামমোহনের দাবি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়েই সীমাবদ্ধ। ঘটনাটির উৎপত্তি অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল জন অ্যাডামের সংবাদপত্রের Licensing System প্রবর্তনেই দেখা দেয়। তৎপূর্বে ভারতের অন্যত্রও মুদ্রণ-স্বাধীনতাকে ইংরেজরা খর্ব করে।

উক্ত পত্রের মর্ম ছিল যে মনুষ্যপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে। সে-স্বাধীনতা রোধ কোনও আদর্শ সরকারেরই করা অনুচিত। সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত অপকার তো করেই না, বরঞ্চ সেই অধিকার অবদমনেই অপকার সাধিত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকারকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জনে সহায়তা করে।

ঐ আর্জি নাকচ হয়ে যাওয়ায় তিনি ইংলণ্ডে সম্রাটের কাছে আপিল করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে দীর্ঘ বাদানুবাদ চলে। এমন কি বেণ্টিঙ্ক, যিনি সহমরণ প্রথা রহিত করেছিলেন, তিনিও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে শিথিল করেন নি। মেটকাফ গভর্নর-জেনারেল হয়ে আসার পর এ-নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করেন (১৮৩৫)।

বিশ্বজনীন মানবতা

যুক্তি ও মুক্তির উদ্‌গাতা রামমোহন ছিলেন বিশ্বজনীন মানবতন্ত্রে বিশ্বাসী। সহিষ্ণুতা, সাহচর্য ও সৌহার্দের বন্ধনে তিনি বিশ্বমানবের সমন্বয় চেয়েছিলেন। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও জড়তা থেকে মন ও আত্মার মুক্তিসাধন করে একদিকে তিনি যেমন নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীন অথচ সুসংবদ্ধ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেন।

তুলনামূলক অধ্যাত্মবাদের চিন্তা তাঁর মনে বিশ্বধর্মের বিশ্বাস সঞ্চারিত করে। পরব্রহ্মের উপলব্ধিস্বরূপ সকল আধ্যাত্মিক মতের মৌল আদর্শের সমন্বয়ে একেশ্বরবাদকে তিনি সর্ববাদীসম্মতরূপে কল্পনা করেন। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে দাদু, কবীর, নানক, তুকারামের ভাবধারার উত্তরসাধক মনে করা যায়।

সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী রামমোহন ছিলেন সর্বপ্রকার জাত্যভিমানের ঊর্ধ্বে; তাই তাঁর অন্তরে বিশ্বজনীন ভাবাবেগ বিরাজ করত। তাঁর চোখে সমগ্র মানবজাতি একই সমাজভুক্ত— বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়কে তিনি সেই সমাজের শাখা মনে করতেন। ১৮৩২ সালে তিনি ফ্রান্সের বৈদেশিক

মন্ত্রীকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিবাদের নিষ্পত্তিকল্পে একটি বিশ্বকংগ্রেস গঠনের সুপারিশ করেন।[৩৪] ঐ সময়ে ইউরোপে চারটি রাষ্ট্র ধর্ম, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সংঘ গঠন করেছিল তিনি তার সম্প্রসারণ কামনা করেন। রামমোহনের মানবতন্ত্রী ও বিশ্বজনীন হৃদয়াবেগ অনেকটা ডেভিড হিউমের আদর্শের সঙ্গে তুলনীয়।

চার : শিক্ষাচিন্তা

ইংরেজরা এদেশে আসার পর তাঁরা যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, তার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তর বাদানুবাদ ঘটে। একদল ইংরেজের ইচ্ছা ছিল এদেশে টোলো শিক্ষাপদ্ধতি বজায় রাখা। এঁদের মধ্যে বোম্বাইতে এলফিনস্টোন, মুনরো প্রমুখ ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এঁদেরই আর এক দল চাইতেন আরবী ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন শেষোক্ত দলের। মেকলে প্রমুখ দ্বিতীয় দলের অভিমত ছিল : **Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect.** রামমোহন এই দ্বিতীয় দলের সমর্থন করেন। আধুনিক ভাষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার আশু ব্যবস্থার তিনি সুপারিশ করেন। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনকে তিনি স্বাগত জানান, এবং নিজের উদ্যমে যে ইংরেজী বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন, এদেশীয়দের প্রচেষ্টার সেটাই ছিল সর্বপ্রথম। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনিও ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। কলেজটি পূর্বে ইঙ্গ-ভারত বিদ্যার 'মহাপাঠশালা' নামে পরিচিত ছিল। রামমোহন প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে সেখানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় চিন্তা ও অধিবিদ্যায় তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রচেষ্টা কিছু কম ছিল না। কিন্তু দেশের পশ্চাদপদ জনমনের সঙ্গে মানব প্রগতির সংযোগসাধনকল্পে চাইতেন পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর একটি পত্র দেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে তিনি শিক্ষায় বেকনের আদর্শ সমর্থন করে বলেন :

'If it had been intended to keep the British Nation in igno-

rance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequenly promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences.' ৩৫

রামমোহন অবাধ অধিকার (laissez-faire) তত্ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন না— বিশেষ করে একটি ক্ষেত্রে, সেটি হল শিক্ষা। জনশিক্ষাবিস্তারে তিনি সরকারি প্রচেষ্টার সুপারিশ করেন। তিনি মনে করতেন যে দেশবাসীর নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধ ও চেতনার বিকাশ ও উন্মেষের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষার আশু প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে সরকারি প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা কার্যকর।

পাঁচ : আর্থনীতিক চিন্তা

রাষ্ট্রনীতির ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহনের চিন্তা বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রচনায় ছড়ানো চিন্তাগুলির সমন্বয়ে তাঁর তাত্ত্বিক মনোভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর চিন্তাকে যেমন সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা যায় না, তেমনি পুরোপুরি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতীও তাঁকে বলা যায় না। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানায় তাঁর বিশ্বাস থাকলেও মনোভাব তাঁর সর্বাংশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ঝোঁকে নি। কারণ অসহায় ও দুঃস্থ মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায় বলে তিনি মনে করতেন।

পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ যে অন্যায় সেকথা তিনি তাঁর 'Rights of Hindoos over Ancestral Property' নিবন্ধে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন দায়ভাগ আইনের সমর্থক।

কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় রামমোহন সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভূস্বামীদের সুবিধার্থে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে মনে করা ভুল। জনকল্যাণ চিন্তাই তাঁর মানসপটে ক্রিয়াশীল থাকত। তিনি সাধারণ মানুষকে জমিদারের দাপট থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষক ও খেতমজুররা যাতে বঞ্চিত না হয় সে-বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভূমিব্যবস্থার প্রশাসনে সরকারের সরাসরি অনুপ্রবেশ তিনি পছন্দ করতেন না; কারণ তাতে অনুমিত উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত অধিক রাজস্ব আদায় হওয়াটা অনিশ্চিত। খাস জমিই সরকারি অব্যবস্থার পরিচায়ক। তাই তিনি বলেছেন: **'every man is entitled by law and reason to enjoy the fruits of his honest labour and good management'**।[৩৬] মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করতেন— তাতে রায়তওয়ারী প্রথার পরিবর্তে জমিদারী প্রথার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। অবশ্য জমিদারদের অত্যাচার থেকে নিরীহ প্রজাদের রক্ষার বিষয়ে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

চাষীর দুঃসহ দারিদ্র্যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। তাই তিনি জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকারকে সমর্থন করেন নি এবং জমিদারদের উপর আরোপিত করের হ্রাস হওয়া প্রয়োজন বোধ করতেন। উদ্দেশ্য, যাতে অনুপাতে সাধারণ প্রজারা উপকৃত হয়। তাতে সরকারের আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

১. বিলাস দ্রব্যের উপর এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় যেসব বস্তু সেগুলির উপর অধিক কর আরোপ।[৩৭]
২. রাজস্ব বিভাগের ব্যয় সংকোচন। হাজার, দেড় হাজার টাকার বেতনের ইউরোপীয় কালেক্টরের পরিবর্তে তিন চার শো' টাকার বেতনে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রজাদের খাজনা কমে গেলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। ফলে সরকারের প্রশাসনিক নৈপুণ্য দৃঢ় হবে।[৩৮]
৩. স্থায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে স্থানিক রক্ষীদলের ব্যবস্থা হলে ব্যয়-সংকোচ ছাড়াও জনসাধারণের সাহচর্য ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে।[৩৯]

বিলাতে সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে (১৮৩০) রামমোহন এদেশ থেকে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে নিঃসারিত হয়ে যায় তার একটা তথ্যসমন্বিত চিত্র তুলে ধরেন। **'On Colonial policy as Applicable to the**

Government of India' নিবন্ধে তাঁর সেই বক্তব্যটি পাওয়া যায়। বিকল্প পন্থা হিসাবে তিনি এদেশে ইংরেজদের বসবাসের সুপারিশ করেন ;[৪০] যাতে ঐ-অর্থ আর দেশের বাইরে চলে না যায়। বিষয়টি তখন খুবই বিতর্কমূলক ছিল। এ-সম্পর্কে ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাসের প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে রামমোহন বলেছিলেন :

> 'I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European Gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs'.[৪১]

ফলে রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু হয়। বস্তুতঃ রামমোহন বিলাতের চাষী ও শ্রমিকদের এদেশে আসার আহ্বান জানান নি। তিনি চেয়েছিলেন বিলাতের শিল্পনিপুণতা ও মূলধনের আমদানি। উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন ইংরেজদের আগমনে এদেশের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে। ইংরেজরা এদেশের কৃষিপদ্ধতির উন্নতি এবং যন্ত্রশিল্পের বিস্তার সাধন করবে। তাছাড়া তাদের সান্নিধ্যে এদেশের অধিবাসীরা রাজনৈতিক অধিকার ও চেতনা লাভে সমর্থ হবে এবং তাদের মারফত ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও অসন্তোষগুলি সহজে বিলাতের কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হবে।[৪২]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছিল। কৃষির ক্ষেত্রে তাদের আংশিক ভাগিদার ছিল এদেশের জমিদাররা। উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর আঁতাত। উভয়ের এই একচেটিয়া স্বত্ব নষ্ট করে দেবার একমাত্র ক্ষমতা ছিল অন্যান্য ইংরেজ বণিকদের। তাদের সাহায্যেই বাংলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ছিল ইতিহাসের নির্দেশ। রামমোহন সেই নির্দেশ অনুভব করতে সক্ষম হন।[৪৩]

সমসাময়িককালে নীলকরদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদাররা নীলকরদের অত্যাচারকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে নিজেদের দুষ্কৃতি ঢাকবার চেষ্টা করত। নীলকরদের মধ্যে যেটুকু ঔদার্য ছিল তার একটুও এদেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দেখা যেত না। নীলকররা মানুষকে খাটালে মজুরি দিত —যেটা জমিদারদের ছিল চক্ষুশূল। ইংরেজদের আগমন ও বসবাস বৃদ্ধি পেলে কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে এই আশঙ্কায় জমিদাররা রামমোহনের প্রস্তাবকে নিন্দা করে। রামমোহন কোম্পানি ও জমিদারদের একচেটিয়া স্বত্বে কুঠারাঘাত করে

অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন সুপারিশ করেন। কোম্পানি অন্যান্য ইংরেজদের অনুপ্রবেশের বিরোধী ছিল।[৪৪]

বাংলা দেশে নীলচাষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ফরাসী বিপ্লবের পর সেণ্ট ডোমিনিগো থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে। খরচখরচা বাদ দিয়ে নীলচাষ থেকে বছরে ৩৬ লক্ষ পাউণ্ডের মত বৈদেশিক অর্থাগম হত। কিন্তু যেসব ইউরোপীয়ান ঐ সময় নীলচাষ করতে আসত তারা কোনও মূলধন আনত না। তারা ভারতীয় অথবা কোম্পানির চাকুরে কিংবা স্থানীয় অন্যান্য ঋণদানকারী এজেণ্টদের কাছ থেকে মূলধন কর্জ করে কারখানা স্থাপন করত।[৪৫] রামমোহন চেয়েছিলেন যে যেসব ইউরোপীয়ানের শিক্ষা, উন্নত চরিত্র ও মূলধন আছে তাদেরই শুধু এদেশে বসবাসের অনুমতি দেওয়া দরকার।

লণ্ডনের এক পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের একটি প্রবন্ধে এদেশে ইংরেজদের বসবাসের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই দর্শানো হয়। তিনি বলেন যে প্রস্তাবটিকে সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত। ইংরেজদের সহযোগিতায় রামমোহন এদেশে যে অবাধ বাণিজ্য ও শিল্পবিপ্লবের পত্তনে অগ্রণী হন তাকে এখানকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত বলে মনে করা যায়।[৪৬]

ছয় : উপসংহার

ইংরেজরা আসার পর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে ভারতীয় সমাজের বহু শতকের নিশ্চলতায় গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। পশ্চিমী উদারতন্ত্রী আদর্শ ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের নিষ্প্রাণ সমাজ ও মননজীবনকে উজ্জীবিত করে তোলে। তারই ফলে দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণ।

রাজা রামমোহন ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎরূপে অভিহিত। পশ্চিমী সংস্কৃতিকে তিনি আবাহন জানিয়েছিলেন, ইতিহাস-ভূগোলের গণ্ডিকে বিশেষ প্রাধান্য দেন নি। কিন্তু একাধারেই তিনি যুক্তির অনুসারী ও ভক্তির সাধক ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি যুক্তি ও উদারতন্ত্রী মনোভাব পোষণ করতেন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ধর্মাদর্শের যুক্তিসম্মত সংস্কারও ছিল তাঁর কাম্য। ফলে তাঁর ভূমিকা হয়ে পড়ে দ্বিধারায় বিভক্ত। যুক্তিবাদী ও উদারতন্ত্রী রামমোহন

বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; যার মূলে রয়েছে অতিপ্রাকৃত ও বিশ্বাতীত পরম সত্তা এবং যেখানে বিশ্বাসের বেদীমূলে যুক্তি উৎসর্গীকৃত। বৈদান্তিক চিন্তায় মানবিকতার স্থান গৌণ, জাগতিক সবকিছুর অস্তিত্বই অকিঞ্চিৎকর।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক চিন্তার সমান্তরাল ধারায় বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী আদর্শেরও বিশেষ অবস্থান ছিল ; যার পরিণতি ঘটে বৌদ্ধ ভাববিপ্লবে। আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা নৈতিকতাই ছিল বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ; প্রগতির বাহক বণিকশ্রেণীর প্রতি ছিল তার সহৃদয় মনোভাব। কিন্তু যুক্তি ও ঐহিক প্রত্যয়ের সঙ্গে বৌদ্ধদের নির্বাণতত্ত্ব সঙ্গতিহীন। এই অন্তর্বিরোধ ও তার সুযোগে ব্রাহ্মণ্য-শ্রেণীর পুনরাধিপত্যে বৌদ্ধধর্ম খর্ব হয়ে পড়ে। ইউরোপেও একসময় খ্রীষ্টান চার্চের আধিপত্যে যুক্তিবাদী-মানবতন্ত্রী প্রাচীন গ্রীক জীবনাদর্শ চাপা পড়ে গিয়েছিল। প্রায় সহস্রবছরকাল পর চতুর্দশ শতকে আরবের একদল পণ্ডিত লুপ্ত গ্রীক আদর্শকে পরিপুষ্ট করে ইউরোপে পৌঁছিয়ে দেন। তারই প্রভাব ও প্রেরণায় ইউরোপের মননজীবন সর্বক্ষেত্রেই নবীনতার স্পর্শ লাভ করে। যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তা ও নতুন চেতনায় সেখানকার সৃষ্টিশক্তি জেগে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের সার্বভৌমতা, যাকে এককথায় রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে। পরে খ্রীষ্টধর্মের সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে 'রিফর্মেশন'-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ; তাতে রেনেসাঁস-ধর্মী আদর্শ খর্ব হয়ে পড়ে। রিফর্মেশন-আন্দোলনের ব্যর্থতায় যুক্তিবাদী-মানবতন্ত্রী আদর্শ আবার নতুন প্রাণবেগ লাভ করে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমপ্রসারে ঈশ্বরের স্থান হয় অবনমিত।

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণও ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়। রামমোহনের ভূমিকা লুথার ও ক্যালভিনের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতে নবাগত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি নিষ্ফল হয়ে যায় দেশের তৎ-কালীন চিন্তানায়কদের অন্তর্বিরোধের ফলে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ যুক্তিবাদী হয়েও বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করতে পারেন নি। মধ্যযুগের 'ক্যাথলিক' ইউরোপ 'প্রটেস্টাণ্ট' রিফর্মেশনে পরিমার্জিত হয়েছিল ; মধ্যযুগের ভারত উনিশ শতকের বৈদান্তিক রিফর্মেশনে পরিশোধিত হয়।[৪৭]

রামমোহনোত্তর ভারতে রেনেসাঁসের যে-অবিমিশ্র লক্ষণ দেখা দেয় তা হয়েছিল স্বল্পকালস্থায়ী। ভারতের সমাজ ও মননজীবনে পশ্চিমী সংস্কৃতির সংঘাত সঞ্জাত তরঙ্গ এদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন উপকূলে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে যায়।

এর কারণ অবশ্য সবটাই বিদেশাগত আদর্শের সঙ্গে এদেশের আদর্শগত সংঘাত নয়। নবীনাদর্শে উদ্বুদ্ধ নব্যশিক্ষিতদের স্বদেশী ঐতিহ্যের উপর অস্ত্রোপচারও তার অন্যতম কারণ। তাঁদের উগ্র বিজাতীয় মনোভাব এবং খ্রীষ্টান পাদরি ও বিদেশী শাসকদের অবজ্ঞার আচরণ এদেশের আত্মাভিমানে আঘাত করে। তাই রামমোহন থেকে বঙ্কিম বিবেকানন্দ পর্যন্ত সবাই দেশগৌরববোধ প্রতিষ্ঠা-কল্পে স্বদেশের প্রাচীন ভাবভাণ্ডার থেকে উপকরণ আহরণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তানায়করা যে সবাই সর্বাংশে নাস্তিক ছিলেন তা নয়। তবে তাঁরা মানুষকেই দিয়েছিলেন প্রাধান্য। সেখানেও অধ্যাত্মবাদী জীবনবিমুখ চিন্তার সঙ্গে ইহলৌকিক মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর টানাপড়েন চলেছিল কয়েকশো বছর ধরে। ইউরোপের পাঁচশো বছরের অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানরাশি ভারতভূমিতে হঠাৎ এসে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যাবারই কথা; বিশেষ করে একটা সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে বেশ পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণে ইহবিমুখ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে ইহমুখীন বস্তুবাদী মানবতাবাদের দোটানা দেখা যায়।

রামমোহন শাস্ত্র মানতেন। সেইসঙ্গেই অবশ্য একথাও বলতেন যে শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে বিচারের অধিকার আছে। তিনি নিজে কোনও ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। প্রাচীন ধর্মাদর্শের যুক্তিসম্মত সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সত্য নির্ণয়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের আদর্শে পুরোপুরি নিজ অভিমতের উপর নির্ভর কিংবা আর্যসমাজীদের মত বেদকেই একমাত্র প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেন নি। তন্ত্র, পুরাণ এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থকেও প্রামাণ্যের মর্যাদা দেন। যুক্তির সাহায্যেই হিন্দুধর্মকে বাহ্য আচার ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমনের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এই যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে মিলিত হয় তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। হিন্দুধর্মের পরিমার্জনা যেমন তাঁর কাম্য ছিল, তেমনি জীবনের অনুধ্যান ছিল বাহ্য আচারানুষ্ঠানমুক্ত সকল ধর্মের বিশ্বজনীন অন্তর্মাধুর্যের ভিত্তিতে বৈশ্বিক মানবধর্মের (Universal Religion) প্রবর্তন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিশ্বজননীন মানবতার পরিমিশ্রণ ঘটে।

আধুনিক ভারতের অন্যতম রূপকার রামমোহন ছিলেন প্রাচীন ও নবীন ধারার সেতুবন্ধস্বরূপ। যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে বহু জাতির পদার্পণ ঘটেছে। উদ্ভব হয়েছে নানা ভাব, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির— দেখা দিয়েছে তাদের ঐক্য-

বিধানের সমস্যা। নানক, কবীর, দাদু প্রমুখ সাধকেরা এই বিচিত্রধারার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। ইংরেজরা এদেশে আসার পর অনুরূপ এক সাংস্কৃতিক জটিলতা দেখা দেয়। রামমোহন তার সামঞ্জস্য বিধান করে নবাগত জীবনাদর্শকে আবাহন করেন। তমসাচ্ছন্ন দেশকে অজ্ঞতা, প্রথাপীড়ন ও অবক্ষয় থেকে তিনি উদ্ধারের প্রয়াসী হন। জনমনে ধর্মভাব ও নব্যসংস্কৃতির সুর সংযোজন করে তিনি এক নতুন ঐকতান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে উদারতন্ত্রী ভাবধারা যে-শ্রেণীর নেতৃত্বে ছড়িয়ে পড়ে সে-শ্রেণী ছিল নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণী। ক্ষয়িষ্ণু অনাচারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থাকে এই নবোদ্ভূত শ্রেণী নতুন চেতনায় উদ্দীপিত করে। উৎপীড়িত মানুষকে তারা মুক্তি ও নতুন সমাজব্যবস্থার নিশানা দেখায়। ব্রিটিশ বণিকদের আবির্ভাবে এদেশেও অনুরূপ একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রামমোহন ছিলেন সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁর আমলে অবশ্য নগরকেন্দ্রিক ও বাণিজ্যস্বার্থান্বিত সংকীর্ণ ঐ-শ্রেণী সুস্পষ্ট সামাজিক শ্রেণীর (Social Class) রূপ নেয়নি। তাঁদের গোষ্ঠী-চেতনাও ছিল অবিকশিত। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মক্ষেত্রেও যেমন অর্থনীতিক্ষেত্রেও তেমনি তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবনবিমুখ সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের সমর্থন করতেন না। তিনি ও তাঁর সহযোগিদের বিলাস ও ভোগের জীবন পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমগোত্রীয়। তাঁদের ভোগ-বিলাস অবশ্য সময়, শ্রম, অর্থ ও বস্তুর পরিমিত ব্যবহারসাপেক্ষ ছিল—রাজারাজড়াদের সীমাহীন অমিতব্যয়িতার মত নয়। নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠানে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় নিবারণার্থে তাই তাঁরা ধর্মসাধনাকেও করে তোলেন ব্যক্তিগত ও পরিমিত সময়নির্দিষ্ট।[৪৮]

রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি এদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে সেখানকার রাষ্ট্রচিন্তারও তিনি সমধিক গুণগ্রাহী ছিলেন। নিজস্ব কোনও রাষ্ট্রতত্ত্ব তিনি উদ্ভাবন করেন নি। ইউরোপীয় লিবার‍্যাল আদর্শ তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত হয়। ভারতের উত্তরকালীন সংসদীয় গণতন্ত্রের বীজ তাঁর মনেই প্রথম উপ্ত হয়েছিল। দেশের মডারেট রাজনীতির তিনিই ছিলেন পুরোগামী।

সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও রাজনীতি তাঁর মনের বিচরণক্ষেত্র ছিল না। রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম ও প্রধান উপাদান সমাজবিপ্লবেই তাঁর

অধিক প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতন্ত্রী আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও রাজতন্ত্রেও তাঁর সানুরাগ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে বিবেচিত রবার্ট ওয়েনের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন; কিন্তু তাতে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন নি। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সামাজিক গণতন্ত্রেরও যে প্রয়োজন আছে সে-বিষয়ে তিনি যথোচিত সচেতন ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর মনে প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা বা সক্রিয় ভূমিকা কিছু ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করলে তবেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সহজ ও সম্ভব হবে। এবং তখনই সারা বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কেবল পঞ্চায়েতী স্বয়ংসম্পূর্ণতা কিংবা দেশগত আত্মনির্ভরতাই নয়, ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধতার চিন্তাও তাঁর মনে উদিত হয়। তাঁর সময়ে দলীয় রাজনীতি তো দূরের কথা জাতীয় চেতনাও দেখা দেয় নি। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার উন্নয়ন, মুদ্রণ-স্বাধীনতা অর্জন, নারীর সামাজিক মুক্তিসাধন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি প্রচেষ্টা তাঁর প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর মত। কার্যতঃ তাঁরই ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ দেশের পরবর্তীকালের চিন্তানায়করা একক ও সংঘবদ্ধভাবে দেশের সামাজিক চেতনার পরিপুষ্টি সাধন ও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতায় গতি সংযোজন করেন।[৪৯]

নির্দেশিকা

১. Norman Mackenzie. *Socialism : A Short History.* 1966, p. 11.

২. M. N. Roy. *Scientific Politics.* 1947, pp. 74-77.

৩. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন'। ১৯৬৩, পৃ ১১৪।

৪. মিঃ গর্ডন নামক এক বন্ধুকে লিখিত রামমোহনের এই চিঠিটি তাঁর মৃত্যুর পর বিলাতের 'এথেনিয়াম' পত্রিকায় ১৮৩৩ সালের ৫ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। চিঠিটিকে রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট্ জাল বলে অভিহিত করেছেন; যদিও তাঁর এই অনুমানের স্বপক্ষে কোনও কারণ তিনি দেখান নি। মাক্স ম্যুলার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই চিঠিটিকে একেবারে

অসত্য বলে উড়িয়ে দিতে চান নি। দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কলেটের *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* গ্রন্থের ৪৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫. Brajendranath Seal. *Rammohun Roy : The Universal Man.* p. 6.

৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আত্মজীবনী'। ১৯৬২, পৃ ৩১১-৩১৮।
বিপিনচন্দ্র পাল—'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮, পৃ ৩৩।

৭. S. D. Collet. *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* ed. by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli. 1962, Appendix IV.

৮. *Ibid.* Appendix II.

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রামমোহন রায়'। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা ১৬, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৩।

১০. *The English Works of Raja Rammohun Roy.* ed. by Jogendra Chandra Ghose. 1901, Part I, p. 287.

১১. *The Father of Modern India : Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations.* 1933. ed. by S. C. Chakravarty. Part 2, p. 133.

১২. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'। ১৮৮১, পৃ ১২৯।
(তৎসহ ইংরেজী রচনাবলীর ১ম খণ্ডে *Preliminary Remarks* দ্রষ্টব্য।)

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৪. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত চিত্র'। ১৯৫৮, পৃ ৩১।

১৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২০।

১৬. Brajendranath Seal. *Rammohun Roy : The Universal Man* pp. 11-12

১৭. *Ibid.* pp. 12-13.

১৮. *Ibid.* 18-21.

১৯. Karl Marx. 'The British Rule in India', *Selected Works of Marx and Engels.* Vol. I, p. 317.

২০. Bimanbehari Majumdar. *History of Political Thought : From Rammohun to Dayananda (1821-84)* 1934. Vol. I, p. 10.

২১. *The English Works of Raja Rammohun Roy.* Part I, p. 221. ('Rights of Hindoos over Ancestral Property')

২২. *Ibid.* p. 84 ('A Paper on Revenue System of India')

২৩. *Ibid.* pp. 242-244 ('Rights of Hindoos over Ancestral Property')

২৪. *Ibid.* p. 99 ('Appendix to the Judicial and Revenue System of India')

২৫. *Ibid.* p. 310 ('An Appeal to the King in Council')

২৬. *Ibid.* pp. 32-33 ('Judicial System of India')

২৭. *Ibid.* pp. 303-305 ('An Appeal to the King in Council')

২৮. *Ibid.* pp. 47-48 ('Judicial System of India)

২৯. Bimanbehari Majumdar. *History of Political Thought.* p. 18.

৩০. S. D. Collet. *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy.* pp. 130-131.

৩১. *The English Works of Raja Rammohun Roy.* Part III, p. 105. (Final Appeal to the Christian Public)

৩২. V. P. Varma. *Modern Indian Political Thought.*. 1961, p. 26.

৩৩. *The English Works of Raja Rammohun Roy.* Part I, p. 5. ('Preliminary Remarks')

৩৪. S. D. Collet. *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy.* 1962. Appendix IX.

৩৫. *Ibid.* Appendix II.

৩৬. Susobhan Chandra Sarker, ed. *Rammohun Roy on Indian Economy.* 1965, p. 23 ('A Paper on the Revenue System of India')

৩৭. *Ibid.* p. 25.

৩৮. *Ibid.* pp. 25-27.

৩৯. *The English Works of Raja Rammohun Roy.* Part I, p. 103. ('Appendix to the Condition of India')

৪০. *Ibid*, p. 77 ('Ans. to Q. 52 on Revenue System of India')
৪১. Jatindra Kumar Majumder, ed. *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*. 1941, pp. 439-49.
৪২. *Ibid*. pp. 113-120
৪৩. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন'। ১৯৬৩, পৃ ২৪।
৪৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১০২।
৪৫. R. C. Dutt. *Economic History of India*. 1960, Vol. I, pp. 199-200
৪৬. Susobhan Chandra Sarker, ed. *Rammohun Roy on Indian Economy*. pp. 84-89.
৪৭. Niranjan Dhar. 'From Rammohun to Manabendra', *The Radical Humanist*. 8 October, 1967, p. 461.
৪৮. বিনয় ঘোষ, সম্পা.। 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র'। ১৯৬৩, খণ্ড ২, পৃ ১।
৪৯. Pattabhi Sitaramyya. History of Indian National Congress (1885-1935). 1935, p. 17.

অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ ১৮২০ - ১৮৮৬

এক : ভূমিকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে বাংলার যুবমানসে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্তক হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।[১] তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন নিখাদ বস্তুবাদী। রামমোহন যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন অক্ষয়-কুমারের বয়স দশ। রামমোহনোত্তর বাংলার দার্শনিক বিপ্লবীদের (Philosophical Radicals) মধ্যে অক্ষয়কুমার অগ্রগণ্য। তিনিই রামমোহনের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক উত্তরসাধক। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শ দুটি ধারায় প্রবহমান ছিল। এর ভক্তিবাদী দিকটির প্রধান পথিক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আর যুক্তিবাদী পথে অগ্রসর হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার।

নবদ্বীপ থেকে মাইল চারেক দূরে চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম। ঐ বছর আর একজন স্মরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অক্ষয়কুমারেরই পরবর্তী জীবনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দশ বছর বয়সে কলকাতায় আসার পর অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়। উনিশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অর্থাভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এত অধিক ছিল যে', পরিণত বয়সে 'তিনি ছাত্রদের সহিত একত্রে মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে রসায়ন ও ২য় বর্ষে উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর তিনি জর্মনভাষা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করেন'।[২]

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে সংবাদ প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তিনিই মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সংযোগ ঘটিয়ে দেন। অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী-সভায় সদস্য মনোনীত হন (১৮৩৯) এবং পরের বছর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি পড়াতেন ভূগোল আর পদার্থবিদ্যা। ঐ-দুই বিষয়ে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা হুগলী জেলায় বাঁশবেড়েতে স্থানান্তরিত হলে অক্ষয়কুমার ঐ কাজে ইস্তফা দিয়ে বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের সঙ্গে 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।

পত্রিকাটি মাস ছয়েক বেরিয়েছিল। ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। অক্ষয়কুমার তার অন্যতম সহ-সচিব হন। লিখিতভাবে ১৮৪৬ সাল থেকে ঐ-পত্রিকার সম্পাদক হলেও বস্তুতঃ গোড়া থেকেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তত্ত্ববোধিনীর উদ্দেশ্য ছিল: 'পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত, ধর্মনীতি, স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থা, জ্যোতিষ, শারীরস্থান, শারীর বিধান'[৩] প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা। সমকালীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব প্রথম বারো বছর (১৮৪৩-৫৫) অক্ষয়কুমারের উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ পত্রিকাতে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছাড়াও বহু মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অবাধ জ্ঞানার্জনস্পৃহা, দেশের প্রতি, বিশেষতঃ দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষকদের প্রতি দরদী মনোভাব এবং দেশবাসীর দুঃখমোচনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ঐসব রচনাগুলিতে পাওয়া যায়। সমাজকে তিনি বিচার করতেন জৈব (organic) প্রত্যয়ে। শিক্ষা ও রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়ে তিনি গ্রীক দার্শনিকদের অনুগামী ছিলেন। লকের 'সামাজিক-চুক্তি-তত্ত্ব' তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে এবং ম্যালথাসের জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ-তত্ত্বেরও তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদবেদান্ত ও পরব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বাদি আলোচিত হলেও অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এ-কথা দেবেন্দ্রনাথেরই উক্তিতে জানা যায়।[৪] অক্ষয়কুমারের কাছে ধর্মের অর্থ ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ। এতদ্‌বিষয়ক চিন্তার পরিচয় তাঁর দু-খণ্ডে প্রকাশিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' গ্রন্থটি বহন করে। জর্জ কুম্ব-এর 'কন্‌সটিটিউশন অব ম্যান' অবলম্বনে অক্ষয়কুমারের উক্ত গ্রন্থ রচিত।

প্রথম দিকে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, (১৮৪৩) কিন্তু নিজস্ব মত ও স্বতন্ত্র পথে। ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি যুক্তিবহ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়:

'ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদায় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা

কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।'[৫]

স্বভাবতঃই তাঁর মতামতকে অগ্রাহ্য করা হত এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ দেখা দিত। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল: 'The negative, critical and destructive part of the work of the Brahmo Samaj, thirty years ago, was principally done by him.'[৬]

ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় তিনি প্রার্থনার প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মের উপাসনায় পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও তিনি বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতেন। একবার উপাসনাকে তিনি একটি সমীকরণের[৭] সাহায্যে তার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করেন:

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

∴ প্রার্থনা = ০

'বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত'— এই মতই একসময় আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হত। এবিষয়ে অক্ষয়কুমার বিচার উপস্থিত করেন ও দেবেন্দ্রনাথকে স্বীয় মতে আনয়ন করেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন:

'বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ১১ই মাঘ দিবসে সাংবৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।'[৮]

এছাড়া অক্ষয়কুমার বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা প্রবর্তনেও উদ্যোগী হন। শাস্ত্র থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন; তাতে অক্ষয়কুমারের সায় ছিল না। শাস্ত্রীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে তিনি চাইতেন প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তন ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তাঁর যুক্তিপ্রবণ মনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি ভাষণ থেকে:

'অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্যভট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোমৎ যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।

কণ্ঠ ও তলবকার, মূষা ও মহম্মদ এবং যীশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।'[৯]

১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনে দ্বিতীয় 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহর্ষি ছিলেন তার সভাপতি এবং অক্ষয়কুমার ছিলেন কর্মসচিব। প্রতিষ্ঠানটি তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী সদস্যদের মিলনকেন্দ্র ছিল। পারস্পরিক মতের সংঘর্ষে সভাটি বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ঐ সভায় অক্ষয়কুমার একবার হাত তুলে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণের জন্যে ভোট গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাসগৃহে প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৪) যুক্তিবাদী নব্যসম্প্রদায়ের 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃৎসমিতি'তে অক্ষয়কুমারের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল : 'স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ প্রচলন রোধের' জন্যে আন্দোলন। রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদের ভ্রাতা প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ যুক্তিবাদী, সমাজসংস্কারক ও নব্যপন্থীগণ ছিলেন ঐ সমিতির সদস্য। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে।[১১]

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন অক্ষয়কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে বিদ্যাসাগর কলকাতায় 'নর্ম্যাল স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫) করেন। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করার পর বিদ্যাসাগরের অনুরোধে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ পদে তিনি বছর তিনেক ছিলেন। এর কিছু আগে তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' গ্রন্থটির দুই খণ্ড (১৮৫১, ১৮৫৩) এবং 'চারুপাঠ' গ্রন্থটির দুই খণ্ড (১৮৫৩, ১৮৫৪) প্রকাশিত হয়। চারুপাঠের তৃতীয় খণ্ড (১৮৫৯) ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১ম খণ্ড ১৮৭০, ২য় খণ্ড ১৮৮৩), এবং 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুরুতর শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। দুরারোগ্য ঐ রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

দুই : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারকে অজ্ঞাবাদী (agnostic) বলে অভিহিত করেছেন।[১২] অক্ষয়কুমারের মতে বিশ্বজগৎ প্রকৃতির নিয়মে চলে, বিশ্বাতীত কোনও ঈশ্বরের নির্দেশে নয়। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বরসৃষ্ট নিয়ম। প্রার্থনার পরিবর্তে সেই নিয়ম পালন করলেই সুখী হওয়া যায়। 'মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা'— এই ছিল তাঁর মত।[১৩] তিনি মনে করতেন যে বিজ্ঞানই যখন সর্বজ্ঞানের আকর, তখন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের জীবন ও সমাজের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। এই চিন্তাকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে নিজের আত্মীয়বর্গ, সমাজ ও দেশের, তথা সমগ্র মানবকুলের প্রতি কর্তব্য-পালন বিধেয়— এ-ই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও যথার্থ উপাসনা। তিনি বলেছেন :

> 'বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য ; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশকপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।'[১৪]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবণতার সুসমঞ্জস ও যুগপৎ উন্নতির অনুশীলনই হবে প্রকৃত ধর্ম—যা তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শরূপে উপস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্তব্য সম্পাদন করা না করাই ধর্ম ও অধর্ম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে : 'সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের পত্তনভূমি বুদ্ধি ও যুক্তি। বুদ্ধিকে নেতা করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধধর্ম্মের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন।'[১৫]

যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিহার্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং অতীন্দ্রিয় সত্তায় তাঁর আস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তিনি প্রকৃতিকে স্বতঃসিদ্ধভাবে নিয়মনির্দিষ্ট জ্ঞান করতেন এবং তারই পৃষ্ঠপটে তিনি মানুষ ও সমাজকে বিচার করেছেন। তাঁকে সেজন্যে অনায়াসে বস্তুবাদী বলা চলে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা আধুনিককালে এদেশে তিনিই প্রথম করেন। তিনি বলেছেন :

> 'পূর্ব্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এবিষয়ে অনুসন্ধান

করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।'[১৬]

প্রাকৃতিক নিয়মে সুখের সন্ধান স্বতঃসিদ্ধ। সুখের মানদণ্ডেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও সাফল্য নির্ণেয়। হিতবাদীরা সুখকেই সন্দেহাতীতভাবে সকলের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মূল্যবত্তা মনে করে তারই ভিত্তিতে মনুষ্যজীবনের বিচার করেছেন। ইংলণ্ডের হিতবাদী চিন্তা ঐ সময়ে বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কেশবচন্দ্র সেন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

'The politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its philosophy Positivism.'[১৭]

বেনথামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তায় অক্ষয়কুমার যথেষ্টই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরও ঐ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই হিতবাদী চিন্তাধারাকে আরও পরিপুষ্ট করে তোলেন। সুখকে তাঁরা সার্বজনীন সুখ হিসাবেই দেখতেন। তবে দুজনের দেখার দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন ; অক্ষয়কুমার দেখতেন ব্যক্তিমানুষের বিকাশের দিক থেকে ; পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টিগত উন্নতির দিক থেকে দেখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষাবধি মিল-বেনথামের আদর্শকে পরিহার করেন।

প্রকৃতির নিয়ম তথা সুখ অর্জনকে অক্ষয়কুমার ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। তাতে ভৌতিক পর্যায়ে নিয়মনিয়ন্ত্রিত জড়জগতের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। শারীরিক ক্ষেত্রে মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রক্রিয়ায় দৈহিক নিয়মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মানসিক পর্যায়ে জৈব চেতনার বিশ্লেষণ এবং মানুষ ও পশুর ভিন্ন স্তরে নিহিত চেতনার কথা আলোচিত হয়েছে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জৈব প্রবণতাকে অক্ষয়কুমার বুদ্ধি, ধর্ম ও নিকৃষ্ট বৃত্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর এই বস্তুনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীতে অতীন্দ্রিয় চেতনার কোনও অস্তিত্ব নেই। মানবিক প্রবণতা প্রসঙ্গে যদিও তিনি অর্জনস্পৃহা, লোকানুরাগ, সাবধানতা ইত্যাদির সঙ্গে ভক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন— কিন্তু সে ভক্তি ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের প্রতিই প্রদর্শনীয়। বঙ্কিম দর্শনেও ভক্তির এক বিশেষ স্থান আছে। এবং তিনিও তা মহৎ আদর্শের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্বিধ নিয়ম প্রাচীন শাস্ত্রগুলি থেকে আহৃত। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমারের ত্রিবিধ নিয়ম বেদ ও উপনিষদের

নিগড়ে বাঁধা হয় নি। প্রকৃতিকে বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিতে জেনে কিভাবে সেই জ্ঞান থেকে সুখ অর্জন করা যায় সে-সম্পর্কে অক্ষয়কুমার তিনটি সূত্র দর্শিয়েছেন: ১. শরীর ও মনের যথোচিত সঞ্চালন; ২. সমুদয় মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান; ৩. বাহ্যবস্তু সম্পর্কিত নিয়মের সঙ্গে সুসমঞ্জস মনোবৃত্তির সংগতিসাধন এবং সঠিক, সৎ ও শুভপথে পদক্ষেপের পন্থা নিরূপণ।

এখানেও পশ্চিমী হিতবাদী চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বেশ মিল দেখা যায়। দেহমনের শক্তি ও বিকাশের কথা বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। তবে তাঁরা সকলেই তার লক্ষ্য হিসাবে সদাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে ছিল সমাজ, পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমারের মানসনেত্রে ছিল মানুষ। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণে মানুষ ও তার জীবনদর্শনকে বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই চেয়েছিলেন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারী জীবন ও সমাজের সুসমঞ্জস বিধিব্যবস্থা। উত্তরসূরীদের মধ্যে এই বিজ্ঞাননির্ভর মানবতন্ত্রী মনোভাব মানবেন্দ্রনাথের দর্শনেই বিশেষ দেখা যায়।

অক্ষয়কুমার নির্বিচারে কোনও কিছু গ্রহণ করতেন না। প্রকৃতিকেই তিনি যথার্থ জ্ঞান ও ধর্মের উৎস মনে করতেন। তাঁর মতে প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান থেকেই মানুষ সঠিক জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হতে পারে; সেদিক থেকে প্রকৃতির নিয়মেই ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নিহিত; প্রকৃতির নিয়মকে উদ্ঘাটিত করতে হলে এবং তার থেকে মানুষ ও সমাজের পালনীয় অন্যান্য নিয়মে পৌঁছতে হলে যুক্তিবাদী মনননির্ভর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থাকা চাই। তাঁর কথায়: 'বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য'। ঈশ্বর শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন— কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাতীত, অতীন্দ্রিয় ও উপাস্য কোনও শক্তি নন।

ইউরোপের মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদীদের মত তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না যে চূড়ান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের গোচরীভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম কালক্রমে আরও উদ্ঘাটিত হতে পারে; হলে সে-নিয়ম অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এ-কথায় বোঝা যায় যে তিনি অন্ধবিশ্বাসকে আদৌ সমর্থন করতেন না, বস্তুতঃ বিবর্তনের গতিপথে জ্ঞানের রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। বিজ্ঞানই মানুষের যাবতীয় বিধিব্যবস্থার আদর্শ ও মানদণ্ড।

তিন : রাষ্ট্রদর্শন

অক্ষয়কুমারের সমাজের উৎপত্তি প্রত্যয় অ্যারিস্টটলের চিন্তায় প্রভাবিত। সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) বশেই তাঁর মতে সমাজের উদ্ভব ঘটে—যুক্তি অথবা চুক্তি সমাজসৃষ্টির কারণ নয়।[১৮] এবিষয়ে তিনি রামমোহনের অনুগামী—রামমোহন সমাজসৃষ্টির কারণস্বরূপ চুক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। চুক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমকালীন ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতামত উভয়কেই প্রভাবিত করে-ছিল। অক্ষয়কুমার এবিষয়ে মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন :

'পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করা মধুমক্ষিকার স্বভাব। যদি এক একটি মধু-মক্ষিকা এক একটি প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয়, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎকার ও একত্র সহবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ শক্তিসহকারে সমবেত যত্ন দ্বারা যেরূপ সুখ সম্ভোগ ও কার্য্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্যই অসুখে কালযাপন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ…সমাজবদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে।'[১৯]

তাঁর মতে ঈশ্বর স্নেহ, দয়ামায়া, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলি সহজাত গুণে মানুষকে যেমন মহিমা দান করেছেন, তেমনি ঐসব বৃত্তিগুলির স্ফুরণার্থে প্রয়োজন সমাজবদ্ধতার প্রবৃত্তিতেও তাকে মণ্ডিত করেছেন। বিষয়টিকে তিনি আরও সবিস্তারে বোঝানোর জন্যে বলেছেন :

'মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ নির্ম্মাণ, শস্য উৎপাদন, নৌকা গঠন, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি যাবতীয় সুখ-সাধন ব্যাপার লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজবদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমারদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করে…যিনি আমারদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের গৃহস্থ ও জনসমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে স্বভাবতই অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়।'[২০]

সহজাত প্রবৃত্তি-প্রসূত ও প্রকৃতির বিধানাশ্রয়ী প্রত্যয় ছাড়াও সমাজকে তিনি

জীবদেহ (organio) সদৃশ মনে করতেন। ঘড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,[২১] যেমন ঘড়ির বিভিন্ন অংশের নিজ নিজ কাজ ও গঠনবৈচিত্র্য আছে এবং সেগুলির সমন্বয়ে ঘড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলে থাকে, তেমনি মানুষও আত্মস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গস্বরূপ সমাজের সঙ্গে সে সুসংবদ্ধ। যন্ত্রসদৃশ সমাজও একটা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান। মানুষ প্রাণীসদৃশ সমাজের অংশ, তাই ব্যক্তি-মানুষের মঙ্গল সমগ্র সামাজিক মঙ্গলেরই নামান্তর। বেনথামের প্রত্যয়াশ্রয়ী মানুষের অহংপ্রবৃত্তিতে অক্ষয়কুমার বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে সমাজের সুষম বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ঈশ্বর চান সকলের মঙ্গল ; তাই তিনি মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন অহং ভাব সঞ্চারিত করেছেন, তেমনি তার মনে এ-বোধও দিয়েছেন যে অপরের স্বার্থ রক্ষার মধ্য দিয়েই নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব। অপরের তথা সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের মনোবৃত্তি প্রকারান্তরে নিজেরই ক্ষতির কারণ হয়।

তাঁর মতে সামাজিক সকল বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য সর্বাত্মক কল্যাণসাধন—এবং তার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল ব্যক্তিমানুষের স্বীয় স্বার্থকে সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাসিত করে তোলা। কথাটি laissez-faire মতবাদের প্রকারান্তর মনে হতে পারে—বস্তুতঃ এ-মনোভাব তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাধান্য পায় নি— কারণ তিনি নিজেই বলেছিলেন যে অহং যেমন মানুষের একটি প্রবৃত্তি তেমনি পরার্থপরতাও মানুষের অপর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। একের স্বার্থকে অপরের মনে তিনি প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষের মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য পরিণামে প্রতিটি ব্যক্তিকেই সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী করে তুলবে। স্বার্থের এই উদার ও উদ্ভাসিত চিত্র মানুষের মনোজগতে যে অনুপস্থিত সে-বিষয়ে অক্ষয়কুমার অবহিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন স্বার্থের অমিল ও সংঘাতই সমাজের যাকিছু দুঃখকষ্টের মূল। এ-কথার নজির হিসাবে দেখিয়েছেন যে কোনও দেশের রাজা পররাজ্য লোভে যখন অন্ধের মত যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন উভয় দেশের সাধারণ মানুষ অশেষ দুঃখ ও বিনাশের সম্মুখীন হয়। জনসাধারণ যদি নিজ স্বার্থ ও রাষ্ট্রস্বার্থের অবিচ্ছেদ্যতা উপলব্ধি করে শাসকদের হিংসাত্মক আচরণকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটবে।

ধর্ম ও প্রকৃতির বিধিব্যবস্থাকে উপেক্ষা করলে মানুষের সমুচিত দুর্ভোগ ঘটে। পররাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধবিগ্রহও এ কারণে অমঙ্গল ও বিনাশের পথে মানুষকে নিয়ে

যায়। যুদ্ধ মানবিক মূল্যবত্তার পরিপন্থী। বহু সভ্যতাই তাঁর মতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত অক্ষয়কুমার বলেছেন :

'ইংরেজরা অধর্ম্মসহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্মসহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব, যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া প্রজাদিগের সহিত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল মনোবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে'।[২২]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ইংরেজদের ভারতভূমি অধিকারকে তিনি অনুমোদন করেন নি। এরূপ মনোভাব ঐ সময় প্রায় বিরল ছিল। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের আগমনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।

অক্ষয়কুমার মনে করতেন যে, জন্ম থেকেই মানুষের উপর কতকগুলি দায়িত্ব এসে পড়ে যেগুলির যথোচিত প্রতিপালন অপরিহার্য। তার মধ্যে নিজের স্বাস্থ্য বজায় রাখা, নিজেকে শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে তোলা এবং সন্তানসন্ততিদের সযত্ন লালন ও পালনের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করা— মানুষের জন্মগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে-মানুষ প্রকৃতই সুখের সন্ধানী তাকে এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।[২৩] অক্ষয়কুমারের চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নৈতিক আদর্শের সংমিশ্রণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে তার প্রযুক্তির নির্দেশ এদেশের রাষ্ট্রচিন্তায় একটি অভিনব অবদান।

চার : সমাজতত্ত্ব

অক্ষয়কুমারের মতে রাষ্ট্র সমাজেরই দর্পণ। সমাজের চরিত্র ও চেহারা রাষ্ট্রের মধ্যেই ফুটে ওঠে। উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র যেখানে দুর্বল ও অরাজকতায় পূর্ণ সেখানকার নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে তোলে ও ছোট ছোট গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে লোকেরা এক-একটি গোত্রাধীনে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিবারভুক্ত বলে মনে করে।

এ-ধরণের সমাজব্যবস্থা মধ্য এশিয়া ও আরব জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়।[২৩] ভারতের সামাজিক বৈশিষ্ট্যেই এখানকার যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত বলে অক্ষয়কুমার মনে করতেন। তবে রাষ্ট্রশক্তি সবল ও কুশল হলে জনসাধারণের মনে ধন প্রাণ সম্পত্তি সম্পর্কে স্বতই নিরাপত্তার ভাব জাগতে পারে; সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চলে যায়; সমাজসংগঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্থান পায়।

তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীর স্বার্থান্বিত সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সরকার ঐ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতিভূ। ব্যক্তিমানুষ যে-কারণে সমাজবদ্ধ হয়েছে সেই কারণ বা উদ্দেশ্য সরকারি কার্যকলাপের অঙ্গীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় – যূথবদ্ধ প্রচেষ্টা বিনা বহু কাজই সাধন করা যায় না। অক্ষয়কুমার আরও মনে করতেন যে, সরকারের কাজ শুধু লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষাই নয়; তাদের বৈষয়িক উন্নয়ন এবং দেহ ও মনের বিকাশ সাধনেও সহায়তা করা অন্যতম কর্তব্য। লোকে স্বাস্থ্যহীন হলে তারা তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়। একের রোগ অপরের ভিতর সংক্রামিত হয়। লোকের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞান বিস্তারও সরকারের কাজ। ঠিক তেমনি নীতিজ্ঞান ও মননশীলতার সাহায্যে মানুষের ইন্দ্রিয়াসক্তি সংযত না হলে সমাজেরই অশেষ দুর্গতি ঘটে— সেজন্যে জনসাধারণের নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধনার্থে সরকারকে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হতে হবে। যে-সরকার জনসাধারণের কাছে তার এইসব দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সে-সরকার রিক্ত অধমর্ণের ন্যায় দোষী। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন সরকারের একটি গুরুদায়িত্ব তেমনি দৈহিক জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবত্তায় মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলাও সরকারের আদর্শ হওয়া উচিত।

সমাজসংস্কারে অক্ষয়কুমারের চিন্তা ও চেষ্টাও স্মর্তব্য। পূর্বসূরী রামমোহন ও সুহৃদ বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রয়াসের তিনি অনুগামী ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি বিবাহের বয়সকে আইনের সাহায্যে বর্ধিত করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে লোকে শিক্ষা সমাপ্তির পর ১২ থেকে ৩৬ বৎসর কালাবধি বিবাহ করতেন। মেয়েদেরও বিবাহ হত এমন বয়সে যখন তাদের স্বামী মনোনয়নের বুদ্ধি দেখা দিত। জার্মানির নজির উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে সেখানে বিবাহের ন্যূনতম বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২৫ এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮; স্ত্রীকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে সক্ষম জেনে তবেই সেখানকার যাজক ও কর্তৃপক্ষ লোককে বিবাহের অনুমতি দিতেন। ভারতেও এ-ধরণের আইন থাকা আবশ্যক বলে তিনি অনুভব করেন— নইলে ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধি সুদূর পরাহত।

বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মতামতের সামান্য উদ্ধৃতি করা যেতে পারে :

১. 'কন্যা ও পুত্রের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক…'

২. 'শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্ত্তী হইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে…'

৩. 'পিতৃকুল, মাতৃকুল অথবা তত্তৎ কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে…'

৪. 'অসুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, নির্ব্বোধ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে…'

৫. 'স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্য্যের রীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবশ্যক…'

৬. 'এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহু-বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে…'[২৫]

উপরিউক্ত আলোচনাতেই তিনি সুপ্রজননবিদ্যা (eugenics) ও শরীরতত্ত্বের দিক থেকে বাল্যবিবাহের অহিত দর্শিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের এবিষয়ে অভিমতের সঙ্গে সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের মতামত উল্লেখ করে অপরিণত বয়সে বিবাহের অপকারিতা বিশ্লেষণ করেছেন। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বিবাহের বয়স নির্ধারণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শীতল দেশে যে-প্রথা প্রচলিত তা উষ্ণ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কাজেই শীতল দেশকে এবিষয়ে আদর্শ জ্ঞান করা অনুচিত। বিবাহের ন্যূনতম বয়স সরকারের বেঁধে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। বহু বিবাহের অপকারিতা প্রসঙ্গে লোকের নিষ্ক্রিয়তায় সরকারকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে বলে তিনি অনুশোচনা করেন। সেজন্যে ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন। স্ত্রী কিংবা স্বামী কেউ যদি অবৈধ যৌন সংসর্গ করে অথবা একের প্রতি অপরে নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে তাদের বিবাহ নাকচ করে দেওয়া উচিত। বিবাহকে হিন্দুরা ধর্মাচরণ মনে করে, তাতে চুক্তি বলে কিছু নেই—অক্ষয়কুমার হিন্দুদের এই প্রথার নিন্দা করেছেন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম বিবাহ বিল অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' গ্রন্থ থেকেই অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।[২৬]

সুরাপানদোষ (alcoholism) কিরূপে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অহিত সাধন করে থাকে সে বিষয়ে অক্ষয়কুমার তথ্যবহুল প্রমাণের সাহায্যে বিস্তারিত-ভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৭]

পাঁচ : দণ্ডনীতি

১৮৫৫ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দণ্ডনীতির উপর কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেগুলিতে তিনি কয়েদিদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয় তার সমালোচনা করেন। কারাগার প্রশাসন সম্পর্কিত 'অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ রিপোর্ট'-এর তথ্যগুলি উল্লেখ করে তিনি দেখান যে অশেষ নির্যাতন ও অত্যাচার সত্ত্বেও বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে। এই রিপোর্টের বহু পূর্বে প্রকাশিত জেলখানার স্বাস্থ্যসংরক্ষণ বিষয়ে 'হাচিনসন রিপোর্ট'-এ বলা হয়েছিল যে ছশো কয়েদির মধ্যে ১৮২৯ সালে ১৬৬ জনের মৃত্যু ঘটে। তাতে কয়েদিদের জীবন সম্পর্কে একটি করুণ চিত্র দর্শিয়ে একথাও বলা হয় যে অতি প্রত্যুষে উঠে সায়াহ্নকাল অবধি কয়েদিদের রোদ ও জলের মধ্যে কাজ করতে হয়; মাঝে ঘণ্টা খানেকের জন্যে থাকে আহারের বিরতি; আহারের জন্যে তাদের মাথাপিছু মাত্র দু-তিনটি পয়সা দেওয়া হয়। ১৮৩৬ সালে মেকলের সভাপতিত্বে গঠিত এক উপদেষ্টা কমিটি কয়েদিদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের বহর আরও বাড়ানোর সুপারিশ করে।[২৮]

একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে অক্ষয়কুমারের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়মনিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়মাধীনে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করলে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডভোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং সেই নিয়মের সঙ্গে সামাজিক দণ্ডনীতিও সম্পৃক্ত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দিক থেকে দণ্ডের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি দূর করা যায় না। সেগুলির কারণ নির্মূল না হলে কুপ্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে থেকেই যায়। এ-প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মনস্তাত্ত্বিক বিচারে তিনটি কারণ দর্শিয়েছেন :

১. 'কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল থাকাতে তাহার আতিশয্য দ্বারা আপনা হইতেই পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ;'
২. 'বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়' ;
৩. 'কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও অনেকানেক কুকর্ম্ম ঘটিয়া থাকে।'[২৯]

কারণগুলির প্রথমটি সহজাত, দ্বিতীয়টি পরিবেশজনিত এবং তৃতীয়টি অশিক্ষা প্রসূত। কুশিক্ষা ও অশিক্ষার দরুন অনেক সামাজিক দুর্নীতির উদ্ভব হয়, যেমন সতীদাহ, সাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি এবং সেগুলি সামাজিক আইনে অবৈধ নয়। মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ দূরীকরণ ও অপরাধীদের শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত মতামত হল :

১. অপরাধীকে কারারুদ্ধ করে তার মানসিক চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। সেই সঙ্গে তাকে কাজেও নিযুক্ত রাখতে হবে।
২. কারাগারে সম্ভাব্য অসৎ সংসর্গ থেকে অপরাধীকে সরিয়ে রাখতে হবে।
৩. উত্তম শিক্ষকের সাহায্যে অপরাধীর বুদ্ধিবৃত্তির মার্জনা ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিকাশ এবং কারাগারে সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ ও পরিদর্শনের সাহায্যে অপরাধীদের সদুপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা।

অক্ষয়কুমার কয়েদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে বলেন যে তারা অশুভ প্রবৃত্তির বশে অপরাধে লিপ্ত হয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধ নিবারণ হয় তবে দেখা দরকার কি কারণে তারা ঐসব কাজে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য এ-প্রচেষ্টা কোনও দেশেই হয় নি। ফলে অসহ্য পীড়ন সত্ত্বেও সর্বদেশেই অপরাধীর সংখ্যা না কমে বেড়েই গিয়েছে। দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিহিংসা। এবিষয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই কথা অনুভব করেছেন যে, শাস্তিদানের নামে মানুষের পশুবৎ প্রতিহিংসা গ্রহণের অবদমিত ইচ্ছা প্রকাশ পায়। অক্ষয়-কুমার মনে করতেন যে রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য মানুষের অশুভ প্রবৃত্তির দমন ও তার উন্নত মনোবৃত্তির উন্মেষ সাধন। ইদানীং মানবতন্ত্রী একদল সমাজতাত্ত্বিক কয়েদিদের প্রতি সদয় আচরণ ও সরকারী নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। কয়েদিরা মনের দিক থেকে রুগ্ন—তাদের মানসিক চিকিৎসা হওয়া উচিত—শাস্তি নয়। অবশ্য তাদের আটকে রাখা দরকার, নইলে তাদের মানসিক রোগের ছোঁয়াচে-প্রভাবে সমাজের বাকি সুস্থ লোকেরা আক্রান্ত হতে পারে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের সক্রিয় জীবনে অভ্যস্ত করতে হবে। বিভিন্ন জীবিকায় তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা দরকার, যাতে তারা মুক্তির পর অর্থোপায়ের পথ খুঁজে পায়।

অক্ষয়কুমার মৃত্যুদণ্ডকে অন্যায় ও বর্বরতা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তাতে হত্যা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটেনা। এইজন্যে যে, যখন কেউ খুন করে তখন সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতস্থ ; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষমতা থাকে না এবং নিজের জীবনের জন্যেও তখন সে পরোয়া করে না। অনেক ক্ষেত্রে হত্যার পর হত্যাকারী নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দেয়। এসব লোককে ফাঁসি দেওয়া অর্থহীন ও অমানুষিকতা। খুনীকে নির্বাসনে দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না— কারণ তাতে তারা ভিন্ন স্থানে গিয়ে অন্যান্য সৎলোককে কলুষিত করার সুযোগ পায় এবং সামাজিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে হীন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে পারে।

ছয় : শিক্ষাচিন্তা

শিক্ষকতা অক্ষয়কুমারের একসময়ে উপজীবিকা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং পরে বিদ্যাসাগরের নর্ম্যাল স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষার বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে গভীর চিন্তা ও অধ্যয়ন করেন। বাংলা দেশের শিক্ষাতত্ত্বে তাঁর অবদান অসামান্য।

জনশিক্ষাই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। এদেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁর 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থটিতে (১ম ভাগ, ৮ম অধ্যায়) পাওয়া যায়। নর্ম্যাল স্কুলের কার্যকালে বইটি রচিত। ঐসময়ে ছাত্রদের উপযোগী 'চারুপাঠ' প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেন। বাংলার নবজাগৃতির মানসক্ষেত্র তাঁর লেখনীর কর্ষণে বহুলাংশে উর্বর হয়ে ওঠে। অক্ষয়কুমারের শিক্ষা সম্পর্কিত আদর্শ ও পদ্ধতি আজকের দিনেও প্রযোজ্য। কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উত্তরসূরীরা অনেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়।

শিক্ষার বিষয়টিকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার সাহায্যেই দেশের যাবতীয় দুর্গতির নিরসন হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার

সংস্পর্শে এসে এদেশের জাগৃতি ও নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গেই তিনি শিক্ষাকেও যুক্ত করেন। তাঁর মতে :

'তাঁহাদের রাজ্যের সর্ব্বস্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধেয়, অপর সাধারণ সকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য।'[৩০]

শিক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও দুর্বল হয়ে পড়ে। পনের বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সরকারের উদ্যোগ একান্তই কাম্য। দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় শিক্ষায় বঞ্চিত হয়ে রুজিরোজগারে শিক্ষানবিশিতে নিযুক্ত হয়— এর বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৫ সালে যখন তিনি একথা উচ্চারণ করেন তখন ইংলণ্ডেও এদাবি স্বীকৃতি পায় নি। সরকারি প্রচেষ্টায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়নির্বাহের প্রশ্নে অক্ষয়কুমার বলেন যে সরকারের গরজ থাকলে অর্থাভাব ঘটবে না। সরকার যদি সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করেন এবং ধনবান-দের বিলাসব্যসনে অর্থের অপচয় সংকোচনে সমর্থ হন তাহলে শিক্ষাবিস্তারে অর্থাভাব থাকবে না। সেজন্যে তিনি জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করেন :

'রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আহুতি প্রদান করিয়া নর-কণ্ঠ নিঃসৃত শোণিত প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং প্রজাগণ অনিষ্টকর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সুরারূপ সাজ্যাতিক গরল গলাধঃ-করণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহাদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্ব্বক সৌভাগ্য সাধন উদ্দেশ্যে ব্যয় হইলে, জনসমাজ কতদিন আর এরূপ শ্রীহীন থাকে ?'[৩১]

'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার একসময় বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে কোনও বিদ্যালয় না থাকায় অনুশোচনা করেন। তিনি সরকারকে ঐসব গ্রাম থেকে শিক্ষাবাবদ চাঁদা তোলার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তাতে আপত্তির পরিবর্তে জনসাধারণ সাগ্রহে সাড়া দেবে। বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্যে

গঠিত Council of Education-এর উপর চাঁদা থেকে সংগৃহীত অর্থ রক্ষণ ও ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব অর্পণের সুপারিশ করেন।

তিনি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের এক বিস্তারিত পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছিলেন। এই খসড়ায় তিনি দু-বছর বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা বলেছেন— ছোটদের কাছে তখন বিদ্যালয় হবে খেলার জায়গা ; ঐ সময়ে তাদের হাতেকলমে শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা দেওয়া হবে। তারা তখন পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার রীতিনীতিও শিখবে। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ ও মানুষের তৈরি জিনিসপত্রের সঙ্গে পরিচয় ও পার্থক্যবোধ তাদের গড়ে উঠবে। শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনা ও আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুদের সহজাত শুভবৃত্তির উন্মেষ ঘটবে ; শিশু অন্যায় করলে তাকে সাজা দেওয়া নিশ্চয় দরকার— কিন্তু তা মারধর করে নয়— শিশুদের পঞ্চায়েত ডেকে শিক্ষকের পরিচালনায় দোষীর বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে। এর ফলে অভিযুক্ত শিশু লজ্জিত হবে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য শিশুদেরও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সজাগ করে তুলবে। বিদ্যালয়ে যন্ত্রবৎ কিছু বানান মুখস্ত না করিয়ে বস্তুমুখী শিক্ষা ও গণিত শিক্ষাদানের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষকতা মানুষ গড়ারই নামান্তর, সেজন্যে শিক্ষাকার্যে নিয়োগের পূর্বে শিক্ষকদের যথোচিত শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা চাই। একথা বিদ্যাসাগরও বিশেষভাবে সঙ্গে অনুভব করেছিলেন এবং নর্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানত এই কারণেই।

অক্ষয়কুমারের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় স্তর ৬ থেকে ১৪ কিংবা ১৫ বছর বয়স অবধি বিস্তারিত। বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসার ব্যবস্থা থাকবে ; গাছপালা ও কুঞ্জে পরিবৃত বীথিকার দুধারে থাকবে দেশবিদেশের মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি। অল্প ব্যবধানে স্থাপিত কাঠের তক্তায় লেখা থাকবে নানা নীতিকথা ও আদর্শ বাণী। এই শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে ক্রমে ছাত্রদের ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা-দানের তিনি সুপারিশ করেন। সেই সঙ্গে ছবি, চার্ট ইত্যাদি সরঞ্জামের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় বোঝানোর উপযোগিতাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাস পড়ানোর সময় যুদ্ধবাজ বীরদের আদর্শ ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা তাঁর মতে অনুচিত। ঐ সব চরিত্র পাঠের সময় ঈর্ষা, লোভ, হিংসা, যুদ্ধ ইত্যাদি অহিতকর বিষয়ে ছাত্রদের চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। ব্যায়ামের উপর অক্ষয়কুমার খুবই গুরুত্ব দিতেন। দৈহিক শক্তির অভাবেই তাঁর মতে বিশ্বের বহু সভ্যতা

নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আক্রমণকারী কোনও জাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে সৃষ্ট শক্তিমত্ততা ও নিম্নপ্রবৃত্তিগুলি মানুষকে ক্রমে যেন অবনতির পথে নিয়ে না যায় সে-সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দেন।

অক্ষয়কুমারের পরিকল্পিত শিক্ষার তৃতীয় স্তরে বলা হয়েছে যে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রই কেবল বিশ থেকে বাইশ বছর বয়স অবধি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। বাকী সাধারণ মেধার ছাত্রদের কারিগরী এবং পেশার পক্ষে উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে— বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বগত উচ্চশিক্ষা তাদের ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন: 'গ্রামে গ্রামে কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।' শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে উত্তরকালের জীবিকানির্বাহের একটা সংগতি থাকা প্রয়োজন। কৃষি ও কারিগরি শিক্ষাবিস্তারকার্যে তিনি সরকারি উদ্যোগ দাবি করেন; ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কলকারখানা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার যথোচিত সংযোগ থাকা চাই। শিক্ষার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সংগতি বজায় রাখার মত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের অবস্থানকেও তিনি অপরিহার্য জ্ঞান করতেন। অক্ষয়কুমারের রচনায় এদেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিন্তা বোধ হয় সর্বপ্রথম দেখা যায়:

> 'নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্তব্য। আবশ্যকমত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব, সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রান্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে।'[৩২]

জনশিক্ষা সম্প্রসারণে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনকে সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। পাঠ্য-পুস্তকের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও বৃদ্ধির চিন্তাও তাঁর ঐ আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

রামমোহন ইংরেজীর মাধ্যমেই উচ্চ শিক্ষার প্রসারকামী ছিলেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার মাতৃভাষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে একটা বিদেশী ভাষা প্রথমতঃ আয়ত্ত করাই শক্ত— তার উপর সাধারণ গরিব লোকেদের পক্ষে সীমিত সময়ে আর একটি ভাষা শেখা অসম্ভব ও অকার্যকর। একথা তিনি ভালভাবেই অনুভব করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুফল সমাজের সর্বনিম্ন স্তরেও পৌছতে পারে; সেক্ষেত্রে বিদেশী

ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন কেবল উচ্চস্তরের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। তিনি দেখিয়েছেন যে ইতিপূর্বে যাঁরা ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিজাতীয় উন্নাসিক ভাব দেখা দিয়েছে। তাছাড়া মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজীতে শিক্ষা-দানের ব্যয়বাহুল্য চার গুণ অধিক। মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব সম্পর্কে অক্ষয়কুমার যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভাল বই বাংলায় অনুবাদ করিয়ে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার পথকে তিনি সুগম করতে চেয়েছিলেন। তবে ইংরেজী ভাষাশিক্ষাকে তিনি অবহেলা বা বর্জনেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। সরকারি কাজকর্ম মাতৃভাষায় হওয়াটাই তাঁর কাছে কাম্য ছিল। শিক্ষার বিস্তারে সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকাই প্রধান বলে অক্ষয়কুমার অভিমত প্রকাশ করেন।

সাত : আর্থনীতিক চিন্তা

তত্ত্বগতভাবে অর্থনীতি সম্পর্কে অক্ষয়কুমার পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনা করেন নি। সমসাময়িককালে জনসাধারণের দুঃখ ও দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের খণ্ড চিত্রগুলির সমাহরণে একটি সুস্পষ্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই মনোভাবকে সাম্যপন্থী (egalitarian) বলা চলে, যেটা পরবর্তী-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে।

ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ সম্পর্কিত অবিচ্ছেদ্যতা থেকে তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হন যে জনসাধারণের বৃহদংশ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত থাকলে পরিণামে সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয়। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যমোচন না হলে সমগ্র সমাজের দুর্দশা বেড়েই চলে। দুঃখী মানুষ সামাজিক কল্যাণের অনুকূল না হয়ে অহিতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অশিক্ষা, মাদকতা ও কর্মশৈথিল্য দেখা দেয়— উদ্ভূত হয় নানাবিধ অপরাধ-প্রবণতা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। দুঃখী মানুষ কোনও রীতিনীতি ও আইনকানুন বোঝে না; বুঝলেও দারিদ্র্য তাদের সে-বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। নির্বিত্ত, স্বাস্থ্যহীন ও রোগাক্রান্ত মানুষের সঙ্গে একই সমাজে বিত্তবান ও সুস্থ মানুষের

সহাবস্থান অসম্ভব। ধনবৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল— সেজন্যে মহামারী লাগলে সকলেরই জীবন হয়ে পড়ে সংকটাপন্ন।[৩৪]

সমাজের বৈষয়িক, নৈতিক ও মননশীল বিকাশের প্রয়োজনে তিনি দারিদ্র্যকে সর্বপ্রথমে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে ধনীরা সব দেশেই উৎকৃষ্ট বস্তুসম্ভার উপভোগ করতে চায় এবং মনে করে যে অন্যেরা তাদের সুখ ও উপভোগের রসদ জোগাবে। যে-সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অহোরাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রমে রত থাকে সেখানে সামাজিক উন্নতি আয়ত্তের অতীত। ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি ও নীতিবোধ দিয়েছেন। দারিদ্র্যের ফলে মানুষ ঈশ্বরদত্ত ঐ সত্তা থেকে বঞ্চিত।[৩৫] অক্ষয়কুমার সেজন্যে বলেছেন যে বিত্তবান ও বুদ্ধিমানদের উচিত শ্রমজীবীদের জ্ঞান ও উন্নতি অর্জনে সাহচর্য দেওয়া। সেইসঙ্গে সরকারকেও তিনি প্রয়োজনীয় আইনের সাহায্যে জনহিতার্থে যত্নবান হতে উপদেশ দেন। তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্র জনসাধারণেই প্রতিভূ। জনসাধারণের উপর অনর্থক কর আরোপের কোনও অধিকার তার নেই।[৩৬] মানুষ চায় নিজের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার অধিকার — সেই অধিকারকে বজায় রাখতে যতটুকু প্রয়োজন ততটা কর সরকার অবশ্য আদায় করতে পারেন। তাঁর মতে ভারতে ইংরেজ সরকার প্রজাদের প্রতি এই ন্যূনতম কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে— গ্রামীণ অধিবাসী ও রায়তদের দুঃসহ অবস্থাই তার মস্ত প্রমাণ।

দারিদ্র্যের পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে মানসিক জড়তা, বাল্যবিবাহ, ক্রিয়াকর্মে কুসংস্কার, মাদকতা, ভূস্বামীদের অত্যাচার, বাণিজ্যিক জটিলতা ছাড়াও বন্যাপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণও দারিদ্র্যের উৎস।[৩৭] ম্যালথাসের জনতত্ত্বকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে জনসংখ্যা দেশের সাধ্য অতিক্রম করলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে পরিবার পালনের ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা অনুচিত।[৩৮]

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে তিনি কয়েকটি পন্থাও নির্দেশ করেন। ধনবানদের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের দরিদ্রের স্তরে নামিয়ে আনার তিনি বিরোধিতা করেন— তিনি দরিদ্রকে ধনীর পর্যায়ে উন্নীত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্যে তিনি প্রথমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাহায্যে লোকের নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন—যাতে শিক্ষার ফলে স্বতঃ-প্রণোদিত মানুষ স্বীয় উন্নতিসাধনে তৎপর হয়। দ্বিতীয়তঃ আইনানুগ বিধি-

ব্যবস্থার সাহায্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্যোগায়োজন চাই। তৃতীয়তঃ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কায়িকশ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার মানুষকে প্রচুর অবসর দেবে— যে-সময়টা মানুষ তার মনের ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ পাবে। এবিষয়ে রাসেল প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়।

রামমোহনের উত্তরসাধক অক্ষয়কুমারও সমকালীন শিল্পোন্নয়নকে আবাহন জানান।[৩৯] জীবনধারণের উপযোগী সমুদয় ভোগ্যপণ্য সংক্ষিপ্ত সময়ে উৎপাদন করে মানুষ উদ্বৃত্ত সময় বা অবসর জ্ঞান ও ধর্মচিন্তায় ব্যয় করতে সক্ষম হবে।

আট : রামমোহন ও অক্ষয়কুমার

আগেই বলা হয়েছে যে অক্ষয়কুমার রামমোহনের সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী জীবনাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বহুবিষয়ে প্রভেদ থাকলেও অক্ষয়কুমার রামমোহনকে আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসাবে প্রণতি জানিয়েছেন :

> 'তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে।'[৪০]

ঐতিহাসিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠপটে অর্থাৎ আরোহী পদ্ধতিতে রামমোহন বিচারবিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমারের পদ্ধতি ছিল অবরোহী অর্থাৎ সাধারণ ও অনুমান থেকে বিশেষে উপনীত হওয়া।

সমাজসংস্কারই ছিল রামমোহনের লক্ষ্য ; প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারাকে তিনি নস্যাৎ করে দিতে চান নি। শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলিকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতেন। অক্ষয়কুমার সেদিক থেকে বরং অনেকটা আপস-বিরোধী ছিলেন— মূলত তিনি ছিলেন এক তাত্ত্বিক— সবকিছুকেই তিনি সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের বিচারে গ্রহণ করতেন।

রামমোহন বিবাহব্যবস্থায় শৈবপদ্ধতি প্রয়োগ অবধি এগিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার প্রচলিত বিধিব্যবস্থা যুক্তির সাহায্যে ভেঙে দিতে চান। বিধবা-ববাহ তো বটেই, অসবর্ণ বিবাহ ও প্রাক্‌বিবাহ প্রণয় এবং পরিচয়াদিরও তিনি

পক্ষপাতী ছিলেন ; বিবাহ বিচ্ছেদকে তিনি সমর্থন করতেন— বিশেষ করে যেখানে স্বামী অথবা স্ত্রী দুশ্চরিত্র, অথবা মনের মিল যেখানে অনুপস্থিত কিংবা স্বামী যেক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করে। যৌবনোদ্গমের পূর্বে বিবাহবিধির তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে সকল বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম পালনই বাঞ্ছনীয়।

রামমোহন মনে করতেন যে এদেশে নীলচাষসূত্রে ইংরেজদের আগমন ও ও বসবাস ঘটলে পরিণামে এখানকার শিল্পোন্নয়ন তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে অভিযোগ অতিরঞ্জিত ও কায়েমি স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। বৈপরীত্যে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে নীলকরেরা এদেশীয় কৃষকদের সর্বনাশের মূল। পরবর্তীকালে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লঙ সাহেবও দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা যে আন্দোলন শুরু করেন অক্ষয়কুমার তথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেই তার পুরোগামী বলে মনে করা হয়।[৪১]

ইংরেজদের ভারত শাসন সম্পর্কে রামমোহন যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অনেকাংশে ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেন অক্ষয়কুমার। তাই রামমোহনের মতো তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন নি। সরকারের প্রতি তাঁর অপ্রসন্ন মনোভাবের প্রধান কারণ ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা ও আবেগপূর্ণ দরদ। সরকারের কাজ যেখানে মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক মানোন্নয়ন, সেখানে অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সরকারি ব্যর্থতারই প্রমাণ। জনগণের এই দুঃখদুর্দশার জন্যে তিনি সরকারকে অভিযুক্ত ও নিন্দা করেন। বৃহত্তর জনজীবনের অর্থনৈতিক সংকটের জন্যে তিনি ইংরেজ শাসনকেই দায়ী করেন। মফস্বলবাসী ও কৃষকদের দুঃসহ জীবনের চিত্র তিনি নিরন্তর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে দেশের শিক্ষিত জনমানসে তুলে ধরতেন। মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব যে ইংরেজ সরকারের অক্ষমতার ফলেই উদ্ভূত সেকথা তিনি নির্ভয়চিত্তে প্রকাশ করেন।

অত্যাবশ্যক ভোগ্যবস্তুর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির জন্যে তিনি সরকারের প্রতি দোষারোপ করে বলেন যে দেশবাসীর বিশেষ করে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও শরীর ভগ্নপ্রায়। তবে ঐসব দোষারোপ সর্বাংশে সত্য নয় এবং সেগুলি কিছুটা অতিশয়োক্তি ও একদেশদর্শিতা বলে মনে করা হয়।[৪২]

রামমোহন ইংরেজ সাম্রাজ্যাধীনে সমমর্যাদাসম্পন্ন অধিকার চাইতেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার সর্বপ্রকার পরাধীনতাকেই অপছন্দ করতেন। হিন্দুর নরক

মুসলমানের 'জাহান্নম' ও খ্রীষ্টানের 'হেল্' অপেক্ষা পরাধীনতা হেয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। দেশের দুঃখমোচনের জন্য তিনি বিলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, অবস্থাবিপাকে আমরা ইংরেজদের সানন্দে সবকিছু সমর্পণ করে এদেশের রাজসিংহাসনে বসিয়েছি— তাদের উচিত এদেশবাসীর যথোচিত মঙ্গলসাধন।

রামমোহন সুরাপানের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু অক্ষয়কুমার স্পষ্টভাবেই সুরাপানের বিরোধিতা করেন।

নয় : উপসংহার

ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি ধারায় অক্ষয়কুমার প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকৃতিবাদ (Naturalism) নামে পরিচিত। ডিমোক্রিটাস, লুক্রেটিয়াস, স্পিনোজা প্রমুখ দার্শনিকগণ প্রকৃতিবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু তাঁদের মৌল প্রত্যয় ছিল অভিন্ন।

প্রকৃতিবাদীদের মতে বিশ্বচরাচর সুনির্দিষ্ট এক নিয়মাধীনে নিয়ন্ত্রিত। বস্তুর উদ্ভব ও অবলুপ্তি এবং যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা একই নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ; অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত কোনও সত্তার দ্বারা তা নির্দিষ্ট নয়। বস্তুময় বিশ্বপ্রকৃতির গতিপথ সুনিয়মিত; সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আধার এই জগৎ চলেছে সেই বাঁধাধরা নিয়মের পথে। বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য, পরিবর্তনের ভিতর স্থায়িত্ব এবং বহুমুখী ও বিস্ময়কর নিসর্গের ভিতর বুদ্ধির গোচরাধীন দৃঢ় এক বস্তুসত্তা বিরাজমান। সেই সত্তার পশ্চাতে কোনও অলৌকিক বা ঐশ অভিপ্রায় নেই।[৪৪]

অণুর উপাদানে গঠিত বস্তুসত্তার প্রকৃতি নিরপেক্ষ ও সমন্বিত এবং তার নিয়মাবদ্ধ গতিপথ চিরন্তন। গতিশীল বিশ্বজগতের ঘটনাপ্রবাহ যেন এক যান্ত্রিক নিয়মাধীনে শৃঙ্খলা ও পারম্পর্যে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেও অনুরূপ নিয়মশৃঙ্খলা ও সাযুজ্য বিদ্যমান। এই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত নৈসর্গিক পরিবেশের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় ও তুরীয় কোনও পরমসত্তার অস্তিত্বকে প্রকৃতিবাদীরা স্বীকার করেন নি।

প্রাচীন গ্রীসে এই প্রকৃতিবাদ বস্তুবাদের সরল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতিবাদের ছাঁচে বস্তুবাদ রূপায়িত হয়েছিল বটে, কিন্তু সকল প্রকৃতিবাদীকে বস্তুবাদী বলা যায় না।[৪৫]

অধিকাংশ প্রকৃতিবাদীই নীতিশাস্ত্রকে পরিবেশের অনুসারী জ্ঞান করতেন এবং আধ্যাত্মিক বিচারে প্রকৃতিবাদের প্রধান লক্ষণ নিরীশ্বরবাদ কিংবা অজ্ঞাবাদ। অক্ষয়কুমার অজ্ঞাবাদী হিসাবেই পরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করতেন।[৪৬]

বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ও মুক্ত মন নিয়ে অক্ষয়কুমার সবকিছুর বিচার করতেন। পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হলেও দেশের সনাতন আদর্শ ও প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা কম ছিল না। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দুটি খণ্ড তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরোধিতা (heresy) করার জন্যে অক্ষয়কুমার, 'বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি অশুভ দিন ও অশুভক্ষণ দেখিয়া ভ্রমণার্থ যাত্রা করিতেন, কুত্রাপি নির্জ্জন দেবমন্দিরে গিয়া, আপনার অভিমতানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। যে দিন অপরাপর লোকে যোগ-স্নান ও গ্রহণান্ত স্নান-উদ্দেশে গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, ইনি তাহার বিপরীত দিকে সরোবরে স্নান জন্য গমন করিতেন।'[৪৭]

অক্ষয়কুমার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কল্পনা করেন। তিনি সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে যত বলেছেন সে-তুলনায় জনসাধারণের নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট। জনগণের দুঃখমোচনের জন্যে তিনি বিলাতের মহানুভব ব্যক্তিদের যত্নবান হতে অনুরোধ জানান। ভারতীয়দের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব সঠিক পালনের জন্যেও তিনি ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মনে করতেন যেহেতু ভারতীয়েরা ইংরেজদের সার্বভৌম কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করে নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ তাদের কাছে সঁপে দিয়েছে, সেহেতু তাদেরই উপর ভারতীয়দের কল্যাণসাধনের মহান দায়িত্ব নির্ভর করে।

তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী। তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিতর্কক্ষমতা তাঁকে সমকালীন বিদ্বৎসমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও দূরদৃষ্টি তাঁর চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়। প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রবল স্রোতের বিপরীতে সন্তরণ করার ফলে স্বভাবতই তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে

পড়ে। নবীনবাংলার শীর্ষস্থানীয় চিন্তানায়ক অক্ষয়কুমার তাঁর জীবনসাধনাকে সাহিত্য,সাময়িকপত্র ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেন। বাংলার মনন- ও সমাজ-বিপ্লবে অক্ষয়কুমারের অবদান অসামান্য।

নির্দেশিকা

১. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'। খণ্ড ১, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৮২।

২. নগেন্দ্রনাথ বসু, সংকলক। 'বিশ্বকোষ'। ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ১।

৩. S. K. De. *Bengali Literature in the Nineteenth Century. 1962*, p. 606.

৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আত্মজীবনী'। ১৯৬২, পৃ ৪১৪।

৫. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ, ১৭৭৭ শকাব্দ। ১৪১ সংখ্যা, পৃ ১০।

৬. S. K. De. *Bengali Literature in the Nineteenth Century*. 1962, p. 610.

৭. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। 'অক্ষয়চরিত'। পৃ ৩৯ (পাদটীকা)

৮. রাজনারায়ণ বসু। 'আত্মচরিত'। পৃ ৬৮।

৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ, ১৭৭৭ শকাব্দ।

১০. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আত্মজীবনী'। ১৯৬২, পৃ ২২০।

১১. সুশীলকুমার দে। 'অক্ষয়কুমার দত্ত', শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ ২১২।

১২. রাজনারায়ণ বসু। 'আত্মচরিত'। পৃ ৬৮।

১৩. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'। খণ্ড ১, ১৯০৭, উপক্রমণিকা, পৃ ৪০।

১৪. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, বিজ্ঞাপন।

১৫. সুশীলকুমার গুপ্ত। 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ'। ১৯৫৯। ৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৬. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ১, উপক্রমণিকা।

১৭. P.S. Basu. *Life and Works of Brahmananda Keshub Chandra Sen*. p. 106.

১৮. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। ১ম ভাগ, ৭ম মুদ্রণ, ৫ম পরিচ্ছেদ।

১৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৫৯-৬০।

২০. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। ২য় ভাগ, পৃ ২৮-২৯।

২১. অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্ম্মনীতি। পৃ ৫৮।

২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩০-৩১।

২৩. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, পৃ ২২৯-২৮৭।

২৪. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। ১ম ভাগ, পৃ ১৯৭-১৯৮।

২৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। ৫ম অধ্যায়।

২৬. B. B. Majumdar. *History of Political Thought*. p. 139.

২৭ অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। ২য় ভাগ। পৃ ২২৯-২৮৭।

২৮. B. B. Majumdar. *History of Political Thought*. pp. 147-150।

২৯. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। ২য় ভাগ, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ১২৭।

৩০. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। পৃ ১৬৬।

৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৬৭।

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৬৪।

৩৩. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৪০ সংখ্যা। চৈত্র ১৭৭৬ শকাব্দ।

৩৪. পূর্বোক্ত পত্রিকা। ১২২ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৭৭৫ শকাব্দ।

৩৫. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, পৃঃ ৪৪-৪৬।

৩৬. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। পৃ ১৬৯-১৭০।

৩৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। চৈত্র, ১৭৭৬ শকাব্দ।

৩৮. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, পৃ ২৫-২৭।

৩৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পৌষ, ১৭৭৬ শকাব্দ।

৪০. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'। খণ্ড ১, ভূমিকা।

৪১. B. B. Majumdar. *History of Political Thought.* p. 129.

৪২. *Ibid.* p. 151.

৪৩. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'। খণ্ড ২, ভূমিকা।

৪৪. D. D. Runes, ed. *The Dictionary of Philosophy.* 1942, p. 205.

৪৫. E. R. A. Seligman, ed. *Encyclopaedia of the Social Scinces.* 1959, Vol. 11-12, pp. 302-305

৪৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আত্মজীবনী'। পৃ ৪১১-৪১২।

৪৭. মহেন্দ্রনাথ রায়। 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত'। ১২৯২ বঙ্গাব্দ। পৃ ৩০৬।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ - ১৮৮৪

এক : ভূমিকা

রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে অক্ষয়কুমারকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়কুমার রামমোহনের ভক্তিবাদী আদর্শ-গ্রহণ করেন নি— সে-আদর্শের প্রধান অনুসারী হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহনের ভক্তিবাদী দিকটির আরও পরিপূর্তি ও পরিমার্জন করেন মহর্ষির শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। বিপিনচন্দ্র পালের মতে : 'it will have to be admitted, he largely supplemented and even corrected the great Raja himself'। [১] বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যের পথনির্দেশ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মপ্রচারকের আদর্শের সমন্বয়প্রয়াস সমগ্র আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের একটি অনন্য অবদান। কেশব-চন্দ্রের ইতিহাসচিন্তা ও বিশ্বজনীন ঐক্যের সাধনা অনুরূপ মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন 'Keshub was an ardent nationalist, an ardent social reformer, an ardent man of god'।[২] সুবক্তা ও সুলেখক কেশবচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন (১৮৫৭)। বয়স যখন তাঁর উনিশ সে-সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সচিব নিযুক্ত হন। বয়স্ক শিক্ষা (adult education), স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজোন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একটি বৃহত্তর গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে কেশবচন্দ্র স্বয়ং 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন (১৮৫৯)।

সকল মতের নিষ্কর্ষ গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনের তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয় সাংস্কৃতিক ধারার তিনি গভীর অধ্যয়ন করেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল মুক্ত ও উদার। রামমোহনের মত তিনিও সমাজসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। খ্রীষ্টান ক্যাথলিকদের মত কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ প্রকাশের পন্থায় তিনি বিশ্বাস করতেন। তাতে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের দুষ্কর্মপ্রসূত পাপপ্রত্যয়ের একটা মিল দেখতে পান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সকল চিন্তাশীল মনীষীর আদর্শে তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করেন।

১৮৬২ সালে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য। বছর দুয়েক ধরে (১৮৬৪-৬৬) ভারতের বিভিন্ন স্থান তিনি পর্যটন করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারানুষ্ঠান, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, উপবীতধারণ, মদ্যপান, অবরোধপ্রথা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ছিল সেই পরিক্রমার উদ্দেশ্য। সে-সময়ে দেশে ঐ ধরণের কাজ বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সমান মনে করা যায়। ১৮৬৪ সাল থেকে 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একটি পত্রিকার তিনি প্রকাশন শুরু করেন।

তিনি ও তাঁর অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়ে যান। কারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ, অসবর্ণ বিবাহ ও খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শনে আপত্তি তোলেন। ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। এই গোষ্ঠীর একদল পরে আবার বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে একত্র 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) করেন। তাঁরা কেশবপন্থীদের গুরুবাদ পছন্দ করতেন না—ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটা গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই বিভেদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে নিজেরই সৃষ্ট বিবাহ আইন ভঙ্গ করে কেশবচন্দ্র নিজের অপরিণীতা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারের বিবাহ দেন, এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এইসব কারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতাবলম্বীরা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন।

লর্ড লরেন্স ও বিলাতের একেশ্বরবাদীদের আমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন (১৮৭০)। সেখানে বিভিন্ন সভায় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রানী ভিক্টোরিয়া ও প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন কেশবচন্দ্রকে ভোজে আপ্যায়ন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীদের পরিচয় ঘটে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মিল খুঁজে পান। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্রের মাধ্যমেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতা দেখা দেয়। মাক্স ম্যুলারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই কেশবচন্দ্র ১৮৮০ সালে 'নববিধান' ('New Dispensation') আদর্শের প্রবর্তন করেন। সর্বধর্মের সমন্বয় (Religion of Harmony) ছিল এই নবচিন্তার মর্ম। নববিধানের মূলকথা হল জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনের মধ্যে ঐকাত্ম্য স্থাপন ও যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন। কেশবচন্দ্রের 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' উক্ত নবজীবনাদর্শের

প্রধান গ্রন্থ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এই মতের একজন বিশিষ্ট প্রচারক। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা ছিল নববিধান গোষ্ঠীর মুখপত্র।

সকল জাতি ও ধর্মের লোকদের নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মস্ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন (১৮৭১) রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং তাঁর উদ্যোগে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে একত্র বসবাস ও মিলিত উপার্জনে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে 'ভারত আশ্রম' স্থাপিত হয়। দেশব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে তিনি 'প্রচারক সভা' নামে অপর আর একটি সংস্থা এবং শিক্ষাবিস্তার ও চিন্তার আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্বরূপ কলকাতায় 'অ্যালবার্ট হল্' ও 'অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন।

কেশবচন্দ্র যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দির' নির্মাণ করেছিলেন সেটি তাঁর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সমন্বয়প্রচেষ্টার এক মূর্ত প্রতীক। মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে চয়ন করে তিনি 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। সুসংগঠিত উপায়ে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হয়।

উচ্চ আদর্শ ও শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কেশবচন্দ্র বাংলার সামাজিক ও নৈতিক মানকে নতুন ধারায় উন্নীত করার প্রয়াসী হন। বহুমুখী সমাজসংস্কারকর্মে নারী প্রগতিকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ পাঁচটি বছর তিনি সমন্বয়ধর্ম প্রচার, গ্রন্থরচনা ও সংস্কারকর্মে অতিবাহিত করেন। নতুন ধর্মাদর্শ প্রচারের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা এবং সাধকদের জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী 'জীবন বেদ' ও 'নবসংহিতা' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধকদের নিয়ে সার্বভৌম সাধুমণ্ডলীর পত্তন, নারীসমাজ গঠন ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে লোকশিক্ষা প্রচারই তাঁর এই সময়ের প্রধান কাজ ছিল।

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও আচরণে একসময়ে খ্রীষ্টধর্মের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ ও নীতিকথার অনুরাগী ছিলেন; কেশবচন্দ্র আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানী আচারানুষ্ঠান অনুযায়ী নববিধান মন্দিরের রীতিনীতি রূপায়িত করেন। আচার্য-অভিষেক (ordain), ধর্মে দীক্ষাদান, শেষভোজন ইত্যাদি অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় ধারারই অনুকৃতি। জীবনের

শেষ পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই হয়ত খ্রীষ্টানী মনোভাব তিনি কিছুটা পরিত্যাগ করেন এবং অন্তর্লৌকিক বৈদান্তিক যোগক্রিয়ায় আকৃষ্ট হন।

দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদী আত্মবিকাশ,উন্নয়ন ও স্ফুরণের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—পক্ষান্তরে তাঁরই শিষ্য কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টীয় মার্গে চলতে শুরু করেন। তিনি রামমোহনের যুক্তিবাদী মনের দ্বারা তেমন প্রভাবিত হন নি, যতটা হয়েছিলেন ভক্তির আদর্শে। তিনি শেষদিকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহযোগিতায় নববিধানসভায় বৈষ্ণবদের অনুরূপ সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের জীবন ও মননে একধারে ভক্তিবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সমাজ-সংস্কার ও মুক্তির প্রেরণা এক সমন্বিত রূপ পেয়েছে।

দুই : ধর্মচিন্তা

কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শ আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি অভিনব পদক্ষেপ। তাঁর কাছে ধর্মের প্রত্যয় ছিল প্রকৃতিগত—অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধির জন্যে মানুষের সহজাত ঐশ প্রবণতা ও অধ্যাত্মবোধই যথেষ্ট, সেজন্যে প্রচলিত কোনও ধর্মের নির্দেশ, শাস্ত্রগ্রন্থ বা গুরুর প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে মানুষের ধর্ম ও নীতিবোধের উৎস দ্বিবিধ। একটি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী কোনও ধর্ম বা অনুশাসন ; দ্বিতীয়টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বজ্ঞা (Intuition)। কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় ধারাটি অবলম্বন করেন। জীবন বেদের গোড়ায় তিনি লিখেছেন :

> 'গির্জায় যাইব কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব, তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত কোরান পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।'[৩]

প্রার্থনাই তাঁর প্রাকৃতিক বা ব্যক্তিগত ধর্মের প্রথম সোপান। সে-প্রাথনা পার্থিব কোনও বস্তুর জন্যে নয়। নিষ্কাম প্রার্থনার পথ অনুসরণ করে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি চেয়েছিলেন। পৃথিবীর পাপপঙ্কিল পরিবেশ পরিত্যাগের জন্যে দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ তিনি 'পাপবোধ' জাগ্রত করার উপদেশ দেন। তমসাচ্ছন্ন ও জড়তাগ্রস্ত আবেশ থেকে জীবনকে মুক্ত করার তাগিদে তিনি তৃতীয় সোপান

হিসাবে 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা' নেবার কথা বলেন। ক্রমে বিবেক, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সোপান অতিক্রম করে সার্বভৌম চিন্তার স্তরে উপনীত হবার অভিমত প্রকাশ করেন। সর্বোপরি তিনি বৌদ্ধ আদর্শে বৈরাগ্যকে স্থাপন করেছেন।[৪]

কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শের মর্মকথা হল জীবনের পরিপূর্ণতা। পূর্ণ যিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে নিজেরও পূর্ণতা— অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত মানবিক সকল শুভবৃত্তির উন্মেষ চাই। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বেশ মিল দেখা যায়। উভয়েই দেহ মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। সমগ্র সত্তার পূর্ণ বিকাশের ফলেই পরমাত্মার সঙ্গে সহজে মিলিত হতে পারা যায়। বিজ্ঞানচর্চাকে কেশবচন্দ্র যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং ধর্মচর্চাকে বিজ্ঞানবিমুখ করতে চান নি। হিমালয়ভ্রমণকালে এক পত্রে তিনি তাঁর অনুরাগীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন :

'ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্ম হইবে। তোমরা সকলের উপর বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, শরীরবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রকৃতির ঈশ্বরের জীবন্ত শাস্ত্র। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ দেবনিশ্বসিত এবং প্রার্থনা আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শাস্ত্র। নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রতিবিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগূঢ় রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর।'[৫]

কেশবচন্দ্র বিশ্বের প্রচলিত সকল ধর্মের নিষ্কর্ষ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও ধর্মমতের উপর নিজ আদর্শ স্থাপন করেন নি। তাঁর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে মোটামুটি এইভাবে দেখানো যায় :

১. জীব ও জগতের নিয়ামক পরম সত্তা সদাই ক্রিয়াশীল।
২. ঐশ নির্দেশ গ্রহণে উপযোগী মানুষের কাছে ঈশ্বরাদেশ প্রেরিত হয়।
৩. মনুষ্যজীবনের সহিত জড়িত যাবতীয় নৈসর্গিক বিষয় ঐশ নির্দেশে তাৎপর্যবহ। প্রার্থনার ফলে সেই নির্দেশ মনুষ্যহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এবং তা যদি পরীক্ষামূলক হয় তাহলে পরীক্ষার সম্মুখীন হবার শক্তিও মানুষ প্রাপ্ত হয়।

সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই ছিল তাঁর প্রধান কামনা ও বাসনা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর ত্রিত্ব (Trinity)-প্রত্যয়ে বিন্যস্ত : God in Nature, God in Soul এবং God in History[৬]। শেষোক্ত স্তরেই ঈশ্বর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশমান।

তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ মানবগণের মাধ্যমে দিব্য অভীপ্সা নিয়তই সঞ্চারিত হয়; বিশ্বচরাচরের অবিরাম নবরূপায়ণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সকল পাপাচারীকে উদ্ধার করেন। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর মানবমনে সদাই পবিত্র মূল্যবোধ সঞ্চার করেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে[৭] কেশবচন্দ্র অনুভব করেন যে সকল ধর্মেই সত্য বিরাজমান। সেই বিশ্বাসেই তিনি নববিধান আদর্শে সকল ধর্মের সমন্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে একটি মৌল আধ্যাত্মিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' গ্রন্থে ধর্মীয় সকল মত ও পথের একটি সমন্বয়তত্ত্ব তিনি উপস্থাপিত করেন। নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সংস্কারকের পথানুসারী কেশবচন্দ্র বর্তমান কালে এক নতুন সমাজ-বিপ্লবের নিশানা দেখান।

কেশবচন্দ্রের সমন্বয়পন্থী নববিধান আদর্শ বৈশ্বিক সৌহার্দ্য, সর্বাত্মক ও সমবায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সহায়ক বলে মনে করা যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন একটি মানবসমাজের চিন্তা কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শে সুপরিস্ফুট:

> 'গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা পরমতাসহিষ্ণুতা নববিধানের ভাবের একান্ত বিরোধী জানিয়া উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে। তোমাদের বিশ্বাস অসর্ব্বান্তর্ভাবক না হইয়া সর্ব্বান্তর্ভাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অনুরাগ না হইয়া সার্ব্বভৌমিক ঔদার্য হউক। যদি তোমরা কেবল আপনাদের লোক, আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনকে ভালবাস ইহাতে আর তোমাদের কি গৌরব? ··· তোমরা নূতন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। তোমরা নূতন ধর্ম্মমত সংসৃষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিবে।'[৭]

তিন: ইতিহাসচিন্তা

কেশবচন্দ্র সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন; তিনি মনে করতেন ঈশ্বরই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রকাশমান হন; ইতিহাস ও মানবাত্মার মাধ্যমে ঐশ নির্দেশ অভিব্যক্তি লাভ করে; ঈশ্বরনিরপেক্ষ জড় ও

জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব; বিশ্বচরাচরের সুসমঞ্জস সম্পর্ক ও শুভগতি এবং মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট :

> '...There is God in History. He who created and upholds this vast universe also governs the destinies and affairs of nations. The same hand which we trace in the lily and the rose, in rivers and mountains, in the movements of the planets and the surges of the sea, regulates the economy of human society, and works, unseen, amid its mighty revolutions, its striking vicissitudes, and its progressive movements. History is not what superficial readers take it to be, a barren record of meaningless facts—a dry chronicle of past events, whose evanescent interest vanished with the age when they occurred. It is a most sublime revelation of God.'[৮]

প্রকৃতির ন্যায় ইতিহাসেও ঈশ্বর প্রকাশমান হন। আপাতদৃষ্টিতে যে-ইতিহাস মানুষের রচনা বলে মনে হয় বস্তুত: তার অন্তরালে এক ঐশশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু ঈশ্বর ইতিহাসে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন? তার জবাবে কেশবচন্দ্র বলেছেন মহান মানুষের (Great Man) মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রকাশমান হন। তাঁর এই কথায় কার্লাইলের একটি উক্তি যেন ধ্বনিত হয়েছে : **'history of the world is the biography of great men'**। এক একটি যুগ ও জাতি কোনও এক মহান ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্রীভূত ও সংঘবদ্ধ হয়। কালের প্রবাহে কত সমাজ ও জাতির উত্থান ও পতন ঘটে থাকে; সংখ্যাতীত মানুষের স্রোত বয়ে চলে—যুদ্ধবিগ্রহে কত নাম-না-জানা মানুষই জীবনবলি দেয়—কিন্তু নাম থেকে যায় কেবল নেতৃবৃন্দ ও সেনানায়কদের। এই নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিরাই সব কিছু চালনা করেন। তাঁদের খ্যাতি ও দ্যুতি ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। **Heroes, Reformers, Prophets** ইত্যাদি আখ্যা তাঁরা পান। কেশবচন্দ্রের মতে ইতিহাসখ্যাত মহান মানবদের সাহায্যেই ঈশ্বর ইতিহাসে অভিব্যক্ত হন। এক-একটি যুগের প্রতিভূ মহামানবরা নিজেদের ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন—অন্তর্ভাবকে বহির্লোকের মধ্য দিয়ে রূপায়িত না করা অবধি স্বস্তি পান না। গীতোক্ত বিভূতি যেমন স্বতঃই বিচ্ছুরিত হয় তেমনি তাঁদের ধ্যানের বস্তু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চিরন্তন জ্যোতির্ময়ের ন্যায় ফুটে ওঠে। প্রকৃতির প্রয়োজন ও সমাজের তাগিদে ঐ সব মহামানবগণ আবির্ভূত হন। বিশ্বনিয়ন্তার

নৈতিক শক্তিকে তাঁরা প্রকাশমান করে তোলেন। যৌবনে তিনি কার্লাইল ও ইমার্সনের এই চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কার্লাইলের ব্যক্তিপূজা-তত্ত্ব তাঁকে চমৎকৃত করে।

মানবিক কল্যাণকল্পেই ঐসব মহান ব্যক্তিরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হন—তাঁরা ঈশ্বরেরই প্রতিভূ—নানা গুণ ও শক্তিমণ্ডিত মহান ব্যক্তিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিপথ রচনা করেন। সাধারণ মানুষ থেকে তাঁরা সর্বাংশে উন্নত; সেজন্যে কেশবচন্দ্র তাঁদের অতিমানব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর 'Great Man' তত্ত্বের সঙ্গে হেগেল ও নীট্‌শের অতিমানব প্রতীতির কিছুটা মিল আছে এবং এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে তাঁর চিন্তার বিশেষ পার্থক্য নেই। কেশবচন্দ্রের অতিমানব একদিকে দেশ ও কালের প্রতিভূ; অপরদিকে বিশেষ কোনও ভাবধারার প্রবক্তা। কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে অতিমানবের নিঃস্বার্থ ত্যাগ, অনাবিল তিতিক্ষা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, জ্ঞানবিদ্যার মৌলিকতা ও অজেয় শক্তি থাকে।[৮]

এশিয়াকে কেশবচন্দ্র মানবসভ্যতার পীঠস্থান (Holy Ground) বলে মনে করতেন; এশিয়াতেই বিশ্বের সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি ভূমিষ্ঠ হয়েছে; এশিয়াতেই জন্মেছেন অধিকাংশ মহান ব্যক্তি; তাই এশিয়ার ধুলো তাঁর কাছে সোনার চেয়েও আদরণীয় ছিল। ইউরোপকে তিনি এশিয়ার ঔদার্য, মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমের বাণী গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তাঁর 'নববিধান' আদর্শে এশিয়ার সকল চিন্তা ও ধর্ম সমন্বিত হয়েছে। ভারতে ইংরেজদের আগমনকে তিনি দিব্য অভীপ্সা বলে মনে করতেন: 'It is Providence that rules India through England.'[৯]। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের যে সামাজিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে তার সংশোধনের জন্যে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে এদেশের সংযোগ থাকা আবশ্যক। ভারতকে জগৎসভায় সম্মানিত আসন ফিরে পেতে হলে পশ্চিমী সংযোগ ও সাহায্য তাঁর মতে অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী ইংলণ্ডেরও উপকারসাধন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন:

> 'The mutual intercourse between England and India, political as well as social, is destined to promote the true interests and lasting glory of both nations.'[১০]

দেশের নৈতিক ও সামাজিক সংকটের সন্ধিক্ষণে ইংরেজের আবির্ভাবকে তিনি

স্বাগত জানিয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্য ভারতকে দীন ও হীনবল করে তুলেছিল— সময়টা তাঁর মতে তখন খুবই সমস্যাসংকুল— ইংরেজশাসনও তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কতিপয় ইংরেজের বিসদৃশ আচরণ সত্ত্বেও এদেশে ইংরেজরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সূচনা করেছে। তাই কেশবচন্দ্র তাঁর 'England and India' বক্তৃতায় ইংরেজদের ভারতবিজয়কে বিধিনির্দিষ্ট ('Providential Dispensation') বলে অভিহিত করেন। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন ভারতে ইংরেজ শাসন প্রকারান্তরে ঐশ আশীর্বাদস্বরূপ। সেজন্যে ব্রিটেনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই তাঁর অভিমত ছিল।

চার : রাষ্ট্রদর্শন

অক্ষয়কুমারের মতো কেশবচন্দ্রও মনে করতেন যে প্রাকৃতিক প্রবণতা ও প্রয়োজনেই সমাজের উৎপত্তি। সামাজিক ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সম্ভাবনা পরিণতি লাভ করে। ব্যক্তিসত্তা পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্র অতিক্রম করে সারা বিশ্বের সংঘবদ্ধতায় পরমসত্তার সন্ধান পায়। ঐক্যবদ্ধতা মানুষের স্বভাব। মানুষে-মানুষে ঐক্যের ভিত্তিতেই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া যায়।

কেশবচন্দ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন। গোষ্ঠীর নামে তিনি ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে চান নি। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি বলেন :

> 'We do not want any single instrument to supplant and supersede the rest ; We do not wish that only one voice should sing and all the others be annihilated or hushed in silence. True music is not all drum or all violin ; it is the perfect agreement of all varieties of sound, instrumental and vocal'.[১১]

ব্যক্তিমানুষকে তিনি দিব্যবিধান অনুযায়ী মূলতঃ নীতিপ্রবণ ও যুক্তিমুখী বলে মনে করতেন। মানুষের ঐ সহজাত সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশই ছিল তাঁর কামনা। তিনি চাইতেন :

১. অনুশাসনমুক্ত মানুষের ভালমন্দ বিচারের স্বাধীন ক্ষমতা ;

২. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মূলে ব্যক্তির স্বাধীন বিবেকের অনুশাসন ;
৩. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা।[১২]

কেশবচন্দ্র মুক্তির পূজারী ছিলেন। 'জীবন বেদ' গ্রন্থে তিনি মুক্তির জয়গান করেছেন। পরাধীনতা তাঁর কাছে ছিল এক মস্ত পাপস্বরূপ— যা ঈশ্বরের প্রতি বৈরিতা বিশেষ ; মুক্তির প্রশ্নে তিনি ছিলেন অটল ও অনমনীয়। তিনি মনে করতেন যে কুসংস্কার ও অজ্ঞানের একমাত্র প্রতিষেধক হল স্বাধীনতা। দাসত্ব ব্যক্তির অধীনেই হোক বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনে হোক তা মন্দ বই আর কিছু নয়। বর্ণবৈষম্য ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতায় তাঁর এই মুক্তির চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল মানুষের মধ্যে একই ঈশ্বর বিরাজ করেন ; সেজন্যে মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অন্যায়। মুক্তিকে তিনি আত্মম্ভরিতা, হঠকারিতা বা নৈরাজ্য-বাদী দৃষ্টিতে দেখতে নিষেধ করেন। ঈশ্বরের অনুগতরূপে ঈশ্বরের উপর অচল আস্থা ও নির্ভরতাই মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে।

সামাজিক মুক্তির প্রসঙ্গেও তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন প্রবক্তা। তমসাচ্ছন্ন দেশ ক্রমে আলোকের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে মুক্তিকামী মানুষ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে বলে তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর রচনায় যুগের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায়শঃই তাঁর সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায় :

> 'The love of freedom is the chief characteristic of the present age... This love of freedom manifests itself in all departments of speculation and practice. In politics men aspire to that form of government in which every section of the community may be fairly and fully represented. In education, the cry all over the civilized world is— enlighten the masses...In society, there is an earnest struggle to break through the fetters of tradition, custom and conventionalism. In religion also we see the effects of a strong desire to enfranchise the spirit...'[১৩]

কেশবচন্দ্রের মতে মুক্তি সম্পর্কিত মূল্যবোধই হল জাতির প্রাণশক্তিস্বরূপ। আর এই মুক্তিকে তিনি দেখেছেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ইংরেজদের ভারত আগমনকে কেশবচন্দ্র ঐশ অভিপ্রায় বলে মনে করতেন এবং ইংলণ্ডের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই ছিল তাঁর অভিমত। মন্থর

স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণপূর্বক তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজশক্তি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিভূ। তাই মানুষের নতি ও আনুগত্য রাজারই প্রাপ্য। ঐ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র একথাও বলেছেন যে রাজদ্রোহ কেবল রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধই নয়— ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণও বটে। রাজানুগত্য অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসের ঐশ প্রত্যয়কে (God in History) অগ্রাহ্য করা। ভাবাবেগবশতঃ কেশবচন্দ্র বলেছিলেন: 'We love our Queen as our mother'। ভারতে ইংরেজ শাসনের পশ্চাতে কেশবচন্দ্রের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উত্তরকালে অনেক রাষ্ট্রনায়ককে প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমান করা হয়। বিশেষ করে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে তাঁর এই চিন্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মডারেট-পন্থী ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ রাজনীতিকের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়।[১৪]

কেশবচন্দ্র মনে করতেন যে প্রাচীনকালে রাজার প্রতি হিন্দুদের আনুগত্য দেবভক্তিস্বরূপ ছিল; হিন্দুরা গৃহে পিতামাতাকে যেমন দেবতার তুল্য ভক্তির চোখে দেখে রাজাকেও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই দেখত।[১৫] এই দৃষ্টিভঙ্গী কেশবচন্দ্রের মতে প্রকৃতিগত। রাজার রাজ্যশাসন ত্রুটিপূর্ণ বা অনিপুণ হলেও— প্রজারা পিতার গুণাগুণ বিচার না করে যেমন ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, রাজার প্রতিও তেমনি আনুগত্য প্রদর্শন করত। এ-মনোভাব হিন্দুদের প্রকৃতিগত ও তাদের অনাবিল হৃদয়ের লক্ষণ:

> 'Loyalty shuns an impersonal abstraction. It demands a person, and that person is the sovereign, or the head of the state, in whom law and constitutionalism are visibly typified and represented.'[১৬]

রাজানুগত্যকে তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সমতুল মনে করতেন কারণ তাঁর মতে আনুগত্য তাতে দৃঢ়তা ও পবিত্রতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং পুণ্য আবেগ ও চেতনার সৃষ্টি করে। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতাকে কেশবচন্দ্র নিন্দা জানাতেও কোন দিন পরাঙ্মুখ হন নি। ভারতের আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রকে তিনি ইংরেজশাসনের থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখতেন। ইংরেজশাসন দিব্যবিধানে প্রবর্তিত— ঐ-শাসন ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তার বিরোধিতা ও সংশোধনেরও অবশ্য প্রয়োজন আছে। ভারতকে ইংরেজের অধীনে রাখার পরিবর্তে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান অধিকার ও

সমবায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই ছিল তাঁর কামনা। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য, সৌহার্দ্য ও সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি যত্নবান হন। শাসনব্যবস্থার গলদ দূর করার জন্যে রাজদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণকে তিনি দেব-অভিপ্রায়ের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে :

> 'Sedition is rebellion against the authority of God's representative, and therefore against God. It is not merely a political offence, but sin against Providence.'[১৭]

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁর অভিপ্রেত ছিল। ইংরেজদের শুভবুদ্ধি ও বিবেকের কাছে সেজন্যে তিনি আবেদন জানান। সমকালীন ইউরোপে সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় যে-সব পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছিল, কেশবচন্দ্র সে-বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এদেশে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও বিভিন্ন লেখায় ও ভাষণে বারংবার উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে সে-সবের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। বিখ্যাত 'Asia's Message to Europe' বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

> 'Among the advanced nations of the west the tendency of modern politics is not to exclude any, but to include all ; not to destroy and ignore any section, but to represent the whole people. The highest form of government is synonymous with the most thorough-going and comprehensive representation.. If you have even the semblance of good government, if you care for real political prosperity, surely you cannot reject the humbler classes ; you cannot extinguish them because of their poverty, you cannot crush them into atoms because of their ignorance. There is everywhere a cry for justice, justice to the weak and powerless, justice to the working classes. Not to listen to that cry would be a disaster.'[১৮]

হ্যামিলটনের নীতিদর্শন তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং হয়তো সেই প্রভাবেই মনে করতেন যে নীতি ও ধর্ম কেবল গুহায় অথবা পর্ণকুটিরে বিরাজ করে না ; সেইসঙ্গে একথাও বলতেন যে বিত্তবানদের বরাতে মুক্তি জোটে না। তাঁর নববিধানে ধনী-নির্ধনের স্থান ছিল সমান। তাঁর মতে রাজপ্রাসাদেও যেমন, তেমনি দরিদ্রের কুটিরেও ঈশ্বর বিরাজ করেন।

কেশবচন্দ্র নিজেকে সোশালিস্ট বলে জাহির করেন নি। রাজনীতির ব্যাকরণ-

গত চেতনাও হয়তো তাঁর ছিল না। কিন্তু সোশালিজ্‌মের যা মূলকথা—অর্থাৎ মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শ—তা তাঁর সমগ্র চিন্তা ও আচরণে স্পষ্টই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বড়মানুষ কে? এ-প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন :

> 'আমাদের দেশে এদেশের ছোটলোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে··· পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোটলোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর দুঃখে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না।'[১৯]

ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল সেকথা তিনি ঐ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেন। কেশবচন্দ্র বিপ্লব চান নি। শান্তিপূর্ণ সংস্কারের সাহায্যে দেশের পরিবর্তন চেয়েছেন। তা বলে তিনি দুর্বলতার প্রশ্রয়ও দেন নি। তিনি বলেছেন :

> 'যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া একবার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন বলপূর্বক কমাইতে পার, ইহাতে একান্ত যত্ন কর।··· তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠে দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড়-মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে। তোমরা কি মানুষ নও?'[২০]

কেশবচন্দ্রের সমন্বয়বাদী বিশ্বজনীনতা রাষ্ট্রের ভাববাদী প্রত্যয়ের অনুসারী ছিল। তাঁর কাছে রাষ্ট্র ছিল কতকগুলি জীবন্ত অবয়বের ঐক্যবদ্ধ একটি জটিল যন্ত্রের মতো—সর্বজনের চিন্তা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করাই তার উদ্দেশ্য। আর্থিক কৌলিন্যের অধিকারী জমিদার ও পুঁজিবাদীদের সঙ্গে একত্র নির্বিত্ত চাষী ও শ্রমিকের প্রযত্নে রাষ্ট্র সজীব ও সুসংবদ্ধ আকার ধারণ করে। তাদের কোনও একটির বিচ্যুতি ঘটলে রাষ্ট্রের অঙ্গহানি হয়। কেশবচন্দ্রের কথায় রাষ্ট্র হল : 'the perfection of consolidated fellowship'।[২১] তাই রাষ্ট্রদেহে শ্রেণীবিদ্বেষ ও অসূয়া, বিভেদ ও দলীয় মনোভাব ক্ষতিকর।

কেশবচন্দ্র রাষ্ট্রকে যদিও জীবসদৃশ (organic) ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখতেন, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বিক শক্তিময়তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বিশ্বসম্প্রীতির আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সেই দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন : 'what is a wonderful thing is balance of power in the civilized world'।[২২] মৌল আধ্যাত্মিক সুরেই তাঁর বিশ্বজনীনতা অভিব্যক্তি লাভ করে।

কেশবচন্দ্রের মতে প্রাচীন ভারতে ব্যক্তি-মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না— মুসলমান আমলেও নয়। রাজার ইচ্ছাতেই সব-কিছু চলত। ইংরেজশাসনকালে যে মানুষ বিশেষ কিছু স্বাধীনতা পেয়েছে তা-ও তিনি বিশ্বাস করতেন না। ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের দুটি মূল কারণ তিনি দর্শিয়েছেন। প্রথমতঃ ভাষার প্রভেদ, দ্বিতীয়তঃ ধর্মের অমিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরবোধ্য একটি ভাষা না থাকলে জাতীয় ঐক্য-সাধন অসম্ভব। হিন্দি ভাষাকেই তিনি এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে :

> 'যদি ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয় তবে তাহার উপায় কি? সম্ভব ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দি ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে।'[২৩]

ধর্মের মধ্যেও যে নানা ভেদাভেদ তা বিদূরিত করে ভারতকে একতাবদ্ধ করার জন্যে তিনি এই বলে অভিমত প্রকাশ করেন : 'আর্য্যজাতির চিরপূজ্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইলে সর্বপ্রকার অনৈক্য চলিয়া যাইবে'।

পাঁচ : সমাজোন্নয়ন-চিন্তা

রামমোহন প্রদর্শিত সমাজসংস্কার ও কল্যাণকর্মেও কেশবচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিলাত থেকে ফেরার পর (১৮৭০) দেশবাসীর নৈতিক উজ্জীবন ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সেই

উদ্দেশ্যে তিনি 'Indian Reforms Association' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মোটামুটিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পাঁচটি ধারায় বিভক্ত ছিল :

১. নারীর সামাজিক অধিকার অর্জন ও উন্নতি সাধন ;
২. সর্বাত্মক শিক্ষার প্রবর্তন ;
৩. সুলভ পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ ;
৪. মাদকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন ;
৫. নানাবিধ সংস্কার ও সেবাকার্যের আয়োজন।

নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রশ্নটিকে কেশবচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে তাদের মুক্তিসাধনের জন্য প্রযোজন যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা। সেজন্য স্ত্রীশিক্ষার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষণ-প্রাপ্ত একদল মহিলার সাহায্যে গৃহে গৃহে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সভা নামে একটি সংস্থা গঠন করেন (১৮৬৩)। তাঁর চেষ্টাতে মহিলাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার তাগিদে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বিবেচনার জন্যে নারীশিক্ষা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। মহিলাদের জন্যে 'বামাবোধিনী' ও 'পরিচারিকা' নামে দুটি পত্রিকারও প্রকাশন শুরু করেন। বিপথগামিনী মেয়েদের উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একটি আশ্রমেরও পত্তন করেছিলেন।

দেবদেবীর নামে পুরুতপাণ্ডাদের চাতুরীতে সাধারণ মানুষ কিভাবে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা শিক্ষিত জনসমক্ষে তিনি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। মাদকতা নিবারণ প্রসঙ্গে তিনি সরকারি নীতির নিন্দা করে বলেন যে সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে এ ব্যাপারে উদাসীন; যদি রাজস্বের উৎস হয় মানুষের দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা, আর্থিক ক্ষতি ও অপরাধ প্রবণতা তাহলে রাজস্ব আদায় না হওয়াই মঙ্গল। শেষোক্ত বিষয়গুলিতে কেশবচন্দ্র রামমোহনের পরিবর্তে অক্ষয়কুমার দত্তর দ্বারাই প্রভাবিত হন।

নববিধানের সদস্যদের জন্যে রচিত 'নবসংহিতা' গ্রন্থে প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় আচারবিচার সম্পর্কে যেসব উপদেশ আছে তার মধ্যে কেশবচন্দ্রের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছয় : শিক্ষাচিন্তা

সমসাময়িককালে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, পানদোষ ও বিজাতীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ করে কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষাব্যবস্থায় নীতিবোধ, স্বদেশ-প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। তাঁর মতে : 'to the influence of ungodly education is to be attributed the want of progress in the social conditions of the country'। এই সময়ে একদল মনে করতেন যে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়— কারণ ধর্মের মধ্যেই যা কিছু কুসংস্কার, যুক্তিবিমুখতা ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিহিত থাকে। তার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র বলেন :

> 'If intellectual progress went hand in hand with religious developments, if our educated countrymen had initiated themselves in the living truths of religion, patriotism would not have been mere matter of oration, but a reality in practice. Society would have grown in health and prosperity...That unity and nationality which are considered a great desideratum would have been established.'[২৪]

তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশবাসীর নৈতিক ও সামাজিক চেতনা ব্যতিরেকে দেশের মুক্তির সাধনা সফল হবে না; শিক্ষাই রাষ্ট্রচেতনার উপাদান। তাই তিনি ভাবীকালের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহী হতে উপদেশ দেন। শুধু উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। শিক্ষার উন্নয়নে তিনি ঐ সময়ে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আজও স্মরণযোগ্য। সমসাময়িককালে আরও যে দুজন মনীষীকে অনুরূপ কাজে অগ্রণী হতে দেখা যায় তাঁরা হলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

এদেশে অধুনা প্রবর্তিত বয়স্ক শিক্ষার আন্দোলন তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন। কারিগরি শিক্ষার জন্যে Industrial School এবং শ্রমজীবীদের মানসিক বিকাশ সাধনকল্পে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং Working men's Institution প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষার জন্য তিনি Normal School-এর পত্তন এবং উপযোগী অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে— তা প্রাথমিক কিংবা উচ্চশিক্ষাই হোক অথবা নারী কিংবা শ্রমিকদের জন্যেই হোক— প্রতিটি স্তরের পক্ষে উপযোগী পরিকল্পনা তিনি রচনা করেন। শিক্ষা বিস্তারের

জন্যে প্রয়োজনীয় কর আরোপের প্রস্তাবও তিনি তুলেছিলেন। তাঁর শিক্ষার চিন্তা ও তৎপরতার মোটামুটি রূপ ছিল এইরকম :

১. দেশীয় বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম পরিদর্শনের জন্যে একজন উপযুক্ত পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন ;
২. চাষী ও শ্রমিকদের উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক ;
৩. জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত ;
৪. অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্যে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির উপর প্রযোজ্য সরকারি অনুদানের নিয়মকানুন শিথিল করা আবশ্যক ;
৫. ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকগণের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার ব্যবস্থা ;
৬. সরকারী সাহায্যে প্রকাশিত সংবাদপত্র বিনামূল্যে গ্রামে গ্রামে বিতরণ ;
৭. গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্যে জমিদারদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সযত্ন উদ্যোগ ;
৮. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে দেশীবিদেশী ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কাছ থেকে শিক্ষা বাবদ স্বল্প পরিমাণ কর সংগ্রহের আইনানুগ আয়োজন।

জনশিক্ষার সুবিধার্থে কেশবচন্দ্র এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' নামে সহজবোধ্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাছাড়া ছোটদের জন্যে তিনিই প্রথম 'বালকবন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেন। বাড়ীর ঝিচাকরদের প্রতি সাধারণতঃ যে ঔদাসিন্য প্রদর্শিত হয় ও তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে গৃহ ভৃত্যদের জন্যে 'রজনী-বিদ্যালয়' স্থাপন করা প্রয়োজন।[২৫]

সাত : উপসংহার

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র। মনন ও ব্যক্তিত্বে তাঁর সমকক্ষ জননেতা সমসাময়িককালে দেখা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের গুণ ও সম্ভাবনার অধিকারী বলে মনে

করতেন।[২৬] বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে 'সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত' বলে অভিহিত করেছেন।[২৭] অকালে আকস্মিক মৃত্যু ও জীবনাদর্শের কিছুটা বিচ্যুতির ফলেই হয়ত তাঁর সম্ভাবনা যথোচিত পরিপূর্তি ও সার্থকতা লাভ করে নি এবং তাঁর উদ্যমও বিশেষ কার্যকর হয় নি।

রামমোহনের পর বাংলার মননধারা মূলত ভক্তিবাদের পথে অগ্রসর হয়েছিল। সে পথের প্রধান পথিক দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য ও সঙ্গী ছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র অধিক মাত্রায় খ্রীষ্টীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ায় তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হন। তৎকালীন বাংলার চিন্তানায়কদের অধিকাংশের মধ্যেই ইউরোপের হিতবাদ ও দৃষ্টবাদ যে প্রভাব বিস্তার করেছিল কেশবচন্দ্র তাকে ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁর মন অত্যধিক স্বজ্ঞা ও অতীন্দ্রিয় আবেগে আবিষ্ট হয়ে পড়ায় পরবর্তীকালে বিদ্বজ্জনমানসে যুক্তি ও বস্তুতন্ত্রী চিন্তার ক্রমবিস্তারে তিনি ক্ষুব্ধ হন। গোড়ার দিকে তাঁর মধ্যে যে উদারনৈতিক ও প্রগতিবাদী মনের স্ফুরণ ঘটে তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের অপরিণামদর্শিতার ফলে নববিধান গোষ্ঠীর বনিয়াদ সংকীর্ণ ও শক্তিহীন হয়ে যায়। তিনি এক নতুন ধরণের পুরোহিততন্ত্র গড়ে তোলেন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে মুষ্টিমেয় কিছু লোককে অন্যান্যদের উপর আধিপত্যের সুযোগ দেন। বিপিনচন্দ্র সখেদে লিখেছেন :

'আমরা পিতামাতার শাসন অস্বীকার করিয়া যে-যুক্তিবাদের আশ্রয়ে ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, কেশবচন্দ্রের মণ্ডলীতে তাহার যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান ছিল না।'[২৮]

ভাঙন শুধু নববিধান গোষ্ঠীতেই ধরে নি। উপরন্তু তাঁদের উগ্রতার ফলে দেশে এক প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপক্ষ গড়ে ওঠে—সেকথা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[২৯]

আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অবদান অনন্যসাধারণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবাদর্শের মিলন তথা সকল ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশ্বজনীন সংস্থার পতাকাতলে প্রেম ও শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং মুমুক্ষু মানুষের মুক্তির কল্পনা নিঃসন্দেহে মৌলিক ও অনবদ্য। সকল ধর্মই তাঁর কাছে ছিল ঐশ সত্যের প্রকাশ। প্রথম দিকে তাঁর আধ্যাত্মিক বিশ্বজনীনতার যে অস্পষ্টতা ছিল তা তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে কেটে যায়। সকল ধর্মের নিকর্ষ— উপনিষদের একেশ্বরবাদ, ইসলামের সাম্য এবং খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর ও মানবের পিতাপুত্র-প্রত্যয়ের

সমন্বয়ে তিনি মানুষকে একটি নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন। নববিধান আদর্শে তিনি সকল দর্শন ও ধর্মের অধিবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্বগুলিকেই শুধু সমন্বিত করেন নি—সেগুলির ঐতিহাসিক প্রত্যয় ও প্রতীকাদিও গ্রহণ করেন। তাই কেশবচন্দ্রকে সর্বধর্মসমন্বয়ের ও বিশ্বজনীনতার সার্থক প্রতিভূ বলা যায়। সর্বধর্মের মৌল চিন্তার ভিত্তিতে পরস্পর নির্ভরশীল একটা সজীব মানবিক সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ রামমোহনের আদর্শকেই তিনি পরিবর্ধিত রূপ দিয়েছেন।

ইমার্সন ও কার্লাইল পাঠ করেই হয়ত কেশবচন্দ্রের মনে ব্যক্তিপূজা ও অতিমানব-তত্ত্ব অঙ্কুরিত হয়। তিনি মনে করতেন যে প্রকৃতির প্রয়োজন ও তাগিদেই ঐসব মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে এবং বিশ্বনিয়ন্তার নৈতিক শক্তি তাঁদের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে ; মহামানবদের আবির্ভাব সামাজিক প্রয়োজনও বটে ; তাঁরা শান্তি ও মুক্তির মন্ত্র প্রচার করেন। মহামানবদের জীবনে একটি সুরই কেবল অনুরণিত হয় : 'আদর্শের জন্যেই বাঁচা ও মরা'। এখানে হেগেল ও নীট্‌শের অনুরূপ চিন্তা স্মর্তব্য— যে-চিন্তাকে ফ্যাসীবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়। ভারতের মাটি ও জলহাওয়ায় ব্যক্তিপূজা, অবতারতত্ত্ব ও অতিমানবতা নতুন কিছু নয় এবং শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই প্রতীতি গ্রহণ করেছেন। তাই ফ্যাসীবাদের পক্ষে ভারতভূমি অনুর্বর নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী কেশবচন্দ্র এই স্ববিরোধী ও সংকীর্ণ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকলেও স্বেচ্ছাচারী শক্তিমত্ততাকে তিনি অনুমোদন করতেন না।

মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফুরণে তাঁর বিশ্বাস ও আগ্রহ ছিল। সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তিনি আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির প্রয়াসী হন। আধ্যাত্মিক নবজাগরণের ভিত্তিতে তিনি তাঁর সমাজসংস্কারের কর্মপন্থা রূপায়িত করেন। প্রভূত প্রয়াস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির দ্বারাই তিনি দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব বলে মনে করতেন।

ইংরেজদের তিনি এদেশের অছিরূপে দেখতেন এবং তাদের কাছ থেকে সুবিচার চাইতেন।[৩০] এদেশের সম্পদ আহরণ করে ইংরেজের বিত্তবৃদ্ধির তিনি নিন্দা করেন ; সেজন্যে ইংরেজদের উদ্দেশে বলেন যে এই পাপের জন্যে তাদের একদিন ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ভারতে ইংরেজশাসনের একমাত্র কৈফিয়ত হল : 'good and welfare of India' ; ম্যাঞ্চেস্টারের উন্নতির জন্য

ভারতকে শোষণের তিনি সমালোচনা করেন। এখানে কেশবচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

এদেশে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি প্রথমাবস্থায় ইংরেজ বিতাড়ন বা রাজনৈতিক চেতনা থেকে হয় নি। নিজের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধ সৃষ্টি থেকেই জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে ওঠে। একসময় দেশটা পাশ্চাত্ত্য আচারানুষ্ঠানের অনুকরণ ও খ্রীষ্টীয় মতে ধর্মান্তরিতকরণের দিকে খুবই ঝুঁকে পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। সেই আন্দোলনের দক্ষ নেতৃত্ব কেশবচন্দ্রকে জনপ্রিয় করে তোলে। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: **'Keshub Chandra Sen was a great organizer, a born leader of men with a penetrating insight into human nature'**। কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি 'দেশের বিজাতীয়করণের ঘোর বিরোধী' ছিলেন।[৩১] প্রাক-কংগ্রেস আমলে রাজনীতি যখন সুস্পষ্ট দলীয় রূপ পরিগ্রহ করে নি সেসময়ে তখনকার সংস্কারবাদী আধা-রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের তৎপরতা দেশের পরবর্তী দিনের স্বদেশী আন্দোলনের যেন পূর্বপ্রস্তুতি। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়:

> 'Social reform, industrial revival, moral and spiritual uplift, have all followed in the track of the great national awakening which had its roots in the political activities of our leaders ...The activities of Iswar Chandra Vidyasagar helped Keshub Chandra Sen by enabling him to appeal to instincts and tendencies broadened by the spirit of reform. His work in its turn, helped that of Kristo Das Pal and others ; and the new School of Politicians...'[৩২]

তৎকালে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা অচিন্তনীয় ছিল। বিপিনচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করতেন বলেই হয়তো লিখেছেন যে কেশবচন্দ্রের রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনায় সমগ্র জগতের কল্যাণার্থে প্রার্থনা করা হত; কিন্তু স্বদেশের জন্যে করা হত না, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথাও বলা হত না। বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ-সাধনে রাজনারায়ণ বসুকে (১৮২৬-১৯০০) প্রথম পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন।

বস্তুতঃ রাজনীতিকে কেশবচন্দ্র ধর্মের একটি অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন।

সরাসরি রাজনীতি করা তাঁর কাম্য ছিল না। ধর্মের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক ততটুকুই এবং তার বেশী রাজনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চান নি। একথাও অবশ্য অনুভব করতেন যে ধর্ম-সম্পৃক্ত রাজনীতিকে বর্জন করা কোনও সামাজিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি রাজনীতিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না। তবে তাঁর মধ্যে সে-সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হতে পারতেন বলে সুরেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩৩]

নির্দেশিকা

১. Bipinchandra Pal. 'Keshub Chandra Sen'. In *Character Sketches*. 1957, p. 12.

২. Quoted in V. P. Varma. *Modern Indian Political Thought*. 1961, p. 48.

৩. কেশবচন্দ্র সেন। 'জীবন বেদ'। ১৯১৭, পৃ ৩।

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১০৬।

৫. কেশবচন্দ্র সেন। 'পত্রাবলী'। ১৯৪১, পৃ ২৩৩।

৬. Keshub Chandra Sen. *Lectures*. p. 56.

৭. কেশবচন্দ্র সেন। পত্রাবলী। ১৯৪১, পৃ ২৩২-২৩৩।

৮. Keshub Chandra Sen. *Lectures*. p. 56.

৯. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India*. 1904, p. 127.

১০. Keshub Chandra Sen. *Lectures*. p. 325.

১১. Keshub Chandra Sen. *Lectures in Asia*. p. 64.

১২. Amiya Chandra Banerji. 'Brahmananda Keshub Chandra Sen', *Studies in Bengal Renaissance*. ed. by Atul Chandra Gupta. 1962, p. 80.

১৩. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India*. 1904, p. 99.

১৪. V. P. Varma. *Modern Indian Political Thought*, 1961. p. 44.

১৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সংকলক। 'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী'। খণ্ড ১, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

১৬. Keshub Chandra Sen. *Lectures*. p. 322.

১৭. P. S. Basu. 'Political Thoughts of Keshab Chandra Sen', *Navavidhan*, December 15, 1938, p. 46.

১৮. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India*. 1904, p. 507.

১৯. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী'। খণ্ড ১, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

২০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২১।

২১. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India*. 1904, p. 506.

২২. *Ibid.*

২৩. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী'। খণ্ড ১, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩-৪।

২৪. Quoted in : A. C. Banerji, 'Brahmananda Keshav Chandra Sen', *Studies in the Bengal Renaissance*. ed. by Atul Chandra Gupta, 1962, p. 83.

২৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী'। খণ্ড ১, নিবেদন।

২৬. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making*. 1963, p. 131.

২৭. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, ১৩৬১, পৃ ৬১৮।

২৮. বিপিনচন্দ্র পাল। 'সত্তর বৎসর : আত্মজীবনচরিত'। ১৯৬২, পৃ ২৪৭।

২৯. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making*. p. 6.

৩০. Quoted in : C. R. Das. *Speeches*. pp. 212-213.

৩১. রাজনারায়ণ বসু। 'আত্মচরিত', ১৯৬১। পৃ ১১৮।

৩২. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making*. p. 183.

৩৩. *Ibid*. p. 6

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৮৩৮-১৮৯৪

এক : ভূমিকা

উনিশ শতকের বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও মননধারার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ভিন্ন আদর্শ ও চিন্তায় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে আশ্রয় করে নবযুগের যে-ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার নায়কদের মত ও পথের কোনও মিল ছিল না। তাঁরা সবাই মিলে ভাব ও আদর্শের কোনও অখণ্ড ধারা বহন করে চলেন নি। তবে ঐ-শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে ভিন্ন মত ও পথে সবাই একটা পূর্ণাঙ্গ-জীবনবোধ ও মূল্যবত্তা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার সাহায্যে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত সমস্যাগুলির এক সমন্বিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। রামমোহন, ডিরোজিওপন্থী নব্যবঙ্গদল, দেবেন্দ্র-অক্ষয়-বিদ্যাসাগরের তত্ত্ববোধিনী সভা এবং কেশবচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়ক জীবনাদর্শের এক-একটি সূত্র তুলে ধরেছিলেন। ঐসব সূত্রগুলিকে গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব চিন্তার সহযোগে একটি সমন্বিত তত্ত্বের রূপ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ঐ-তত্ত্বেরই সুরবিস্তার-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের যে-দ্বিতীয় ভূমিকা তা ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশের হিন্দুপ্রধান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বিদেশী শাসকদের সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে উদারতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিমুখিতা এদেশবাসীর মনে অঙ্কুরিত হয়, নতুন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্দীপিত সমাজসংস্কার প্রয়াস ক্রমে জাতীয় আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটায় ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, গ্রীস ও ইতালির পরাধীনতার অবসানবার্তা দেশের জাতীয় আবেগকে পরিপুষ্ট করে। ইংরেজ শাসনের পক্ষপুটেই চলেছিল সরকারি কাজের সমালোচনা, স্বায়ত্তশাসন ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা পরিষদের দাবি। সিপাহিবিদ্রোহের পর কোম্পানির কাছ থেকে এদেশের শাসনকর্তৃত্ব সরাসরি ইংরেজ সরকার গ্রহণ করার পর অর্থনৈতিক শোষণের ক্রমবিস্তার, রাজনৈতিক একাধিপত্য, প্রশাসনকর্মে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি কারণে দেশবাসীর বিশেষ করে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে

শাসকদের মানসিক বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার এবং সেইসঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা শিক্ষিতশ্রেণীর মনে হীনতাভাব সঞ্চার করে। শিক্ষা, অর্থনীতি ও কর্মজীবনের ব্যর্থতায় জাতীয় চেতনা ক্রমে নানা সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলিত হতে থাকে। জাতীয় চরিত্র, জাতীয় শক্তি, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের চেতনায় সমাজের পূর্বাপর ঐতিহাসিক বিচারের সূত্রপাত হয়। দেখা দেয় অতীতমুখিতা ও অতীত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন-প্রয়াস। জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সার্থকভাবে যিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশের নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদী চেতনায় আধ্যাত্মিক সুর সংযোজন করে তিনি দেশের উত্তরকালীন রাজনীতির সম্প্রদায়গত মনোভাবের গোড়াপত্তন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই এদেশে কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হয়ে গিয়েছিল। অনেক বাতবিতণ্ডার পর ইংরেজী শিক্ষারও চলন শুরু হয়ে যায়। সিপাহিযুদ্ধের পর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৫৮)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে যশোহরে তিনি বছর দেড়েক শিক্ষানবিশি করেন। সিভিল সার্ভিসের নিয়মানুসারে কাঁথি, খুলনা, বারাসত, হুগলি প্রভৃতি স্থানে বদলির পর সবশেষে তিনি আলিপুরে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে পারিবারিক পূজাঅর্চনার পরিবেশে তাঁর মনে অধ্যাত্মচিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়; মধ্যজীবনে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়নের ফলে কিছুটা অজ্ঞাবাদী (agnostic) হয়ে উঠলেও পারিবারিক প্রভাবকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পরিণত জীবনে সাধুসন্ন্যাসীদের সংসর্গে তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে রামমোহনের আরোহী পদ্ধতিতে ইতিহাসচিন্তা এবং অক্ষয়কুমারের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ একসময়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লক্ষিত হলেও তাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন সমধর্মিতা অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে সমকালীন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি।[১]

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন যে ঐ সময়ে হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার দুটি দল দেখা যায়। একটি শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ রক্ষণশীলদের,

অপরটি বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ বসু, নবীন সেন প্রমুখ 'নবজীবন' পত্রিকা-গোষ্ঠীর। মিল-স্পেন্সার-ডারউইনের চিন্তায় বঙ্কিম হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু বঙ্কিমের উপর কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ (Positivism) সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল —যার সাহায্যে তিনি সমাজ ও জীবনের প্রতিটি দিকের নতুন মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হন।[২]

হিন্দুধর্মের বিশেষ ব্যাখ্যাসূত্রেই বঙ্কিমের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বাঁধে।[৩] রামমোহন সম্পর্কেও বঙ্কিমের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; তার কারণ রামমোহনের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বেশি অন্তরঙ্গতা।[৪] তাছাড়া রামমোহনের চিন্তায় হয়ত বঙ্কিম তাঁর অভীষ্ট অখণ্ড কোনও জীবনতত্ত্ব খুঁজে পান নি, যা থেকে সমাজ ও জীবনের একটা সুস্পষ্ট নীতি ও আদর্শ পাওয়া যায়। বঙ্কিম চিন্তাশক্তিকে জাগাতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে রামমোহনোত্তর আদি ব্রাহ্ম-নেতা দেবেন্দ্র-কেশবের 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। নববিধানপন্থী কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাঁদের যুক্তি ও বিচারবিবর্জিত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও প্রত্যাদেশ-বাদকে মানতে পারেন নি। একমাত্র অক্ষয়কুমারের প্রাকৃতিক নিয়মনির্দেশিত যুক্তিবাদে বঙ্কিম অনুপ্রাণিত হন।

সবকিছু সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে ব্রাহ্মদের সঙ্গে অমিলের চেয়ে মিলই তাঁর বেশি ছিল— বিশেষ করে এইজন্যে যে ব্রাহ্মধর্ম বলতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনও ধর্মমত নেই— তাঁদের বিভিন্ন দল ও উপদলের চিন্তায় যথেষ্ট পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়। তাই বিপিনচন্দ্র বলেছেন:

> 'বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুশীলনধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র।'[৫]

গোঁড়া হিন্দুদের চেয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গেই তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি সমাজসংস্কারে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে আইন প্রবর্তন অপেক্ষা জনচেতনা সৃষ্টিই হবে অধিক কার্যকর। তিনি মনে করতেন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যথোচিত চেতনা সৃষ্ট হলে মানুষের মন থেকে ঐসব সামাজিক সংকীর্ণতা স্বতঃই বিদূরিত হবে। ছাত্রজীবনে 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় রচনা প্রকাশের সূত্রে প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে

ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় গুপ্তকবির বিশেষ প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই হয়ত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভিন্নচিন্তা দানা বাঁধে।

ধর্ম ও হিন্দুত্বের তিনি পৃথক ব্যাখ্যান করেছেন। দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-প্রত্যয় বৈদিক নয়; কারণ তাতে বঙ্কিমের উক্তি অনুযায়ী 'সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল';[৬] তাঁর হিন্দুত্ব প্রত্যয় ঔপনিষদও নয়, কারণ সেখানে 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মের কোন ব্যবস্থা নাই';[৭] তাঁর হিন্দুত্ব বুদ্ধের জ্ঞানময় ও ধ্যানময় ধর্মও নয়, কারণ 'বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না।'[৮] তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্বের প্রত্যয় কি? তিনিই বলেছেন:

'এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দ প্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিকদিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।'[৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-প্রত্যয় সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তর (১৮৪৮-১৯০৯) অভিমত হল: 'তিনি হিন্দু ধর্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, আমার মতে তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণ— একটি চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য-সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সঞ্জীবনী-শক্তি প্রচার করণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের জ্ঞান বিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন— এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা আজ বঙ্গ সমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র।'[১০]

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় স্ববিরোধিতা বা পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। সেকথা তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি— কে না করে?··· মত পরিবর্ত্তন— বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার কখনও মত পরিবর্ত্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান-বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।'[১১]

প্রথম জীবনে যে-মানুষ স্বভাবতই ছিলেন যুক্তিবাদী নবীনতার অনুরাগী

পরিণত বয়সে তিনি হয়ে পড়েন প্রাচীনতার পক্ষপাতী। নবীন বয়সে মিল ও বেনথামের প্রভাবে তিনি 'সাম্য' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরে নিজেই তার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। এমনকি অধিকার-ভেদ স্বীকার করে বলেন, 'সকলে তুল্যরূপে মোক্ষাধিকারী নহে।' পাশ্চাত্ত্য সমাজের অনুসরণে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারেও তাঁর বিশেষ অনুমোদন ছিল না। তবে নারীকে তিনি যথোচিত মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেন নি।

বেনথামের হিতবাদ (Utilitarianism), মিলের যুক্তিবাদ (Rationalism) ও স্পেন্সারের অজ্ঞাবাদ (Agnosticism) বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় একসময়ে যতই প্রভাব বিস্তার করে থাকুক না কেন তিনি কোনদিনই যথার্থ নাস্তিক ছিলেন না। স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে তিনি মনে করতেন যে ঐ শব্দ দুটির দ্বারা কোন স্থান বোঝায় না— অবস্থান বোঝায়। রামমোহনের পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণচিন্তা ও প্রয়াস উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে :

> 'যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্র হইবে সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।'[১২]

প্রাক্-বঙ্কিম বাংলার মননধারায় সবারই দৃষ্টি পড়েছিল ইহজীবনের পুনর্গঠনে —ধর্ম, মুক্তি ও ইশ্বরচিন্তার কাজ হয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল কেবল জীবনাচারের দিকটি—যেন বঙ্কিমেরই দৃষ্টিদানের অপেক্ষায়। তাঁর সঙ্গে সমকালীন বিদগ্ধ সমাজের মতের মিল ছিল না। গতানুগতিক ধারা থেকে স্বতন্ত্রপথে নিজের ভাবনাচিন্তাকে মুক্তি দেবার জন্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটির সাহায্য নিয়েছিলেন। ক্রমে তাঁকে ও তাঁর ঐ পত্রিকাটিকে ঘিরে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পত্রিকাটি বেশি দিন চলে নি। ১৮৮৪ সালে তিনি 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামে দুটি পত্রিকা বের করেছিলেন এবং সেদুটির মাধ্যমে স্বকীয় পদ্ধতিতে ধর্ম ও দর্শনচর্চায় প্রবৃত্ত হন।

তত্ত্বগতভাবেই তিনি চিন্তা করেছেন, যুক্তি খুঁজেছেন, কিন্তু হাতেকলমে প্রয়োগের চিন্তা ও চেষ্টা— অর্থাৎ ধর্মপ্রচার, সমাজসংস্কার কিংবা দলগঠনের দিকে তিনি যান নি। তবে তাঁর চিন্তা ও সাধনা যে সর্বাংশে একক ও আত্মকেন্দ্রিক ছিল তা নয়। প্রকারান্তরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সংগঠিত তৎপরতার মতো তৎকালীন বাংলার একদল পণ্ডিত ও মনীষীকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল।

বিপিনচন্দ্রের মতে বাংলাদেশে বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর ভূমিকা অনেকটা অষ্টাদশ শতকের ফরাসী 'এন্সাইক্লোপিডিস্ট'দের সঙ্গে তুলনীয়।[১৩] চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সতেরো শতকের প্রথম ভাগ অবধি ইউরোপীয় মানসে যে বহুমুখী পরিবর্তন দেখা দেয় তা 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত। রেনেসাঁসের কাল, কারণ ও চেতনা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে; তাহলেও মোটামুটি একথা সর্বস্বীকৃত যে মধ্যযুগে চার্চের আধিপত্য ও আত্মবিনাশী ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে স্বাধীন বিচার-বোধের ক্রমমুক্তি, প্রাচীন গ্রীক বা হেলেনিক আদর্শে মানবতন্ত্রী দৃষ্টিতে বুদ্ধির অবাধ অনুশীলন ও মুক্তির সাধনা, শিল্পসাহিত্য ও বিজ্ঞান-বাণিজ্যের বিস্তার ছিল ঐ সময়ের লক্ষণ। সে যুগ যে সর্বার্থে অধ্যাত্মচিন্তা-বর্জিত ছিল তা নয়, তবে ক্রমশঃ পারত্রিক চিন্তার প্রাবল্য অপসৃত হয়ে পার্থিব জীবনের ভাবনা ও নবজীবন-বোধের সূচনা হতে থাকে। রেনেসাঁসের সূত্র ধরে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে সমবায়িক সম্পর্কের ভিত্তিতে 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' নামে একটি চিন্তাশীল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ের লেখকেরা ছিলেন সেই দলে। দলের মুখ্য সংগঠক ছিলেন দিদেরো এবং দালাঁবেয়ার। রুসো, ভলতেয়ার, মঁতেস্কো প্রমুখ চিন্তা-নায়কও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের চেষ্টাতেই বহু খণ্ডে ফরাসী 'আঁসিক্-লোপেদি' সংকলিত হয়েছিল (১৭৫১-৭২)। ঈশ্বরবিশ্বাসী কিংবা নাস্তিক নানা মত ও মেজাজের ব্যক্তিই সেই দলে ছিলেন, যাঁদের মূল আদর্শ ছিল যাজক-সম্প্রদায়ের দাপট ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন ও মানবকল্যাণ-সাধন। তাঁরা মনে করতেন যে বিশ্বজগৎ নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত এবং মানবহিতার্থে সেই নিয়ম সম্পর্কে সকলের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। প্রকৃতিবাদ-পরিমিশ্রিত হিতবাদই ছিল তাঁদের নীতিতত্ত্বের মূলকথা। সমকালীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও তাঁরা যুক্ত ছিলেন। অত্যাচারী চার্চের ভণ্ডামি এবং সেইসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু রাজশক্তি ও স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধেও এঁরা সরব ও সক্রিয় ছিলেন। এঁদের আন্দোলনেই নিহিত ছিল পরবর্তী কালের সমাজতন্ত্রী ও বস্তুবাদী আদর্শের বীজ। স্যাঁ-সিমঁ (Saint-Simon) ও কোঁতের চিন্তাও সেই ভাবধারা থেকে উৎপন্ন।[১৪]

উনিশ শতকে বাংলাদেশে 'বঙ্গদর্শন'-লেখকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ এক ভূমিকা লক্ষ করা যায়। রামমোহনের পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সাধনা ছিল বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, কিন্তু পরস্পরবিচ্ছিন্ন; নব্যবঙ্গদলের সমাজকল্যাণ-

কর্মে যুক্তিধর্মিতা, অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের লক্ষ্য-পরিবর্তন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিজ্ঞানসাধনা, তত্ত্ববোধিনী-গোষ্ঠীর সংযত তত্ত্বালোচনা, হিন্দুদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বিরোধ, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালী জনচিত্তের বিকাশ বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলেছিল। বিভিন্ন ধারায় প্রবহমান সেইসব খণ্ডপ্রয়াস বঙ্কিম-পর্বে এসে সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করে। রামমোহন-উত্তর বাংলার জীবন ও মনন ছিল পশ্চিমী ধারায় প্রভাবিত। ফলে দেশের জনসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ছিল পশ্চিমী শিক্ষায় প্রাগ্রসর, কিন্তু বৃহৎ দ্বিতীয় দলটি সে-শিক্ষায় বঞ্চিত থাকে। শিক্ষিত বাঙালীর বাংলা সাহিত্যে রুচি ছিল না। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রঙ্গলালের রচনা স্কুলপাঠ্য হিসাবে পরিগণিত হত, মাইকেলের সাহিত্য সমাদর পেলেও 'সেকালের সাধারণ ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর সোজা ছিল না, বুঝা কঠিন ছিল'।[১৫] ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলে অভিহিত তখনকার সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল 'ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতা সাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ সংস্কার'।[১৬] ব্রাহ্মদের সেই আদর্শ অনেকটা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতায় ছিল আবদ্ধ; তাঁদের ধর্ম- ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে যে-সব সাধারণ মানুষ যোগ দেন নি বা দিতে পারেন নি তাঁরা বাংলার নবচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যান। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের সেই দ্বিধারাকে যুক্ত করার প্রয়াসী হন। সেদিনের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের যেমন সংযোগ ঘটে, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগসূত্র সূচিত হয়।[১৭] নিছক সাহিত্যচর্চা বা সংবাদ পরিবেষণের জন্য পত্রিকাটির সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের গতিনির্ণয়, জাতীয় ধারার মূল্যায়ন, বিজ্ঞানচর্চা, সমাজবিজ্ঞানের অনুধাবন এবং সেইসঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গদর্শনে নিয়মিত প্রকাশিত হত। সেই-সব রচনার মধ্যে চিন্তাগত ঐক্য প্রকাশ পেত; আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই একতার মধ্যমণি। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিষয়গুলি ছিল মোটামুটি তিন ধরণের: ১. বিশ্লেষণধর্মী, অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির ব্যাখ্যান ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা; ২. গৌরবোদ্দীপক, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশবাসীর কর্মোদ্যোগ ও গৌরববোধ জাগ্রত করা এবং সাহস ও বীর্যের উন্মেষসাধন; ৩. সাহিত্যচর্চা। যদিও বঙ্গদর্শনের মেয়াদ ছিল মাত্র চার বছরের তবু তারই মধ্যে বাংলার ভাবুক-সমাজে একটা জীবনবোধ ও স্থায়ী মূল্যবত্তা সঞ্চারিত হয়।[১৮] বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে ঘিরে সেদিন দেশের যে-সব জ্ঞানীগুণীর

সমাবেশ ঘটে তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। এঁদের সকলেই যে সাহিত্যশিল্পী ছিলেন তা নয়, কিন্তু পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার বিচারে এঁরা নিঃসন্দেহে উচ্চস্থানের অধিকারী। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।'[১৯]

বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক কোনও আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগ দেন নি। অন্যান্য চিন্তানায়কেরা তত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে যখন সংস্কার-আন্দোলনে সক্রিয়, সে-সময়ে তিনি ধ্রুব আদর্শের বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক গবেষণায় নিমগ্ন। দল গঠন, ধর্মপ্রচার বা সমাজসংস্কারে তাঁকে সরাসরি নামতে দেখা যায় নি। হয়তো চাকরির কাজে বেশির ভাগ সময় মফস্বলে ঘোরাঘুরি করা ও আটকে থাকার দরুন গঠনমূলক কর্মতৎপরতায় তাঁর পক্ষে জড়িত থাকা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া সরকারি চাকুরে হওয়ার ফলে পাছে সরকারের রোষনজরে পড়েন সেই আশঙ্কায় রাজনীতি সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে লিখতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন:

> 'I won't take up politics, because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonian against 'Mookerjee.' That is why *Bangadarshan* has little of politics in it.'[২০]

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করেছিল। তার সঙ্গে তিনি পরোক্ষ সংশ্রব বজায় রাখতেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে (১৮৭৬) তিনি একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে নবগঠিত কংগ্রেসের বিরোধী মনে করতেন। কংগ্রেসের বিরোধী না হলেও তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র মনোভাব পোষণ করতেন:

> 'কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই। দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে ও

অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুরূপ কার্য্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক কখনই উহার আবশ্যকতা ও মহত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না…।' ২১

উপরের উদ্ধৃতি থেকে দেশে নবোদ্ভূত দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ও গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও সিপাহিবিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বান্ধব বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে-বিষয়ে নীরব থাকেন। এখানে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল দেখা যায়, যদিও রামমোহন জন্ অ্যাডাম প্রবর্তিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচন-নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লিটনের 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, ১৮৭৮' বিতর্কের সময় দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন।২২ অন্যদিকে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের মতো তিনিও ইংরেজশাসনকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক সৃজনশীলতা মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি অপরিণত চিন্তা ও রোমান্টিক উপন্যাসের যুগ। 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় বাল্যরচনার শুরু (১৮৫২) এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রকাশসহ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাবের (১৮৭২) প্রাক্কাল অবধি এই পর্যায়ের বিস্তার। এই পর্যায়ে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দেন নি। বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকে 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) রচনার পূর্ববর্তী সময়কে দ্বিতীয় পর্যায় বলা চলে। এই পর্বে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭২), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৩), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এইসব রচনায় তাঁর দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক চিন্তার প্রথম পরিচয় মেলে। বস্তুতঃ এই পর্যায়টিই তাঁর মননশীল জীবনের সার্থক পরিচয় বহন করে। আনন্দমঠ (১৮৮২) থেকে জীবনের শেষাবধি তৃতীয় পর্যায় বিস্তৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ যেমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা, তৃতীয় পর্যায়ে তেমনি 'প্রচার' পত্রিকার প্রকাশনও (১৮৮৪) তাঁর অপর এক কৃতিত্বের পরিচিতি। উক্ত পর্যায়েই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধর্মী তিনটি উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। মানসিকতার ক্রমবিবর্তনে এইসময়ে তাঁর চিন্তায় আমূল

পরিবর্তন দেখা দেয়, যার পরিণতি 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) গ্রন্থদুটিতে সুপরিস্ফুট।

দুই : ইতিহাসচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্র জাগতিক গতিশীলতা ও ঘটনাপরম্পরার পশ্চাতে সৎ, চিৎ ও আনন্দের অস্তিত্ব নির্দেশ করেন। জগতে যা কিছু বিদ্যমান বা সত্য বলে প্রতীয়মান তা সেই সৎ-এর প্রকাশ; জাগতিক প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, বহুত্বের মধ্যে একটি ঐকতান অনুরণিত হওয়ার পিছনে এক অনন্ত ও অনির্বচনীয় শক্তি বিদ্যমান— যা থেকে বিশ্বচরাচর জন্মায়, যার সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয় এবং পরিণামে তারই সঙ্গে লীন হয়ে যায়— সবকিছুই সেই চিতের উপর নির্ভর করে। সতে যে চিতের অস্তিত্ব— তারই প্রভাবে জাগতিক শৃঙ্খলা ও তাতেই জীবনের সার্থকতা এবং আনন্দযুক্ত সেই সার্থকতায় জীবের সুখ বর্তায়।

জন্মজন্মান্তর ধরে 'কর্ষণ' করে জীবের অন্তর্নিহিত ও অব্যক্ত ঐ সচ্চিদানন্দভাব ক্রমেই অভিব্যক্তি লাভ করে; জীবের সেই প্রচ্ছন্ন 'সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী' শক্তির বিকাশ ঘটে, সেই অস্বচ্ছ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম বিস্ফুরিত হতে থাকে— একেই বলা হয় ক্রমবিকাশ (Evolution – E = out and volve = to roll)।[২৩] যে-জীবে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম চরমোৎকর্ষ লাভ করে, সচ্চিদানন্দ সেক্ষেত্রে মহোজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্মের স্বারূপ্যসিদ্ধ, তিনিই মুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষের সহজাত সকল বৃত্তিসমূহের অনুশীলন দ্বারা সম্যক বিকাশ, পরিণতি ও সমন্বয়ই ধর্মের লক্ষ্য এবং তিনিই আদর্শ পুরুষ যাঁর সকল বৃত্তি বিকশিত, পরিণত ও সামঞ্জস্যময়। এই অবস্থাকেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলা হয়, এখানেই মোক্ষ। তাঁর মতে: 'ধর্মের সার oulture— কর্ষণ— মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম্ম'। কিন্তু কিসের এই কর্ষণ? হীরেন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত বীজের কর্ষণ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে:

> 'প্রকৃতি ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হয়, বিবর্তনের ফলে তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, পুষ্পিত হইয়া চরমে মহামহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করে।… এই যে প্রকৃতি-ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ, যাহা কর্ষণের চরম ফলে একদিন মহামহীরুহরূপে

বিকশিত হইবে— ঐ বীজ ব্রহ্ম-মোক্ষিত বীজ। সেইজন্য উহাকে ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ··· ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু— এককথায় ব্রহ্মখণ্ড··· ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ— তিনি একাধারে প্রতাপঘন,প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন··· জীব যখন ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি তখন জীবের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ-প্রজ্ঞা-প্রেম বিস্ফূর্ত না হইলেও অব্যক্তভাবে বিদ্যমান আছে।'[২৪]

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক সত্তায় তিনি বিভক্ত। সেই ত্রিসত্তার একজন করেন সৃজন, অন্যজন পালন করেন ও অপরজন ধ্বংস করেন। তাঁর এই বৈদিক ত্রিদেব প্রত্যয়কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করতেন। এই জগৎ ব্যাপী সর্বত্র, সর্বকার্যে এক অনন্ত, অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয় শক্তি আছে— যা সমস্ত কিছুর কারণ এবং বহির্জগতে অন্তরাত্মার স্বরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র উপনিষদ্-কথিত সৃষ্টি-তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে বলেছেন :

'জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থূল কথা··· ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution-বাদের স্থূল কথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না— একাঙ্গিত্ব ও বহ্বাঙ্গিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়··· কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে।'[২৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটিকে অংশত প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বও আছে। তাতে তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা দর্শিয়েছেন। তাঁর মতে মহাভারত নিছক কল্পনাপ্রসূত মহাকাব্য নয়, ইতিহাসও। কারণ কৃষ্ণের উল্লেখ মহাভারত ছাড়া বিভিন্ন সময়ে লিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ চরিত্রটি তাই কবিমনা ভাবুকের কল্পনাজাত রূপকমাত্র নয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন যে ঋগ্‌বেদে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তিনিই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বাসুদেব কিনা সেকথা বলা শক্ত। হীরেন্দ্রনাথ পুরাণান্তর্গত কৃষ্ণবংশের একটি বংশলতিকার উল্লেখ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

'Bankim Chandra's story of Shree Krishna followed the main canons of modern scriptural and historical criticism that had been first introduced by the Brahmo Samaj into

modern Bengali thought and literature. In building up some sort of a history out of the legends and traditions that had gathered in course of unremembered centuries around the name and character of Shree Krishna in the Hindu books, Bankim Chandra really followed the lead of Renan whose life of Jesus Christ had been at one time a favourite study with the members of the Brahmo Samaj.'[২৬]

বঙ্কিমচন্দ্র অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে জ্ঞান করতেন। কিন্তু ভগবানের মনুষ্যদেহ ধারণ সম্ভব কিনা এবং তার প্রয়োজনই বা কি সে-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

'সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।... অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।... এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি ?'[২৭]

তবে কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা কৃষ্ণের মানবচরিত্র উদ্‌ঘাটন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বধর্ম ও বর্ণাশ্রম বিষয়ক প্রত্যয় দুটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে স্বধর্ম ব্যাপকার্থে গীতায় প্রযুক্ত হয়েছে, কারণ গীতার উপদেশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়, সার্বভৌম। তাঁর কথায় : 'ইহজীবনে যে, যে-কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম'। গীতার ব্যাখ্যানে তিনি বলেছেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ— অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির। তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই?... ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।'[২৮]

সমকালীন যুগের দাবিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃতি ও অতীতের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি বর্তমানকে অস্বীকার না করে উভয়কে প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বিত করার প্রয়াসী হন। স্বর্ণময় অতীতকে তিনি দেশ ও কালের অতীত পরম তত্ত্ব বলে উপলব্ধি করতেন। এবং সে-চেতনায় দেশ-কাল নির্বিশেষে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন।

তিন : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটিতে সর্বাধিক পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক লেখাতেও তাঁর দার্শনিক মতামতগুলি ছড়িয়ে আছে; তিনি সমন্বয়ধর্মী ও সম্পূর্ণ একটি জীবনদর্শন রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক মননশীলতার পরিচায়ক। প্রতীচ্যের নবলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি নিষ্কাম ধর্ম তথা ভারতের সনাতন জীবনাদর্শকে নবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক চিন্তাধারা তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর উপর পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে শেষাবধি স্থায়ী না হলেও তা তাঁর মানসিকতার পরিশীলনে বিশেষ সহায়তা করে।

শিক্ষিত বাঙালীসমাজে 'পজিটিভিজম' ও 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' মতবাদের দ্রুত বিস্তার ঘটায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একবার অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। পূর্বের কোনো একটি সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে রাজনারায়ণ বসু বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি 'জঘন্য কোম্‌ত্‌ মতাবলম্বী' বলে নিন্দা করেন। ওগুস্ত কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭)-এর দৃষ্টবাদ (Positivism) এক সময় বাঙালী বিদগ্ধসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন এই প্রভাবিতদের একজন— তখন তাঁর বয়স ও মন উভয়ই অপরিণত। কোঁৎকে তিনি আদর্শ রূপে জ্ঞান করতেন। কোঁৎ-এর মতবাদে মানবিক চিন্তাধারায় তিনটি ক্রম-পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে : 'Theological, philosophical and the positive or scientific'। ভারতীয় চিন্তার ধারানুসারে যাকে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বলা যায়। প্রথম পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির সবকিছু বিষয়ের সঙ্গে এক-একটি দেবদেবীকে যুক্ত করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ-সব দেবদেবী অ-দৃষ্ট প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে ধর্ম ও দর্শনের পথ রচনা করেন। আর তৃতীয় পর্যায়টিকে 'বৈজ্ঞানিক ক্রম' মনে করা হয়। কোঁৎ-এর মতে অধ্যাত্মচর্চা নিষ্ফল— বিজ্ঞানই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞানের বিকাশ অনুযায়ী কোঁৎ তাকে এইভাবে ক্রমবিন্যস্ত করেন : গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিদ্যা ও সমাজতত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিজ্ঞানের সঙ্গে 'প্রজ্ঞান' প্রত্যয়টি যুক্ত করেন। তাঁর মতে ভৌত বিষয়কে জানতে হলে বহির্বিজ্ঞান অর্থাৎ কোঁৎ-এর প্রথম চারটি বিভাগের সাহায্য নিতে হবে। আত্মতত্ত্ব জানার জন্য প্রয়োজন বহির্বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জীববিদ্যা এবং অন্তর্বিজ্ঞান, অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের সাহায্য। এ-সব

জ্ঞানের উৎস তাঁর মতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। কোঁৎ অজ্ঞাবাদী (agnostio) ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কোঁৎ-এর চিন্তায় প্রত্যক্ষ তন্মূলক অনুমান ব্যতীত প্রমাণান্তর নেই।[২৯] ঈশ্বর হয় কাল্পনিক, নয়তো অ-দৃষ্ট—দৃষ্টবাদীর কাছে তা পরিত্যাজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানতত্ত্বে বলা হয়েছে 'প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল'। পরে 'বিবিধ প্রবন্ধে' সন্নিবেশিত "জ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন: 'এই সকল মত আমি এখন পরিত্যাগ করিয়াছি।' 'ধর্ম্মতত্ত্বে'ও একথার পুনরুক্তি করে বলেছেন: 'সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে।' হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)-এর অজ্ঞাবাদী ভাবনার অর্থাৎ যে-মতে ঈশ্বর তর্কাতীত, অচিন্তনীয় অপরিমেয় ও অজ্ঞেয়, সে-মতে বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকেই কোঁৎ প্রমাণের পথ মনে করতেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তার পরিচয় পাওয়া যায়:

> 'প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা ও অনাদর করিবে না··· আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।'[৩০]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল বক্তব্য যে ভাগবত উক্তির উপর রচিত সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কোঁৎ-এর একান্ত অনুরাগী হলেও তিনি কোঁৎ-এর প্রভাব পরবর্তীকালে বর্জন করেন।

পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২)-কেও তিনি এক সময় সানুরাগচিত্তে শ্রদ্ধা করতেন। বেনথাম হিতবাদের (Utilitarianism) প্রবর্তক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'বেন্থাম হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন'।[৩১] এ-বিষয়ে বেনথামের প্রধান অনুগামী ছিলেন জন্ স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩)। হিতবাদের সারমর্ম হল: সুখ ও আনন্দই মানুষের একমাত্র কাম্য। সেই পন্থাই মানুষের অনুসরণীয় যাতে বহুজনের হিত সাধিত হয় (Greatest good of the greatest number)। এবং হেয় ও পরিত্যাজ্য হল তা-ই বহুজনের পক্ষে যা অহিতের কারণ। হিতবাদ ও সুখবাদ (hedonism) এক নয়। এ বিষয়ে অবশ্য নানান মত আছে। হিতবাদী মতে সুখদুঃখই ধর্ম ও অধর্মের একমাত্র মাপকাঠি। হিতবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:

'যদি একদিকে একজনের হিতসাধন ও আর একদিকে দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম্ম ··· এখানে good of the greatest number ··· পক্ষান্তরে যেখানে একজনের অল্প হিত, আর একদিকে আর একজনের বেশী হিত পরস্পর-বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম্ম ··· এখানে কথাটা greatest good.' [৩২]

গীতার 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় হিতবাদ বিদ্যমান ছিল। হিতবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আপেক্ষিক-ভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, অর্থাৎ যেমন সত্য পালনে পরের অনিষ্ট আশঙ্কা থাকলেও সত্যভঙ্গ অন্যায় নয়।

বেনথামের মতো মিলকেও বঙ্কিমচন্দ্র অপরিণত বয়সে আদর্শ জ্ঞান করতেন। কিন্তু পরে মিল সম্পর্কেও তাঁর মতপরিবর্তন হয়। হিতবাদকে তিনি কমলাকান্তর মুখ দিয়ে 'পুরুষার্থ' ও 'উদার দর্শন' বলে পরিহাস করলেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন: 'হিতবাদ মতটা, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। ··· হিতবাদ ধর্ম্ম—অধর্ম্ম নহে।'[৩৩]

হিতবাদের পক্ষাপক্ষে যা কিছু বক্তব্য থাকুক না কেন মূলতঃ তা উদারনৈতিক এবং ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির কল্যাণপন্থী। বেনথামের দৃষ্টিতে সুখ যে-কোনও প্রকারের হোক না কেন তা সমপর্যায়ভুক্ত। বেনথামের অনুগামী মিল সেজন্যে সুখের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং মানুষের উচ্চতর সত্তা তথা মানসিক বৈশিষ্ট্যের কষ্টিপাথরে সুখকে যাচাই করে নিতে বলেন। তাঁর মতে: 'It is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied—better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied'। মিলের এ-কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেছেন:

'ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না, সে-অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ।'[৩৪]

সুখের তিনি তিনটি পর্যায় দেখিয়েছেন। সুখ ত্রিবিধ: ১. স্থায়ী; ২. ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য; ৩. ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। হিতবাদী দর্শনে বহুর জন্যে একের আত্মত্যাগের কারণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে ঈশ্বর সর্বভূতে বিদ্যমান—সর্বজনের সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধির মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম, প্রীতি ও ভক্তির উন্মেষ— সমস্ত জগৎকে আত্মবৎ প্রীতির আধার করাই কাম্য। হিতবাদী

প্রত্যয় অনুযায়ী ধর্মকে তার অঙ্গ মনে না করে হিতবাদকে ধর্মের অঙ্গস্বরূপ তথা তাঁর 'অনুশীলন' তত্ত্বের একটি অংশ বলে মনে করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে 'বৃত্তি' আখ্যা দিয়েছেন এবং সেগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী নামে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। এগুলিকে অবশ্য তিনি স্থানান্তরে মোটামুটি মানসিক ও শারীরিক রূপে বর্গবিন্যাস করেছেন। ঐ-বিভাগগুলি প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

'শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে, শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না··· মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে; কতকগুলি কাজ করে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয় ; আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তক নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল।'[৩৫]

তাঁর মতে ঐ-বৃত্তিগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সেগুলি কেবল বিকশিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই। মনের জন্য সুস্থ শরীর এবং শরীরের জন্যে সুস্থ মন। 'তাহা হইলেই বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতি ঘটিবে। ইহাই ধর্ম্ম।'

অনুশীলন-তত্ত্বের মূল-কথাই হল সকল বৃত্তি পরস্পর সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হয়ে অনুশীলিত হবে, একে অপরকে অবদমন করে বর্ধিত হবে না। অনুশীলনের স্থূল কথা পারস্পরিক সামঞ্জস্য। তবে বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তি সুখ নয়— সুখের অঙ্গ, সুখটা ঘটে তাদের সমবায়ে। সেখানেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা। তাকেই বলা যায় মানুষের ধর্ম। তবে বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে এতগুলি বৃত্তির সম্যক পরিপূর্তি ও সমন্বয় সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় বলে মনে করতেন।

দ্ব্যর্থহীনভাবেই তিনি বলেছেন যে পশ্চিমী অনুশীলনধর্মের লক্ষ্য নিছক সুখমাত্র। কিন্তু তাঁর অনুশীলন-তত্ত্বে তিনি ভারতীয় ভাবধারাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন এবং সেটা তাঁর মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ—এবং তারই উপর ভগবদ্গীতা প্রতিষ্ঠিত ; তাঁর এই অনুশীলন-তত্ত্বের লক্ষ্য মুক্তি।

ভক্তিবাদের আশ্রয়ে তিনি অনুশীলন-তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ভক্তিশাসিত-অবস্থাকেই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য বলে অনুভব করতেন এবং তাঁর কাছে ভক্তিই অনুশীলনের একমাত্র মার্গ। 'অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি'র উৎস হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরভক্তিই তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব। ভক্তির পরেই তিনি শান্তি, প্রীতি, দয়া ও অহিংসার কথা বলেছেন। তাঁর কাছে অহিংসা একটি প্রধান আদর্শ; ধর্মের প্রয়োজন ভিন্ন যে-হিংসা তা থেকে বিরত হওয়াই ধর্মের নির্দেশ; অবশ্য হিংসাকারীর দমনের জন্যে হিংসা অধর্ম নয়। কামক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে অনুশীলন দ্বারা সংযত রাখা উচিত, ধ্বংস নয়— এই ছিল তাঁর হিংসা সম্পর্কে অভিমত। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঐশ প্রয়োজন ও নিয়ম রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযম অবশ্যই পালনীয়।

তাঁর 'চিত্তরঞ্জিনী' প্রত্যয়ও তাৎপর্যপূর্ণ। কথাটি নন্দনতত্ত্বের; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়: 'যে-সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্ম্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি—তাহারাই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি'। ঈশ্বর অনন্ত সুন্দর; তিনি একাধারে সত্য, শিব ও সুন্দর। যা কিছু সুন্দর তার উৎস সেই চিরসুন্দর। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এই বৃত্তিকেও ঈশ্বরাভিমুখী করা প্রয়োজন। তাকেই বলা যায় নিষ্কাম ধর্ম, চিত্তশুদ্ধি ও স্থায়ী সুখ। তার লক্ষণ ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি। তাকেই বলে ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত অনুশীলন-তত্ত্বটির উৎস সম্পর্কে মতভেদ আছে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন:

> 'তাঁহার অনুশীলনধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র। ··· সেকালে মার্কিণ চিন্তা-নায়ক থিয়োডোর পার্কারের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়িয়াছিল। পার্কার ও নিউম্যান তখনকার নবীন ব্রাহ্মদের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। পার্কারের চতুরঙ্গ ভক্তি বা fourfold piety এই অনুশীলন ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও এই আদর্শের প্রেরণাতেই তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' রচনা করেন।'[৩৬]

উক্তিটি কিছুটা তর্কসাপেক্ষ। ব্রাহ্মদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার সমধর্মিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীকে তদানীন্তন ব্রাহ্মরা আদৌ সুনজরে দেখতেন না। বস্তুতঃ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে তিনি কোঁৎ-এর যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেই যে তাঁর ঐ তত্ত্ব মূলতঃ উৎপন্ন সেকথা সহজেই অনুমেয়। তাঁর ঐ তত্ত্বে স্পেন্সার ও মিলেরও প্রভাব ছিল। এছাড়া সমসাময়িক-

কালে প্রকাশিত দুটি বই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। দুটিরই লেখক সার জন রবার্ট সীলী (১৮৩৪-১৮৯৫)। তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাকারী হিসাবে প্রশংসা করেছেন। সীলীর চিন্তার প্রাসঙ্গিক যে-অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হয় তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

'১. এযুগে এমন কতকগুলি নতুন উপাদানকে স্বীকার করতে হবে যা হয়তো প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে নেই। ২. এ যুগে যে নতুন মূল্যবোধ ধর্মের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে সংস্কৃতি বা culture। ৩. কালচার হচ্ছে কলা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত। ৪. সংস্কৃতিই ধর্মের স্থান নিচ্ছে। ৫. ধর্মের সার নীতি, একথা না বলে বলা উচিত ধর্মের সার হচ্ছে সংস্কৃতি।'[৩৭]

বঙ্কিমচন্দ্র যুগোপযোগী নতুন সমাজ চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন— যার উপাদান হিন্দুধর্মে নেই। সমসাময়িক যুগসমস্যা অনুভব করে তিনিও কালচারের প্রতি ঝুঁকেছিলেন, তবে একটু অন্যভাবে, অর্থাৎ নিছক কলাকল্পনার পরিবর্তে বৃত্তির সুসমঞ্জস অনুশীলনকল্পে সমাজের উপযোগী ব্যক্তির স্বভাবধর্মকে কর্ষিত ও বিকশিত করে তুলতে। সীলী যেমন খ্রীষ্টকে নতুন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার প্রয়াসী হন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা তাঁর মানবচরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব মানবতন্ত্রী এবং অলৌকিকতাবর্জিত যুক্তিবহুল বলে মনে করা হয়।

নিষ্কাম ভক্তিকে তিনি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রহ্লাদ তাঁর কাছে প্রেমের প্রতীক। প্রেম নিষ্কাম হলেও ভক্তির পরিপূর্তি নয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মকে তিনি গ্রহণ করেন নি। আনন্দমঠে বলেছেন : 'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেম-ময়— কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়— সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব— কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।' বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদকে তাঁর অনুশীলন-তত্ত্ব থেকে পৃথকরূপে দর্শিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে একসময় নাস্তিক মনে করতেন।[৩৮] পরে তাঁর মতিগতি বদলায়। তাঁর ধর্মতত্ত্বের মূলে ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর স্বীকৃত। তাঁর কথায় : 'ব্রহ্ম [illegible]স্থার পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একত্বই মুক্তি। জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন [illegible]তে লোকে মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ঐ ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি লাভ হয়।' [illegible]বদিহি করতে মতো তিনিও ব্রহ্মকে সগুণ কিন্তু নিরাকার জ্ঞান করতেন। কা[illegible]

মতে সর্বব্যাপী হতে পারে না। ধর্মের শীর্ষে উপনীত হতে হলে তাঁর মতে কতক-গুলি স্থূল সোপান অতিক্রম করে সূক্ষ্ম স্তরে যেতে হয়। ধর্মের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা, দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা, তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা (বা বৈষ্ণবধর্ম) অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।

চার : রাষ্ট্রদর্শন

কেশবচন্দ্রের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও রাজনীতিকে ধর্মের একটি অঙ্গরূপে দেখেছেন। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। রামমোহনের আদর্শে তিনিও পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারার সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন। কোনোটিই তিনি অন্ধভাবে গ্রহণের পরিবর্তে যুক্তিবিচারপূর্বক উভয়ের নিষ্কর্ষই তিনি গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে তিনি দৃষ্টবাদ ও হিতবাদের আলোকে পরিমার্জনার প্রয়াসী হন। তবে ঐ দুটি মতবাদের পাশ্চাত্ত্য প্রত্যয়কে তিনি বহুলাংশে বর্জন করেন। বেনথাম মনে করতেন মানুষ মূলতঃ আত্মকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক হৃদয়বত্তা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা বলেছেন। মিলের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একসময় বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। মিলের আদর্শেই তিনি স্ত্রীজাতিকে সমানাধিকার দানের সমর্থক হয়েছিলেন। অবশ্য মিলকে তিনি পরে সমালোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও পরিচালনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক বা চুক্তিগত উৎপত্তি বিষয়ক প্রত্যয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সমকালীন ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের 'ইচ্ছা'গত প্রত্যয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যাও তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে: 'শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে'। বাহুবল পশুবলেরই সামিল। মানুষকে সেই বলেরই আশ্রয় নিতে হয়; অনরণ তাঁর মতে মানুষ অংশত এখনও পশুর পর্যায়ে রয়েছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য, কথ্যতে বাহুবলেরই অধীনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কথাটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বিবেক কয়েতাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের উদ্গাতা মেকিয়াভেলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের

জাতীতাঁম্প।[৩৯] মেকিয়াভেলির মতো বঙ্কিমচন্দ্রও স্বদেশপ্রেমকে যথোচিত

তুলনা করা হয়

গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে উভয়ের মধ্যে মৌল প্রভেদ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাষ্ট্র-দর্শনকে নীতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেকিয়াভেলির রাষ্ট্রতত্ত্বে নীতি-কথার স্থান গৌণ; সেখানে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে নীতিকথা শৃঙ্খলিত। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি ও নীতিতত্ত্ব সম্পৃক্ত। পারিবারিক স্নেহভালবাসাকে তিনি সারা মানবসমাজে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। সারা মানবজাতির মঙ্গল কামনায় তাঁর দেশভক্তি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাঁর কথায়: 'সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস ও সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস। যদি তাহাই হইল, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়।' স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্যে তিনি স্বদেশপ্রেমকে বিচার করেছেন এই বলে:

> 'সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই ধর্ম্ম নাই ··· আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া—এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত ··· পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।'[৪০]

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিমানুষের অধিকার অপেক্ষা তার সামাজিক দায়দায়িত্ব অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সেজন্যে তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র ও তার বিধি-ব্যবস্থার তাত্ত্বিক নির্দেশ বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজেরই প্রাধান্য ছিল বেশি, উত্তরকালে তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রভাবিত করে। উভয়েরই মতে জনচিত্ত ও জীবনের ধারক ও বাহক হল সমাজ; রাষ্ট্রের স্থান সেখানে গৌণ। সমাজের নিরাপত্তা ও যূথবদ্ধ সমাজজীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার তাগিদেই রাষ্ট্রের আবশ্যকতা। বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্র ও সরকারকে একার্থে দেখতেন। তিনি মনুষ্যজীবন ও সমাজজীবনের অনুক্রম সম্পর্কে কিছু না বললেও, স্পেন্সারের চিন্তায় তিনি প্রভাবিত বলে মনে করা হয়— অর্থাৎ কালের প্রবাহে সমাজের উৎপত্তি ঘটেছে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। জনকল্যাণে রাষ্ট্রের ভূমিকায় তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। সমাজোন্নয়ন ও সংস্কারের জন্যে আইনানুগ বিধিব্যবস্থার চেয়ে মানুষের সমাজ-চেতনায় তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে লোকে আইনভঙ্গ ও অনুচিত কাজ করলে একদিন সমাজের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়। সমাজকে তিনি রাষ্ট্র থেকে পৃথকরূপে দেখতেন।

তাঁর চিন্তায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃত বনিয়াদ হল মানুষের শুভ প্রবণতা; সেজন্যে তিনি লোকের শুভ বোধ ও আচরণ, নীতিপরায়ণতা ও চেতনার উন্মেষ চাইতেন। গোঁজামিলের পথ বেয়ে রাষ্ট্রাধিকার করায়ত্ত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। সমকালীন ইংরেজী কেতাদুরস্ত ব্যক্তিদের বিদেশী রীতিনীতি, ভাব ও ভাষায় আন্দোলন সৃষ্টির কোনও মূল্য দিতেন না। নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ অধিবাসীরা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তিনি আরও অনুভব করেন যে ভুঁইফোড় নেতাদের মধ্যে ত্যাগ ও সংকল্প বলে কিছু নেই। কমলাকান্তর মুখ দিয়ে তিনি তাই বলিয়েছেন: 'আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিকস লিখিতে বলেন?' রাষ্ট্রনীতিকদের বাকসর্বস্বতায় তাঁর কোনও রুচি ছিল না, রাষ্ট্রনীতিকরা ইংরেজদের যে-কোনও একটা কারণে কিছু সমালোচনা করলেই নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধিলাভ হয়েছে বলে মনে করেন। সরকারকে অহেতুক নিন্দা করাতেও তাঁর স্পৃহা ছিল না। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর অরুচির প্রধান কারণ মনে করা হয় যে তিনি ভিন্নপথে জাতির নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিন্তাহীন আবেগের পরিবর্তে তাঁর তত্ত্বগত একটা সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল।

বাহুবল কথাটি তিনি ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক শক্তির অর্থে বলেন নি। সংঘবদ্ধ, বলদর্পী জাতির শক্তিমত্তার দিক থেকে তিনি কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাহুবল সভ্যতা ও প্রগতির পরিপন্থী; অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের রুখতে হলে বাহু-বলের আবশ্যকতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। বাহুবল জনমতের (অর্থাৎ বাক্য-বল) কাছে নগণ্য। কারণ রক্ত-ঝরা পথে বাহুবলের আধিপত্য বিরাজ করে—জনমতের সমর্থন ব্যতিরেকেই বাহুবল অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু অর্জন করে থাকে। বস্তুতঃ জনমতেই মানুষের পরার্থচিন্তার উন্মেষ ঘটে। সামাজিক উৎপীড়নের অবসান একমাত্র জনমতের দ্বারাই সম্ভব। অবশ্য জনমতের পশ্চাতে অনেক সময় বাহুবলের প্রয়োজন হয়। বাহুবলের প্রয়োজনকে বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্নার্থে সমর্থন জানিয়ে শারীরিক বৃত্তির বিকাশ কামনা করেছেন; চেয়েছেন মানুষের সবল স্বাস্থ্য। অহিংসা-বাদকে যে তিনি সর্বার্থে গ্রহণ বা বর্জন করেন নি সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

ধর্মকর্মের সুবিধার্থে ও প্রয়োজনেই সমাজের আবশ্যকতা ঘটে বলে তিনি মনে করতেন; সমাজবদ্ধ না হলে মানুষের জৈব অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে

না। জ্ঞানার্জন-বৃত্তির বিকাশ সাধিত হয় না, ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাও জন্মায় না এবং ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা ব্যাহত হয়। তাই ধর্ম রক্ষার্থে সমাজের প্রয়োজন। সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন।

সমাজের উৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক সম্পদে সকলেরই অধিকার সমান ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুতে মানুষের লোভ থাকত না। সঞ্চয়েরও কোনও প্রয়োজন তখন ছিল না। কাজেই ধনবৈষম্যের কোনও প্রশ্ন উঠত না। প্রাক-সমাজজীবনে মানুষ বর্বর ছিল বলে হব্‌স অভিমত প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেকথায় বিশেষ আপত্তি না করলেও প্রাক-সমাজজীবন দ্বন্দ্ববিধুর ছিল বলে তিনি স্বীকার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র রুসোর অনুরাগী ছিলেন। রুসোর প্রাক-সামাজিক স্বর্ণজীবনের প্রত্যয় তাঁকে প্রভাবিত করে। তবে সংগ্রহ ও সঞ্চয় প্রবৃত্তি যে মানুষের আদিম জীবনেও ছিল সেকথা তাঁর মনে উদিত হয় নি।

সমাজ মানুষের স্বাধিকার হরণ করে বলে তিনি মনে করতেন। যূথবদ্ধ সমাজের নিগড়ে মানুষ তার অনেক স্বাতন্ত্র্যই হারায়; অবদমিত হয় তার ইচ্ছা; সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক ও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা হয়তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ ব্যবস্থার সুফল ও কুফল সম্পর্কে সচেতন থেকে সমাজের কাছে মানুষকে তিনি অনুগত থাকতে উপদেশ দেন:

> 'সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।'[৪১]

সমাজকে বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রের উপরে স্থান ও প্রাধান্য দিলেও রাষ্ট্র বা সরকারের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি। জনজীবনের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্যে সরকারের প্রয়োজন। রাজা অর্থাৎ শাসক সবাই হতে পারে না। সেজন্যে একজনকে শাসনকর্তা হতে হয়। সমাজকে তিনি পরিবারের মাপকাঠিতে বিচার করতেন। পরিবারে যেমন একজন গৃহকর্তা থাকেন, সমাজেরও তেমনি কর্তা হলেন রাজা। পিতার পরিবার পালনের মতো রাজা রাজ্যপালন করেন। সেজন্যে পিতার সমতুল রাজাও শ্রদ্ধার পাত্র। রাজা বলতে তিনি রাজশক্তি মনে করতেন; এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যেরও পার্থক্য অনুভব করতেন; অনেকটা যেমন গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও পার্লামেন্টের প্রতি নতি স্বীকার করতে হয়। সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য না

থাকলে সে-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে— কারণ রাষ্ট্রশক্তির উৎস হল নাগরিকরাই :

'গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায় রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান— নইলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না।'[৪২]

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রতত্ত্বে রাজা কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, রাজশক্তির প্রতিভূ। রাজশক্তি যদি প্রজাপীড়ক হয় তাহলে তা আর ভক্তির পাত্ররূপে বিবেচিত হবে না। স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ভক্তির পরিবর্তে সুশাসনে বাধ্য করাই জনগণের উচিত কাজ বলে তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার প্রণালী সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে গিয়েছেন; অবশ্য আনন্দমঠে ভবানন্দর মুখ দিয়ে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; কিন্তু সে-বিদ্রোহের রূপ কি তা তিনি সবিস্তারে বলেন নি। প্রজার পালন ও রাজার প্রতি আনুগত্য— এই দুইয়ে মিলে সার্বভৌম শক্তি গঠিত হয়। প্রজাপালনে বিরত হলে তাদের আনুগত্যে রাজার কোনও অধিকার থাকে না। তবে কার দ্বারা এবং কি পদ্ধতিতে ভালমন্দের যাচাই হবে সে প্রসঙ্গে তিনি যান নি।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পরিণত বয়সে মিল্‌কে তিনি পরিহার করলেও মিলের 'স্বাধীনতা' প্রত্যয়কে তিনি বর্জন করেন নি। এ বিষয়ে স্পেন্সারও তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেন। তিনি মনে করতেন যে ভালমন্দ বিচারের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত সার্বভৌম শক্তি যদি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ প্রণোদিত সমাজবিরোধী ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয় তবে তাতে অন্যায় কিছু নেই। নতুবা নিজের হিতাহিত নির্ধারণে মানুষের স্বাধিকারহরণ ও রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। তাবলে রাষ্ট্রীয় অবদমনের প্রয়োজনকে তিনি সর্বক্ষেত্রে বর্জন করেন নি।

সাম্যের পূজারীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত। এ সম্পর্কে লেখাগুলি তাঁর বঙ্গদর্শনে ১৮৭৩-৭৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে সেগুলি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে ঐ বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। ভূমিকায় তিনি আগেই বলেছিলেন যে তাঁর সেইসব আলোচনা পাশ্চাত্ত্য চিন্তার ধারাবহ নয়। কারণ পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদার্শনিকরা সাম্যকে নাগরিক ও রাজনৈতিক

দৃষ্টিতেই শুধু বিচার করেছেন ; আর একদল করেছেন অর্থনৈতিক দিক থেকে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণেই সাম্যের আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে নাগরিক ও রাজনৈতিক সাম্য ইংরেজদের আনুকূল্যে এদেশে অল্পবিস্তর প্রবর্তিত হয়ে থাকলেও সাধারণ মানুষ সেগুলির উপকার থেকে বঞ্চিত ; কারণ এদেশের সমাজেই সাম্য প্রতিষ্ঠা পায় নি। মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্য থাকলে আইনানুগ সাম্য নিষ্ফল হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অর্থনৈতিক সাম্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন সামাজিক সাম্যের তাগিদেই। বৈষয়িক উন্নতি অবশ্যই চাই ; গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তা না থাকলে সমস্ত নীতিবাক্যই নিঃসার বলে প্রতিপন্ন হয়।

অসাম্যকে বহুদিক থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন— রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও বর্ণবৈষম্যমূলক। প্রাকৃতিক সাম্যে তিনি বিশ্বাস করতেন না ; প্রকৃতি মানুষকে অসমরূপেই সৃজন করে ; কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ রোগা আবার কেউ বা মোটা। তবে ব্রাহ্মণ বৈশ্য কিংবা বাঙালী ইংরেজের অসাম্য প্রকৃতিগত নয়।

দেশের যতকিছু দুর্গতির মূলে তিনি কৃত্রিম অসাম্যকেই দায়ী করেন। অন্যান্য দেশে অসাম্য দূর করার জন্যে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে বৈপ্লবিক পথ অনুসৃত হয়েছে। প্রাচীন রোমে 'পেট্রিশীয়' ও 'প্লিবীয়'দিগের লোকেরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বৈপ্লবিক নীতি অবলম্বিত হয়েছে। মহান চিন্তানায়করা প্রথমটিকেই শ্রেয় মনে করেছেন।

সাম্যপ্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসে তিনজনকে পথপ্রদর্শক মনে করতেন, যথা বুদ্ধ, যিশু ও রুসো। বুদ্ধদেব শূদ্রদের ব্রাহ্মণদের স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন ; ফলে সেইসময়ে ভারতীয় সভ্যতার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। যিশু খ্রীষ্ট কৃতদাসদের শৃঙ্খলমোচনে সচেষ্ট হয়েছিলেন ; পশ্চিমের প্রগতিকে যিশুই বেগবান করে তোলেন। ভলটেয়ারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র রুসোর অর্থনৈতিক সাম্যকে অপছন্দ করতেন। তবে ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে রুসোর চিন্তাই গতিবেগ সঞ্চার করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ফরাসী বিপ্লব পশ্চিমী সভ্যতার মোড় ফিরিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে রুসোর সমাজ-সাম্যের চিন্তাই তার প্রধান প্রেরণা ছিল। রুসোকেই তিনি সাম্য ও সমাজবাদের জনক বলে অভিহিত করেন। উত্তরকালে ইউরোপের সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়করা রুসোর দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত

হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সমকালীন সাম্যবাদী চিন্তার সম্যক পরিচয় ও 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কসীয় চিন্তা ও আদর্শ জানার সুযোগ হয়তো তিনি পান নি; কারণ মার্কসের রচনা তখন ইংরেজীতে সহজ লভ্য ছিল না। 'ইণ্টারন্যাশন্যাল' বলতে তিনি মার্কস-প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার (১৮৬৪-৭৪) কথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মিলের চিন্তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে লালনপালনে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার সন্তানসন্ততিদের না থাকাই কাম্য, বাকিটা সমাজের কর্তৃত্বাধীনে যাওয়াই সংগত। সাম্য ও সমাজবাদের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সেবিষয়ে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তবে সাম্যবাদ সম্পর্কে চিন্তায় অস্বচ্ছতা থাকার ফলে তাঁর মনোভাবে কিছুটা নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সাম্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে সাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে পূর্বেই তিনি তাঁর 'সাম্য' নিবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন:

> 'আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে— কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক— কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের মুক্তির পথ মুক্ত চাহি।'[৪৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতার প্রত্যয়ও ছিল স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা বলতে তিনি নিছক রাজনৈতিক আত্মতৃপ্তি বা অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মনে করতেন না; ঐ দুটি বিষয়ের পরিপূর্তি হলেই মানুষের অন্য সবকিছু উৎকর্ষ সাধিত হবে সেকথা ঠিক নয়। তাই তিনি বলেন: 'স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ,··· ইহার এমন তাৎপর্য্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে।' রাজা বা রাষ্ট্রশাসনকে তিনি শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যেই চাইতেন। সেটা যেন অনেকটা বাইরের ব্যাপার। ভিতরের বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র —অর্থাৎ সেটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক নয়। প্রকৃত সামাজিক শাসনেই পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তার বিকাশ সম্ভব। রাষ্ট্রিক শাসনকর্তার জাতবিচার তাঁর কাছে গৌণ।

পাঁচ : সমাজতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র হেনরি টমাস বাক্‌ল্‌-এর (১৮২১-৬২) চিন্তায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাক্‌ল্‌ মনে করতেন যে জলবায়ু, জমির উর্বরতা ও খাদ্যাভ্যাস মানুষের চরিত্র গঠনের সহায়ক। ঐগুলি পর্যাপ্ত ও অনুকূল না হওয়ায় মানুষের সঞ্চয়প্রবৃত্তি ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। মননশীল ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী শুধু জ্ঞানার্জনে রত থাকে যাদের হাতে থাকে প্রচুর অবসর; সেটা ব্যাপকভাবে সম্ভব হয় যদি উৎপাদনের একটি অংশ ভোগের পরও উদ্বৃত্ত থাকে। মননশীল ঐ গোষ্ঠী তাদের ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনে অংশ নেয় না। বিত্তের সঞ্চয়ই শুধু নয়, বণ্টন ব্যবস্থাতেও প্রকৃতির প্রভাব বিদ্যমান। সঞ্চয় থেকেই ক্রমে বিত্তবান ও বিত্তহীন সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। চাহিদা ও সরবরাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়ায় শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয়। জনসংখ্যা বেশি হলে মজুরি যায় কমে। পক্ষান্তরে যেসব দেশে জমির উর্বরতা ও জলবায়ু অনুকূল সেখানকার মানুষের জীবন ধারণের চাহিদা কম, কিন্তু জনসংখ্যা বেশি। ঠাণ্ডা দেশের চেয়ে গরম দেশে শ্রমিকদের মজুরি কম। বাক্‌ল্‌ তাঁর তত্ত্ব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভারতীয়রা অধিকাংশই চাউলভোজী, তাদের প্রজনন প্রবণতাও অধিক; সেখানে শ্রমজীবীদের অবনত রাখার জন্যে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাক্‌লের এই তত্ত্বটিকে ভারতীয় পটভূমিকায় বিচার করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি মিলের মতকেও গ্রহণ করেছেন। মিল বলেছেন যে পুঁজি ও জনসংখ্যার অনুপাতে তারতম্য ঘটলে মজুরির হেরফের হয়। শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস না হলে মজুরির পরিমাণ বাড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মনে করতেন। বসবাসের জন্যে দেশান্তরে চলে যাওয়া কিংবা বিবাহ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া জনসংখ্যাহ্রাসের আর কোনও উপায় নেই। দুটি পন্থাই এদেশে অপরিজ্ঞাত। খাদ্যের বিশেষ অভাব না থাকায় লোকে বিবাহ সংকোচনে যত্ন নেয় নি; কাজেই জনসংখ্যা বেড়ে দগের চলেছে। ওদিকে শ্রমের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় শ্রমজীবীদের জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। তাদের জীবনে অবসর না থাকায় মনন ও চিন্তনে তারা অনুন্নত। শিক্ষিত লোকেরা সেই সুযোগটা সম্পূর্ণই গ্রহণ করে থাকে।[৪৪]

বাক্‌লের ব্যাখ্যান ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র এদেশবাসীর তুষ্টচিত্ত জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মানুষকে বিষয়বিমুখ করেছে ও

কৃচ্ছ্রসাধনে ইন্ধন যুগিয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপেও চার্চ-তন্ত্র অনুরূপ পথ প্রদর্শন করত। রেনেসাঁসের ধাক্কায় সে-সংস্কার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ভারতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানুষকে জীবনবিমুখ করে তোলার ফলে সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শূদ্রের অবদমনে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হতাশা, নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে শূদ্র উৎপাদনকার্যে যত্নবান হয় নি; ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে; বৈশ্য হয়েছে বিপন্ন, এবং ক্ষত্রিয়রা ভোগলিপ্সায় হীনবীর্য হয়ে পড়ে; অর্থনৈতিক দুর্বিপাক ও অশিক্ষার ফলে জনগণ শাসকদের দায়িত্বপালনে বাধ্য করতে পারে নি। রোম ও ইংলণ্ডে জনশক্তি প্রবল থাকায় রাজশক্তি সংযত ছিল। ভারতে শূদ্রদের অবদমনে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের অবক্ষয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের বজ্র-আঁটুনি আরও শক্ত করে তোলে; ফলে সমাজের লাভের পরিবর্তে অবনতি ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গুপ্ত আমলের পর থেকেই ভারতে সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক বৈষম্য দেখা দেয় ও সাম্যের সমাধি রচিত হয়। মিলের প্রভাবে তিনি এদেশে নারীজাতির প্রতি অসাম্য আচরণের নিন্দা করেন। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি স্ত্রীজাতিকে সম্পত্তির সমানাধিকারে নীতিগতভাবে সমর্থন জানান। 'কৃষ্ণকান্তর উইল' উপন্যাসে ভ্রমরের মুখ দিয়ে তিনি অবিবেচক স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর বিদ্রোহ করার অধিকারকে তুলে ধরেছেন।

ছয় : আর্থনীতিক চিন্তা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রিক দায়িত্বের উপর রামমোহন ও অক্ষয়কুমার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন; কারণ মানুষে[illegible]বাধিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রেরই কর্তব্য বলে তাঁরা মনে করতেন। পক্ষান্ত[illegible] এম[illegible] রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী চিত্রকে ভাল চোখে দেখেন নি, তিনি মনে করতেন [illegible]ক্তির যাকিছু বিকাশ তা আধ্যাত্মিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক তাতে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয়; সমাজের যে-কোনও উন্নয়ন বা সংস্কারকর্মে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের ভূমিকাই তাঁর কাছে অধিক কার্যকর বলে মনে হয়েছিল। আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় যদি মানুষের যথোচিত বোধ ও চেতনা না থাকে। সেজন্যে তিনি শিক্ষার উপরই

সর্বাধিক গুরুত্বদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তায় মিলের প্রভাব দেখা যায়।

ব্যবসাবাণিজ্যে সরকারী অনুপ্রবেশকে তিনি সমর্থন করতেন না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক উদ্যম বা ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণকে তিনি জনকল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। অর্থনৈতিক সংরক্ষণ (protection) সেহিসাবে অহিতকারী। এখানে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিচ্যুতি লক্ষণীয়। রামমোহন কিন্তু আমদানি-শুল্কের প্রয়োজনকে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির দিক থেকে সমর্থন করে-ছিলেন। বঙ্কিম অবাধ বাণিজ্য (free trade) নীতিকে সমর্থন করেন।

তিনি মনে করতেন যে যেহেতু ভারত একটি উষ্ণদেশ ও এখানকার ভূমি উর্বর, সেইহেতু ভারতীয় সভ্যতার গোড়া থেকেই লোকে অলস ও কায়িক শ্রমে বিমুখ; এবং জ্ঞানের আলোচনায় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অধিক প্রবণতা দেখা যায়। উষ্ণতাজনিত শারীরিক শৈথিল্য, পরিশ্রমে নিস্পৃহতা ও ভিন্ন দেশে গমনেচ্ছার অভাবে দেশের ধনোৎপাদন যথোচিত বর্ধিত হয় নি; ফলে দেশে সামাজিক তারতম্য বিস্তার লাভ করেছে—শ্রমজীবীদের দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্ব ক্রমে স্থায়ী হয়ে দেশকে অবনতির দিকে নিয়ে গেছে। প্রতিকারস্বরূপ তিনি দেশান্তর গমন ও বিবাহপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সংকোচনের উপদেশ দিয়েছেন।

রামমোহন থেকে দাদাভাই নৌরজী পর্যন্ত অনেকেই দেখিয়েছেন যে ইংরেজ শাসনের ফলে এদেশের ধনৈশ্বর্য বহুলাংশে ইংলণ্ডে পরিবাহিত হয়ে থাকে যা 'Drain Theory' নামে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন:

> 'এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে।'[৪৫]

তিনি একথাও মনে করতেন যে 'ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্ব-

কালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।'[৪৬]

তবে একথা তিনি বলেছেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের যে আয় বেড়েছিল, তা মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগেই চলে যায়। দেশের এই আয়-বৃদ্ধির উপকার থেকে বৃহত্তর জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে।

কৃষকদের তৎকালীন দুরবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে উদ্‌ঘাটিত করেন। বাংলার কৃষকদের সমস্যা তাঁর চেষ্টাতে সরকারের গোচরীভূত হত। সরকারি বিধিব্যবস্থা বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তিনি সমালোচনা করেছেন; কিন্তু একেবারে রদ করতে চাননি; শাসকদের উপর তাঁর বিশেষ অনাস্থা ছিল না; তিনি চাইতেন সরকার সদয় হয়ে কৃষকদের দুর্গতি দূর করুক। কর্নওয়ালিসের আমল থেকে ডালহৌসির শাসনকাল অবধি ভূমি সংস্কারে কর্তৃপক্ষ যেটুকু উদ্যোগী হয়েছে তা সদাই জমিদারদের স্বার্থানুকূলে এবং কৃষকদের স্বার্থের বিপরীতে গিয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অতিধনবানকে জমির মৌরসী স্বত্বের অধিকার দেওয়া ইংরেজদের এক মস্ত ভুল। বস্তুতঃ যে-ব্যক্তি জমি চাষ করে এবং আবহমানকাল ধরে জমির স্বত্ব ভোগ করে আসছে তাকেই ঐ বন্দোবস্তে জমির মালিকানা দেওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতভেদ সুপরিস্ফুট; বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার যাকিছু দুর্গতির মূল। তবে এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের মতের মিল ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে কৃষকদের মঙ্গলার্থে যে-সব বিধিব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি তার মধ্যে রামমোহন অধিক খাজনা আদায় করা ও প্রজাদের উৎখাত করায় জমিদারদের অধিকার যাতে না থাকে সে-সম্পর্কে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন।

জমির প্রত্যক্ষ মালিকানা ত্যাগ ও ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে তিনি সরকারকে তারিফ করেন। কিন্তু সম্পত্তির বণ্টনে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ চান নি। তিনি একথাও অনুভব করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের বিত্তের বহর বেড়ে গিয়েছে এবং সংখ্যাগুরু চাষীরা ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। বিত্তকে বঙ্কিমচন্দ্র গোবরের সঙ্গে তুলনা করেন; জমে গেলে তা থেকে পচা গন্ধ বেরোয়—আর তা ছড়িয়ে দিলে জমির উর্বরতা বাড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখা না দিলে বাংলার অধিবাসীরা তাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পেত;

তিনি মনে করতেন যে তৎকালীন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কতিপয় বাবুর গুঞ্জনধ্বনির পরিবর্তে সমুদ্রের কর্ণভেদী গর্জনের মতো প্রতিবাদের আওয়াজ উত্থিত হওয়া প্রয়োজন। জমিদারি প্রথার ভালমন্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

১. সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন। ছোট জমিদার কিংবা জমিদারি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারই অধিক।

২. নায়েব গোমস্তাদের উৎপীড়ন অনেক সময় জমিদারের অজ্ঞাতসারেই ঘটে।

৩. অনেক জমিদারের প্রজাও ভাল নয় ; পীড়ন না করলে খাজনা দেয় না।[৪৭]

'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থটিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থনীতিতত্ত্বের সুগভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্রঘটিত ভ্রান্তি' উপলব্ধি করে তিনি কিছুকাল তাঁর ঐ-গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দেন।

সাত : শাসন ও দণ্ডনীতি

ভারতের প্রশাসন ও বিচার বিষয়ক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে সাক্ষ্যদান করেছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ; দুজনেই সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং দুজনেই সমকালীন প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। জুরিপ্রথা, হেবিয়াস কর্পাস আইন, বিচারকার্যে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে রামমোহন যা সুপারিশ করেছিলেন তা কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপায়িত হয়। তবুও তার চার যুগ পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐসব বিষয়ে পুনরায় নতুন করে সোচ্চার হতে হয়। বিচারালয় ও বেশ্যালয়কে তিনি সমপর্যায়ভুক্ত করেন— যেখানে টাকা না ফেললে প্রবেশাধিকার মেলে না।

তিনি স্পষ্টই অভিযোগ করেন যে দেশের আইন ব্যবস্থা ধনীর উৎপীড়ন থেকে দরিদ্রকে রক্ষা করতে অক্ষম। যারা উকিল নিয়োগ, সাক্ষীর ব্যবস্থা, আমলা ও চাপরাশিদের উৎকোচ দিতে পারে তাদেরই কাছে দেশের বিচারালয়ের দ্বার উন্মুক্ত। যদি কেউ নিজের সর্বস্ব পণ করেও আদালতের শরণাপন্ন হয় তাহলেও সে সুবিচার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থে তিনি রায়তের উপর জমিদারি অত্যাচার ও উৎপীড়নের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেছেন যে উত্তম আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও আইনত অপরাধী জমিদারদের কোনও সাজা হয় না, পরিবর্তে নিরীহ দুর্বল ব্যক্তিরাই নিগৃহীত হয় ও শাস্তি পায়। আইন-আদালতের তিনি পাঁচটি ত্রুটি দেখিয়েছেন :

১. 'মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য···।'

২. 'আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না ··।'

৩. 'বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়···।'

৪. 'বর্ত্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা···।'

৫. 'বিচারকবর্গের অযোগ্যতা···।'[৪৮]

ইংরেজদের বিচারব্যবস্থার প্রতি তিনি যতই কশাঘাত করে থাকুন না কেন সে-ব্যবস্থা হিন্দুশাসনকালের চেয়ে যে উন্নততর তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। হিন্দুরাজত্বে ব্রাহ্মণদের দাপটে শূদ্ররা ছিল অসহায়। সে হিসাবে ইংরেজ আমলে অব্রাহ্মণরাও বিচারকর্মের অধিকারী—প্রাচীনকালে যা ছিল অচিন্তনীয়। অবশ্য প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য না থাকায় সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা যে শক্ত তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীন ও পরাধীন ভারতের তিনি একটি তুলনামূলক বিচার করেছেন। পূর্বে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে রাজা এখানেই বসবাস করতেন—আর এখনকার রাজা থাকেন বিলাতে। রাজা নিজ বাসভূমির স্বার্থে অধীনস্থ সুদূর দেশের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। প্রাচীন কালে এদেশের রাজারা জনসাধারণকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলতেন—কাজেই উভয়ের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। এখানে অত্যাচারী কোন্ দেশ বা জাতের লোক সে-প্রশ্ন গৌণ—তিনি দেশীয়ই হোন অথবা বিদেশী হোন প্রকৃতিতে তাঁরা সমস্থানীয়। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে বঙ্কিমচন্দ্র যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন ; সে-যন্ত্র তার নিজ নিয়মেই চলে। সরকারি কর্তাদের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভাল কি মন্দ তাতে কিছু যায় আসে না।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের সম্পর্কের চেয়ে ইংরেজ ভারতীয়দের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল বলেই তিনি মনে করতেন। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কি ইংরেজ, কি ভারতীয়—সবাই একই নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের প্রতি প্রযোজ্য আইন ছিল স্বতন্ত্র। ভারতীয়েরা ইংরেজদের বিচার করতে পারে না ; কিন্তু শূদ্রেরা কি ব্রাহ্মণদের বিচার করতে পারত ? তিনি প্রশ্ন

করেছেন যে দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের একজন জজ, রামরাজ্যে তাঁর স্থান কোথায় ছিল? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের ছিল দোর্দণ্ড দাপট, কিন্তু ইংরেজ আমলে ঐ রূপ শ্রেণীর জোরে কেউ আধিপত্যে অধিকারী নয়।

ভারতীয়রা রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত; ফলে প্রশাসনের যথোচিত শিক্ষা তারা পাচ্ছে না এবং তাদের সহজাত গুণগুলিও উন্মেষের পথ পাচ্ছে না বলে তিনি অনুভব করেন। রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনৈতিক অধিকার চলে গেলেও ইংরেজশাসন প্রবর্তিত হওয়ায় এখানকার মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি উপলব্ধি করেন যে স্বাধীনতার পরিবর্তে ভারতীয়রা আধুনিক জ্ঞানবিদ্যার অধিকারী হয়েছে। তিনি একথাও বলেন যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ অস্তে গিয়েছে, উদয় হচ্ছে শূদ্রের প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রত্যয়টি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়।

আট : বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ থেকে আগত যে-দুটি মতবাদ ভারতে নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার একটি উদারতন্ত্র, অপরটি জাতীয়তাবাদ। ঐ-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'ন্যাশন্যাল' শব্দটির ব্যবহারে দ্রুত বিস্তৃতি দেখা যায়। ন্যাশন্যাল পত্রিকা, ন্যাশন্যাল পার্টি, ন্যাশন্যাল মেলা ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা সে সময়ে একদল শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট আবেগ মাত্রই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নব-অঙ্কুরিত ঐ-আবেগকে সুস্পষ্ট দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপিত করেন। ব্যক্তি ও জাতির সর্বাত্মক কল্যাণ-সাধনায় তিনি সকলকে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। তিনি মনে করতেন যে যখন সবাই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে তখন সকলের মনোভাব ও আচরণ একই খাতে প্রবাহিত হবে।

জাতীয়তাবাদের প্রধান দুটি লক্ষণ বিভিন্ন জাতির স্বার্থকে পৃথকরূপে বিবেচনা করা। এক জাতির কল্যাণ অপর জাতির পক্ষে অকল্যাণকর হতে পারে। দুটি জাতির মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে উভয়েই অপরের ক্ষতিসাধন করে স্বীয় স্বার্থের সিদ্ধি কামনা করে। এ-মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভাল বা মন্দ

যাই হোক না কেন, যে-জাতি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ তারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। জাতীয়তাবাদের এই লক্ষণ সমকালীন ভারতে অনুপস্থিত ছিল বলে তিনি মনে করতেন। আর্যরা এদেশে যখন এসেছিল তখন তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করত। পরে তারা যখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভেদ দেখা দেয়, পূর্বের ঐক্য আর থাকে না। সমকালীন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ও প্রদেশান্তর্গত মানুষের মধ্যে একতার অভাব তিনি অত্যন্ত অনুভব করেন; এমনকি একই জাত ও ধর্মের মধ্যেও যে যথেষ্ট অনৈক্য দেখা যায় তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> 'বহুকাল পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে।'[৪৯]

তাঁর মতে প্রাচীন ভারতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসকদের কোনও স্বার্থান্বিত সম্পর্ক বিরাজ করত না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমাজের শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া ছিল, সে-শ্রেণী ছিল ক্ষত্রিয় শ্রেণী। রাজা ও প্রজার স্বার্থ এক না হওয়ায় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাবোধ বলে কিছু ছিল না; লোকে চাইত ভাল রাজা, স্বাধীনতা নয়; রাজশক্তির প্রতি সাধারণের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজতক্তে যেই বসুক না কেন, খাজনা মকুব করত না। সাধারণের চোখে তাই শাসক দেশীয়ই হোন বা বিদেশীই হোন তাতে কিছু যায় আসে না। স্বাধীনতার বাণী ও জাতীয়তাবাদের চেতনা ইংরেজরাই এদেশবাসীকে দিয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর কথায় :

> 'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জা[illegible] না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি [illegible] াহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি [illegible] থে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই [illegible] র মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ই[illegible] ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি,

তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।'[৫০]

এদেশে 'জাতীয়তাবাদ' প্রত্যয়টি যে পুরোপুরি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। এশিয়ার দুটি বৃহত্তম দেশ চীন ও ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার অস্তিত্ব ছিল না। চীন ও ভারতের সাধনা ছিল বিশ্বজনীন। নবাগত জাতীয়তাবাদকে তিনি ধর্মের ব্যঞ্জনায় প্রচার করেন। কারণ তিনি জানতেন যে ভারতবাসীর হৃদয়জয়ের একমাত্র পথ হল ধর্ম। দেশ-প্রেমকে তাই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে অভিহিত করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে এদেশবাসীর নির্বিকার মনোভাব ঘোচাতে হলে জাতীয়তা-বাদের একটা ধর্মীয় আদর্শ স্থাপন করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান দেশকে জননীরূপে কল্পনা করা। দেবী দুর্গাকে তিনি বঙ্গভূমির সঙ্গে একাত্মরূপে দেখেছেন। তাঁর জাতীয়তাবোধের এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :

> 'The third and supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother... It is not till the Motherland reveals herself to the eye of the mind as something more than a stretch of earth or a mass of individuals, it is not till she takes shape as a great Divine and Maternal power...'[৫১]

বঙ্কিমচন্দ্রকে এদেশে জাতীয় চেতনার অন্যতম জনকরূপে অভিহিত করা হয়। বহুশত বৎসর পূর্বে ভারতমাতার যে স্বর্ণমূর্তি দীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য দেশবাসীর প্রতি তাঁর ব্যাকুল আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। জাতীয়তাবাদের নবমন্ত্রে দীক্ষিত দেশবাসী তাঁর সে ডাকে সাড়া দেয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থটি মানুষের মনে এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পূর্বরচিত 'বন্দেমাতরম' সংগীতকে তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। উত্তরকালে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে এ-সংগীত প্রেরণার প্রধান উৎসস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সংগীতের প্রথম শব্দটি ('বন্দেমাতরম') স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপক 'স্লোগান' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ মদনলাল ধিংড়া ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন।

বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' শব্দটি জাতীয় আবেগের এক মূর্ত দ্যোতনা, যার স্পন্দন ভারতবাসীর নাড়ীতে যেন অনুভব করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দীক্ষাদাতা হলেও আকস্মিকভাবে ইংরেজের এদেশ পরিত্যাগ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কারণ ইংরেজের কাছ থেকে নবলব্ধ জাতীয়তাবাদের চিন্তা শুধু শিক্ষিতদের মধ্যে নয়, সর্বস্তরের মানুষের মনে তার আগে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উপলব্ধি করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর বাণী দেশবাসীর কানে সম্পূর্ণ না পৌছোলেও একদিন যে তাঁর কথা প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সে-সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ভারতবাসীর মানসনেত্রে দেশমাতৃকার রূপ ও শক্তি দর্শিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব আবেগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। দেশের শক্তি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমিত বলে তিনি মনে করতেন না; শক্তির ধারক ও বাহক সারা দেশ। আনন্দমঠে তিনি জাতীয় মুক্তিসেনা গঠনের ইঙ্গিত করেছেন। শ্রেণীবিশেষকে তিনি ক্ষমতাসীন করতে চান নি; তাঁর চিন্তায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যায়।

ব্যক্তিকে তিনি সমষ্টির অঙ্গরূপে দেখেছেন; সমষ্টিগত দেহের প্রাণ হল জন্মভূমি; মানুষের যাবতীয় মূল্যবত্তার উৎস মাতৃভূমি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এরূপ সমন্বয়চিন্তা ব্যতিরেকে ঐসময়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। দেশাত্মবোধকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে অভিমত প্রকাশের সঙ্গেই তিনি দেশমাতৃকার দেবীতুল্য রূপ বর্ণনা করেছেন। একটি কথা এখানে স্মরণ করা দরকার যে বঙ্কিমচন্দ্র নিরাকারবাদী হলেও অনগ্রসর উপাসকদের কাছে রামমোহনের মতো তিনিও মূর্তিপূজার প্রয়োজনকে মানতেন। কারণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী লোকের কাছে বিমূর্ত উপাসনার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয় না। সেজন্যে দেবীমূর্তির সাহায্যে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেন। উত্তরকালে অনেকের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালও তাঁর এই চিন্তায় প্রভাবিত হন।

আনন্দমঠের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানন্দের মুখ দিয়ে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে সন্তানদের কাছে দেশ ছাড়া আর কোনও জননী নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষ প্রভাবিত করে। 'অনুশীলন দলে'র নামকরণ হয়েছিল তাঁরই 'অনুশীলন-তত্ত্ব' থেকে। স্বামী বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন।

অরবিন্দ একসময়ে 'আনন্দমঠে'র অনুকরণে 'ভবানী মঠ' গঠনের চেষ্টা করেছিলেন।

'আনন্দমঠ' সম্পর্কে লর্ড রোনাল্ড্‌শে লিখেছেন : '...the secret societies modelled themselves closely upon the society of the children of *Ananda Math*, 'Bandemataram!' the battle cry of the children became the war cry not only of the revolutionary societies, but of the whole of nationalist Bengal...'[৫২]

'আনন্দমঠ' রচনার পরিকল্পনা কোন্ সূত্রে হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রচলিত মত এই যে ১৭৭২ সালের সন্ন্যাসীবিদ্রোহ এবং ঐ সময়কার দুর্ভিক্ষ থেকেই গ্রন্থটির উপকরণ সংগৃহীত হয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তে বলা হয়েছে : '...His outstanding work, however, is the *Ananda Math* a story of the sannyasi rebellion of 1772. The rebels gained a crushing victory over the 'British' and Mohammedan forces.'[৫৩]

এ বিষয়ে বিমানবিহারী মজুমদার এক তথ্যপূর্ণ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে 'আনন্দমঠ' রচনার উদ্ভাবনা বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কে নামক এক বিপ্লবীর সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার বিবরণ থেকে ঘটে। বঙ্কিমের সমসাময়িককালে দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে ফাদ্‌কের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার কথা জানা যায়।[৫৪] রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ফাদ্‌কে ভারতের জঙ্গি জাতীয়তাবাদের প্রথম পথপ্রদর্শক।[৫৫]

তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবল বিপ্লববাদের তত্ত্বগুরু মনে করা ভুল। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিবর্তে গঠনমূলক সমাজোন্নয়নচিন্তা ও প্রচেষ্টায় তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। গোখলের 'সার্ভ্যান্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে রচিত হয়েছিল।

আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি জাতীয়তাবাদকে একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক পটভূমিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থটি এ কথার প্রমাণ। তাঁর উপর কোঁৎ-এর প্রভাব ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সমস্ত জৈবিক প্রবণতা ও উন্নত বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধনের মধ্য দিয়ে 'মানব দেবী'-র পূজাই ছিল উভয়ের আদর্শ। পার্থক্য এই যে যেখানে কোঁৎ-এর নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টবাদ 'has love for its principle, order for its basis, and progress for its end', সেখানে বঙ্কিচন্দ্রের ধর্মের প্রত্যয় পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী। শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে তিনি সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করার সময় মানব-

হিতের প্রশ্নকেও সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবপ্রেমই প্রকারান্তরে আত্ম-উপলব্ধি তথা ঈশ্বরোপাসনা।

দেশপ্রেমের পশ্চাতেও তাঁর সেই মানবপ্রেমের কথাই পাওয়া যায়। সর্বভূতেই ঈশ্বর বিদ্যমান। সেজন্য সকল জীবকেই নিজের মতো করে ভালবাসা দরকার। আত্মরক্ষার চেয়ে সমাজরক্ষা অধিক প্রয়োজন; কারণ সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। ব্যক্তি ও পরিবার সমাজেরই অংশ। সেজন্য সমষ্টির মঙ্গলার্থে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে তিনি দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে একই আকারে কল্পনা করেছেন। অন্য জাতির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা প্রতি জাতির মৌল কর্তব্য; তখন ধর্ম ও সুনীতি অন্তর্হিত হয়; সেই বিষয়ে সজাগ থেকে তিনি মানবিক দৃষ্টিকোণে দেশপ্রেমকে রূপায়িত করেছেন; তাঁর কাছে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রভেদ নেই; বিশ্বপ্রেমকে আদর্শ করলে স্বদেশভক্তিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এমন কথা তাঁর মতে অর্থহীন। তিনি চেয়েছিলেন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার; একে যেমন অপরের অনিষ্টসাধন করবে না, তেমনি অপরকেও নিজ অনিষ্টসাধনের সুযোগ দেওয়া অনুচিত। নিঃস্বার্থ স্বাদেশিকতা মানুষের মনে ও কর্তব্যে সঞ্চারিত হলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর সংঘাত দেখা দেবে না।

সকল জীবের প্রতি প্রীতিকেই তিনি আদর্শ করেছিলেন। কিন্তু বিবদমান বিশ্বে স্বাদেশিকতার প্রাবল্য অনস্বীকার্য। কোঁৎ-এর দেশাত্মবোধ ছিল সংকীর্ণ। উদারতন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে প্রেম ও প্রীতির সঞ্চারকরূপে দেখেছিলেন; মানুষ নির্বিশেষে সবারই মঙ্গল ছিল তাঁর কামনা। ব্যক্তিবিশেষের কাছে বৈশ্বিক বোধ ও চেতনা আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য বলে দেশভক্তিই তার কাছ থেকে আশা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেশভক্তিকে আধ্যাত্মিক আলোক ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যে পরিশীলিত করেন।

এক সময়ে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ধারায় ধর্মের প্রতাপ ছিল খুবই প্রবল। ক্রমে ধর্মের স্থান অধিকার করে জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধন করেন। হিন্দুধর্মের ঔদার্যে পরিমার্জিত বঙ্কিমমানস জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা সম্পর্কে যথোচিত সচেতন ছিল। পাশ্চাত্ত্যের দেশপ্রেমিকতা তাঁর কাছে আদৌ রুচিকর ছিল না। তিনি বলেছেন:

'ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির

সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন।'[৫৩] হিতবাদীরা 'greatest good of the greatest number'-এর যে-আদর্শ তুলে ধরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বৈশ্বিক চেতনায় গ্রহণ করেন। দৃষ্টবাদীরাও 'মানব দেবী'-র বন্দনা করেছেন। কিন্তু ঐসব মহান আদর্শ ইউরোপীয় মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীক, রোমান ও ইহুদি সভ্যতা এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যেজন্যে ইউরোপে জাতীয়তা ও আন্ত-র্জাতিকতার সমন্বয় ঘটে নি বলে তাঁর মনে হয়েছে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে নির্ভুল বলা যায় না; কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিভিন্ন সময়ে বৈশ্বিক আদর্শ ঘোষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপীয় রেনেসাঁসই সেখানকার জাতীয়তা-বাদের উৎস। রেনেসাঁসের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। তারই মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল জাতীয় আবেগ ও উদ্দীপনা। এদেশেও রেনেসাঁসের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাগ্রহ উৎসাহ ছিল। সেজন্যে প্রথমে তিনি রামমোহনের মতো ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিধানে তৎপর হন। ঐসময়ে এদেশের বিদগ্ধ সমাজ ইংরেজী ভাব ও ভাষার বন্যায় ভেসে চলেছিল; সে-বন্যাকে বঙ্কিমচন্দ্রই সুপটু প্রয়াসে রোধ করেন। তিনি সকল কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন; জাতীয় জীবনের ঐক্যবন্ধনকল্পে বাংলাভাষার উন্নতি বিধানের জন্য :সোচ্চার হন। তবে তিনি সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পক্ষপাতী ছিলেন। সেইসঙ্গে একথাও উপলব্ধি করেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে অক্ষম এবং একটি বিদেশী ভাষা জাতীয় ঐক্যেরও অন্তরায়। তাই তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাংলাভাষায় সর্বস্তরের মানুষকে সমাজসচেতন করে তোলার প্রয়াসী হন।

জাতীয় বোধ ও চেতনা সৃষ্টির জন্য তিনি ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হন। তবে সে-ইতিহাস রাজপুরুষদের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা নয়— দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, অর্থনীতির কালানুক্রমিক মূল্যায়নই তাঁর ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা মূলতঃ প্রাদেশিক বিষয়েই সীমিত ছিলেন; শুধু বাংলার কথাই তিনি বলেছেন। অবশ্য প্রাদেশিক

সংকীর্ণতা তাঁর ছিল না এবং স্বতন্ত্র বঙ্গ রাষ্ট্র গঠনের কথা তিনি ভাবেন নি। তবে সর্বভারতীয় জাতীয় আবেগ ও ঐ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।'[৫৭]

নয়: শিক্ষাচিন্তা

সামাজিক অসংবদ্ধতাকে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার অন্তরায় বলে মনে করতেন; প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থায় দেশবাসী জর্জরিত ছিল; তাই তিনি সাম্যের জয়গান করেছিলেন; চেয়েছিলেন মানুষ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকারের প্রতিষ্ঠা; তবে আইনের পথ বেয়ে সাম্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না— তাতে লোকের দুর্গতি ঘোচে না— মানুষে মানুষে বৈষম্যও বিদূরিত হয় না। সেজন্যে তিনি সমস্যার আরও গভীরে গিয়ে তার সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সে-সমাধানের পথ ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের মধ্যেই রয়েছে বলে তিনি অনুভব করেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়করাও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-শিক্ষার তাগিদ অনুভব করেন সে-শিক্ষা পুঁথিগত নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার নিরঙ্কুশ বিকাশ, কার্যকুশলতা, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যে যথোচিত চেতনাই সে-শিক্ষার মূলকথা। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি মানুষের চতুর্বিধ বিকাশের রূপ ও পদ্ধতি দর্শিয়েছেন। বলা বাহুল্য ঐ শিক্ষাতত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ পুঁথিগত নয়। নজির হিসাবে তিনি এদেশের ধাত্রীদের কথা বলেছেন যারা তথাকথিত শিক্ষিত বাবুদের চেয়ে কোনও অংশে কম শিক্ষিত নয়। প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষার প্রচার ও প্রসার তাঁর মতে অনুন্নত ছিল না। মহাভারতকে তিনি উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন। সে-যুগে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ এমনকি

স্ত্রীলোকেরাও যে শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত ছিল না সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় দেখা যায়।

রামমোহন থেকে সমকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবিষয়ে তেমন যত্ন নেন নি বলে বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেছেন। বস্তুতঃ লোকশিক্ষার বিষয়ে কেরি, হেয়ার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ অনেকেই যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষিত লোকেরা কৃষক ও সাধারণ মানুষের শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। তাঁরা বক্তৃতামঞ্চে বড় বড় কথাই শুধু বলে থাকেন, পত্রপত্রিকায় গালভরা কথাও লেখেন অনেক—উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—কর্তাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অথচ আসল সমস্যাটি অবহেলিতই থেকে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন দেশের ছ-কোটি মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেন ; কিন্তু সে-সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ পায় না। তাঁর মতে দেশের আপামর মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, নিপীড়ন থেকেও তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে। যথোচিত শিক্ষা পেলে স্ত্রীলোকেরাও স্বাবলম্বী হতে পারে। সেজন্যে তিনি লোকশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার কামনা করেন।

জনসাধারণকে সংস্কৃতিবান করার কাজে নিরক্ষরতার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ কথকতার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে জ্ঞাতব্য নানা কথা শোনানো যায়। শিক্ষিত লোকদেরও লোকশিক্ষায় সযত্ন উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদির সাহায্যে ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিতরা শিক্ষাহীনদের সহজেই জ্ঞানের আলো দেখাতে পারেন। সংবাদপত্রগুলিকেও লোকশিক্ষার বাহন হতে হবে। শিক্ষার বিস্তারে গুরু ও সন্ন্যাসীদের কর্মপন্থা অবলম্বনের তিনি সুপারিশ করেছেন। তাঁর প্রায় সকল গ্রন্থেই শিক্ষাদাতার ভূমিকায় গুরু বা সন্ন্যাসীর চরিত্র দেখা যায়।

দশ : উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সময় ও সমাজকে সামনে রেখে নতুন সমাজবোধ ও জীবনাচার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যুক্তির সাহায্যে তিনি নবাগত জীবনবোধকে উপলব্ধি করেন, কিন্তু সমসাময়িক সমাজমনে আবদ্ধ ধারণায় নবকলেবরে হিন্দু-অতীতকেই চলমান করে তুলতে চান। পরাধীনতার গ্লানিময় জাতির অনিশ্চিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিকল্পস্বরূপ অতীতমুখিতাই তাঁর কাছে ছিল সহজতর পথ।

রামমোহনের ব্যাবহারিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত বিদ্রোহী চিন্তা, সমাজবিপ্লবী নব্যবঙ্গদলের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ইহলৌকিক বস্তুবাদী জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তিনি। পশ্চিমী সংস্কৃতির যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শও বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রথম দিকে রেখাপাত করে। কিন্তু তাঁর চোখের দেখা মনের জড়তায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই উত্তরাধিকার নিষ্ফল হয়ে যায়। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, ঐহিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন। পরিণত জীবনে বিমূর্তভাব ও সর্ববিষয়ে পরমত্বের আতিশয্য ঘটিয়ে পূর্ব-অনুসৃত মত ও পথ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। চিন্তা ও প্রযুক্তির মধ্যে বিরোধ ছিল যথেষ্ট। যুক্তিবিরোধী যুক্তিজালের সাহায্যে তিনি গুরুবাদ ও সমষ্টিবাদের পথ সুগম করে দেন। রামমোহনের রেফর্মেশন্ আন্দোলন বঙ্কিমচন্দ্রের কাউণ্টার-রেফর্মেশনে পরিণতি লাভ করে।

রামমোহনের মতো তিনিও মননশীল দৃষ্টিতে ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করেন। খ্রীষ্টানদের সমালোচনা, ভিন্নমুখী ব্রাহ্মদের ক্রিয়াকলাপ, দয়ানন্দ ও শশধর তর্ক-চূড়ামণি কর্তৃক সনাতন আদর্শের প্রচার প্রভৃতির মধ্যে থেকে তিনি পৃথক পথ কেটে স্বতন্ত্র সমাজাচার এবং ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরোধ ও অসংগতি দূর করে সমন্বিত জীবনাদর্শ স্থাপনকল্পে যুগোপযোগী এক তত্ত্বের সন্ধান করেন। তিনি মনে করতেন : 'কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ— সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে।'[৫৮] এই বিশ্বাসের পিছনে ছিল তাঁর অনুশীলন-তত্ত্ব, যার মূলকথা হল ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বর সর্বলোকে বিরাজমান, কাজেই সর্বলোকে প্রীতিই ধর্মের প্রধান নির্দেশ। তারই পৃষ্ঠপটে তিনি নতুন জীবনাচারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে চাই সর্বলোক ও আত্মার অভিন্নতা বোধ—

একমাত্র সেই চেতনাতেই জ্ঞান, কর্ম ও ধর্মাচরণ নির্ভরশীল। সেই জ্ঞান থেকেই আসে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সুখ ও শান্তি। হিন্দুধর্মের মধ্যেই তিনি সেই চেতনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

প্রাচীন মূল্যবোধের সাহায্যে নতুন জীবনাদর্শে তিনি সমকালীন শিক্ষিত মানুষের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি এবং দেশগরিমা সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন। আত্মশক্তি ও গরিমায় মানুষকে ঐভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনা-সৃষ্টির ভিন্ন কোনও পথ তিনি সে সময়ে খুঁজে পান নি। জাতিবিদ্বেষকে তিনি ভিন্নার্থে দেখেছিলেন : 'বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্য-ক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।'[৫৯]

তাঁর প্রাচীনতার চিত্র ছিল আধুনিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত। অনেকটা যেন নতুন পাত্রে পুরোনো মদিরার মতো। দেশের প্রাচীন স্থিতিকে তিনি প্রতীচ্যের জ্ঞানবিদ্যায় গতিশীল করতে উদ্যোগী হন। বর্তমানের সাহায্যে অতীতের ভালোমন্দ গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি যে-নতুনের সন্ধান দিয়েছিলেন তা প্রকারান্তরে ভবিষ্যতের এক ভিন্ন নিশানা দেখায়। তাঁর প্রচারিত হিন্দুধর্মের জাগরণ ও হিন্দুসাম্রাজ্যের চিত্র উত্তরকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

বিমূর্ত ভাবের আতিশয্যে তিনি স্বদেশচিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে ফেলেন ; দেশের প্রতি দৈব ব্যঞ্জনার প্রয়োগ এবং ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বিত চিন্তা পরবর্তীকালে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার পথে নিয়ে যায়। তাঁর স্বদেশপ্রীতি, জগৎপ্রীতি, আত্মপর ভেদ-শূন্যতা প্রভৃতি প্রত্যয় পরম অর্থে (absolute) ব্যবহৃত। অর্থাৎ দেশ, কাল ও সমাজের অতীত ও উর্ধ্বে ঐ পরমতত্ত্ব চিরন্তন—মানুষ তার ক্রীড়নক মাত্র। সাম্যের প্রথম প্রবক্তারূপে রুসোকে তিনি আদর্শ করেছিলেন। রুসো সমষ্টির ইচ্ছায় (General Will) পরমত্ব আরোপ করেন। রুসোর মতে সমষ্টির ইচ্ছাধীন নয় এমন কোনও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অসহনীয়। সমষ্টির ইচ্ছাকে মানতে অনিচ্ছুক সবাইকে সমষ্টি তার নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য করবে। সমষ্টিকে বলীয়ান করার তাগিদে রুসো ব্যক্তিকে সমষ্টির উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল করেন। সমষ্টির কাছে ব্যক্তির নির্বিচার আনুগত্য রুসোর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সমাজের পরিচায়ক। রুসোর প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে ভক্তি করার উপদেশ দেন ; ভক্তি ভিন্ন

উপায় নেই। ভক্তির পাত্র সমাজই শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। রাজাই হল সমাজ এবং সমাজ আমাদের শিক্ষক। এখানে হেগেলীয় চিন্তার সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা যায়। হেগেলের মতে রাষ্ট্র দিব্য অভীপ্সার প্রতীক। ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও বিচারের উর্ধ্বে রাষ্ট্রের নির্দেশ ঈশ্বরেরই নির্দেশ। জাতীয় ব্যক্তিত্বের (National Spirit) মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে নির্বিচারে মিশিয়ে দেওয়াই নাগরিকমাত্রের মহান কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৃতি পুরোপুরি কলাকৈবল্যবাদী নয়। তবে উদ্দেশ্যমূলক বা প্রচারধর্মী আখ্যা না দিয়ে বরং তাকে নীতিধর্মমূলক বলাই ভাল। তাঁর শিল্পীমনের সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ভণ্ডামি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতার সংঘাত তাঁর বিভিন্ন রচনায় সুপরিব্যক্ত। তখনকার প্রকাশ্য কোনও আন্দোলনেই তিনি নিজেকে জড়াতে চান নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি মনে করতেন জনজীবনের সাংস্কৃতিক বনিয়াদ শক্ত না হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নয়নপ্রয়াস নিষ্ফল হবে। তাই জনমনকে পরিশীলিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অপকার সম্পর্কে তত্ত্বগত চেতনা ও উদার মনোভাব থাকলেও প্রয়োগের দিক থেকে তিনি ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে তাঁর যুক্তিবোধ ও প্রচলিত নীতিবোধের সংঘাত সুপরিস্ফুট। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবেই তিনি ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং জমিদারদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণতঃ মুসলমান বিদ্বেষী মনে করা হয়। এ কথার প্রতিবাদ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের লেখায় পাওয়া যায়।[৬০] তবে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের দুঃখদুর্দশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অনুক্ত রয়ে গিয়েছে। তিনি কেবল বাঙালীর সমস্যাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেদিক থেকে রামমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তদানীন্তন নায়কবৃন্দ ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে সমসূত্রে বাঙালীকে যুক্ত করেন।

মহাপুরুষদের চরিত্র ও প্রতিভায় প্রায়শঃই এক বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়। তাঁর কোন্ বর্ণটি যে সমসাময়িক যুগচিত্তে প্রতিফলিত হবে তা শুধু তাঁর উপরেই নির্ভর করে না, যুগচিত্তের উপরেও করে। ইতিহাসে মহামানবদের যে-চিত্র ফুটে ওঠে তা তাঁর ও সেই সময়ের সংমিশ্রিত পরিচিতি। বর্ণবৈচিত্র্যের ফলেই মহান নায়কদের রূপ ও পসার যুগের দাবিতে আকৃতি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি ও

সাম্যের বাণী একদা সমাজচিত্তে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধের আধ্যাত্মিক আবেদন ও দেশমাতৃকার মন্ত্রমুগ্ধ কল্পনা জনমনে স্থায়ী আসন অর্জন করে। উত্তরকালে তা ভাবাবেগসর্বস্ব, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়।

নির্দেশিকা

১. শ্রীম। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। খণ্ড ৫, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। ২১৪ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কথোপকথনের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ'। ১৯৫৬। ১১১ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উক্তিটি উদ্ধৃত।

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী'। খণ্ড ১, পৃ ১৮৫।

৪. কালীনাথ দত্ত। "বঙ্কিমচন্দ্র", সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৫. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। ১৩৬৪। পৃ ১৯০।

৬. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ১, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। পৃ ৬৬৮। ("ধর্ম্মতত্ত্ব")।

৭. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। পৃ ১৫৮-১৬০।

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র'। ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১১. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃ ১০৩২। (২য় বিজ্ঞাপন, "কৃষ্ণচরিত্র")।

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬৩৩। ("ধর্ম্মতত্ত্ব")

১৩. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। পৃ ১৬০।

১৪. E. R. A. Seligman, ed. *Encyclopaedia of the Social Sciences.* 1959, vol. 5-6, pp. 527-531

১৫. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। পৃ ১৫৯।

১৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৭. ভবতোষ দত্ত। "বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন", অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য'। ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ২৫-৩৩ পৃষ্ঠা।

১৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৯. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড ১০, পৃ ৫৫।

২০. *Bengal Past and Present.* vol. 8, part 2, no, 16, April-June, 1914, p. 279.

২১. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃ ২৪। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ভূমিকায় উদ্ধৃত।

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২২। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। পৃ ৯১।

২৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র'। পৃ ১১৪।

২৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১১২-১১৩।

২৫. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃ ৪৩৩। ("কৃষ্ণচরিত্র")

২৬. Bipin Chandra Pal. *Beginning of Freedom Movement in India.* 1959, p. 52.

২৭. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃ ৪৩৩। ("কৃষ্ণচরিত্র")

২৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৭৬১, ৬৯৩-৬৯৪।

২৯. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র'। পৃ ৪৩।

৩০. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃ ৬৬৬। ("ধর্ম্মতত্ত্ব")

৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৫৪। ("কমলাকান্ত")

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬৫৩-৫৪। ("ধর্ম্মতত্ত্ব")

৩৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬৫৯ ("ধর্ম্মতত্ত্ব")

৩৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৫৯২, ৫৯৪-৫।

৩৬. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। পৃ ১৯০-১৯১।

৩৭. ভবতোষ দত্ত। 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র'। ১৯৬১। পৃ ৬৮-৬৯।

৩৮. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ", সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠা।

৩৯. B. B. Majumdar. *History of Political Thought.* p. 402.

৪০. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। খণ্ড ২, পৃ ৬৭১। ('ধর্ম্মতত্ত্ব')

৪১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬১৯।

৪২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬১৬।

৪৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৪০৬। (উপসংহার, "সাম্য")

৪৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩০১। ("বঙ্গদেশের কৃষক")

৪৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩১৩।

৪৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩১০।

৪৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৯৭-৮।

৪৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩০৭-৮।

৪৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৪০। ("বিবিধ প্রবন্ধ")

৫০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৪০-১।

৫১. Sri Aurobindo. *Bankim - Tilak - Dayananda.* 1955. p. 12.

৫২. Earl of Ronaldshay. *The Heart of Aryavarta.* 1927, p. 114.

৫৩. *Encyclopaedia Britannica.* 1960, vol. 5. ('Chatterji, Bankim-Chandra')

৫৪. B. B. Majumdar, *Militant Nationalism in India.* 1966. Appendix.

৫৫. R. C. Majumdar, ed. *The History and culture of the Indian People.* vol. 10, part 1, *British Paramountcy and Indian Renaissance*, 1965. pp. 908-914.

৫৬. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। খণ্ড ২, পৃ ৬৬১। ("ধর্ম্মতত্ত্ব")

৫৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ১, পৃ ১৬-১৭। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ভূমিকায় উদ্ধৃত।

৫৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ২, পৃ ৫৯৬ ('ধর্ম্মতত্ত্ব')

৫৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ১, পৃ ২২। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ভূমিকায় উদ্ধৃত।

৬০. রেজাউল করীম। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ'। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৮-১৯২৫

এক : ভূমিকা

রামমোহনের আমল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় অবধি এদেশে যে-স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা উত্তরোত্তর বিকশিত হয় তা মোটামুটি দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল : একটি সাংস্কৃতিক, অপরটি রাজনৈতিক। জীবন ও সাধনায় রামমোহন দুটিকেই যুক্ত করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন মডারেট অর্থাৎ নরমপন্থী। আর রাষ্ট্রচিন্তায় ছিলেন উদারনৈতিক নিয়মতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর সেই আদর্শেরই বিস্তার দেখা যায় পরবর্তীকালের রাজনীতিকদের চিন্তায়। উনিশ শতকের শেষাবধি দেশের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যায়ক্রমে মডারেট নেতৃবৃন্দেরই একাধিপত্য ছিল। রানাডে, নৌরজী, ফিরোজ শাহ্ মেটা, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে-শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনীতিকবৃন্দ রামমোহনের মডারেট রাষ্ট্রচিন্তার পরিপুষ্টি সাধন করেন, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের স্থান ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই অনন্যসাধারণ। সারা ভারতের নবজাগ্রত অথচ অসংবদ্ধ জাতীয়তাবোধকে একই 'নেশন'-এর চেতনায় আবদ্ধ করার প্রথম কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথের।[১] তিনি যখন সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন (১৮৭৫) সে সময়ে দেশের সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও দলীয় রাজনীতি ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উক্ত ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখটি ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয়। সেদিন কলকাতার টাউন হলে ফরাসি বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় দুইশতাধিক নাগরিক যোগদান করেছিলেন। আজকের দৃষ্টিতে সেদিনের ঐ সভার তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা হয়তো সম্ভব নয়—কারণ দেশের রাষ্ট্রচেতনার তখন সবেমাত্র শুরু। সে বছরেই বড়দিনে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর অক্টারলোনি মনুমেণ্টে ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা যায়।

রামমোহন ফরাসি বিপ্লবাদর্শের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বিলাতযাত্রার পর বাংলাদেশে দুটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেখা দেয়। প্রথমটি তাঁর চিন্তায় আংশিক-

ভাবে প্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ডিরোজিও-শিষ্যদের দল। দ্বিতীয় দলটি ছিল তাঁর উদারতন্ত্রী ও নরমপন্থী আদর্শের অনুবর্তী। সম্ভবতঃ ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্যরাই মনুমেণ্টে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[২]

হিন্দু কলেজকে (পরবর্তীকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ) কেন্দ্র করে ইয়ং বেঙ্গল দলটি গড়ে ওঠে। তখন রামমোহন দেশেই ছিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ এবং যুক্তিবাদী স্বাধীনচিন্তায় বিশ্বাসী এই দলের দীক্ষাদাতা ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে যে-চারজনের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় তাঁরা হলেন: রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ। দলের দ্বিতীয় সারির অন্যতম ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। আবার সরাসরি ডিরোজিওর শিষ্য না হলেও অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীদের স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তার ফলে সমসাময়িক-কালে তাঁদের প্রতি যথারীতি কুৎসা বর্ষিত হয়। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি ঘটে। যথেষ্ট কুখ্যাতি সত্ত্বেও নব্যবঙ্গ-গোষ্ঠীর সবাই যে নাস্তিক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ধর্ম ও সমাজসংস্কারে তাঁরা অনেকেই বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন।

দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা, বিচারবিতর্ক ও পারস্পরিক সংযোগের এক মিলনকেন্দ্র হিসাবে ডিরোজিও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৮-৩৯) স্থাপন করেছিলেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন ডেভিড হেয়ার। নব্যবঙ্গ দল রামমোহনের আধ্যাত্মিকতা-মিশ্রিত নরমপন্থী রাষ্ট্রদর্শন গ্রহণ করেন নি। তাঁরা রামমোহন-প্রস্তাবিত ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের পরিপন্থী ছিলেন। স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজ-নীতির চর্চা এবং সমাজচিন্তার সুবিধার্থে তাঁরা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৮৩৮)। নব্যবঙ্গ দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) পত্রিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং *The Enquirer* (১৮৩১) পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা থাকত।

দ্বিতীয় যে-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকেই বলা চলে রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার যথার্থ উত্তরাধিকারী। উদারনৈতিক

রামমোহন চেয়েছিলেন নরমপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক ধারায় এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক উন্নতি। ইংরেজদের সমতুল্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে তিনি ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্তি কামনা করেন। লিখিতভাবে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের চিন্তা ডারহাম রিপোর্টে (১৮৪০) প্রথম পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তার অনেক আগেই রামমোহনের মনে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার পরিপুষ্টিসাধনে ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) এবং তৎসূত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫) -এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'নীতি-দর্শন' (১৮৪১) গ্রন্থে স্বাজাত্যবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাম-মোহনের রাষ্ট্রচিন্তার সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৬৮) প্রমুখ শিষ্যবর্গ। রামমোহনের গুণানুরাগী রেভারেণ্ড উইলিয়াম অ্যাডামও ছিলেন এই দলে। গণতান্ত্রিক প্রশাসন, বিচার-পদ্ধতির সংস্কার প্রভৃতি রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠী প্রথম দিকে আলোচনা-সভার আয়োজন এবং সেইসঙ্গে একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশনায় উদ্যোগী হন। দ্বারকানাথ *India Gazette*-এর স্বত্ব ক্রয় করে তাঁর অপর একটি পত্রিকা *Bengal Chronicle*-এর সঙ্গে সেটিকে যুক্ত করে দেন। প্রসন্নকুমার *The Reformer* (১৮৩১) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সুবিধার্থে এই গোষ্ঠী 'Landholders' Society' নামে একটি দল গঠন করেন (১৮৩৮)। বস্তুতঃ উক্ত নামে এই জমিদার-সভাই এদেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে 'ব্রহ্মসভা' ও রক্ষণ-শীলদের 'ধর্মসভা'র বিরোধ স্তিমিত হয়ে পড়ে। উভয় গোষ্ঠীর সমর্থক ও নেতৃ-স্থানীয়রা জমিদার সভায় সংযুক্ত হন। তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের সঙ্গেই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক উন্নতির বিষয়কেও গুরুত্ব দিতেন। এঁরা সর্বভারতীয় সংযোগ ও সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। সমসাময়িককালে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এঁদের সংযোগ ছিল। বিলাতে রাজনৈতিক প্রচারের সুবিধার্থে রেভারেণ্ড উইলিয়াম অ্যাডাম ইংলণ্ডে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন (১৮৩৯)। 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি'র সঙ্গে উক্ত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বিলাতে ভারতীয়দের, বিশেষ করে জমিদার-শ্রেণীর, স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সুবক্তা ও সুপরিচিত রাজনীতিজ্ঞ জর্জ টমসনকে (১৮০৪-৭৮) প্রতিনিধি নিযুক্ত

করা হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। উনিশ শতকে ইংলণ্ডে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতা উইলবারফোর্সের অন্যতম সহকারী ছিলেন টমসন। তিনি সেই কাজে আমেরিকাতেও কিছুকাল আন্দোলন পরিচালনা করেন। রামমোহনের বিলাত ভ্রমণের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দ্বারকানাথ নিজেও প্রচারকার্যের প্রয়োজনে বার-দুয়েক বিলাত-যাত্রা করেন (১৮৪২ ও ১৮৪৪)। বিলাত থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি টমসনকে সঙ্গে এনেছিলেন। দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে ছিল টমসনের সাহায্যে এদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। টমসন কলকাতায় একটি রাজনৈতিক আলোচনাকেন্দ্র গঠন করেন।[৩]

ইয়ং বেঙ্গল দলের রাষ্ট্রচিন্তায় বিপ্লবী মনোভাবের প্রাধান্য ছিল; আধুনিক কালের রাজনৈতিক পরিভাষায় তাঁদের 'বামপন্থী' বলা যেতে পারে। টমসনের প্রভাবে তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎসাহিত বোধ করেন। রামমোহনের নরমপন্থী চিন্তার অনুসারী দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ রাষ্ট্রীয় সংস্কারবাদীদের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের সেতুবন্ধ ছিলেন তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৫-১৮৫৭)। নিজের একান্ত শিষ্য তারাচাঁদকে রামমোহন ব্রহ্মসভার প্রথম কর্মসচিব করেছিলেন। তারাচাঁদের উপর ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। জ্ঞানান্বেষণ-সভায় মধ্যপন্থী তারাচাঁদ ও চরমপন্থী রামগোপালের মিলন ঘটে। প্রধানতঃ তারাচাঁদেরই উদ্যোগে 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৩২-৪৩)। তারাচাঁদের অনুগামীদের 'চক্রবর্তী ফ্যাকশন' বলা হত।[৪] তারাচাঁদ *The Quill* নামে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। টমসনের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রধানতঃ তারাচাঁদের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন (১৮৪৩)। দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' ছিল ধনী অভিজাতসম্প্রদায়ের সমিতিবিশেষ। আর নবগঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' হল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান। ডিরোজিওপন্থী নব্যবঙ্গ দলের বিভিন্ন সভা ও পত্রপত্রিকার ক্রিয়াকলাপ সাধারণতঃ তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমা-বদ্ধ থাকত। বস্তুতঃ টমসনের উপদেশেই তাঁরা উগ্র মনোভাব পরিত্যাগ করে সংঘবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে পদক্ষেপ করেন।

১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখটিও বাংলাদেশের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক

আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয়। এইদিন দেশের প্রথম 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়েছিল।[৫] রক্ষণশীল, উদারতন্ত্রী, চরমপন্থী প্রভৃতি সবাই একই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে নতুন একটি দলে 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' এবং 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সংযুক্তি ঘটে। রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে নবগঠিত এই দলের সচিব ও সভাপতি নির্বাচিত হন।

রামমোহনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, তারাচাঁদ প্রমুখ নরমপন্থী ও উদারতন্ত্রীদের নেতৃত্ব ১৮৪৩ সাল অবধি বিস্তৃত। অতঃপর রামমোহনের চিন্তায় প্রভাবিত কিন্তু সরাসরিভাবে দীক্ষিত নন যাঁরা তাঁদের উপর এই উদারতন্ত্রী ধারার নেতৃত্ব এসে পড়ে। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের তৎপরতা ১৮৬১ সাল অবধি প্রত্যক্ষ করা যায়। তারপর 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার (১৮৭৬) প্রাক্কাল অবধি রামমোহনের চিন্তা ও আদর্শের বাহক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বদ্বর্গ।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শক্তি ও কর্মতৎপরতা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। স্থানিক ভিত্তিতে তার কোনও শাখা গঠিত হয় নি; চাঁদার হার (পঞ্চাশ টাকা) সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ সংস্কারকেরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযোগী একটি গণতান্ত্রিক দলের প্রয়োজন অনুভব করেন।[৬] অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা পর্যটন করে জেলাভিত্তিক কয়েকটি সমিতি গঠন করেছিলেন (১৮৭২)। তাঁর প্রয়াসে ঐ সমিতিগুলির সমন্বয়ে 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় (১৮৭৫)। স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন ছিল লীগের অন্যতম প্রধান দাবি। শিশিরকুমার দলটিকে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস পাল, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, প্রমুখ তদানীন্তন সকল বাঙালী রাষ্ট্রনেতাই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে লীগের অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করে ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই ভারতসভা ('ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন') স্থাপন করেন।[৭]

ভারতসভা প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। যাঁদের উদ্যোগে এই সভার জন্ম তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর

অনুগামীদের প্রয়াসে সভা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শাখা বিস্তার করে। দেশব্যাপী প্রচার-অভিযান ও প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে অবশ্য কেশবচন্দ্রই ছিলেন পুরোগামী। কিন্তু ধর্ম ও সমাজসংস্কার ছিল তাঁর কর্মতৎপরতার সীমানা। সেদিক থেকে সুরেন্দ্রনাথকে সারা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নেতা বলা চলে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে একই নেশনের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার প্রথম প্রয়াসী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রামমোহনের মডারেট ও লিবার‍্যাল রাষ্ট্রচিন্তাকে সুরেন্দ্রনাথ অভিজাতশ্রেণীর মজলিশ থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠায় সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের অনতিকাল পূর্বের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বিচিত্র ঘটনা ও বহুবিধ পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। সিপাহি বিদ্রোহের পরে কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭); প্রথম ভাইসরয় ক্যানিং-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৮৬১); নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০); ওয়াহবি আন্দোলনের সূত্রধরে উত্তর বঙ্গে কৃষকবিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩); হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবর্তনস্বরূপ রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা'র সূত্রপাত (১৮৬৭); 'মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫৬) 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) এবং 'সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনে'র মাধ্যমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাজাত্যবোধের উৎপত্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ শাসনের সঙ্গেই এদেশে 'নেশন' ও 'ন্যাশন্যালিজম' শব্দ দুটির বিস্তৃতি ঘটে। মোগল আমলের শেষ দিকে বহুধা-বিভক্ত ভারতভূমি ইংরেজ শাসনাধীনে সংযুক্ত হয়। ক্রমে টেলিগ্রাফ, রেলপথ প্রভৃতি যোগাযোগব্যবস্থার প্রবর্তন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের মধ্যে মানসিক নৈকট্যের পথ প্রশস্ত করে তোলে। কিন্তু কেবল ভৌগোলিক অখণ্ডতায় নেশন গঠিত হয় না। নেশনের মূল উপাদান দেশবাসীর আবেগসম্পন্ন ঐকাত্ম্যবোধ। রামমোহন থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত ভারতের জাতীয় ঐকাত্ম্যবোধ ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণাঙ্গ নেশনের রূপ দিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে ক্রমে এদেশে জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্র, আধুনিক প্রশাসন, সংসদীয় গণতন্ত্র ও পার্টি রাজনীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে গঠিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অরাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে সুরেন্দ্রনাথ অভিন্ন স্বার্থ ও জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেন। রাষ্ট্র-

চিন্তায় তিনি পশ্চিমী আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই আদর্শকেই তিনি এদেশে রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্র ও মৌলিক কোনও রাষ্ট্রদর্শন রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন নি। একটি গ্রন্থই তিনি লিখেছেন— সেটি হল তাঁর আত্মজীবনী *A Nation in Making*। গ্রন্থাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথের ভাষণগুলি থেকেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন প্রত্যয়ের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম এক রক্ষণশীল পরিবারে। কিন্তু পিতা ছিলেন ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ারের ছাত্র; পিতার ঔদার্যে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা পেলেও সুরেন্দ্রনাথ পারিবারিক ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন না; সারা জীবনেই তিনি মধ্যপথ অবলম্বী ছিলেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শ্রীহট্টে সহযোগী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন (১৮৭১)। কিন্তু মাথা উঁচু রেখে তাঁর পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধীনস্থ ইংরেজ আমলারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি সাজানো অভিযোগ দায়ের করে। এক তদন্ত কমিটির কাছে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। মাসিক পঞ্চাশ টাকার পেনসনে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান— কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়।

দেশে ফিরে এসে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ইংরেজী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন (১৮৭৫)। বছর পাঁচেক পর সে-চাকরি ছেড়ে ফ্রি চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ১৮৮২ সালে তিনি নিজেই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে বড়লাট লর্ড রিপনের নামে সেই বিদ্যালয়টিকে একটি কলেজে পরিণত করেন। দেশের শিক্ষাবিস্তারকল্পে সযত্ন শ্রম ছাড়াও তাঁর প্রভূত অর্থদান উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে আনন্দমোহন বসু 'Students' Association' নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন (১৮৭৫)। সুরেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত হন। বিভিন্ন কলেজে শাখা স্থাপন করে তিনি কলকাতা ও মফস্বলে ছাত্রদের কাছে দেশাত্মবোধক নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শিখ জাতির অভ্যুত্থান এবং ম্যাৎসিনি ও শ্রীচৈতন্যের উপর তাঁর ভাষণ সে সময়ে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সভাগুলিতে বিপিনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ ভাবীকালের বহু মনীষী রাজনৈতিক প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) দশ বছর আগে সুরেন্দ্রনাথের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। শিশিরকুমারের ইণ্ডিয়া লীগে ভাঙন ধরার পর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৬) সুরেন্দ্রনাথকে পুরোধা হিসাবে দেখা যায়। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ বাংলার তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও স্মরণীয়। সে কাজের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। আত্মজীবনী *A Nation in Making* গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য চারটি উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করেছেন: ১. দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন; ২. একই রাষ্ট্রচেতনায় সারা ভারতের ঐক্যসাধন; ৩. হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী স্থাপন; এবং ৪. সকল আন্দোলনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন অর্জন।[৮]

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি জানানোও ছিল ভারতসভার অন্যতম প্রধান কাজ। ভারতসচিব লর্ড সল্‌জ়বেরি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে উনিশে নামিয়ে আনায় সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার প্রতিনিধি হিসাবে সারা উত্তরভারত পর্যটন করে তার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করেন (১৮৭৭)। উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন:

> 'The true aim and purpose of the civil service agitation was the awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of India.'[৯]

সেই আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রথম জয়মাল্য দান করে।[১০] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সেই কাজে সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ঐ সফরকালেই ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লির দরবারে তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর উদ্যোগে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের প্রথম এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ 'Native Press Association' গঠন করেন।[১১]

এর পর সুরেন্দ্রনাথকে আরও দুটি বৃহৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে দেখা যায়। সে-দুটির উদ্ভব ঘটে ভাইসরয় লর্ড লিটনের আমলে (১৮৭৬-৮০)। ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আইনের সাহায্যে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচন এবং ১৮৭৯ সালে ভারতে ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে 'আর্মস অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ

করার ফলে দেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়। লর্ড রিপনের আমলে (১৮৮০-৮৪) প্রেস আইন রদ করে দেওয়া হয়। আমলাতন্ত্রের নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ক্রমেই তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। জনমত গঠনের সুবিধার্থে ১৮৭৯ সালে 'বেঙ্গলী' নামে একটি পত্রিকার স্বত্ব তিনি কিনে নেন। দীর্ঘকাল তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কারের (১৯১৯) পর তিনি পত্রিকাটির সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে পত্রিকাটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সমসাময়িককালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন (১৮৮৩)। জনদরদী রিপন তাঁর আইন সচিব সার কার্টনি ইলবার্টকে দিয়ে দেশীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচারের অধিকার দেবার জন্য একটি বিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপন করেন। বিলটি পেশ হওয়া মাত্র দেশের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা সেই বিলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং তার ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি অর্থভাণ্ডার গঠন করে। বিলটি অবশ্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ইউরোপীয়ানদের আচরণে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে যথারীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারতীয় স্বাজাত্যবোধকে আরও জাগ্রত করে তোলে। সুরেন্দ্রনাথও ইউরোপীয়ানদের অনুকরণে একটি জাতীয় অর্থভাণ্ডার খোলেন। জাতীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব এর আগে উঠে থাকলেও সংঘবদ্ধ প্রয়াস তাঁর নেতৃত্বেই এই প্রথম দেখা যায়। অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> 'The main object, therefore, is to bring the Government of the country into harmony with national aspirations...we are anxious to have provincial self-government. We desire Parliamentary Institution'.[১২]

সুরেন্দ্রনাথ প্রতি মহকুমাতে কমপক্ষে একটি করে কেন্দ্রের অধীনে গ্রামের মণ্ডলদের সহায়তায় গ্রামপিছু একটি ও শহরগুলির প্রতি পাড়া থেকে একটি করে টাকা সংগ্রহ করে অন্যূন ছ-লক্ষ টাকার একটি ভাণ্ডার গঠনের আবেদন করেন এবং দেশের আইনজীবীদের তিনি এই অর্থসংগ্রহ অভিযানে অগ্রণী হতে আহ্বান জানান। তবে সেই সঙ্গে চাষিমজুর, দোকানি-পসারিদের সাহচর্যও কামনা করেন। বস্তুতঃ দেশের রাজনীতিতে এতদিন জমিদার ও বিত্তবানদের

আধিপত্য চলেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাতে নির্ধন সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটালেন।

ইলবার্ট বিলের উত্তাপ প্রশমিত হবার আগেই আবার এক তীব্র জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। বেঙ্গলী পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশের দরুন আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ দু-মাস কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর ইলবার্ট বিল আন্দোলনসূত্রে গঠিত জাতীয় অর্থভাণ্ডার নবোদ্যমে সম্প্রসারণ ছাড়াও কলকাতায় ভারতসভার উদ্যোগে[১৩] প্রথম এক সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের (Indian National Conference) তিনদিনব্যাপী অধিবেশন হয় (১৮৮৩)। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে যে বছর বোম্বাইতে কংগ্রেসের জন্ম হয়। দেশের নবজাগ্রত জাতীয় উদ্দীপনা ক্রমে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়। ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত ভ্রমণে যান। সর্বত্রই তিনি অভূতপূর্ব সংবর্ধনা লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৪-১৯০৬) সভাপতিত্বে বোম্বাই কংগ্রেস ও অক্টেভিয়ান হিউমের (১৮২৯-১৯১২) সভাপতিত্বে মাদ্রাজে অনুরূপ এক সম্মেলন হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় তিনটি প্রয়াস সমন্বিত হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

কংগ্রেস সংগঠন ও তার নিয়মকানুন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল সজাগ। কংগ্রেসকে দৃঢ়ভিত্তি করার জন্যে তিনি যুগপৎ নিচ ও উপর উভয় পর্যায়েই আন্দোলন পরিচালনার জন্যে প্রাদেশিক সম্মেলনের সূত্রপাত (১৮৮৮) করেন।

স্বায়ত্তশাসনকে তিনি উদীয়মান রাজনৈতিক নেতাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রথম পাঠ বলে মনে করতেন ; তাঁর মতে স্বায়ত্তশাসনই গণতন্ত্রের তৃণমূল। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৯ সাল অবধি তিনি স্বয়ং পৌরসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারতসভার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার জন্যে আন্দোলন শুরু করা হয়। ছোটলাট আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির কলকাতা পৌরসভার আমলাতান্ত্রিক সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় ও তার বাইরে তীব্র জনমত সৃষ্টি করেন। তখন ছিল লর্ড কার্জনের আমল (১৮৯৯-১৯০৪)। সুরেন্দ্রনাথের বিরোধিতা ফলপ্রসূ হয় নি। ম্যাকেঞ্জি বিল গৃহীত (১৮৯৯) হবার চব্বিশ বছর পরে সুরেন্দ্রনাথ পূর্বের সে-পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন, যে-সময়ে তিনি বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তখন তিনি স্বায়ত্তশাসন আইনের আমূল সংস্কারসাধন করেন।

রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই দেশের প্রশাসনিক

ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জন্যে তৎপর হন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে যথোচিত প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্যে তিনি নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যান। কংগ্রেস থেকে ১৮৯০ সালে আর. এন. মাধোলকর, আর্ডলি নর্টন, অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের অনুকূলে সেখানে জনমত সৃষ্টিই ছিল ঐ দলের উদ্দেশ্য।

১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০১ সাল অবধি তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। আইনসভার মাধ্যমেই দেশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায় করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। জনপ্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি অবিরাম সমালোচনা ও আন্দোলন চালিয়ে যান। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি তাঁর তথ্যবহুল ভাষণগুলিতে প্রতিফলিত হয়। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রশাসনিক অর্থব্যয় সম্পর্কে ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ১৯০১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি আমলাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করেন। তবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অসহযোগ নীতিকে জনমনে সঞ্চারিত করতে চান নি। কারণ তখন তিনি মনে করতেন যে ঐ-নীতি গ্রহণ করলে সরকারের উৎপীড়ন বেড়ে যাবে। তাঁর মতে : 'a single unwary step will land us to a setback'.

মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসমাবেশে ছাত্রদের রাজনীতিচর্চা প্রসঙ্গে এক প্রচণ্ড বিতর্ক হয় (১৮৯৪)। থাপার্দে ও মালব্য ছাত্রদের রাজনীতিচর্চা না করাই উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে, ছাত্ররা রাজনীতিচর্চা করবেই, তাদের আটকানো যাবে না, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজেও ছাত্ররা রাজনীতি করে থাকে। দেখতে হবে শুধু, তারা যাতে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। সমসাময়িককালে যুবকদের মধ্যে অপরের মতামতে অসহিষ্ণুতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশীয় আদর্শের প্রতি যে-অবজ্ঞার মনোভাব লক্ষিত হয় তার তিনি নিন্দা করেন। আশাবাদী সুরেন্দ্রনাথ মনে করতেন ছাত্রদের সাময়িক অশিষ্ট উদ্দামতা অচিরেই নিবারিত হবে। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ্, সেজন্যে যুবকদের মতিগতি সঠিক অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন; ছাত্রদের মঙ্গলচিন্তা তাঁর নানা কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে বহু সময়ে ফুটে উঠেছে।

কংগ্রেসের জন্ম কিছুটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই হয়েছিল, তবে কংগ্রেসের শৈশব-

কাল থেকেই সুরেন্দ্রনাথ তার একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১৮৯৫ সালে পুনায় এবং ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। মডারেট দলভুক্ত হলেও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময়ে (১৯০৫) তিনি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ছলচাতুরীতে অধৈর্য হয়ে চরমপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকালে সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রবল বিরোধিতার ফলে তাঁকে সরকারি মহলে 'Surrender not Banerjea' আখ্যা দেওয়া হয়। বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনের সময়ে জনচিত্তে বিদেশীদের প্রতি জাতিবিদ্বেষের ভাব যাতে সঞ্চারিত না হয় সে বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। স্বদেশী ব্যবসায়-বাণিজ্যের পত্তন ও প্রসারে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। এই সময়ে দেশে যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার উদ্ভব ঘটে তাতে তাঁর আদৌ সমর্থন ছিল না; তবে সেজন্যে তিনি ইংরেজ শাসকদের দোষী করেন। ১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে তাঁর নরমপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশে একদল প্রবল সমালোচনা শুরু করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেবার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।[১৪]

মডারেট বা নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতেন। কলকাতা কংগ্রেসের (১৯০৬) পর থেকে ঐ দুটি দলের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার কিছুকাল পরে মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে উভয় দলের বিরোধ চরম আকার ধারণ করলে তিনি দুদলের মধ্যে আপসের চেষ্টা করেন। সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) ঐ-বিরোধ কংগ্রেসের ভাঙন সৃষ্টি করে। চরমপন্থীরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অপসৃত হন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন কর্তৃপক্ষের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; ফলে লালা লাজপৎ ও বিপিনচন্দ্রকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করা হয়; অরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান এবং টিলক কারারুদ্ধ হন। চরমপন্থী দলের যেমন অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি নরমপন্থী চালিত কংগ্রেসও হীনবল হয়ে পড়ে; দমনমূলক আচরণে দেশের রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯১০ সালে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে যান। তার আগের বছরই মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

সেই সংস্কার তিনি সর্বাংশে সমর্থন করেন নি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আইন রদ হয়ে গেলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করেন (১৯১৩-১৯১৬)।

লখনৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) নরম ও চরমপন্থী দলের মিলন ঘটে। তার কিছু-কাল পরে অ্যানি বেসান্টের উপর অন্তরীন আদেশ জারি হওয়ায় কংগ্রেসে 'Passive Resistance'-এর প্রস্তাব ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ সে-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কারণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনও তাঁর মন থেকে যায় নি। তিনি তখন বলেছিলেন :

> 'Passive resistance could not succeed unless there was a over-whelming body of public feeling behind it and there were many who would be willing to suffer for the cause which had provoked it. We were not sure that these conditions existed in the present case.'[১৫]

সুরেন্দ্রনাথের এ-দূরদৃষ্টি উত্তরকালে গান্ধীও উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে। মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার (১৯১৯) নিয়ে উভয় দলের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। রাজদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ 'রৌলট বিল' কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিধিবদ্ধ করার প্রতিবাদে সারা দেশে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় এবং সেইসূত্রে ঐ বছর এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ নীরব থাকেন। ঐ বছরেই বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের পর মডারেটরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নভেম্বরে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে তাঁদের এক স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মডারেটরা ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ভারত-শাসন (১৯১৯) বিল সম্পর্কে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে তিনি সাক্ষ্যদান করেছিলেন এবং ঐ বিল সমর্থনও করেন। ১৯২১ সালে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর যশ ও জনপ্রিয়তা তখন অস্তমিত। ১৯২৩ সালের কাউন্সিল নির্বাচনে স্বরাজ দলের প্রার্থী রাজনীতিতে নবাগত বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি পরাজিত হন। ১৯২৫ সালে জনচিত্তের অন্তরালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

দুই : ইতিহাসচিন্তা

সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ দার্শনিক-কবি টেনিসনের উল্লেখ করে বলেছেন, তিনিও টেনিসনের এই মতে বিশ্বাসী যে-ইতিহাসের রথচক্র বিবর্তনের পথে আবর্তিত হয়; সেই যাত্রাপথের প্রতিটি পর্যায়েই পদক্ষেপ করতে হয়; লাফ দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানো যায় না; তাই অবস্থার সঙ্গে আদর্শের সংগতি থাকা চাই। প্রকৃতি ও মানবেতিহাসের উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই নীতির বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন :

> 'In nature as well as in moral world there is no such thing as a cataclysm. Evolution is the supreme law of life and of affairs. Our environments, such as they are, must be improved and developed, stage by stage, point by point, till the ideal of the present generation becomes the actual of the next.'[১৬]

তাঁর মতে ইতিহাসের গতি ঐশ নির্দেশে নির্ধারিত। দিব্য নির্দেশে প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে থাকে একটি শুভ উদ্দেশ্য। তাই ইউরোপে রোমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গেই সেখানকার আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় সভ্যতার আলোকপাত এবং পরে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। সেই দৃষ্টিতেই ইংরেজ শাসনকে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের মতো তিনিও ঐশ অভীপ্সা বলে মনে করেন : 'British rule as providential, as one of the dispensations of the God of History'।[১৭] ১৮৫৮ সালের রাজকীয় ঘোষণাকে তিনি ভারতের জয়টিকা ও তার রাজনৈতিক নবজন্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। ইংরেজের ভারত-শাসনকে তিনি তিনটি দিক থেকে দেখেছিলেন : ১. ভারতীয় সমাজের পক্ষে অশুভজনক অবস্থার মূলোচ্ছেদ। ২. ভারতীয় চরিত্রে আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং পুরুষোচিত কর্মশক্তির সঞ্চার; ৩. ভারতে স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির প্রবর্তন।[১৮]

তাঁর মতে মানবসভ্যতা পুব থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিল। এখন পশ্চিমকে তার দেনা শোধ করতে হবে। সে-দেনা পরিশোধ শুধু চিন্তার স্তরে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা নয়—ভারতীয়দের রাজনৈতিক ভোটাধিকার দানের মধ্যে দিয়ে তা মেটাতে হবে।

টেনিসনের মতানুযায়ী তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শোণিত-চিহ্নিত পথে

মানবসভ্যতা ও প্রগতির রথ এগিয়ে চলে। আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানে রক্তপাত ঘটেছে প্রচুর; কিন্তু তারই ফলে প্রতীচ্য প্রাচ্যের জ্ঞানবিদ্যার আস্বাদ লাভ করেছিল, প্রাচ্যের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণমূলক দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রতীচ্যের মননধারা বিকশিত হয়। তিনি লিখেছেন:

> 'Observation and experiment were now to regulate Western science, as they had before regulated Eastern science. The blood therefore that was shed in the Greek expedition was not shed in vain...out of that blood, out of that treasure, there arose the proud fabric of European science.'[১৯]

ভারতীয় ঐতিহ্য এবং অতীত দিনের সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ভারতের গরিমাকে তিনি তুলে ধরেন। ব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, শংকর, পাণিনি ও পতঞ্জলির অবদান তাঁর কাছে মহাগৌরবের বিষয় ছিল।[২০] বিশ্বের সকল ধর্মকেই ভারতমাতা তাঁর কোলে স্থান দিয়েছেন বলে ভারত প্রাচ্যের এক পবিত্র পীঠস্থান। তিনি দেশের যুবমানসে নৈতিক নবজীবন সঞ্চারকল্পে আদর্শের উৎসস্বরূপ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারার মহত্ত্ব অনুধ্যান করার উপদেশ দেন; ভারতীয় ইতিহাস মানুষকে কালজয়ী আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয়; তার আধ্যাত্মিক ভাবধারায় হতাশা, নৈরাশ্য ও প্রতিপক্ষের প্রতি বৈরী মনোভাব জয় করা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের বহু বিষয়ই কালের প্রবাহে অকার্যকর ও অচল হয়ে গেলেও ভারতের লিপিবদ্ধ চিন্তার ভাণ্ডার এখনও প্রাচুর্যে পূর্ণ; বর্তমানে প্রাচীন মননশীল সাধনার অনুবর্তন যদি সম্ভব না হয়, তাহলে নীতিনিষ্ঠ চিন্তা ও আদর্শের রূপায়ণপ্রচেষ্টা দেশের নব-উজ্জীবনের পক্ষে অনুকূল হবে।

মানবহৃদয়ে উদারতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ তাঁর মতে দিব্য প্রভাব -সঞ্জাত। উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন যে শাক্ত ধর্মের নিষ্করুণ কঠোরতার প্রতিষেধক হিসাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রবেশ করেছে, শ্রীচৈতন্য বাংলা-দেশের ঐক্য ও সর্বধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তাই শ্রীচৈতন্যের আদর্শেই তিনি দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। তাঁর মতে রামমোহনের মনন ও জীবনাদর্শ যেমন পশ্চিমের ভাবধারায় গঠিত তেমনি শ্রীচৈতন্যও মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রভাবিত।[২১] প্রতি যুগন্ধর ব্যক্তির মানসে সমকালীন কৃষ্টি ও চিন্তা-অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই ব্যক্তি সমসাময়িক চিন্তা ও প্রভাবকে অতিক্রম করে

সমাজকে উন্নত ভাবধারায় চালিত করেন ; এবং সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি জনজীবনের প্রতিটি বিষয়কে উৎকৃষ্ট করে তোলেন।[২২]

তিন : রাষ্ট্রদর্শন

সুরেন্দ্রনাথ সমকালীন মডারেট রাজনীতির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। মডারেট রাষ্ট্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য যে, তাতে রাষ্ট্রশক্তির মূলে ন্যায়নীতির প্রশ্নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই। হিংসাত্মক বলপ্রয়োগকে তৎকালীন মডারেটরা অশুভ পন্থা বলে মনে করতেন ; কারণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে তা মনে এমন এক ক্ষতের সৃষ্টি করে যা সারিয়ে তুলতে যুগযুগান্তর কেটে যায়। তাই তাঁরা বলদর্পী সরকারের পরিবর্তে নীতিনির্ভর রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। গ্ল্যাডস্টোনের বাণী তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল : 'Liberalism was trust in the people, tempered with discretion'। সেজন্য তাঁরা নিরন্তর জনমতের অগ্রাধিকারের দাবিতে মুখর ছিলেন। রোমের ইতিহাস উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে জনসাধারণের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিত স্বীকৃতিদানই রোম সাম্রাজ্যবিস্তারের মূল কারণ। জনমতকে উপেক্ষা করা শাসক ও শাসিত—উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকার অপেক্ষা জনমতই বিচারের উপযুক্ত অধিকারী ; জনমতকে সরকারের ভাগ্য-নিয়ন্তা বলা ভাল। ক্ষমতাবান গোষ্ঠী অপেক্ষা জনমত বহুলাংশে অধিক বলীয়ান, নিষ্কলুষ ও মহান।[২৩] এখানে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের নজির তুলে দেখিয়েছেন যে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা দলীয় শাসন জনমতের বিপরীতে যাওয়ায় বহু সময়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। জনমতকে তিনি দিব্য অভিপ্রায় বলে মনে করতেন। জনসেবাই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সাধনা। মানুষের প্রগাঢ় প্রেম ও আনুগত্যের ভিত্তিতে রচিত দেশ-শাসনের পিছনে তাই জনমনের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ থাকা দরকার। তাঁর মতে বিশ্বাস থেকেই বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায় ; ইংরেজরা ভারতীয়দের অবিশ্বাস করলে সেটা তাদের ভীরুতার পরিচয় দেবে। শাসিতদের বিষয়ে তাঁরা সাবধানতা অবলম্বন করুন ; কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের মনে তা যেন অনর্থক সন্দেহ ও

বিদ্বেষ সঞ্চার না করে। তাহলে সেটা অধর্ম হবে।[২৪] রাজনীতিকে সুরেন্দ্রনাথ কেশব-বঙ্কিমের মতোই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে রাজনীতি মানুষের কাছে আত্মশুদ্ধিকারী ও নীতিনিষ্ঠ আদর্শের উৎস :

'.. Politics based upon religion or deep moral earnestness is the one thing that is needful for this country. Politics divorced from a high moral purpose becomes the paltry squabble for power in which humanity can feel no interest.'[২৫]

সিসেরো ও বার্কের আদর্শে তিনি রাজনৈতিক শক্তির বনিয়াদস্বরূপ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মেকিয়াভেলির 'reason of state' নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের দমনমূলক ক্ষমতার তিনি বিরোধী ছিলেন। পুনা কংগ্রেসে (১৮৯৫) সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

'I desire to place the moral consideration in the forefront; that which is morally indefensible cannot be politically expedient. Politics divorced from morality is no politics at all.[২৬]

সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ইতালির দার্শনিক জননেতা জুসেপ্পে মাৎসিনির (১৮০৫-১৮৭২) চিন্তায় প্রভাবান্বিত। মাৎসিনির আত্মত্যাগ, সহৃদয় নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মাৎসিনি আত্মবিকাশ ও আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাসী ছিলেন।[২৭] সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ইতালির এই মুক্তি-সংগ্রামী অধিনেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশোন্নয়নের কণ্টকময় পথে এগিয়ে যাবার জন্যে উৎসাহিত করেন। পরবর্তীকালে অরবিন্দ, লাজপৎ রায়, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বহু নেতাই মাৎসিনিকে আদর্শ করেছিলেন। দেশপ্রেম ও ঈশ্বরাসক্তিকে সুরেন্দ্রনাথ প্রেরণার উৎস বলে মনে করতেন। পুণা কংগ্রেস ভাষণে বলেছিলেন :

'Where will you find better models of courage, devotion and sacrifice; not in Rome, not in Greece, not even in France in the stormy days of the revolution — courage tempered by caution, enthusiasm leavened by sobriety, partisanship softened by a large-hearted charity — all subordinated to the one predominating sense of love of country and love of God'.[২৮]

মাৎসিনি প্রদর্শিত দুটি আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমতঃ, দেশের

রাজনৈতিক অভ্যুন্নতির বনিয়াদস্বরূপ সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও উন্নত নৈতিক মান—সেজন্যে চাই সদাচার ও নির্মল চরিত্র। দ্বিতীয়তঃ, দেশের জন্য সর্বসাধারণের গভীর অনুরাগ এবং জাতীয় আবেগ; শেষোক্ত আদর্শটি 'নেশন' শব্দের মূল উপাদান। সুরেন্দ্রনাথ মাৎসিনির বিপ্লবাদর্শের দিকটি গ্রহণ করেন নি। তিনি মনে করতেন, ধর্মজিজ্ঞাসা থেকেই রাষ্ট্রচেতনার উৎপত্তি। তাঁর মতে:

> 'History teaches us the great truth that, when the spirit of enquiry has once been called forth into play in the field of religion, it is sure to vent itself in other spheres of activity and to display its energies in matters relating to the government of the country.'[২৯]

এই মন্তব্যের সমর্থনে নজিরস্বরূপ তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার মূলে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন এবং সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টাকে দেখিয়েছেন।

বার্ক, মেকলে, মিল, স্পেনসার প্রমুখ ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিকদের রচনাবলী তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় যে উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায় তা ঐ সব দার্শনিকদের চিন্তায় প্রভাবিত। ইংলণ্ডে ছাত্রজীবনে সেখানকার ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতন্ত্র ও যুক্তিমুখী চিন্তা তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। কব্ল, পীট, শেরিডান ও বার্কের বাগ্মিতায় তিনি অনুপ্রাণিত হন। বার্কের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী ও নিয়মতান্ত্রিক আদর্শের তিনি অনুরাগী ছিলেন; পুনা কংগ্রেস ভাষণে বার্কের প্রশস্তি করেছিলেন এই বলে: **'A heaven-appointed Conservative—one made so by the Hand of Nature'**। বার্কের রক্ষণশীলতার মধ্যে তিনি সংকীর্ণতার পরিবর্তে এক দার্শনিক দেশপ্রেমিকের রূপ দেখতে পান। পুনা ভাষণেই তিনি বার্কের একটি চিঠির সপ্রশংস উল্লেখ করেন, যাতে বার্ক একবার ব্রিস্টলের নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে পার্লামেণ্ট-প্রতিনিধির উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার (mandate) নীতির নিন্দা করেছিলেন।

ইংলণ্ডের সাংবিধানিক ঐতিহ্যে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শও তাঁর মনকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তাঁর মতে সপ্তদশ শতকে পিউরিটান বিপ্লব এবং বিনা রক্তপাতে বিপ্লব সাংবিধানিক স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মিলটন, হ্যারিংটন লক প্রমুখ কবি ও দার্শনিক মুক্তির সংগীতকে চিরন্তন রূপ দিয়েছেন। বিলাতের

এই গৌরবোজ্জ্বল সাংবিধানিক ঐতিহ্যের বীজ তিনি ভারতে আনয়ন ও বপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমসাময়িককালে যে-সব ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ভাবতেন, তাঁদের চিন্তা ও প্রয়াস কার্যকর হলে, ইংরেজরা সহজেই ভারতীয়দের সহৃদয় অনুরাগ, সন্তোষ ও আনুগত্য অর্জন করবে বলে তিনি মনে করতেন।[৩০]

ভারতীয় নেশনের রূপকার সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ থাকলেও নৈতিক, মননশীল ও সামাজিক একতার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় এক জাতীয় চেতনা অনায়াসে সৃষ্টি করা যায়। এ-প্রসঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি ও বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে তিনি একথাও মনে করতেন, কোনও জাতির অধঃপতন ঘটলে দিব্য নির্দেশেই তার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। সেই নির্দেশেই গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনির নেতৃত্বে ইতালির বিভেদ ও অনৈক্য দূরীভূত হয়েছিল। সাহিত্য শিল্প দর্শনে ইতালির মতো ভারতও একদিন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। যে-রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাবে ভারত ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি সে-অভাবটুকু ইংরেজরা এসে মিটিয়ে দিয়েছে :

> 'If, at this moment, happily the sentiment of brotherhood has been universally evoked in the minds of the Indian races, it is because under the auspices of British rule, the varied and diversified peoples that inhabit this country have been welded together into a compact and homogeneous mass.'[৩১]

ভারতের জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবিধানে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে ইংরেজী ভাষা, যার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার বিনিময় ঘটেছে; ইংরেজরা রেলপথ বসিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে অত্যন্ত নিকট করে দিয়েছে; তারা মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করে এদেশের মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ দিয়েছে। এক সময়ে আকবর, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রমুখ সাধকেরা ভারতে জাতীয় ঐক্যের সাধনা করে গিয়েছেন— কিন্তু সে-সাধনা দীর্ঘস্থায়ী অথবা কার্যকর হয় নি।[৩২]

ভারতীয় জনমনের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধিকার লাভের একমাত্র পন্থা হিসেবে জাতীয় ঐক্যকেই তিনি বড় করে দেখেন। সেজন্যে তিনি চাইতেন দেশবাসী যেন ঈশ্বরসমক্ষে নিজেদের ভেদাভেদ ত্যাগ করে বিশেষ

কোনও সংস্থাধীনে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য শপথ গ্রহণ করে। তাঁর মতে ভারতের ঐক্যবিধান শুধু যুক্তিনির্ভর হলেই চলবে না, তার পশ্চাতে ভাবাবেগও থাকা দরকার। ভারতীয় ঐক্যের জন্য চাই তার গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনি; তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে তার সার্বজনীন জীবনদেবতার শাশ্বত বাণীকে সমুন্নত রাখতে হবে। ঐক্যের মধ্যেই ভারত নবজীবন লাভ করবে।

ভারতের আগামী দিনের গৌরব ও ঔজ্জ্বল্যে সুরেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। তিনি মনে করতেন, ভারতের শাশ্বত বাণীকে তখনই আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা সম্ভব যখন ভারত স্বাধীন সত্তা অর্জন করবে। এ-বিরাট দায়িত্ব সম্পাদনে চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, অদম্য অধ্যবসায় ও অটল আত্মবিশ্বাস— সেই পথেই ভারতের অভ্যুন্নতি ও পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে। বৈষয়িক উন্নতির প্রথম সোপান রাজনৈতিক স্বাধিকার; ভোটাধিকারে বঞ্চিত মানুষের জীবনে অর্থ-নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে না। ভোটাধিকার মানুষের একটি 'জন্মগত দাবি' এবং মনুষ্যত্বের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের মানদণ্ড। ১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত লখনৌ কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উত্থাপনের সময় তিনি বলেছিলেন:

> 'Political inferiority involves moral degradation...A nation of slaves would never have produced a Patanjali, a Buddha or a Valmiki. We want self-government in order that we might wipe off from us the badge of political inferiority and lift our heads among the nations of the earth and fulfil the great destinies that are in store for us under the blessings of Divine Providence.'[৩৩]

ঐ ভাষণে তিনি বলেন, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের তাগিদ বৃহত্তর বৈশ্বিক মানবকল্যাণের দিক থেকেই অধিক অনুভূত হয়েছে। মানবসভ্যতার প্রত্যুষে ভারত মানুষকে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু মানবসমাজের কাছে ভারতের সেই 'মিশন' আজ অনুপস্থিত। সুরেন্দ্রনাথ সেই 'মিশন'কে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন:

> 'It is our mission to become once again the spiritual guides of mankind, but we cannot fulfil that mission unless and until we ourselves are emancipated, we ourselves are free.'[৩৪]

তাঁর দৃষ্টিতে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুধু রাজনীতির চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ

নয়, তার নৈতিক ও ধর্মীয় ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হবে বলে তিনি আশা করতেন। স্বায়ত্তশাসন ঈশ্বরের এক পবিত্র বিধান। তাঁর কথায় :

'Every nation must be the arbiter of its own destinies—such is the omnipotent fiat inscribed by nature with her own hands and in her own eternal book.'[৩৫]

১৯১৬ সালে ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক প্রেরিত বিখ্যাত 'Memorandum of the Nineteen'-এ সুরেন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই স্মারকপত্রে ভারতীয়দের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সরকার গঠনের কথা বলা হয়। পশ্চিমী সমাজের মুক্তির মন্ত্র সুরেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী ভাষণে ধ্বনিত হয়— যা এককালে প্রকারান্তরে দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের চিন্তায় দেখা গিয়েছিল। মডারেটদের মধ্যে প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথ এবং কিছুটা রানাডের কণ্ঠেই প্রাচীন ভারতের গৌরবগীতি নিনাদিত হয়। দাদাভাই নৌরজি বা ফিরোজ শাহ মেটার চিন্তায় এ-দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। ভারতের জাতীয় ঐক্যের জনক সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন না। এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৮৮৮) তিনি বলেছিলেন : 'We have no wish to assume sovereign authority'।[৩৬] তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষপুটে চেয়েছিলেন শান্তি, সমৃদ্ধি, সুবিচার ও সমানাধিকার। তবে ইংরেজ শাসনকে তিনি চিরস্থায়ীরূপে চান নি। নিজেই বলেছেন :

'Self Government is the ordering of nature, the will of Divine Providence. Every nation must be the arbiter of its own destiny.'[৩৭]

তিনি মনে করতেন যে যোগ্যতা অর্জন করলে ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হবে। প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সুরেন্দ্রনাথকে কোনদিনই স্পর্শ করে নি। তদানীন্তন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে অন্যান্য অগ্রসর সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্যেও তিনি যথোচিত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কথায় :

'The progress of India does not mean the progress of the Hindus alone. It means the advancement of Hindus and Mohamedans alike. It means that Hindus and Mohamedans must march hand-in-hand.'[৩৮]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রাজনীতির বিচার ব্যাখ্যা করলেও তিনি ধর্মের সঙ্গে

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণ ঘটান নি। এটি আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক ধারায় তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিপিনচন্দ্র পাল অভিযোগ করেছেন :

'সুরেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম্মই তারা বোঝে, ধর্ম্মের নামেই তারা মাতে, ধর্ম্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব। অথচ সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজ পর্য্যন্ত মোক্ষ সম্পর্ক বিহীন হইয়া পড়িয়া আছে।'[৩৯]

সুরেন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান করেছেন। সেটা এই যে স্বদেশী আন্দোলন নিছক একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনই শুধু নয়—গণশক্তি ও উদ্যমকে মুক্তি দেবার এ এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন। তিনি বলেছেন :

'Swadeshism does not exclude foreign ideals or foreign learning or foreign arts and industries, but insists that they shall be assimilated into the national system, be moulded after the national pattern and be incorporated into the life to the nation. Such is my conception of Swadeshism.'[৪০]

তাঁর মতে বহুমুখী জাতীয় কর্মতৎপরতার মূলাধার হবে স্বাদেশিকতা, জনচিত্তে অচিরাৎ উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই পন্থা উদ্ভাবিত। দেশপ্রেমের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি হল স্বাদেশিকতা, কোনও কিছুর বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ নেই।

চার: আর্থনীতিক চিন্তা

নৌরজি, গোখলে বা রমেশ দত্তর মতো সুরেন্দ্রনাথও ভারতের অর্থনৈতিক দৈন্য ও অবক্ষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি অনুভব করতেন যে অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের ফলে ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯০২) সভাপতির ভাষণে তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবনতির প্রতিকারস্বরূপ পাঁচটি পন্থা উত্থাপন করেন: ১. ভারতের প্রাচীন উৎপাদন শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং সেইসঙ্গে নূতন শিল্পের প্রবর্তন। ২. জমির খাজনা নির্ধারণে এমন এক নরম পন্থার প্রয়োগ, যার দীর্ঘস্থায়ী ফলাফলে চাষী যেন নিগৃহীত না হয়। ৩. দরিদ্র করদাতার ক্ষেত্রে প্রতিকূল কর ও খাজনার হ্রাস। ৪. প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতীয় ধনের নিষ্কাশন (drain) ও অবক্ষয় রোধ করা। ৫. কর্মসংস্থানকালে মোটা বেতনভুক্ত বিদেশীদের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ।[৪১]

তৎপূর্বে পুনা কংগ্রেসের (১৮৯৫) তথ্যবহুল ভাষণেও তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের বাজেটকে এক মস্ত তামাশা বলে অভিহিত করেছিলেন। আমলাতান্ত্রিক অভিসন্ধি অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করা হয়—ভারতীয়দের রক্ত-শোষা অর্থে ইংরেজের সামরিক অভিযান, তাদের বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক দপ্তরের ব্যয়নির্বাহ ইত্যাদি হয়ে থাকে। জনসাধারণের অর্থে সরকারের নানাবিধ অপব্যয় এবং গ্রীষ্মকালে সরকারি দপ্তর শৈত্যাবাসে স্থানান্তরিত করার প্রচলিত রীতির উপর তিনি তীব্র কশাঘাত করেন। নৌরজি, গোখলে, রমেশ দত্তর সুর তাঁর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়: 'The Home charges constitute a serious drain, and add to the ever-increasing poverty of the country.'[৪২] ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। অবারিত মাদকব্যবসায় থেকে সরকারের বিপুল শুল্ক আদায় হয়ে থাকে, অথচ শিক্ষাবাবদ ব্যয়নির্বাহে সরকার যে কিরূপ নিস্পৃহ—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের এক তুলনামূলক বিবরণ ও তথ্যের সাহায্যে তা তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে দেশে বারংবার দুর্ভিক্ষের কারণ শাসকদের অব্যবস্থা ও অকর্মণ্যতা।[৪৩]

দেশের শিল্পোন্নয়নকে খর্ব করে শুধু কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করার তিনি বিরোধী ছিলেন। বিদেশীদের একচেটিয়া অধিকার ও সুবিধা দেওয়া এবং

অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই তিনি স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশ্য কৃষিকর্মের গুরুত্বকে তিনি উপেক্ষা করেন নি ; ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, খাজনা হ্রাস ইত্যাদি পন্থা অবলম্বনের জন্য তিনি দাবি জানান। এছাড়া বেকারসমস্যা ও আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্য তিনি উপযুক্ত কর্মসংস্থান, সেনা- ও পুলিশ-বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাদি সুপারিশ করেন। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তবে উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধিকারী ইংরেজের কাছ থেকে তিনি ভিন্ন আচরণ আশা করতেন। আহমেদাবাদ ভাষণেই বলেছিলেন :

> 'I would welcome an Imperialism which would draw us nearer to British by the ties of a common citizenship and which would enhance our self-respect by making us feel that we are participators in the priceless heritage of British freedom.'[৪৪]

ব্রিটিশ ইতিহাসের নজির দেখিয়ে তিনি বলেন যে, বাষ্প-চালিত যন্ত্রের উদ্ভব ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতি ঘটে। হৃষ্টচিত্তে তখন তারা অধিকতর আর্থিক সুবিধার্থে ভোটাধিকার দাবি করে। রাজনৈতিক মুক্তি ও অধিকারের কথা তখনই তাদের মনে উদিত হয়। ক্ষমতাসীন মুষ্টিমেয় কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা তাদের সেই আবেগ খর্ব করে দিতে চায়, ফলে দেখা দেয় সংঘর্ষ। জয় হয় কিন্তু গণতন্ত্রেরই।[৪৫]

দেশে প্রায়শঃই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার পিছনে সুরেন্দ্রনাথ অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই মূল কারণ বলে মনে করতেন। দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অথচ খাদ্যোৎপাদনের হার সেই অনুপাতে বর্ধিত হয় নি। মানুষের আর্থিক সংগতি না থাকলেও এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় বিবাহটা অবশ্যই একটি করণীয় বিষয় হিসাবে প্রচলিত ; ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম বা দিব্য ইচ্ছার সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাই সুরেন্দ্রনাথ বলতে বাধ্য হয়েছেন :

> 'No man should marry, until he has the means of maintaining a family. This is what Nature enjoins and the Divine Law sanctions. But we here in Bengal are violating every day and every hour the plainest precepts of the Natural and the Divine Law. And God is a jealous God. Nature

revenges herself with compound interest upon the violators of her Law.[৪৬]

ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে সুরেন্দ্রনাথ অনুভব করতেন যে অবারিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে জর্জরিত মানুষ নৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বৈষয়িক উন্নতি না হলে মানুষের পক্ষে স্থায়ী মূল্যবত্তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এবিষয়ে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা লক্ষ করা যায়।

ভূমিস্বত্বহীন ও ঋণভারে জর্জরিত রায়তের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের গভীর সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়; সেই মনোভাবেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন। রায়তের সর্ববিধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যে নিমগ্ন ও জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত রায়তকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি শিক্ষিত লোকেদের আহ্বান জানান। কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষকরাই যে তার মেরুদণ্ড এবং তাদের প্রতি অবহেলা পরিণামে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর সেকথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। অনাহার, অশিক্ষা ও ব্যাধি থেকে গ্রামীণ জীবনকে উদ্ধার করা আশু প্রয়োজন বলে তিনি অনুভব করতেন।

রাজনীতির মূলে অর্থনীতির অবস্থিতি ভারতীয় মডারেটরা গুরুত্বের সঙ্গেই অনুভব করতেন, তাঁদের মতে ভারতের রাজনৈতিক অনগ্রসরতার উৎস হল অর্থনৈতিক দৈন্য। তাই সুরেন্দ্রনাথ বলেন: 'The economic condition of a people has an intimate bearing upon their political advancement।'[৪৭] ইংরেজ বাগ্মী ও রাষ্ট্রনীতিক জন ব্রাইটের মতানুসরণে তিনিও মনে করতেন যে, কোনও দেশের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও জনসাধারণের দুর্গতি মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণেই দেখা দেয়। স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও সংরক্ষণকল্পে তিনি বলেন:

'Swadeshism will save us from famine and pestilence and the nameless horrors which follow in the train of poverty. Take the Swadeshi vow and you will have laid broad and deep the foundations of your industrial and political emancipation.'[৪৮]

পাঁচ : শিক্ষাচিন্তা

সুরেন্দ্রনাথের পুনা কংগ্রেসের ভাষণকে অর্থনীতিবিদের বক্তৃতা বলা হয়। সে হিসাবে তাঁর আহমেদাবাদ কংগ্রেসের ভাষণকে শিক্ষাবিদের ভাষণ বলা চলে। কারণ তাঁর ঐ ভাষণে দেশের শিক্ষাপ্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছিল— মুদ্রিত ভাষণের ত্রিশ পৃষ্ঠারও অধিক স্থান জুড়ে। এটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, কারণ কর্মজীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর তাঁর শিক্ষকতায় কাটে।

পুনা ভাষণে মিল-এর মত সমর্থন করে তিনি বলেন : the ideas of the educated classes filter downwards and become the ideas of the masses। রাষ্ট্রচেতনার প্রধান উপাদান যে শিক্ষা এবং সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যতীত জাতীয়তাবোধ ও ঐক্য সাধিত হবে না, সেকথা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। শিক্ষার আলো সমাজের একটি স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই লর্ড কার্জন -নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি তাঁর কাছে শিক্ষা-সংকোচনের নামান্তর বলে মনে হয়েছিল। কলেজের সংখ্যাহ্রাস, বেতনবৃদ্ধি, পাঠ্যপুস্তকের ভারবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রস্তাবের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি সেই প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে শিক্ষার সুফলকে কিভাবে কেবলমাত্র ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর কাছে কমিশনের প্রস্তাবগুলি ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বা সিডিশন বিলের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল।[৪৯]

ছয় : উপসংহার

ভারতের রাষ্ট্রীয় নবজাগরণে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রধান দুটি অবদানের প্রথমটি হল সারা ভারতকে একই নেশনের চেতনায় সর্বপ্রথম আবদ্ধ করার বহুকথিত প্রয়াস। দ্বিতীয় অবদানের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়। সেটি হল রামমোহনের আদর্শে ইংরেজের উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার বিস্তারসাধন।

দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সাম্প্রতিক আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা

অনুল্লিখিত না হলেও যথোচিত স্থান পায় নি এবং বহু ক্ষেত্রেই তা বিকৃতরূপে চিত্রিত হয়েছে। কংগ্রেসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে পট্টভি সীতারামিয়া সুরেন্দ্রনাথের সংগ্রামী চরিত্রের দিকটি অনুক্ত রেখে শেষজীবনে তাঁর ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের মনোভাবকে বড় করে দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে গোখলে, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ জননেতাদেরও বাদ দেওয়া যায় না। ইতিহাসকার পানিক্কর মন্তব্য করেছেন যে দেশের সাধারণ শ্রমজীবীদের সমস্যা ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন তাঁর চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল এবং পশ্চিমী শিক্ষাপ্রাপ্ত সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের বহির্ভূত জনসমাজের সমস্যাদি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না।[৫০] মন্তব্যটিতে যে সত্যের কিছু অপলাপ ঘটেছে সেকথা সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বিবরণ থেকে ও তাঁর ভাষণগুলি থেকেও জানা যায়।

রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক থেকে অপরিণত দেশের জনচিত্তে সাহস ও শক্তি-সঞ্চারকল্পে শিখ অভ্যুদয়ের কাহিনী প্রচার, স্বাধীনতার আবেগ সৃষ্টির জন্য নব্য ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রামী মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির আদর্শ স্থাপন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রবক্তা বার্ক ও গ্ল্যাডস্টোনের পন্থা গ্রহণের উপদেশ একাধারে যেমন দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার অনুসরণে নব-যুগের বাংলায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীও প্রচার করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। অভিজাত শ্রেণীর মৌরসিস্বত্ব থেকে তখনকার মজলিশি রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে টেনে এনে তিনি রাষ্ট্রীয়সাধনাকে গণতান্ত্রিক রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্যই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে তাকে দূরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। আহমেদাবাদ ও পুনা কংগ্রেসে সভাপতিরূপে প্রদত্ত সুরেন্দ্রনাথের ভাষণ দুটিতে বৃহত্তর জনসমাজের সুদূরপ্রসারী কল্যাণচিন্তা ফুটে উঠেছে। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অপরিণত প্রাথমিক অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাসকদের কাছে 'প্রার্থনা' কথাটির পরিবর্তে 'দাবি' শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সরকারি আচরণের প্রতিবাদে তিনি বারো বছর আইন পরিষদ বর্জন করেন (১৯০১-১৩)। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনকালে বিদেশী পণ্য বয়কটের নীতি সোৎসাহে সমর্থন করে তিনি নেতৃস্থানীয় মডারেট সহকর্মীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে চরমপন্থী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিরোধ অবসানের ক্লান্তিহীন প্রয়াসের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক মহত্ত্বেরই প্রমাণ মেলে।

মডারেটদের প্রতিপক্ষ চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল একাধিক গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার বিস্তারিত আলোচনায় রাষ্ট্রগুরুকে যথোচিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে সংযত করিয়া ক্রমে প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমান প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীতে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পথই সুরেন্দ্রনাথের সুপরিচিত··· রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশসাধনে ব্রতী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, সাধনা ও প্রকৃতির অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।'[৫১] সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমধর্মী রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বজনগ্রাহ্য আধ্যাত্মিক আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতাকে সংমিশ্রিত না করার ফলে জনচিত্তে স্থায়ী আসন অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে বিপিনচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ এই অভিযোগের মধ্যে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসাই যেন ফুটে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উদারতন্ত্রী মডারেট নেতৃবৃন্দের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির নিষ্ফল পরিণাম আজ সারা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিষময় করে তুলেছে।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথার এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা বিশেষ কোনো দেশ বা কালের একচেটিয়া অধিকারে আবদ্ধ থাকে না; তা সমস্ত মানবসমাজের সম্পদে পরিণত হয়। নতুন জীবনাদর্শের দেশাতীত প্রভাব কিংবা ভিন্ন দেশ থেকে তা আহরণ করা গতিশীল সভ্যতার একটি স্বভাবগত ধর্ম। ইতিহাস-ভূগোলের গণ্ডি অতিক্রম করে জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্বমানবতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পারস্পরিক আদানপ্রদানের মনোভাব না থাকলে বিভিন্ন দেশের শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন বদ্ধ জলাশয়ের মতো গতিহীন হয়ে থাকত। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের যেমন কোনো দেশ বা জাত বলে কিছু নেই, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি জাতিবিচার না থাকাই স্বাভাবিক। সেই দৃষ্টিতেই সুরেন্দ্রনাথের মনে ইংরেজ রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব সমর্থনযোগ্য। কোনও কিছু গ্রহণ ও বর্জনের মাপকাঠি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিচার— দেশগত ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ নয়। স্বদেশের ভাবভাণ্ডার থেকে কালোপযোগী ও কল্যাণকর উপকরণ গ্রহণে সুরেন্দ্রনাথের অনীহা দেখা যায় নি।

তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতার সাযুজ্যে বিশ্বাসী হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে সুরেন্দ্রনাথ আশু কার্যকরতায় আস্থাবান ছিলেন। কার্যকালে

ভাবপ্রবণ আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী তিনি কর্মপন্থা নির্ধারণ করতেন। তাঁর চিন্তায় এই স্ববিরোধ সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে অশুভ পন্থা ও দুর্নীতিকে তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেন নি। অপরিণামদর্শী ক্রিয়াকলাপ ও হঠকারিতার পরিবর্তে তিনি সতর্ক পদক্ষেপে 'ধীরে চলো' নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তা বলে তিনি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনে পিছপাও হন নি। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তাঁর মনে মুক্তি ও প্রগতির চিন্তা সঞ্চারিত হয়েছিল। ক্রমে তিনি রাজনৈতিক রক্ষনশীলতায় প্রভাবিত হন। রানাডে ও কেশবচন্দ্রের মতো তিনিও বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে ভারতে ইংরেজ শাসন বিধির নির্দেশ।

দেশবাসীর মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চারে তিনি নিরন্তর তৎপর থাকতেন। তাঁর অপরিণত রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সংগঠনকর্মে একসময় লিপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়; কিন্তু হিংসাত্মক কার্যকলাপকে তিনি কোনও দিন সমর্থন করেন নি। বঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনকালে তিনি হিংসার পথ থেকে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন। তিনি চাইতেন বিবর্তনের ধারায় দেশের উন্নতি, বিপ্লব নয়। জনগণের মনে উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টির সঙ্গেই নিয়মতান্ত্রিক পথে তা চালনা করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। নিয়মতান্ত্রিক অস্ত্রপ্রয়োগে তিনি বিশ্বাস করতেন। বোম্বাই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের (১৯১৮) পর থেকে তিনি দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও উত্তালতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি কংগ্রেস থেকে সরে আসেন।

শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও বাগ্মী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের নাম সুবিদিত। কিন্তু রাজনীতিই তাঁর মনের প্রকৃত বিচরণক্ষেত্র ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর মৌলিক অবদান বিশেষ না থাকলেও সুদক্ষ সংগঠক, দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক হিসাবে তাঁর অসামান্যতার পরিচয় ইতিহাসে সুচিহ্নিত হয়ে আছে। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন; আরব্ধ সমাজসংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আর-এক বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব তাঁর কাম্য ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবন বিশেষ তাৎপর্যবহ। বলতে গেলে তাঁর জীবনকালেই দেশের নবজাগরণপ্রয়াস সার্থকতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। জীবনের প্রত্যূষে তিনি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের স্নেহাভিষিক্ত সান্নিধ্য লাভ করেন।

মধ্যাহ্নে প্রত্যক্ষ করেন কেশব-বিবেকানন্দ-রানাডে-নৌরজির প্রতিভা। আর সায়াহ্নে পেয়েছিলেন গোখলে-টিলক-বিপিনচন্দ্র-গান্ধী-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিচিত্র মনীষীর সাক্ষাৎ।

নির্দেশিকা

১. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮, পৃ ১৩১-১৩২।

২. বিমানবিহারী মজুমদার। "রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক শিষ্যদল", 'পরিচয়'। তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪০, পৃ ১৯০।

৩. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া'। ১৯৬৫, পৃ ২৮-২৯।

৪. যোগেশচন্দ্র বাগল। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'। ১৯৬৩, পৃ ১৭০।

৫. Sushobhan Chandra Sarkar. 'Derozio and Young Bengal', In *Studies in the Bengal Renaissance*. ed. by A. Gupta. p. 27.

৬. Bimanbehari Majumdar. *Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917). 1965*, p. 139.

৭. *Ibid*. p. 141.

৮. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making*. 1963, p. 39.

৯. *Ibid*. p. 41.

১০. H. J. S. Cotton. *New India or India in Transition*. (Popular edition,) 1886, p. 16.

১১. S. Natarajan. *A History of the Press in India*. 1962, p. 96.

১২. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া'। ১৯৬৫। ১১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩. Amvika Charan Mazumdar. *Indian National Evolution*. 1917, pp. 40-41.

১৪. রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) সুরেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয়টি (১৯৩৯) সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত (প্রথম

প্রবন্ধটি পরে 'সমূহ' গ্রন্থে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়) 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। বিশ্বভারতী সংস্করণ, খণ্ড ১০, পৃ ৬৫৪ (গ্রন্থপরিচয়)।

১৫. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making*. 1963, p. 224.

১৬. *Ibid.* p. 296.

১৭. *Speeches of Surendranath Banerjea, 1876-84*. Vol. 2, p. 49.

১৮. *Ibid.* 1876-80. pp. 22, ('England's Mission in India').

১৯. Surendranath Banerjea. 'An address on Indian unity delivered at the Students' Association, on 16 March, 1876, In *Modern Indian Political Tradition*. ed by K. P. Karunakaran. 1962, p. 32.

২০. *Speeches of Surendranath Banerjea, 1865-1880*. ed. by R. C. Palit, p. 21.

২১. *Ibid.* p. 54. (Speech on Chaitanya at the Students' Association on July 15, 1876).

২২. *Ibid.*

২৩. Surendranath Banerjea. 'Presidential address at the Ahmedabad Congress Session, 1902'. In *Indian National Congress Presidential Speeches*, G. A. Natesan & Co.

২৪. *Ibid.*

২৫. *Speeches of Surendranath Banerjea, 1886-90* ed. by R. J Mitter, p. 71

২৬. Surendranath Banerjea, 'Presidential address at the Poona Congress Session, 1895. In *Indian National Congress Presidential Speeches*, G. A. Natesan & Co.

২৭. *Speeches of Surendranath Banerjea*. 1876-1884, ed. by R. C. Palit. Vol. 1-2, pp. 1-24.

২৮. *Ibid.*

২৯. *Ibid.* p. 34

৩০. *Speeches of Surendranath Banerjea 1886-90*, ed. by R. J. Mitter, pp. 162-163 (Speech at a meeting in Exeter).

৩১. Surendranath Banerjea. 'Speech at a meeting of the Students' Association on 16 March, 1878. In *Modern Indian Political Tradition*, ed. by K. P. Karunakaran. 1962, p. 35.

৩২. *Ibid*, p. 39

৩৩. *Speeches and Writings of Surendranath Banerjea*. pp. 140-141.

৩৪. *Ibid.*

৩৫. *Speeches of Surendranath Banerjea. 1886-90.* ed. by R. J. Mitter (Speech at Calcutta Congress Session, 1886)

৩৬. *Ibid*, p. 22.

৩৭. *Ibid.*

৩৮. *Ibid*. p. 95.

৩৯. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮, পৃ ১৩৬।

৪০. *Speeches and Writings of Surendranath Banerjea*. pp. 299-300 (Speech on Swadeshism)

৪১. Surendranath Banerjea. 'Presidential Address at the Ahmedabad Congress Session, 1902. In *Indian National Congress Presidential Speeches*, G. A. Natesan & Co. p. 666.

৪২. *Ibid*. p. 243.

৪৩. *Ibid*. p. 279.

৪৪. *Ibid.*

৪৫. *Speeches of Surendranath Banerjea*. ed. by R. C. Palit. Vol. 2, p. 5.

৪৬. *Ibid*. p. 3.

৪৭. *Ibid.*

৪৮. *Ibid*. pp. 299-300.

৪৯. Majumdar and Mazumdar. *Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era, 1885-1917*. 1967, pp. 188-189.

৫০. K. M. Panikkar. *The Foundations of New India*. 1963, pp. 90-91.

৫১, বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮, পৃ ১৩৫।

বিপিনচন্দ্র পাল ॥ ১৮৫৮-১৯৩২

এক : ভূমিকা

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহক জাতীয় কংগ্রেসের জন্মকালে দেশের সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনায় স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার যে অভাব ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবেদন-নিবেদন ও তোষণনীতির পথ ধরেই কংগ্রেসের তথা দেশের মুক্তি-আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের মনে অসন্তোষের কৃষ্ণছায়া ঘনিয়ে উঠছিল, যার মূলে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। প্রথমতঃ, দেশীয় পুঁজিপতিদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিদেশী পুঁজিপতিদের দাপটে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ভালভাবে মাথা তুলতে পারছিল না ; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দ্রুত বেড়েই চলেছিল ; তৃতীয়তঃ, দেশবিভাগের (১৯০৫) ফলে স্বার্থহানিতে জমিদার ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তান্ত্রিকদের বিক্ষোভ বর্ধিত হয়।[১]

বিক্ষিপ্ত জনশক্তি ও সংগ্রামী চেতনাকে সুসংবদ্ধ রূপ দান করতে শেষোক্ত কারণটি অনেকাংশে সাহায্য করে। তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের উপরেও জনসাধারণের অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে পশ্চিমী নাগপাশ থেকে জাপানের মুক্তি লাভের সংবাদ (১৯০৫) ভারতীয়দের মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ফলে জাতীয় আন্দোলনের মূলাধার কংগ্রেসে এক নতুন চিন্তা ও এক নতুন নেতৃত্বের উদয় হয়। এই নব্যপন্থীরা জাতীয় সংগ্রামের গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নতুন পথ রচনার প্রয়াসী হন। বর্তমানকালের রাজনৈতিক পরিভাষায় এঁদের বামপন্থী বলা যায়। এই নব্যনেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।[২]

বিনয়কুমার সরকারের ভাষায় বলতে গেলে, বিপিনচন্দ্র শুধু গলার জোরে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাবকে সংযুক্ত করেন নি— 'বিদ্যায়, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানে, দার্শনিকতায়, বিপ্লবযুগে কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই ছিল উঁচু…বঙ্গবিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা'[৩] বিপিনচন্দ্র ছিলেন আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের প্রথম যুগের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক। বিপিনচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপট ছাড়া

তৎপরতা ফলপ্রসূ হতে পারে না। রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত তাঁর বিপুল রচনাবলী একথার প্রমাণ।

রাজনৈতিক জীবনে কারো সঙ্গে রফা করতে না পারার দরুন তিনি যেমন জনচিত্তে বিস্মৃতিবিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনেও আপস করে চলতে না পারায় তাঁকে নিরতিশয় আর্থিক দুর্বিপাক ও নিন্দার ভাগী হতে হয়। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় এবং পরে বিধবা-বিবাহের ফলে পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হন। অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রীহট্ট থেকে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর বয়স ষোল। আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর বিভিন্ন সভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁর মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াতসূত্রে তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে পান নীতিনিষ্ঠ জীবনবোধ ও স্বাধীনতার প্রেরণা। কিন্তু যে-কারণে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অর্থাৎ দেশভক্তি ও স্বাজাত্যাভিমান জড়িত উন্নত ও উদার স্বাধীনতার আদর্শ, তা তিনি কেশবচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পান নি। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদার আদর্শের বিচ্যুতি, প্রেরিত আদেশবাদ এবং গর্হিত সমাজাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। স্বাধীনতা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। নিজের বিচার-বুদ্ধিকে তিনি শাস্ত্রের বা লোকাচারের কাছে বাঁধা রাখেন নি। সেকালের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মদের মধ্যে যে সংকীর্ণতা দেখা যেত তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে স্বাদেশিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৮৭৬)।[৪] পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (১৮৬৪-১৯৩৮) রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কটকের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে পৈতৃক নিবাস শ্রীহট্টে ফিরে গিয়ে সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৮০)। সেটিই বাংলাদেশে 'জাতীয়' নামে আখ্যাত প্রথম বিদ্যালয়। শ্রীহট্টে 'পরিদর্শক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় এবং সেখানে বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর ভাবী দিনের বাগ্মিতা ও প্রখর মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবিকাসূত্রে এরপর বাঙালোরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে তাঁকে দেখা যায়। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির, (পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি নামে

রূপান্তরিত) গ্রন্থাগারিক পদে তিনি কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৮৯০-৯২)। বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা ও খ্যাতি যখন উর্ধ্বগামী তখন বাংলার মননজীবনে চলেছিল বিচিত্র ও বহুমুখী অগ্রস্থতি।

বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মনীষীর সংস্পর্শ লাভ করে তিনি বৈষ্ণব চিন্তায় প্রভাবিত হন। বাংলার নবজাগরণে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বটে, কিন্তু ক্রমে তিনি সনাতন হিন্দু ভাবধারার অনুরাগী হয়ে পড়েন। চিত্তরঞ্জন দাশের মতো তিনিও পরিণত বয়সে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্রের *Srikrishna* গ্রন্থে বৈষ্ণব দর্শনের এক অভিনব বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভারতের অন্তরাত্মা ('Soul of India') মনে করতেন। কৃষ্ণচরিত্রে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেছেন।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৮৮৭) বিপিনচন্দ্রকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম দেখা যায়। সন্তঃপ্রবর্তিত অস্ত্র-আইন রদ করা প্রসঙ্গে তিনি ঐ অধিবেশনে এক উত্তেজনাবহুল ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর তৎকালীন মতাদর্শ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন :

> 'I was a democrat, a democrat of democrats, a radical of radicals ; yet I said that neither my democracy nor my radicalism took away in the least measure from my loyalty to the British Government.'[৫]

সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করার আগে তিনি ব্রাহ্মসমাজের একটি বৃত্তি নিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে অক্সফোর্ডে এবং পরে সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ঐ সফরকালে (১৮৯৮-১৯০০) তিনি ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বহু সভায় বক্তৃতা করেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া' (১৯০১-০৭) পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। জাতীয় জাগরণের গতিধারাকে বেগবান করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এই পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবনতি ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে বহু মৌলিক ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলিতে তিনি তীব্র সমালোচনার সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থাদিরও চিত্র তুলে ধরতেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব ঐ সময়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। তখন থেকে লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়শীল জাতীয় চেতনা সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। এযাবৎকাল তাঁর ক্রিয়াকলাপ রাজনীতির তুলনায় সাংস্কৃতিক বিষয়াদির মধ্যেই অধিকতর নিবদ্ধ ছিল। মনোভাবের দিক থেকে তখনও তিনি মডারেট-পন্থী। নৌরজি-গোখলে-মেটা-বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুগামীরূপে তাঁর চোখে ইংরেজরা তখন ছিল হৃদয়বত্তা ও ন্যায়বিচারের দিব্য প্রতিভূ। রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিকারে তিনি আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা-প্রতিবাদকেই মনে করতেন একমাত্র উপায়। কলকাতায় শিবাজি-উৎসব অনুষ্ঠানকালে (১৯০২) বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন :

'We are loyal, because we believe in the workings of the Divine Providence in our national history, both ancient and modern, because we believe that God himself has led the British to this country, to help it in working out its salvation, and realise its heaven appointed destiny among the nations of the world.'[৬]

বামপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তার পরিচয় বরং এর অনেক আগেই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের লেখাগুলিতে (১৮৯৩-৯৪) পাওয়া যায়। ১৯০৩ সালে যখন বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন বিপিনচন্দ্র ইংরেজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং তাঁর ইংরেজভক্তি টুটে যায়। 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথ ছেড়ে রাজনীতির পথ অনুসরণ করে। ইংরেজ-শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি অর্জনের আহ্বান এবার তাঁর কণ্ঠ ও লেখনীতে ধ্বনিত হতে থাকে। আমলাতন্ত্রের বর্ধিষ্ণু স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উদ্ভূত দেশের গণবিক্ষোভে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বদেশ ও বিদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কংগ্রেসের অনুসৃত এতদিনকার নিরুত্তাপ কর্মপন্থায় লোকে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল— নবীন-পন্থীদের মধ্যে একটা জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, যার পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আদর্শ এবং মহারাষ্ট্রে টিলকের নেতৃত্বে মুক্তি-আন্দোলনের অনুরূপ আদর্শ ও কর্মপন্থা। বহির্বিশ্বে আবিসিনিয়ায় ইতালির পরাজয় (১৮৯৬), দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২), চীন ও ইরানে গণ-অভ্যুত্থান, জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় (১৯০৫) প্রভৃতি সংবাদ নিত্যই ভারতীয় সংগ্রামীদের মনে ক্রমাগত রাজনীতির নতুন চেতনা উন্মোচিত করতে থাকে।

নিজস্ব পত্রিকা 'নিউ ইণ্ডিয়া'র মাধ্যমে ও বক্তৃতামঞ্চে বিপিনচন্দ্র অবিরাম

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে থাকেন ; দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের নবরূপায়ণের প্রস্তাবও করেন। স্বাধীনতা অর্জনের কথা দেশ তখনও ভাবতে প্রস্তুত হয় নি। তিনি বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সাময়িক উপায় হিসাবেই দেখেন নি, মুক্তি-সংগ্রামের অস্ত্রস্বরূপেও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে ইংরেজের গড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিহারপূর্বক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনকেও তিনি কাজে লাগান। বস্তুতঃ গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মধারা শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই অনুরূপ ধরনের আন্দোলনের বীজ বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় ও কর্মসূচিতে পাওয়া যায়—যাকে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ('Passive Resistance') নামে প্রচার করেন।

১৯০৫ সালের শেষাশেষি দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বামপন্থী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে এবং স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে জনচেতনায় উচ্ছ্বাসের বান ডাকে। বিপিনচন্দ্রকে সেই আন্দোলনের সংগঠক ও তাত্ত্বিক পুরোধারূপে দেখা যায়। ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট বিপিনচন্দ্র দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন এবং একসঙ্গে দুটি পত্রিকাই (অন্যটি 'নিউ ইণ্ডিয়া') চালিয়ে যেতে থাকেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাব সম্পাদকরূপে পরে অনেককে দেখা গেলেও এর সম্পাদনার দায়িত্ব তিনিই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিকতা ও লেখার কাজ অব্যাহত রেখেই এই সময়ে তিনি দেশব্যাপী প্রচারকার্যে বেরিয়ে পড়েন। দাক্ষিণাত্য ও পূর্বভারতে তাঁর এই সফর দেশের সর্বস্তরের মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বরাজের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে স্থায়ীভাবে চলে এসে (১৯০৬) জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের অধ্যক্ষপদে এবং 'বন্দেমাতরমে'র সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিয়েছেন। চরমপন্থায় বিশ্বাসী ও গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের মধ্যে স্বীয় মতাদর্শের মিল খুঁজে পান। তিনি তাঁর প্রখ্যাত 'উত্তরপাড়া ভাষণে' বলেছিলেন :

> 'When I came I was not alone, one of the mightiest prophets of nationalism sat by my side. It was he (Pal) who then came out.'

সমকালীন মডারেট রাজনীতিকদের কুক্ষিগত কংগ্রেসী-নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র অবহিত ছিলেন। কংগ্রেসে দেশের সাধারণ মানুষের স্থান ও

ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও যথেষ্ট সংশয় পোষণ করতেন। তাঁর তৎকালীন রচনায় এই সংশয়ের আভাস পাওয়া যায়। কংগ্রেসকে কায়েমি স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত করে যথার্থ এক গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায় :

> '...Is the ideal of the Indian National Congress to be an essentially democratic ideal, or is it to work for the replacement of the present white and foreign bureaucracy by a brown one composed of home-materials...'[৭]

'বন্দেমাতরম' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মতভেদ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরিচালনা-সংক্রান্ত মতানৈক্য ছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ ভীরুতা ও কাপুরুষতাকেই মাত্র প্রশ্রয় দেয়। এইসব ক্রিয়াকলাপে সরকারের নিপীড়নের মাত্রা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে এবং জাতির সংগ্রামী মনোবল তাতে ভেঙে পড়তে পারে।[৮] এইসব কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত 'বন্দেমাতরমে'র সংশ্রব ত্যাগ করেন। পত্রিকাটির সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অরবিন্দের উপর ন্যস্ত হয়। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ধৃত হলে (১৯০৮) তিনি আবার বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুক্ত হন। এর ঠিক আগে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও এই পত্রিকার প্রতি তাঁর অন্তরের টান কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাই বন্দেমাতরমে প্রকাশিত রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় (আগস্ট ১৯০৭) স্বাক্ষ্যদান করতে স্বীকৃত না হয়ে স্বেচ্ছায় তিনি ছ-মাসের জন্য কারাবরণ করেছিলেন।

কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) চরমপন্থীদের ভূমিকা কিছুটা সফল হওয়ায় তাঁদের দলীয় শক্তি ও উদ্দীপনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিপিনচন্দ্র সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তাঁর **'Passive Resistance'**-এর আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। **'passive'** শব্দটিকে তিনি ঠিক 'নিষ্ক্রিয়' অর্থে ব্যবহার করেন নি। ইংরেজি **aggressive** শব্দের বিকল্প হিসাবেই ঐ কথাটি প্রয়োগ করেছিলেন। আইন-ভঙ্গের দিকে না গিয়েও দেশের প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে বিকল করার উপায় হিসাবে তিনি **'Passive Resistance'**-এর সাহায্যে দেশে একটি সমান্তরাল শাসন-কাঠামো **(parallel administrative structure)** গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলেন :

'The broad application of this method of Passive Resistance has brought out two or three special movements in India. ... And by these means, Boycott, National Education and Swadeshi included in the Boycott, and by the organisation of the forces and the resources of the people, and by setting up a scheme of practical self-government running parallel to officialised institutions of self-government in the country— to find a school of civic duties for the people.'[৯]

বিপিনচন্দ্রের এই parallel self-government বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের প্রস্তাব এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'Constituent Assembly' গঠনের প্রস্তাবেরও বেশ মিল দেখা যায়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের তিক্ত ও তীব্র বিতৃষ্ণা থাকলেও তা কখনো জাতিবিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করে নি: 'We have preached isolation from the foreigner it is true, but not hatred of him'।[১০] হিংসাত্মক কার্যকলাপেও তাঁর আদৌ সমর্থন ছিল না। এ-সম্পর্কে তিনি 'বন্দেমাতরমে' লেখেন:

'Swaraj has been our proclaimed ideal and the open and lawful methods of Boycott, National Education, National Volunteering, Arbitration Committees and other lawful measures of self-help and self-organisation have been our professed means for the realisation of this ideal. Bombs and assassinations have had therefore, absolutely no place in our propaganda. Both our instinct and our wisdom equally rebel against these outlandish methods of political warfare.'[১১]

বিপিনচন্দ্রের তৎকালীন প্রবন্ধগুলি নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যবহ। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসমাত্রই নয়, ভারতীয় জনজীবনের পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতি ও প্রতিটি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশই যে তার প্রধান লক্ষ্য— বিপিনচন্দ্র সে-কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ উভয়েই স্বরাজকে মানবতন্ত্রী মুক্তির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনকে বিপিনচন্দ্র স্পষ্টতঃ 'Spiritual Movement' নামে অভিহিত করেন।

সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) চরমপন্থী দলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর নরমপন্থীদের আধিপত্য বজায় থাকলেও কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন হীনবল হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে দলবলসহ অরবিন্দের গ্রেপ্তার ও টিলকের কারাদণ্ড এবং তৎসহ সরকারি দমননীতির প্রাবল্যে চরমপন্থী দল বেশ কিছুকালের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র ভারতভূমি ত্যাগ করে দেশান্তরগমনে বাধ্য হন। তাঁর এই বিলাতযাত্রা মূলতঃ রাজনৈতিক নির্বাসন হলেও বিদেশে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন সংক্রান্ত প্রচারকার্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপে তখন কৃষ্ণবর্মা, সাভারকর, মাদাম কামা, লালা হরদয়াল প্রমুখ বিপ্লবী খুবই কর্মতৎপর ছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে বিপিনচন্দ্র তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবপ্রচেষ্টার সহায়ক হবেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে বিপিনচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিরোধিতাই করেন। অবশ্য কর্মধারা বিষয়ে তাঁর মতামত যাই হোক-না কেন, তিনি কিন্তু ঐ-সব বিপ্লবীদের দেশভক্তি ও ত্যাগের অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাতে ভোলেন নি।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। চরম মতের পরিবর্তে ক্রমে তাঁর মন নরমপন্থী হতে শুরু করে। অবশ্য যখন তিনি চরমপন্থী ছিলেন তখনও হিংসাত্মক বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করতেন। ইংলণ্ডে থাকাকালেই তিনি 'স্বরাজ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯০৯)। বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতার জন্যও তাঁর ডাক আসে। বক্তৃতা ও পত্রিকার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দার্শনিক আদর্শ ও বিশ্বজনীনতার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তৎকালীন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও উন্নত জীবনাদর্শ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে *Indian Student* (১৯১১) নামে আর একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন।

এযাবৎকাল বিপিনচন্দ্রের স্বরাজচিন্তার মৌল বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজসাম্রাজ্য থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবার সেই চিন্তা অভিনব ব্যঞ্জনায় ভিন্ন রূপ নিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ভারতের জাতীয় আকাজ্ক্ষা— এ-দুইয়ের মধ্যে তিনি এক সমন্বয়ধর্মী পথের নিশানা দেখাতে শুরু করলেন। বিচ্ছিন্ন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিবর্তে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমবায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ এক নতুন ব্যবস্থার চিত্র তিনি তুলে ধরলেন :

> 'If God were to appear before me with the gift of absolute but isolated sovereign independence for India in his right

hand, and of an equal co-partnership with Great Britain and her colonies in the present Association called the British Empire, in his left hand, I would unhesitatingly say, 'Father' give us the gift in your left hand'.[১২]

পূর্বের চিন্তা ও কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েই বলেন যে, তিনি পূর্বে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছিলেন এবং স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন তা বয়কট বা স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্যস্বরূপ 'Universal Humanity'র আদর্শেই উদ্ভূত হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাধারার পারম্পর্য যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি সে-কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন :

'I frankly confess, that this Federal-ideal, not only in relation to the different communities and provincialities of India but comprising within itself the different units of the existing British Empire, was not revealed in the earlier years of our Nationalist agitation. The time was not yet ripe for it. To proclaim this ideal in 1905 or 1908 would have been suicidal to the Nationalist cause. Those years were of protest and self-assertion.'[১৩]

এই মতপরিবর্তন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের আর একটি প্রধান যুক্তি ছিল যে, সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে শাসকদের মনোভাবে কঠোরতার মাত্রাই কেবল বৃদ্ধি পায়। 'সন্ধ্যা' 'বন্দেমাতরম' 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা একের পর এক সরকারি রোষদৃষ্টিতে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। অনুশীলন সমিতি এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্থা বে-আইনি ঘোষিত হয়; সরকার ফৌজদারি আইন সংস্কার করে বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করেন (১৯০৮); অতঃপর মর্লি-মিণ্টো শাসন ব্যবস্থা (১৯০৯) প্রবর্তিত হয়। ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'উত্তরপাড়া ভাষণে' অরবিন্দ সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির শূন্যতা ও নৈরাশ্যজনক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের (১৯১১) পর বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস সংগঠনে বামপন্থীদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেন। সুরাট অধিবেশনের পর কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছিল, কিন্তু ১৯১৫ সালে অনুষ্ঠিত লখনৌ কংগ্রেসে আবার ঐক্য দেখা দেয়। নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ফিরে আসে। টিলক ও অ্যানি বেসাণ্ট-প্রবর্তিত 'হোম-রুল' আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র অংশ গ্রহণ করেন।

সারা দেশে তাঁদের প্রচার অভিযান চলতে থাকে। এইসময়ে বিপিনচন্দ্রের গতি-বিধির উপর এক সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৯১৮ সালে টিলক ও বিপিনচন্দ্র আন্তর্জাতিক হোম-রুল সম্মেলনে যোগদানের জন্য ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন।

বিপিনচন্দ্র উগ্রপন্থী চিন্তাধারা থেকে সরে আসায় পরবর্তীকালে গান্ধীর অসহযোগ-নীতির সঙ্গে তাঁর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গান্ধীর অহিংস-অসহযোগে তাঁর বিশেষ অসম্মতি না থাকলেও কর্মপদ্ধতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। কাউন্সিল, আদালত, শিক্ষালয় ইত্যাদি সবকিছুই গান্ধী বয়কট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের বিবেচনায় তা ক্ষতিকর ও নিরর্থ বলে মনে হয়। মালব্য, চিত্তরঞ্জন, জিন্না প্রমুখ উদীয়মান নেতৃবৃন্দের সমর্থন সত্ত্বেও ভোটে বিপিনচন্দ্রের অনুবর্তীরা পরাজিত হন। ক্ষতিকর বিবেচনায় গান্ধী-প্রচারিত খিলাফত-আন্দোলনকেও বিপিনচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি। খিলাফত-আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে 'প্যান-ইসলাম'-এর সূত্রপাত হয় তার সুদূরপ্রসারী অশুভ ফলাফলের বিষয়ে বিপিনচন্দ্র তৎকালেই দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২১) সভাপতিরূপে বিপিনচন্দ্রকে তাঁর গান্ধী-বিরোধী মনোভাবের ফলে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ গান্ধীর প্রভাব তখন সারা দেশে বিদ্যুৎগতিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২০) গান্ধী বলেছিলেন যে সদ্যঃপ্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনে দেশবাসী কায়মনোবাক্যে যোগদান করলে দিব্য বিধান অনুসারে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ অর্জিত হবে। গান্ধীর অসংলগ্ন উক্তির সমালোচনা করে বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে সেই কার্যক্রমই বর্তমানে বাঞ্ছনীয় যার ভিত্তি হল 'লজিক', 'ম্যাজিক' নয়। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের পরিণামস্বরূপ এইসময় থেকেই বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে থাকে।

১৯২৮ সালে লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে বিপিনচন্দ্রকে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে শেষবারের মতো দেখা যায়। অতঃপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠরোধ করে রাজনীতি থেকে তাঁকে অপসারণ ও কোণঠাসা করে রাখার নানাবিধ চেষ্টা চলতে থাকে। বিরোধীদের এই প্রয়াস সফল হয়। স্বদেশী যুগের অবিসংবাদিত নেতা বিপিনচন্দ্র

ক্রমে জনচিত্তের অন্তরালবর্তী হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৩২ সালে নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেই নবীন বাংলার এই মনস্বী নেতার জীবনদীপ সবার অলক্ষে নিভে যায়।

দুই : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

ছাত্রজীবনেই বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ব্রাহ্মদের আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিবর্তে তাঁদের উদার সামাজিক মনোভাব ও স্বাদেশিকতাবোধ তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করেছিল। স্বাধীন মানবিকতার সাধনক্ষেত্ররূপে ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও সমাজের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মজলিশি ধর্মালোচনা, যুক্তিবর্জিত ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধী মনোভাব, প্রেরিত মহাপুরুষবাদ এবং ঐশ আদেশ সংক্রান্ত প্রত্যয়, গর্হিত সামাজিক আচার প্রভৃতি কারণে বিপিনচন্দ্রের মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ভাঙন ধরতে শুরু করলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (মে, ১৮৭৮)। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম উদ্যোক্তা শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে বিপিনচন্দ্র 'স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্যার'[১৪] আদর্শ খুঁজে পেলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বিপিনচন্দ্রকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে তখন থেকে ধর্মসাধনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমকে চরিতার্থ করার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয়। সমসাময়িককালে বাংলাদেশে পশ্চিমী অজ্ঞাবাদ (Agnosticism) ও বস্তুতান্ত্রিকতার যে-প্রভাব পড়েছিল বিপিনচন্দ্র তা থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু যে-আবেগ তাঁর মনে অনুক্ষণ বিরাজ করত তাকে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনও পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে তিনি ক্রমে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন, বৈষ্ণব দর্শনকে তিনি অভিনব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশের নবযুগের দার্শনিক ভিত্তিভূমিরূপে ঐ আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

বিপিনচন্দ্রের মতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আদর্শে সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনার

ধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৈষ্ণব সাধনমার্গ থেকে পৃথক।[১৫] উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার উপর মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন যে পদ্ধতিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে— যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার অকাট্যতা লক্ষণীয়। বিপিনচন্দ্র এতদ্‌বিষয়ক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে উপনিষদের ব্রহ্ম, যোগদর্শনের পরমাত্মা এবং ভক্তিবাদের ভগবান তিনটি পৃথক সত্তা নন— একই সত্তার তিনটি অঙ্গবিশেষ।[১৬] বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি, অবস্থান ও লয় সম্পর্কিত পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জীব ও জড়ের অসীম মহাসমন্বয় (unity)। এবং পরমাত্মা সেই একই মহাসমন্বয় হলেও, জীবের অন্তর ও বহির্জীবনের যোগসূত্র বজায় রাখেন; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মহাজাগতিক (cosmic) প্রবাহ থেকে ব্যক্তিজীবনও বিচ্ছিন্ন নয়।

প্রশ্ন এখন, কোন্ শক্তিবলে ব্যক্তিচেতনা সমষ্টির সঙ্গে, মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়— জড় ও চেতনের এবং বিভিন্ন মানুষ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম ও সাহচর্যের যোগসূত্র কোন্ শক্তিবলে স্থাপিত হয়? বাংলার বৈষ্ণববাদী চিন্তা অনুসারে সেই যোগসূত্রের স্থাপনকর্তা হলেন ভগবান। ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক, পরমাত্মা ব্যক্তিত্বের ধারক ও বাহক, ভগবান একদিকে মানুষের সঙ্গে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ রক্ষা করেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কসূত্রও বজায় রাখেন। ভগবান নৈর্ব্যক্তিক নন, কিন্তু পরমপুরুষ হিসাবে বহুবিশ্লিষ্ট ও বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিসমুদয়কে সমন্বিত করেন।[১৭]

বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভগবান নিছক কল্পনা কিংবা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিমাত্র নন, তিনি দেহীর ন্যায় বিরাজমান। এখানে দেহী কথাটির মধ্যে এক দ্বিধ প্রত্যয় বর্তমান। প্রথমাবস্থায় মানুষ পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে; সমগ্র পারি-পার্শ্বিককে কেবল জানা ও অনুভব করার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা হয় না; তদনুযায়ী ক্রিয়াশীলতায় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্তি ঘটে। প্রথমে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পৃথক থাকে, কিন্তু ক্রমে উভয়ের সাযুজ্যে জ্ঞান ও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা দেখা দেয়। বৈষ্ণব মতে পরম সত্তা একদিকে যেমন মানবিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নন, তেমনি সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূতও নন। ঐক্যানৈক্যই তাঁর প্রকৃতি। বিপিনচন্দ্র এই প্রকৃতিকে হেগেলের দ্বান্দ্বিক (dialectic) প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১৮] সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই চিরন্তন প্রক্রিয়া তাঁর মতে ঈশ্বরের লীলা। ঐশী লীলার মধ্যে চলে পুরুষ ও প্রকৃতির নিরন্তর মিলন ও বিচ্ছেদ— শংকরাচার্যের অনুসরণে তাকে কিন্তু মায়ারূপে দেখা হয় নি।[১৯]

বিপিনচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই ভগবান বা পরমসত্তারূপে কল্পিত। অবতাররূপে তাঁর মানবদেহ ধারণের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। কারণ মানুষেরই মধ্যে তিনি নিত্য বিরাজমান। ভগবান নিরাকার নন, আবার জড়াকারও নন, তিনি চিদাকার; তিনি অতীন্দ্রিয় হলেও চিদিন্দ্রিয়-সম্পন্ন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি নিরন্তর লীলা করছেন।[২০] বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে দুর্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনার মাধ্যমে দেবতাকে মানুষরূপে কল্পনা ও মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা বাঙালীর চিন্তা ও সাধনার ইতিহাসে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন শাস্ত্রকে মান্য করেও তার অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা শাস্ত্রবন্ধনকে বাংলাদেশে শিথিল করা হয়েছে। ধর্ম ও সমাজ, স্মৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাংলা-দেশের মনোভাব ছিল উদারনীতি ও সাম্যের পরিপোষক। এই স্বাধীনতার ভাব ও মানবতার আদর্শ মজ্জাগত থাকায় ইংরেজরা ইউরোপ থেকে মুক্তি ও মানবতার বাণী বহন করে আনার ফলে বাঙালীর সুপ্ত স্মৃতি আবার জেগে ওঠে। তাঁর মতে উনিশ শতকের নবযুগে বাংলার সনাতন মুক্তি ও মানবতার আদর্শ নবরূপ লাভ করেছিল।[২১]

তিনি দেখিয়েছেন যে, চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনায় তত্ত্বাঙ্গ, ভাবাঙ্গ ও ভজনাঙ্গের মধ্যে এক অসামান্য স্বাধীনতা ও প্রেরণার আদর্শ ছিল। জাতিবর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলকে সমানভাবে নিজ সম্প্রদায়-ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বাংলাদেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে সমাজ ও শাস্ত্রের শাসনবন্ধন থেকে মুক্তিপ্রয়াসী এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেন।[২২]

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত কৃষ্ণচরিত্রের মতো বিপিনচন্দ্রও নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক কৃষ্ণতত্ত্ব রচনা করেছেন। কৃষ্ণকে তিনিও এক ঐতিহাসিক পুরুষরূপে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে ঐক্য ও সমন্বয়ের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অলৌকিক উপাখ্যানগুলির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এদেশে আর্যরা উপনিবেশ স্থাপন করার পর অনার্যদের সঙ্গে যে-সংঘর্ষ দেখা দেয় অনার্য-বংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণই সেই সংঘাতের নিষ্পত্তি ও সমন্বয় সাধন করেন।

বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য : কৃষ্ণের বাণীতেই ন্যায়পরায়ণতা ও জাতীয় কর্তব্যের যথার্থ নির্দেশ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মের উপদেশ পালনে কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মুক্তি সাধিত হবে। কৃষ্ণের বিশ্বজনীন প্রেমের

বাণীতে ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মৈষণা নিগূঢ় আনন্দবহ। সেই প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্রের জন্য অংশের আত্মত্যাগ চিরন্তন মঙ্গলার্থেই প্রয়োজন ; পরিণামে সমগ্রের মধ্যেই অংশ নিজেকে খুঁজে পায়। বিপিনচন্দ্রের মতে ভারতের সংখ্যাতীত জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব বর্তমান— একমাত্র কৃষ্ণের বাণীতেই তার স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায় ; কৃষ্ণ স্বয়ং প্রেম, ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীকস্বরূপ।[২৩]

তিন : ইতিহাসচিন্তা

আরোহী (inductive) বিচারপদ্ধতিতে বিপিনচন্দ্র ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন। জাগতিক বিবর্তনধারায় তিনি দ্বান্দ্বিক (dialectical) প্রক্রিয়া উপলব্ধি করেন। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে পরব্রহ্মই সেই জাগতিক বিবর্তনের নিয়ন্তা। তাঁর মতে ইতিহাসের পশ্চাতে ঐশ নির্দেশনা (determinism) বর্তমান। ইতিহাস উদ্দেশ্যহীন, পারম্পর্যরহিত ও বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘটনার সমাহার মাত্র নয় ; ইতিহাস হল দিব্য উদ্দেশ্য ও নির্দেশের অভিব্যক্তিস্বরূপ। ইতিহাসের মধ্যে এক মহান অর্থ ও শুভ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে— ভারতের ক্ষেত্রে যা হল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন ও সত্যশিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যয়টি হয়তো সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও নেতৃত্বের আধ্যাত্মিক ভাবভূমি ও চেতনার প্রয়োজনে তিনি উক্ত ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইতিহাসের তিনি ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন :

> 'The Sociological and Psychological group of the sciences have been revealing to us certain universal truths and principles regarding the course of human development in general, in the light of which, we may now build up a more correct history of any people than has hitherto been furnished by the annals of their kings or the journals of their warriors.'[২৪]

দিব্য-নির্দেশনাভিত্তিক যে-নিগূঢ় তাৎপর্য ও সুগভীর অর্থপূর্ণতায় ভারতীয়দের জীবনেতিহাস বিধৃত তা আর্যসভ্যতার আদিপর্ব থেকে শুরু করে মুসলমান আধিপত্য, সেন ও পাল নৃপতিদের শৌর্যবীর্য, মারাঠাদের রাজত্ব, সর্বশেষে ইংরেজ-

আমল অবধি কালানুক্রমে নিহিত। প্রতীচ্যের বিবর্তনতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ না করেই বিপিনচন্দ্র ভারতের ঐতিহাসিক ধারার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় তিনি বেদ ও পুরাণের সাহায্য নিয়েছেন। ইতিহাসকে তিনি ঈশ্বরের লীলাভূমি হিসাবে দেখেছেন। কেশবচন্দ্রের 'God-in-History' প্রত্যয় তাঁকে এ-বিষয়ে প্রভাবিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের অন্তরাত্মা ('Soul of India') বলে মনে করতেন। কৃষ্ণচরিত্রেই ইতিহাস ও বিবর্তনের মূলসূত্রগুলি বিধৃত। কৃষ্ণচরিত্রে ভারতের আত্মা মূর্ত হয়ে উঠেছে। দর্শনগুরু ও উপদেষ্টারূপে শ্রীকৃষ্ণ জাতীয় ঐক্য তথা নানা মত ও পথের সমন্বিত প্রতীকস্বরূপ।

ইংরেজ দার্শনিক বোসাঙ্কেট (১৮৪৮-১৯২৩) -এর চিন্তা অনুসরণ করে তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানবমনে প্রতিফলিত দিব্য অভীপ্সা ক্রমান্বয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন যে পরাধীনতা মানবাত্মার পরিপন্থী; ঈশ্বর তাঁর রূপ ও সত্তায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন— সে মানুষ মুক্তি ও নিষ্কলুষতার অধিকারী— পাপে ও পরাধীনতায় সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। ইংরেজ শাসনাশ্রয়ের মোহ এবং সামাজিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির জন্য দেশবাসীকে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় বিপিনচন্দ্র বিশ্ব-ইতিহাসের সম্ভাব্য তিনটি ধারা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন: এক, সারা দুনিয়ায় শাদাকালোর দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠবে; দুই, প্যান-ইসলাম জিগিরের প্রাবল্য; তিন, মঙ্গোলীয়—বিশেষ করে চৈনিক জাতির প্রতাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।[২৫]

তাঁর এ-তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অল্পবিস্তর প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিকারস্বরূপ তিনি ভারত ও ব্রিটেনের পারস্পরিক সাহচর্যমূলক সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভব করেন। সাম্রাজ্য শব্দটির পরিবর্তে সমবায়মূলক অংশিদারি, (co-partnership) কথাটি তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজের অনুকূলে ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার কোনও প্রশ্নই তাতে নেই।

ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের অনুরাগী হলেও বিপিনচন্দ্র বাস্তব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে নবভারত গঠন পুরানো ধারায় সম্ভব নয়; কারণ ভারতীয় মনন ও চিন্তনে বহু নতুন ধারা মিলিত হওয়ায় অবস্থা হয়েছে বিচিত্র ও জটিল এবং নবোদ্ভূত বিভিন্ন ধারা ক্রমে একই প্রবাহে মিলিত হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমন্বয়ধর্মী আদর্শের (modern ideal) উদয় হচ্ছে বলে তিনি অনুভব

করেন। তত্ত্বগতভাবে সেই আদর্শের মূলসূত্র হল ; ১. **Rationality** ; ২. **Reality** ; ৩. **Spirituality** ; ৪. **Universality**। ব্যাবহারিক দিক থেকেও তিনি আদর্শটির তিনটি সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন : ১. **Freedom** ; ২. **Fraternity** ৩. **Humanity**। ব্যক্তির সম্যক আত্মোপলব্ধি ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে এবং বাস্তব সমাজজীবনের মধ্যে দিয়ে এই আদর্শ যে মানবিক বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে চলেছে তার চরম পরিণতি ঘটবে আধ্যাত্মিকতায় এবং মনুষ্যজীবনে দেবত্বের প্রতিষ্ঠায়।[২৬]

চার : রাষ্ট্রদর্শন

বিপিনচন্দ্রের মতে 'পলিটিক্স' 'পেট্রিয়টিজম' 'নেশন' 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' ইত্যাদি শব্দগুলি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল—পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতির অনুধ্যান ও প্রভাবেই এই শব্দগুলি এদেশে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'রাজধর্ম' ও 'নীতি'—এই কথা দুটিই মাত্র পাওয়া যায় ; ইংরেজী statecraft-কেই 'নীতি' বলা চলে— শুক্রনীতি, কৌটিল্যনীতি, চাণক্যনীতি—সবই statecraft-এর অন্তর্গত। যে-নিয়মে আভ্যন্তরিক ও পররাষ্ট্রিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত তাকেও নীতি বলা হত। এই প্রত্যয় শুধু এদেশেই নয়, অন্যান্য প্রাচীন সমাজ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ইউরোপীয় নীতিবিদ্‌রা রাজ্যনীতিকে Ethics বা ধর্মনীতির অঙ্গ মনে করতেন।[২৭] নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতীয় নীতিবিদ্‌রা মোক্ষ অর্থাৎ জীবের মুক্তিকে আদর্শ হিসাবে রেখেছেন। তাঁদের মতে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যই সমাজের প্রয়োজন ; সমাজশাসনের মূলেও থাকে সেই একই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শুভ শক্তি ও বৃত্তির উন্মেষসাধনপূর্বক তাকে মোক্ষের দিকে চালনা করা। তৎকালে রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ছিল : ১. কর্মাঙ্গ বা শাসনাঙ্গ এবং ২. বিধানাঙ্গ। জনচেতনার বৃদ্ধির সঙ্গেই ঐ-দুটির স্বাতন্ত্র্য প্রসারিত হয়। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির চরম প্রয়োজন সাংসারিক উন্নতি নয় ; জীবের মোক্ষ বা পারমার্থিক মুক্তিই তার লক্ষ্য। হিন্দুরা সকল জাগতিক সম্বন্ধকে উপেক্ষা না করলেও মূলতঃ তাকে অলীক বা মায়িক মনে করতেন। তাঁরা জড়বাদী জগৎ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ও পরমার্থের সন্ধানে অধিক

মনোযোগ দেন। তাঁর মতে হিন্দুরা প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদী—মায়ার প্রভাবে যেখানে ভেদের আধিপত্য সেখানেও তারা অভেদের পন্থা বের করে; ব্যাবহারিক জীবনে ভেদের দ্বারা ভেদকে অতিক্রম করার জন্যে নানাবিধ বিধিনিষেধ, যেমন বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্ণাশ্রম বংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু অতীতকালে সে আশ্রম ও ধর্মে সার্বজনীন মৈত্রী ও সর্বভূতে সমদৃষ্টির মনোভাব ছিল। ঔদার্য এবং নিরাসক্তিতে মণ্ডিত হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজধর্ম। হিন্দুরা নেশন গড়তে গিয়ে ধর্মের আচ্ছাদন ব্যবহার করে, সেখানে ইউরোপীয়রা করেছে পলিটিক্সের—তাই ইউরোপে ধর্মের উপরে পেট্রিয়টিজম স্থান পেয়েছে।[২৮]

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র আরও বলেছেন যে, সন্ন্যাসধর্ম ভারতে প্রাধান্য পাওয়ায় সংসারধর্ম হয়েছে খর্ব—সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশও ব্যাহত হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের কথায় 'বর্ণবিভাগ নিবন্ধন ও আশ্রম ধর্মের প্রাবল্যহেতু হিন্দুসমাজে কখনো যুরোপীয় সমাজের মত ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর, প্রয়োজন ও প্রয়াস হয় নাই।' পরিবার, গোষ্ঠী ও সবর্ণের মধ্যেই ব্যষ্টির স্বার্থ ছিল বিলীন। পাশ্চাত্ত্যের পরার্থ প্রবৃত্তি যেখানে স্বাদেশিকতায় রূপায়িত সেখানে হিন্দুদের পরার্থ চিন্তা গোত্রবর্ণ অতিক্রম করে সর্বভূতে উপনীত। পাশ্চাত্ত্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক পেট্রিয়টিজমের জন্মদান করে, তাদের কাছে রাষ্ট্রই সনাতন বস্তু; ভারতের সনাতন বস্তু ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারতে শিখ ও মারাঠা জাতি সংঘবদ্ধ হয়েছিল।[২৯]

বিপিনচন্দ্রের মতে ধর্মের বন্ধন কেবল ধর্মেই নয়। ধর্মের সঙ্গে, ধর্মের মধ্যে সর্বত্র মানুষের সাংসারিক স্বার্থ ও সুখানুসন্ধান প্রবৃত্তি নিহিত থাকে। হিন্দু, ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্ম কেবল পরমার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় নি; লৌকিক ও সাংসারিক স্বার্থ ও সুখানুসন্ধানের দ্বারাই সেগুলি পরিপুষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্র বা নেশন প্রতিষ্ঠায় সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা সাংসারিক সুখের স্বার্থসন্ধানই ছিল অধিকতর প্রবল। তাই মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় বারভুঁইয়াদের যে-অভ্যুদয় ঘটে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনও অনৈক্য ছিল না। তেমনি সিপাহি বিদ্রোহের সময় ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কাজেই ধর্মের বন্ধন নয়—স্বার্থের বন্ধনেই নেশনের জন্ম। অপর নেশনের সঙ্গে ভেদ আর নিজের নেশনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্য ও একাত্মতা বজায় রাখা নেশন গঠনের আসল রহস্য। নেশন হতে গেলেই বিশ্বের অন্যান্য মানবসমষ্টি থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হয়। বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে মানবেতিহাস ও

মানবসমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বব্যাপী ও বিশাল সমাজবিজ্ঞান আছে— সেই দৃষ্টিতেই বিশ্বনেশনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বহু শাখা সংবলিত এই বিশ্ব-নেশনের মনোভাব নিয়েই ভারতীয় নেশনের তিনি বিকাশসাধন করতে চেয়েছিলেন।[৩০]

বিপিনচন্দ্র ভারতীয় চিন্তা ও সাধনায় 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' শব্দটির কোনও প্রতিশব্দ নেই বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ও স্বাধীনতা এক কথা নয়। স্বাধীনতা বা স্বরাজকে তিনি 'অটোনমি' অর্থে দেখতেন। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অভাবাত্মক, পক্ষান্তরে স্বাধীনতা ভাবাত্মক। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বা অনধীনতায় স্বরাজ লাভ করা যায় না ; ভারতের সনাতন মুক্তির সাধনা কখনও অনধীনতার মাধ্যমে সাধিত হবে না। ভারতীয়েরা একের উপাসক, তারা পৃথিবীকে কোনও দিন ভাগ-বাঁটোয়ারায় উদ্যত হয় নি। এই দুষ্প্রবৃত্তির ফলেই জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্র বিপর্যয় বরণ করেছে।[৩১]

অক্ষয়কুমারের মতো বিপিনচন্দ্রও নেশনকে জৈব (organic) প্রত্যয়ে বিশ্লেষণ করেন। নেশন তাঁর মতে একটি যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়, পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ও নয়। জীবসদৃশ নেশন সর্বব্যাপী এক চেতনা ও নীতির সমন্বয়ে আবদ্ধ। নেশনেই মানবিক সত্তার পরিপূর্তি ঘটে এবং পরমাত্মা প্রকাশমান হন ; ব্যক্তি-মানুষের মহত্তর স্বার্থানুকূলেই আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে বলে তিনি অনুভব করতেন। ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও চেতনায় ভাবী দিনের দিব্য উদ্দেশ্য অভিমুখে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপাদানে গঠিত জীবসদৃশ নেশন নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। নেশনের জৈব গঠন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> 'In a nation, the individuals composing it stand in an organic relation to one another and to the whole of which they are limbs and organs, A crowd is a collection of individuals ; a nation is an organism, the individuals are its organs. Organs find the fulfilment of their ends, not in themselves but in the collective life of the organism to which they belong. Kill the organism— the organs cease to be and to act. ... An organism is logically prior to the organs. Organs evolve, organs change, but the organism remains itself all the same. Individuals are born, individuals die, but the nation liveth for ever.'[৩২]

জাতীয়তাবাদকেও বিপিনচন্দ্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতেন। নিছক রাজ-

নৈতিক স্বাধিকারকেই তিনি পরম বলে মনে করতেন না। তাঁর কথায়: 'আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ চাহি এইজন্য যে এই স্বাধীনতা বা স্বরাজ ব্যতীত পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। আর আমার নিকটে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ অর্থ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে-দেবতা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে প্রকট করা।'[৩৩]

তাঁর মতে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যার মধ্যে বিকশিত হয়েছে জীব ও শিব যুগপৎ তারই মধ্যে প্রকাশমান। যে ভাগ্যবান এই মানুষের সাক্ষাৎলাভ করে তাকে আর মূর্তি গড়ে উপাসনা করতে হয় না। মনুষ্যত্বের বিকাশ সর্বব্যাপী বা সর্বাত্মক হলে সকলে সকলকে পূজা করবে; সংসারেই হবে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন—দুঃখদারিদ্র্য ও পরাধীনতা মনুষ্যত্ব বা দেবত্বের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। দারিদ্র্য ও অজ্ঞান দূর করে এই মনুষ্যদেবতার প্রতিষ্ঠা চাই।

তাঁর জৈব (organic) রাষ্ট্রতত্ত্বকে তিনি জাতির ন্যায় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশ এক আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নয়নের পথে চলেছে—তাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক তৎপরতা বলে মনে করা ভুল। অবশ্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি দেশের মুক্তি আন্দোলনকে বিচার করতেন বলে কার্যতঃ তাকে দার্শনিক কচকচানির মধ্যে আবদ্ধ রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া সনাতন ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক নব্যচিন্তা এক পর্যায়ের নয়। তিনি যথেষ্টই বাস্তবানুগ ছিলেন বলে রাজনীতিকে দাবা খেলার সঙ্গে তুলনা করেন। সেজন্যে রাজনৈতিক কর্মসূচীকে ধরাবাঁধা পথে নির্ধারিত না করে শাসকদের কলাকৌশল অনুসারে তা নিরূপণ করাই ছিল তাঁর অভিমত।[৩৪]

রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার পিছনে তাঁর চিন্তা দুটি প্রত্যয়ে বিভক্ত। প্রথমতঃ, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সামগ্রিক দিক থেকে তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন: **'It judges economics, politics, arts, morals, all— from the standpoint of the whole'**। ভারতীয় চিন্তায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই; রাজনীতি মানবধর্মেরই অঙ্গ ও মোক্ষলাভের অন্যতম মার্গ। জাতীয়তাবাদের এই আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে তিনি একাধারে জাতীয় আবেগ ও বৈশ্বিক চেতনাকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে; ইংরেজের মহানুভবতার মুখাপেক্ষী

না হয়ে নিজ সত্তা ও শক্তির উন্মেষ সাধনপ্রয়াস অধিকতর কাম্য ও কার্যকর বলে তিনি মনে করতেন।[৩৫]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িককালে অরবিন্দ ঘোষের চিন্তায় আরও ব্যাপক ও বিস্তৃতরূপে দেখা যায়। উভয়েই তাঁরা নবশক্তিতে ভারতের ধর্মীয় পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে সে ধর্ম বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের নয়। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ভাবধারার বিবর্তনে যে-উপাদান সংযুক্ত করেছে তারই সমন্বয়ে বিপিনচন্দ্র তাঁর 'Composite Patriotism'-এর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তাঁর মতে শিবাজি উৎসবের মতো আকবর উৎসব পালন করা হলে দেশভক্তি আরও দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

মানুষের অধিকারকে (Rights) বিপিনচন্দ্র প্রকৃতিগত বলে মনে করতেন ; মৌল অধিকারগুলি নিয়েই মানুষ জন্মায় ; যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার জগদীশ্বরই দিয়ে থাকেন ; ঐসব মৌল অধিকার মানুষের একান্তই নিজস্ব, কেউ অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না ; অধিকারবলেই মানুষ সংবিধান রচনা করে ; অধিকারের উৎস সংবিধান নয়। তিনি বলেন : 'There can be no reform, social economic or political that can be got from outside. You must gradually acquire your rights.'[৩৬]

স্বদেশী ও বয়কট শব্দ দুটি সম্পর্কেও তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। সমসাময়িক নেতারা ঐ শব্দ দুটিকে ভিন্নরূপে দেখতেন। মালব্যের দৃষ্টিতে স্বদেশী আন্দোলন ছিল দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ। টিলক মনে করতেন ঐ আন্দোলনের সাহায্যে দেশবাসীর আত্মনির্ভরতা, ত্যাগ ও দৃঢ় সংকল্পসৃষ্টির দ্বারা বিত্তবানদের বিদেশী ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে নিবৃত্ত করা সম্ভব। লাজপৎ রায় দেশীয় মূলধনকে এই প্রচেষ্টায় রক্ষা করা যাবে বলে মনে করতেন। দাদাভাই নৌরজি জনচিত্তের দর্পণে আর্থিক ও শিক্ষার বিষয়ে পুনর্গঠনের সম্ভাবনা অনুভব করতেন।[৩৭]

বিপিনচন্দ্র সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনকে শুধু অর্থনৈতিক কৌশল হিসাবে দেখতেন না। তাতে তিনি গূঢ় রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলীয়ান করার জন্যেই জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি পন্থার অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন :

> 'It is impossible to work out a divorce between politics and economics, politics and industrial advancement in

India. Swadeshism must associate itself with politics ; and when Swadeshism associates itself with politics it becomes boycott ; and this boycott is a movement of passive resistance.'[৩৮]

টিলক ও অরবিন্দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে স্বরাজ ভিক্ষার পথে আসবে না। তাই বিক্ষিপ্ত কিছু কল্যাণমূলক কাজ করে শাসকেরা যাতে সংগ্রামী জনচেতনাকে বিভ্রান্ত ও পরনির্ভর করে না তোলে সেজন্যে তিনি সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার বিষয়েই কেবল সরকারি কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারি প্রভাব থেকে জনমনকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব বিষয়েই বেসরকারি প্রচেষ্টার প্রয়োজন দর্শিয়েছিলেন।

স্বরাজ শব্দটি সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর বাংলায় লেখা 'দেশের কথা' (১৯০৪) গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তারপর কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) সভাপতি দাদাভাই নৌরজি কথাটি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। পরে বিভিন্ন নেতা স্বরাজের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। বিপিনচন্দ্র স্বরাজ বলতে জনগণের স্বরাজ এবং তার তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপটস্বরূপ 'দিব্য গণতন্ত্র' আদর্শটিকে উপস্থাপিত করেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে :

'The ideal of Swaraj that has revealed itself to us is the ideal of Divine Democracy. It is the ideal of democracy higher than the fighting, the pushing, the materialistic, I was going to say, the cruel democracies of Europe and America. This is a higher message still. Men and Gods ; and the equality of the Indian Democracy is the equality of the divine nature, the divine possibilities and the divine destiny of every individual being.'[৩৯]

সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর স্বরাজের মজবুত ইমারতের জন্য চাই সংযুক্ত ভারতের নিপুণ গাঁথুনি। তাতে ভারতের জনমন ও চেতনা সুস্থ রাজনৈতিক পথে চালিত হবে। এবং ঐতিহ্যগত আদর্শের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে ভারতের মুক্তির সাধনা দিব্য গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। শ্রীচৈতন্যকে বিপিনচন্দ্র দিব্য গণতন্ত্রের অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং এ-চিন্তার সন্ধান অদ্বৈত বেদান্তেই পাওয়া যায় বলে মনে করতেন ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও সকল প্রাণীর মধ্যে দিব্য সত্তা আছে বলা হয়েছে এবং তদনুযায়ী সকল প্রাণীই শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় সমানাধিকারী।

দিব্য গণতন্ত্রের প্রত্যয়ে মানুষমাত্রেই একটি ভোটের অধিকারী ; আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় প্রত্যয়টি ভারতীয়দের কাছে খুবই সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী।[৪০]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে গোষ্ঠীর যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-স্বার্থের বলিদান অনুচিত বটে, কিন্তু গোষ্ঠীর প্রয়োজনে ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রশ্ন অসংগত নয় ; গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে ব্যক্তির বিকাশ স্বতঃই দেখা দেবে। উভয়ের মধ্যে তিনি জৈব সমন্বয়সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তির মতামত ব্যক্ত করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করতেন।

'Imperial Federation'-এর তত্ত্ব (১৯১১) বিপিনচন্দ্রের অপর একটি নিজস্ব নতুন উদ্ভাবনা। আন্তর্জাতিক সংঘ গঠনের একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ছিল সেই তত্ত্বের মূল বিষয়। তাতে তিনি এমন এক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন যার অধীনে ব্রিটেন, ভারত ও অন্যান্য স্বয়ংশাসিত স্বাধীন ডোমিনিয়নগুলি পারস্পরিক উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার জন্য আবদ্ধ থাকবে। একই সংস্থাধীনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সকলেই পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সমসাময়িককালে শ্বেতকায় দেশগুলিকে নিয়ে ঐধরণের সংস্থা গঠনের চেষ্টা হয়েছিল— বিপিনচন্দ্র সেই প্রয়াসকেই ভিন্ন রূপে জাতি ও বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্ত করে এক সমবায়ী সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর সেদিনের চিন্তা যেন আজকের কমনওয়েলথ অব নেশনসে রূপায়িত হয়েছে।

তাঁর সেই রাজনৈতিক ফেডারেশনের সঙ্গে তিনি এক আধ্যাত্মিক ফেডা-রেশনের স্বপ্নও দেখেছিলেন। হিন্দুধর্মকে তিনি নানা মত ও পথের সমন্বয়স্বরূপ একটি ফেডারেশনের সমতুল্য জ্ঞান করতেন। বিশ্বজনীন ফেডারেশন গঠনকল্পে বিশ্বের সকল জাতি ও তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ভারতীয়দের তিনি আহ্বান জানান। তাঁর মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নয়।

তাঁর সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞাও স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রচলিত ধারণা, বিশেষ করে মার্কস বা লেনিনের চিন্তার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> '...modern imperialism is not a pure falsehood or an absolute wrong. Its falsehoods are mixed up with its truths and its wrongs with its rights...The greatest fascination of imperialism, to the modern mind, is that it makes for the unification of humanity to an extent and upon a measure

that is impossible under any other known form of human organization or association.'[৪১]

সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে মানবিক মূল্যবত্তা সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের সমসাময়িক সংকীর্ণ ও অত্যাচারী রূপ সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই অবহিত ছিলেন। তিনি সেই সংকীর্ণতা অতিক্রম করে একটি সার্বজনীন রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করা যায় বলে মনে করতেন। লীগ অব নেশনস বা ইউনাইটেড নেশনসের চিন্তা তখন মাতৃজঠরে। সাম্রাজ্যকে তিনি একটা ফেডারেশনের দৃষ্টিতে কল্পনা করেন এবং সেই ফেডারেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি হবে স্বয়ংশাসিত। তাঁর কথায়:

'The empire idea is essentially larger and broader than the nation idea. It aims at the unification of widely separated territories, of widely divergent interests, of widely different cultures, into one organic whole.'[৪২]

তাঁর এই চিন্তার পিছনে একটি বিশ্বজনীন ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সমন্বয়ের কল্পনা ছিল। তিনি যে-সাম্রাজ্যের কল্পনা করেন সেখানে বিশেষ কোনও দেশ বা জাতির আধিপত্য অনুপস্থিত। সেখানে সকলেরই স্থান সমান। তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে এই ধারণায় যে, দুনিয়ার কোনও জাতিই অপর হতে বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। সমাজ থেকেও মানুষ যেমন বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না, তেমনি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক প্রয়োজন ও সুবিধার দিক থেকে সমুদয় রাষ্ট্রের সুসংবদ্ধ সম্পর্ক থাকা চাই। সমাজের মতো সাম্রাজ্যকেও বিপিনচন্দ্র জৈব (organic) বিচারে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বসমন্বয়কারী সংস্থা তথা মানবজাতির ঐক্যবিধানের চিন্তা তাঁর বৈশ্বিক মানবতন্ত্রী চেতনায় গঠিত হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমাগত পরিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পারম্পর্যের অভাব সুপরিস্ফুট। আর সে-বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেকার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের 'Imperial Federation' তত্ত্বের কোনও বিরোধ আছে বলে তিনি মানতেন না। তাঁর মতে— প্রথমে জাতির ভিতকে শক্ত করতে হবে, তারপর চাই বৈশ্বিক সমন্বয় ও মিলন।

পাঁচ : আর্থনীতিক চিন্তা

আর্থনীতিক বিষয়ে বিপিনচন্দ্র কোনও নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন বা তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করেন নি। তাঁর আর্থনীতিক চিন্তা ছিল মূলতঃ বিশ্লেষণমুখী। রানাডে, নৌরজি বা রমেশ দত্তর মতো তিনিও সমকালীন বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটে ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ আলোচনা করেন এবং স্বকীয় দৃষ্টিতে এক নতুন দিকের নিশানা জানান।

ভারতে ইউরোপের অনুকরণে শিল্পোন্নয়নের তিনি বিরোধী ছিলেন। কারণ প্রথমতঃ তাতে মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। মেশিনের ব্যবহার দুই কারণে দরকার হয়— এক, শ্রমের অপচয় নিবারণ ; দুই, দ্রুত উৎপাদন। শ্রমের ক্ষেত্রে মেশিনের বহুল ব্যবহার পরিণামে ভারতের বেকার সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কৃষির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম শিল্পে নিয়োজিত হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।[৪৩] ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারার দিক থেকে বিচার করে তিনি বলেন যে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতীয় শ্রমজীবী ও কারিগরেরা তাদের পূর্বতন স্বাধিকার হারাবে। অতীতে ভারতের শ্রমজীবীরা নগর ছাড়া অন্যত্র কোথাও সর্বাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কুশল কারিগর ও শিল্পশ্রমিকেরা কিছু সময় কৃষিকর্মে অতিবাহিত করে স্বয়ংনির্ভর থাকত। তাদের পুঁজিরও সেজন্যে খুব বেশি প্রয়োজন হত না ; অর্থনৈতিক স্বাধিকার সেজন্যে তাদের অক্ষুণ্ণ থাকত। সমবায়ী ব্যবস্থা থাকার ফলে অর্থনৈতিক শোষণ বলে কিছু ছিল না। একাধারেই তারা ছিল শ্রমিক ও মালিক। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের পরিমাণ ও গতির প্রশ্ন তখনই কার্যকর হয় যখন পণ্যের বহির্বাজার হস্তগত থাকে। ভারতের না আছে পর্যাপ্ত পুঁজি, না আছে বহির্বাজারে আধিপত্য। পরাধীন অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থেব অনুকূলে জুড়ে রাখা হবে— এই আশঙ্কায় বিপিনচন্দ্র ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ভারতীয় ধারায় গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে ইউরোপের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ধারার পক্ষে অনুপযোগী।[৪৪]

তিনি মনে করতেন যে পাশ্চাত্ত্যের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব উপেক্ষিত। সাধারণ মানুষ সেখানে অবিরত শোষিত ও নিপীড়িত হয়। অবশ্য ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে তাদের দুর্গতি কিছুটা প্রশমিত হয়েছে ; দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংগঠন, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। সংঘবদ্ধভাবে সেখানকার শ্রমিকেরা মালিকদের

that is impossible under any other known form of human organization or association.'[৪১]

সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে মানবিক মূল্যবত্তা সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের সমসাময়িক সংকীর্ণ ও অত্যাচারী রূপ সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই অবহিত ছিলেন। তিনি সেই সংকীর্ণতা অতিক্রম করে একটি সার্বজনীন রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করা যায় বলে মনে করতেন। লীগ অব নেশনস বা ইউনাইটেড নেশনসের চিন্তা তখন মাতৃজঠরে। সাম্রাজ্যকে তিনি একটা ফেডারেশনের দৃষ্টিতে কল্পনা করেন এবং সেই ফেডারেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি হবে স্বয়ংশাসিত। তাঁর কথায় :

'The empire idea is essentially larger and broader than the nation idea. It aims at the unification of widely separated territories, of widely divergent interests, of widely different cultures, into one organic whole.'[৪২]

তাঁর এই চিন্তার পিছনে একটি বিশ্বজনীন ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সমন্বয়ের কল্পনা ছিল। তিনি যে-সাম্রাজ্যের কল্পনা করেন সেখানে বিশেষ কোনও দেশ বা জাতির আধিপত্য অনুপস্থিত। সেখানে সকলেরই স্থান সমান। তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে এই ধারণায় যে, দুনিয়ার কোনও জাতিই অপর হতে বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। সমাজ থেকেও মানুষ যেমন বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না, তেমনি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক প্রয়োজন ও সুবিধার দিক থেকে সমুদয় রাষ্ট্রের সুসংবদ্ধ সম্পর্ক থাকা চাই। সমাজের মতো সাম্রাজ্যকেও বিপিনচন্দ্র জৈব (organic) বিচারে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বসমন্বয়কারী সংস্থা তথা মানবজাতির ঐক্যবিধানের চিন্তা তাঁর বৈশ্বিক মানবতন্ত্রী চেতনায় গঠিত হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমাগত পরিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পারম্পর্যের অভাব সুপরিস্ফুট। আর সে-বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেকার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের 'Imperial Federation' তত্ত্বের কোনও বিরোধ আছে বলে তিনি মানতেন না। তাঁর মতে— প্রথমে জাতির ভিতকে শক্ত করতে হবে, তারপর চাই বৈশ্বিক সমন্বয় ও মিলন।

পাঁচ : আর্থনীতিক চিন্তা

আর্থনীতিক বিষয়ে বিপিনচন্দ্র কোনও নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন বা তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করেন নি। তাঁর আর্থনীতিক চিন্তা ছিল মূলতঃ বিশ্লেষণমূখী। রানাডে, নৌরজি বা রমেশ দত্তর মতো তিনিও সমকালীন বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটে ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ আলোচনা করেন এবং স্বকীয় দৃষ্টিতে এক নতুন দিকের নিশানা জানান।

ভারতে ইউরোপের অনুকরণে শিল্পোন্নয়নের তিনি বিরোধী ছিলেন। কারণ প্রথমতঃ তাতে মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। মেশিনের ব্যবহার দুই কারণে দরকার হয়— এক, শ্রমের অপচয় নিবারণ ; দুই, দ্রুত উৎপাদন। শ্রমের ক্ষেত্রে মেশিনের বহুল ব্যবহার পরিণামে ভারতের বেকার সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কৃষির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম শিল্পে নিয়োজিত হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।[৪৩] ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারার দিক থেকে বিচার করে তিনি বলেন যে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতীয় শ্রমজীবী ও কারিগরেরা তাদের পূর্বতন স্বাধিকার হারাবে। অতীতে ভারতের শ্রমজীবীরা নগর ছাড়া অন্যত্র কোথাও সর্বাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কুশল কারিগর ও শিল্পশ্রমিকেরা কিছু সময় কৃষিকর্মে অতিবাহিত করে স্বয়ংনির্ভর থাকত। তাদের পুঁজিরও সেজন্যে খুব বেশি প্রয়োজন হত না ; অর্থনৈতিক স্বাধিকার সেজন্যে তাদের অক্ষুন্ন থাকত। সমবায়ী ব্যবস্থা থাকার ফলে অর্থনৈতিক শোষণ বলে কিছু ছিল না। একাধারেই তারা ছিল শ্রমিক ও মালিক। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের পরিমাণ ও গতির প্রশ্ন তখনই কার্যকর হয় যখন পণ্যের বহির্বাজার হস্তগত থাকে। ভারতের না আছে পর্যাপ্ত পুঁজি, না আছে বহির্বাজারে আধিপত্য। পরাধীন অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে জুড়ে রাখা হবে— এই আশঙ্কায় বিপিনচন্দ্র ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ভারতীয় ধারায় গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে ইউরোপের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ধারার পক্ষে অনুপযোগী।[৪৪]

তিনি মনে করতেন যে পাশ্চাত্ত্যের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব উপেক্ষিত। সাধারণ মানুষ সেখানে অবিরত শোষিত ও নিপীড়িত হয়। অবশ্য ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে তাদের দুর্গতি কিছুটা প্রশমিত হয়েছে ; দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংগঠন, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। সংঘবদ্ধভাবে সেখানকার শ্রমিকেরা মালিকদের

কাছে ন্যায্য সুযোগসুবিধা আদায়ের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের শেষ যে কোথায় তা অপরিজ্ঞাত; পরিণামে হয়তো একটা সমন্বয় অথবা চরম বিনাশ সংঘটিত হবে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শিল্পোন্নতির অনুকরণ ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আদৌ কার্যকর হবে না বলে বিপিনচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতে এই প্রচেষ্টার পিছনে নবজাত দেশীয় পুঁজিবাদী শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তভাবে সক্রিয়। নীতিগতভাবে তাদের সমর্থন করেন এদেশের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁর মতে এই প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। ভারতের নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভরশীল। সময় বিশেষে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কৃষির ব্যাঘাত ঘটলে তাদের অধিকাংশ অনাহারে দিন কাটায়। সেজন্যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিল্পোৎপাদনে নিয়োগ করা প্রয়োজন। শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনকে বিপিনচন্দ্র অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তার রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি।

নৌরজি, রমেশ দত্ত, গোখলে প্রমুখ ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের মতো তিনিও মনে করতেন যে ইংরেজ শাসনকালে দেশের ধনসম্পদ দ্রুত বিদেশে পরিবাহিত হয়ে চলেছে। ভারতে বৈদেশিক মূলধন অতি বেশি লগ্নী হওয়ায় এখানকার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশ চরম বিনাশের সম্মুখীন। এদেশে ইংরেজের রাজনৈতিক শাসনের পিছনে যে অর্থনৈতিক শোষণের অভিসন্ধি নিহিত সে-সম্পর্কে তাঁর চেতনা ছিল প্রখর। তিনি মনে করতেন যে রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধেই এতকাল যাকিছু আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, অর্থনৈতিক শোষণের প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয় নি।[৪৫] প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর ব্রিটেনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন :

১. ক্ষয়িষ্ণু রাজকোষকে দেউলিয়া থেকে রক্ষার জন্য স্বর্ণের যথোচিত রিজার্ভ ব্যতিরেকেই অবাধে নোট ছাড়া হচ্ছে;
২. মহাযুদ্ধের দায়দেনা ও রাশিয়া ও অন্যান্য স্থানে সামরিক ক্রিয়াকলাপের ফলে দৈনিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হচ্ছে;
৩. রাজস্বের স্বাভাবিক আদায় থেকে ঐ ব্যয়নির্বাহ অসম্ভব;
৪. ইংরেজ রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদরা এইকারণে একটা উপায় উদ্ভাবন করেছেন যাতে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের সঙ্গে মুনাফার অংশীদারী শর্তে গঠিত

সংস্থার মাধ্যমে উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে উদ্যোগী হতে পারে ;

৫. ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতির অনুকূলে পূর্বতন অবাধ বাণিজ্য-নীতির বর্জন ;

৬. যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধেরই কাজকারবারে কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি বিরাট অঙ্কের মুনাফা লুটেছে ;

৭. যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের শিল্পবাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ;

৮. ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ; তারা শুধু মুনাফারই অংশ চায় না, কলকারখানার পরিচালনাতেও তারা অংশ গ্রহণ করতে চায় ;

৯. ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার পক্ষে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার শ্রমিক আন্দোলন।[৪৬]

বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্রিটেন তার ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলির কাঁচা মাল ও সস্তার মজুরির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। এই নতুন অর্থনৈতিক অভিসন্ধিকে নির্বাধে কার্যকর করার জন্য ভারতে মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৭-১৯) প্রস্তাব উঠেছে। কি ভারত সরকার, কি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট উভয়েরই টিকি ইংরেজ পুঁজিপতিদের কাছে বাঁধা। এমতাবস্থায় বিপিনচন্দ্র শত্রুর শত্রু অর্থাৎ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রমিকদল একদিকে নিজ দেশের পুঁজিপতি মনোভাব সম্পর্কে সচেতন, অন্যদিকে নিপীড়িত ভারতীয়দের প্রতিও সহানুভূতিশীল ; তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিলাতের শ্রমিক দলের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।[৪৭]

তিনি সেইসঙ্গে একথাও বলেন যে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না, যদি তারা দেখে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ দেশের পুঁজিবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে নীরব রয়েছে। তাই তিনি ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ভারতীয় শ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক আট ঘণ্টা এবং ইংলণ্ডের শ্রমিকদের সমতুল্য মজুরির জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য তিনি আইনানুগ ব্যবস্থারও দাবি করেন। এর ফলে ভারতের সস্তার মজুরির প্রতি ইংরেজের আর আকর্ষণ থাকবে না। বিপিনচন্দ্র এই দৃষ্টিতে ব্রিটেন ও ভারত তথা সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রস্তাব তোলেন।[৪৮]

সস্তার মজুরির পর সস্তার কাঁচা মালের প্রশ্ন। সেদিকে ইংরেজদের প্রলুব্ধ দৃষ্টিকে প্রত্যাহৃত করার জন্য তিনি ভারতে লগ্নী মূলধন থেকে প্রাপ্ত মুনাফার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিতে চান। উদ্বৃত্ত মুনাফা রাজকোষে জমা দেওয়া বাধ্যতা-মূলক করলে দেশোন্নয়নে অর্থের ঘাটতি হবে না। তিনি মনে করতেন যে ভারতীয় শ্রমিকদের ইংরেজ শ্রমিকদের সমতুল্য বেতন ও পদমর্যাদা দিলে প্রকারান্তরে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির সম্পর্ক উন্নত হবে। ভারতীয় শ্রমিকদের ঐসব দেশে জীবিকার সন্ধানে বসবাস বে-আইনি করার কথা আর উঠবে না। ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি কম বলে ঐসব দেশের পুঁজিপতিরা দেশীয় শ্রমিকের পরিবর্তে ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ করে। ফলে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর মনে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দেখা যায়।[৪৯]

ছয় : শিক্ষাচিন্তা

জীবিকাসূত্রে বিপিনচন্দ্র প্রথমজীবনে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী-কালে তিনি সাংবাদিক হন। মাঝে কিছুকাল তাঁকে গ্রন্থাগারিক পদে দেখা যায়। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তার পরিচয় যা পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ সমালোচনামূলক। এ বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনার গভীরে তিনি বিশেষ প্রবেশ করেন নি। জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের অন্যতম সংগঠকরূপে প্রচারকালে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি থেকে তাঁর শিক্ষাদর্শের একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়।

ভারতের সনাতন আদর্শানুসারে তিনি শিক্ষার তত্ত্বগত ভিত্তিস্বরূপ মানুষের জীবনসম্পৃক্ত পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দর্শিয়েছেন। বিষয় পাঁচটি হল : ১. দেহ, ২. অন্তর, ৩. অনুভূতি, ৪. বৈষয়িক কর্ম, ৫. দিব্য প্রেরণা।[৫০]

মানুষের এই পাঁচটি বিষয়ের চাই সমন্বয়, একটির দ্বারা অন্য কোনোটির অবদমন নয়। এগুলির ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের নিম্নবৃত্তিগুলি উচ্চবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আত্মিক সত্তার নিরঙ্কুশ মুক্তি ও আধিপত্য দেখা দেয়। উপরোক্ত বিষয় পাঁচটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিয়মাধীন— যেমন দেহ ও অন্তর শারীরবৃত্ত

ও মনস্তত্ত্বের (Psychophysics) অধীন। বিষয় পাঁচটির সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে।[৫১]

মননশীলতা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা চাই। দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মুখস্থ বিদ্যারই প্রাধান্য বেশি, বোধ ও বুদ্ধিগত বিকাশের সুযোগ অনুপস্থিত। জাতীয় ভাবধারার সঙ্গেও তার আদৌ সংযোগ নেই। মাটির সঙ্গে যোগসূত্রহীন টবে ঝোলানো অর্কিডের মতো এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে ; দেশীয় ধারা ও বিষয়ের পরিবর্তে বিদেশী বিষয়েই ঐ ব্যবস্থা নিবদ্ধ। এর কারণ এদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে ইংরেজের উদ্যোগে।[৫২]

ইংরেজ নিজের শাসন ও শোষণের তাগিদেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপায়িত করেছে। তারা শিখিয়েছে 'ঘটত্ব ও পটত্ব'—যাতে দেশবাসীর 'দাসত্ব' অটুট থাকে। তাই দেশের লোকের চিত্ত 'ঘটাকাশ ও পটাকাশেই' আবদ্ধ—ফলে রাজনৈতিক আকাশ কোলাহল থেকে মুক্ত। আধুনিক শিক্ষার আলোক ভারতবাসীরা পাক্‌ সেটা শাসকদের অভিপ্রায় নয়। কারণ ইউরোপীয় চিন্তা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ আস্বাদ পেলে এখানকার সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্ত্যের গণতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা দাবি করবে। শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—যাতে শাসকদের কায়েমী স্বার্থ তারা অক্ষুণ্ণ রাখে। সেই দৃষ্টিতেই ঐ শ্রেণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পশ্চিমী ভাবধারায় এবং শাসকদের স্বার্থানুকূলে ঐ শ্রেণীকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সাধারণ মানুষ ও আমলাতন্ত্রের মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করতে পারে। জনসাধারণের আনুগত্য তারা একদিকে অর্জন করে, অপরদিকে বিদেশী শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তুষ্টিবিধানের মাধ্যমে নিজেদের সুযোগসুবিধা আদায়ের সঙ্গে নানা সম্মান ও খেতাবে ভূষিত হয়। ভারত সরকারের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই এই নীতি অনুসারে পরিকল্পিত ও রূপায়িত।[৫৩]

বিপিনচন্দ্র চাইতেন দেশের ঐতিহ্য, আবেগ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশেরই প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন। ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে যেমন স্বতন্ত্র আচারবিচার, ইচ্ছা, অভিরুচি, কল্পনা ও নানাবিধ প্রবণতা থাকে তেমনি সংশ্লিষ্ট দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতাত্ত্বিক গঠন, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি অতি স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে

তারতম্য থাকে। তাছাড়াও এক জাতি থেকে অপর জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গঠন পৃথক হতে পারে। সেজন্যে প্রতি জাতিরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে জাতীয় আবেগ, ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫৪]

বিপিনচন্দ্র মানসিক শিক্ষার সঙ্গেই বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রথমটি ব্যতিরেকে মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়বে এবং দ্বিতীয়টির অবহেলায় ব্যক্তি ও জাতির বৈষয়িক অগ্রগতি নিশ্চল হয়ে পড়বে। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রমের বিবরণ-দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পর্ষদে বয়স ও মানসিক গঠন অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদনে যুক্ত করার নীতি গৃহীত হয়; ক্রমে ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের পর একদলকে গবেষণা, অধ্যাপনা ইত্যাদিতে চালিত করা হয় এবং অপরদলকে উৎপাদনের প্রয়োজনে লব্ধ জ্ঞানের প্রযুক্তিকরণে উৎসাহিত করা হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে তিনি অপরিহার্য মনে করতেন।

সুরেন্দ্রনাথের মতো বিপিনচন্দ্রেরও এই অভিমত ছিল যে ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা অনুচিত নয়। বৈশ্বিক মানবতার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে শিক্ষায় দেশপ্রেম সঞ্চার করাও একান্ত প্রয়োজন।[৫৫]

সাত : উপসংহার

রামমোহনের সময় থেকে বাঙালীর মননজীবনে যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল তাতে হয়তো এখনকার রাজনৈতিক দৃষ্টিতে জাতীয়তাবোধ ছিল না, কিন্তু স্বীয় সমাজমুখী ও ঐহিক জীবনবোধ দেখা দেয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই জাতীয় চেতনার ভূমি উর্বর হতে শুরু করেছিল। দেশ গঠনের তাগিদে প্রাচীন মূল্যবত্তার পুনরুদ্ধার, নতুন সমাজবোধের উন্মেষ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির নবরূপায়ণের প্রয়োজনে দেশের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছিল। বিপিনচন্দ্রের কথায়, 'আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা

Nationalism-এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।'[৫৬] স্বদেশাভিমান, স্বাদেশিকতা বা জাতীয় মনোভাব প্রথম দিকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা থেকেই দেখা দিতে শুরু করে। দেশের এই সামাজিক বিবর্তনধারায় বিপিনচন্দ্রের মন গড়ে ওঠে।

রাজনারায়ণ বসুর স্বাদেশিকতার আদর্শ ও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা তাঁর দেশভক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বাদেশিকতা মিশ্রিত ব্রাহ্ম-ধর্মের আদর্শ ও সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন। যৌবনে 'তত্ত্ববোধিনী' গোষ্ঠীর আদর্শ অপেক্ষা 'বঙ্গদর্শন' লেখকগোষ্ঠী তাঁর স্বদেশচেতনাকে অধিক অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দার্শনিক চিন্তায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র দেশপ্রেমিকতার আদর্শে সংকীর্ণতা ও জাতিবিদ্বেষ ছিল না এবং তাতে জাতির পূর্ণাঙ্গ জাগরণের নির্দেশ তিনি অনুভব করেন। সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মের মানবতন্ত্রী নববোধ ক্রমে জাতীয় চেতনার দিকে অগ্রসর হয়— ব্রাহ্মধর্ম ও সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধ ক্রমে ম্লান হয়ে যায় সেই নবচেতনায়— তার পিছনে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান; সেই সঙ্গে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমোদয়, নবপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের ধীরগতিতে সাবালকত্ব অর্জন, শাসকদের উত্তরোত্তর দমননীতি জাতীয় অভিমান ও চেতনায় গতি সঞ্চার করে। আত্ম-শক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে যাঁরা এগিয়ে আসেন বিপিনচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিপিনচন্দ্রের মুক্তবুদ্ধি ও উদার মননশীলতার মস্ত পরিচয় হল যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হয়েও সনাতন হিন্দু আদর্শ ও বৈষ্ণবধর্মের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের আদর্শে অবতারবাদ ও কৃষ্ণচরিতের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যুগের উপযোগিতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। ব্রাহ্মদের নীতিচ্যুতি ও সনাতন-পন্থী হিন্দুদের আপসবিহীন রক্ষণশীলতা থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভিন্ন পথে পদক্ষেপ করেন।

রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে বিপিনচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী দলের শীর্ষস্থানীয়। ঐদলের অন্যতম নেতা টিলকের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার পশ্চাতে ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তা। বিপিনচন্দ্র টিলকের আদর্শকে আধুনিক আবরণ দিতে গিয়ে তার ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গৌণ পর্যায়ে নিয়ে যান; সমসাময়িক যুগের দাবিই হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করেছিল— সে দাবি অতীতের দিকে তাকিয়ে পারত্রিক সুখ চায়নি— চেয়েছিল ঐহিক জীবনের

উন্নতি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজনির্দেশ ছিল প্রচ্ছন্ন। বিপিনচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন শক্তিশালী বিদেশী শাসকদের নির্মূল করতে হলে চাই যুগোপযোগী আদর্শ ও কর্মপন্থা। তাঁর পথ অনুসরণ করে টিলকও ধর্মরক্ষা ও গোরক্ষার পরিবর্তে স্বদেশী ও বয়কটের নীতি গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্র ধর্মীয় আবেগমিশ্রিত উগ্র জাতীয়তাবাদকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরিণত করেন। তাই সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙনের পর ১৯০৭ সালে তাঁকে চরমপন্থীদের কাছে এই কর্মপন্থা উপস্থাপিত করতে দেখা যায়: ১. শিক্ষার সম্প্রসারণ; ২. জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন; ৩. জাতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন; ৪. যথাসময়ে জাতীয় দল গঠিত হলে তার দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক দল গঠন।[৫৭]

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের আমেজ বেশি দিন থাকে নি। তার মন্ত্রস্পর্শে দেশবাসীর জীবনে সঞ্চারিত প্রাণের আবেগ ক্রমে শ্রেণী-বিশেষেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—মননক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই আবেগ শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সৃজনীশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এর বিস্তৃত কারণ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) ও মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯) মাঝামাঝি কাল একপ্রকার নিস্তেজ পরিবেশের সাক্ষ্যই বহন করে। বিপ্লবীরা কেবল সেসময়ে তলে তলে প্রস্তুতিকার্য চালিয়ে যান। তৃতীয় দশকে গান্ধীর নেতৃত্বে আবার এক অভাবনীয় জাগরণ দেখা দেয়। তখন আন্দোলনের উন্মাদনা যতই ঘটে থাকুক না কেন বাংলার জনচিত্তে স্বদেশী যুগে যে প্রাণের সংযোগ ঘটেছিল অসহযোগ পর্বে তা তেমন পারে নি;[৫৮] বিশেষ করে মুষ্টিমেয় যাঁরা গান্ধী আন্দোলনকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মনে অসহযোগ আদর্শ কোন দাগ কাটতে পারে নি। নব অংকুরিত জনচেতনাকে বিদ্যালয়, আদালত, আইন পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানসিক পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁরা চান নি। সেজন্যে নিন্দা ও অপবাদের সঙ্গে সেসময়ে যে-কজনকে একঘরে করা হয় বিপিনচন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন 'লজিকে'র পক্ষপাতী, তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীর 'ম্যাজিক' বুঝতে পারেন নি। গান্ধীবাদী আন্দোলনের উন্মাদনায় তিনি বুদ্ধিজীবনের অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তেমনি নির্বিচার গুরুবাদ বা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অন্ধ অনুসরণও তিনি লক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিপূজার বিরোধী বুদ্ধিবাদী বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সংঘর্ষ ঘটা সেদিন তাই খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিপিনচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ও

সমসূত্রে গাঁথা এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই ভেবে যে, বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতায় জনমন সংকীর্ণ গলিপথে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।[৫৯]

বিপিনচন্দ্রের বহু কিছু দূরদৃষ্টির অন্যতম হল গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলনের পরিণামদর্শিতা। ইসলাম ধর্মের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে মুসলমানদের অন্ধ আধ্যাত্মিক ঐক্যের জিগিরের সঙ্গে রাজনৈতিক একতার কোনও সম্বন্ধ নেই। তাই দেখা যায় যে তুরস্কের নবজাগরণের ফলে খিলাফৎ প্রশ্ন ধুয়ে মুছে গেলেও ভারতে সেই আন্দোলনের জের হিসাবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্রমে ভারতীয় জাতীয়তা ও একতার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়।[৬০]

উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতা সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র যে হীন সাম্প্রদায়িক ভাবনার উর্ধ্বে ছিলেন সেকথা তাঁর *Composite Patriotism*-এর তত্ত্বই প্রমাণ করে। তিনি বুঝেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের যুগযুগান্তরের অবদানে ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্য পরিপুষ্ট। সুতরাং সকলের সমবায়ে ভারতবর্ষীয় এক মহাজাতির ঐকতান সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করে সকলের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও সাধনার সমন্বয় প্রয়াস এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির যে-ফেডারেশন স্থাপনের কথা তিনি ভেবেছিলেন তা আজকের পৃথিবীতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রকট হওয়ার পর নতুন করে উপযুক্ত বিবেচনার দাবি রাখে। ডেমোক্রেটিক স্বরাজ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে প্রচলিত গণতন্ত্রে মানুষের কর্মশক্তি (initiative) সীমাবদ্ধ; প্রয়োজনবোধে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অপসারণ (recall) করার অধিকারও অনুপস্থিত। তাই তিনি গণতান্ত্রিক তৃণমূল-ভিত্তিক পিরামিডাকারে বিন্যস্ত শাসন-কাঠামোর সাহায্যে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন।[৬১] তাঁর ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন প্রস্তাবটিকে হয়তো সেইসময়ে (১৯১০-১১) গালভরা তত্ত্বকথা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেটি যে কত সময়োপযোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা পরবর্তীকালে জাপানের আগ্রাসী নীতি, চীনের অভ্যুত্থান, ঐসলামিক দেশগুলির জোটবন্ধনের প্রয়াস ইত্যাদি প্রমাণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের পরিবর্তে সংযুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর (Federal Self Rule) প্রয়োজন 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতির সমানাধিকার-ভিত্তিক সমন্বয়ের বনিয়াদরূপে তিনি আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী চিন্তাকে রেখেছিলেন। মানব সভ্যতার

বিবর্তনেও তিনি ঐ একই সুরের সন্ধান করেন। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সব কিছুর মূলে তিনি নারায়ণস্বরূপ মানবতাকে উপলব্ধি করেন।

চরমপন্থী থেকে তিনি ক্রমে নরমপন্থী হয়ে পড়েছিলেন। দেশবাসীর অপরিণত রাজনৈতিক চেতনা, উচ্ছ্বাস ও আবেগসর্বস্ব আন্দোলনের নিষ্ফলতা প্রভৃতি মিলিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেদিক থেকে তাঁর শেষজীবনের সেই মনের গতি ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাঁর চরিত্রে একদিকে যেমন দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় দেখা যায় তেমনি বিরোধী পক্ষের চিন্তাভাবনা ও অবদানের প্রতিও যথোচিত স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ করা যায়। এর একটি নজির হল কংগ্রেসের গোড়ার যুগে 'ধীরে চল' নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি পূর্বসূরীদের কর্মতৎপরতায় দেশের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। 'নবযুগের বাংলা' ও 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থ দুটিতে তাঁর এই বাস্তবানুগ সমাজবোধের পরিচয় ও ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা লক্ষণীয়। আজকালকার রাজনীতিতে এ-ধরণের চরিত্র সত্যই বিরল।

বিপিনচন্দ্রের জীবন ও মননের একটি স্ববিরোধ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার। চিন্তা ও ব্যাবহারিক দিক থেকে তিনি যথেষ্টই যুক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু প্রেরণার সন্ধান তাঁর সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ ছিল। নিজেই লিখেছেন: 'উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন।'[৬২] তাঁর এই উপলব্ধি অতীন্দ্রিয় (mystic) অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তিনি তাঁর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে অন্যান্য অনেক নেতার মতো সমাজসাধনায় টেনে আনেন নি। আধ্যাত্মিক ভাবনাকে ব্যাবহারিক ও যুক্তিগত দিক থেকে স্থাপনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর আদর্শ—এবং সেজন্যে বাস্তববোধের যে প্রাধান্য থাকা দরকার সেবিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল না। বিপিনচন্দ্রের উভবলী প্রবণতা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "Pal appeared to be bewildered by the extremely contradictory tendencies of his own ideas. Bourgeois radicalism coupled with religious reformism rendered his political vision rather foggy...Progressive liberalism was getting the upper hand of the religious mysticism in Pal's nationalistic philosophy. Revolutionary tendencies overwhelmd the forces of reaction focussed through him. His pathetic

desire for the imperial connection, in itself, was but a sign of subjective weakness ; but this desire originated in a hidden mistrust of all those ideals cherished by orthodox nationalism.'[৬৩]

তবে তাঁর মননজীবনে নিষ্ঠা, ব্যক্তিপূজা ও অন্ধ আনুগত্যকে স্বীকার না করা এবং তথ্যনির্ভর চিন্তাকে আশ্রয় করে নির্ভীক মনোভাব ব্যক্ত করার সৎ সাহস প্রতিকূল প্রভাব ও পরিবেশকে বহুলাংশেই কাটিয়ে চলত। ভারতীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য অন্ধ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে না পারায় বিপিনচন্দ্রকে শেষজীবনে কোণঠাসা হতে হয়। তাবলে তিনি কর্মজীবনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি কিংবা সুখের তাগিদে নিজের চিন্তা ও সত্তাকে বিকিয়ে দেন নি। সেজন্য তিনি অন্তিমজীবনে অশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেশের অনভিপ্রেত গতিকে তুলে ধরার অপরাধে তাঁর উপর নানা কুৎসা বর্ষিত হয় ; ভারতীয় রাজনীতির রীতি অনুযায়ী তাঁর কণ্ঠরোধেরও নানা ব্যবস্থা হয়। স্পেনদেশীয় দার্শনিক Jose Ortega y Gasset-(১৮৮৩-১৯৫৫)-এর একটি বর্ণনা বিপিনচন্দ্রের প্রসঙ্গে বুঝি আশ্চর্যভাবে মিলে যায় :

'...we are witnessing the triumphs of hyperdemocracy... The mass crushes beneath it everything that is excellent, individual, qualified and select. Anyone who is not like everybody runs the risk of being eliminated.'[৬৪]

নি র্দে শি কা

১. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* Geneve, 1926, p. 195.

২, The Earl of Ronaldshay. *The Heart of Aryavarta. 1928*, p. 89,

৩. 'বিনয়কুমার সরকারের বৈঠকে'। ১ম ভাগ, ১৯৪৪, পৃ ৩৩১।

৪. বিপিনচন্দ্র পাল। 'সত্তর বৎসর : আত্মজীবনী'। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পৃ ২২৪।

৫. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj* : the rise of new patriotism. 1954, p. 124.

৬. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee. *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj*. 1958, p. 12.
৭. *Ibid.* Appendix III.
৮. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ'। ১৯৫৬, পৃ ৫৭৩।
৯. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj*. p. 217.
১০. H. Mukherjee & U. Mukherjee. *Bipin Chandra Pal*... p. 106.
১১. *Ibid*. p. 107
১২. *Ibid*. p. III
১৩. *Ibid*. p. 113
১৪. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। ১৯৬৪, পৃ ১২৬।
১৫. Bipin Chandra Pal. *Bengal Vaishnavism*. 1962, p. 2.
১৬. *Ibid*. p. 4.
১৭. *Ibid.*
১৮. *Ibid*. p. 7.
১৯. *Ibid*. p. 8.
২০. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। ১৯৬৪, পৃ ১৭।
২১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৮।
২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৮৯-২৯২।
২৩. Bipin Chandra Pal. *Writings and Speeches*. 1958, Vol. I, p.61.
২৪. P. D. Saggi. *Life and Work of Lal, Bal and Pal.* (Collection of Speeches and Writings) 1962, p. 280.
২৫. Bipin Chandra Pal. *Soul of India*. 1911, p. vii. (Preface)
২৬. *Life and Utterances of B. C. Pal*. pp. 27-28.
২৭. বিপিনচন্দ্র পাল। 'রাষ্ট্রনীতি'। ১৩৬৩, পৃ ১।
২৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২-১২।
২৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬০-৬১।
৩০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬৪-৭২।
৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৬।
৩২. Quoted in : Varma. *Modern Indian Political Thought*. p. 366.

৩৩. বিপিনচন্দ্র পাল। 'রাষ্ট্রনীতি'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ২০।

৩৪. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj.* p. 206.

৩৫. Bipin Chandra Pal. *Spirit of Indian Nationalism.* 1910, p. 4.

৩৬. *Life and Utterances of B. C. Pal.* pp. 27-28

৩৭. B. Pattabhi Sitaramyya. *History of the Indian National Congress* (1885-1935). 1935, p. 84.

৩৮. Quoted in : Varma. *Modern Indian Political Thought.* p. 368.

৩৯. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj.* p. 201.

৪০. Bipin Chandra Pal. *Memories of My Life and Times.* Vol. I, 1935, pp. 355-357.

৪১. Bipin Chandra Pal. 'Nationalism and Imperialism', in : P. D. Saggi. *Life and Work of Lal, Bal and Pal.* 1962, p. 285.

৪২. *Ibid.*

৪৩. Bipin Chandra Pal. *The New Economic Menace to India.* 1920, p. 210.

৪৪. *Ibid.* p. 216.

৪৫. *Ibid.* p. 1.

৪৬. *Ibid.* pp. 217-219.

৪৭. *Ibid.* pp. 226-227.

৪৮. *Ibid.* pp. 232-235.

৪৯. *Ibid.* pp. 238-240.

৫০. Bipin Chandra Pal. *Soul of India.* p. 201.

৫১. *Ibid.* p. 202.

৫২. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj.* p, 256.

৫৩. *Ibid.* pp. 259-262.

৫৪. *Ibid.* p. 253.

৫৫. *Ibid.* p. 271.

৫৬. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮, পৃ ১২৪।

৫৭. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* p. 197.

৫৮. নির্মলকুমার বসু। "বিপিনচন্দ্র পাল", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা,'। কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক, পৃ ১৬৯।

৫৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৭১।

৬০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৬১. Bipin Chandra Pal. 'My Conception of Swaraj', in : P. D. Saggi. *Life and work of Lal, Bal* and Pal. p. 305.

৬২. বিপিনচন্দ্র পাল। 'জেলের খাতা'। ১৯৫০, পৃ ৬২।

৬৩. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* pp 199-200.

৬৪. Jose Ortega y Gasset. *The Revolt of the Masses.* 1953, (Unwin Pocket Edition) p. 14.

এক : ভূমিকা

বাঙালীর বিগত শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অনেকে এককথায় বৈদান্তিক পুনর্জাগরণের কাল হিসাবে অভিহিত করেন। কথাটি কিছুটা বিতর্কমূলক হলেও দেখা যায় ঐ শতকের প্রথম দিকে লুপ্তপ্রায় বেদান্তচর্চার পুনঃপ্রবর্তনে রামমোহন তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরই নিদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শতাব্দীর শেষদিকে বেদান্ত-চর্চায় গতিবেগ সঞ্চার করেন স্বামী বিবেকানন্দ—একথা ভগিনী নিবেদিতার দিনলিপি থেকে জানা যায়।[১] রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যবর্তীকালে বৈদান্তিক চেতনা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছাড়া আর কারো মনে বিশেষ প্রতিফলিত হয় নি। তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সদস্য বিদ্যাসাগর বেদান্তের বিরোধী ছিলেন। রামমোহনের সেই প্রয়াসকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে স্বামী বিবেকানন্দই প্রকারান্তরে পরিপুষ্ট করেন। শতাব্দীর এই দুই প্রধান দিকপাল বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বেদান্তপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বেদান্তপ্রচারে রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েরই অভিপ্রায় ছিল ধর্মের নবমূল্যায়নের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার।[২] রামমোহন বেদান্তের সাহায্যে বহু দেবদেবী ও মূর্তিপূজার পরিবর্তে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন; শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে তিনি সমাজসংস্কারে উদ্যোগী হন। সমাজসংস্কারের তাগিদেই তিনি প্রথমে প্রচলিত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মীয় অনাচার ও প্রথাপীড়নকে তিনি রাজনৈতিক চেতনা ও দেশ-ভক্তির অন্তরায় বলে মনে করতেন। অপরদিকে বিবেকানন্দ বেদান্তের মায়াবাদকে নবাগত পশ্চিমী ইহজীবনসর্বস্ব ভোগবাদী প্রবণতা ও বস্তুবাদী চিন্তার নিরসনকল্পে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন। উপাদান প্রায় এক হলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। তবে উভয়ের বেদান্তপ্রচারের মূলে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য অস্বীকার করা যায় না। রামমোহনের সংস্কারপ্রয়াস ছিল আইন ও অনুষ্ঠানভিত্তিক। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ মানুষের চারিত্রিক বিকাশ ও বিদ্যাবুদ্ধির

উৎকর্ষসাধনকে অধিক উপযোগী ও কার্যকর বলে মনে করতেন। এ-বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী ছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদের যে-বীজ উপ্ত হয়েছিল তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল দেশের প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত, নিজের সমাজ সম্পর্কে গৌরববোধ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের হিতসাধনার্থে নানাবিধ সংস্কারপ্রয়াস। সমাজ ও ধর্মের নব রূপায়ণচিন্তার সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত স্বদেশাভিমান ক্রমে জাতীয় চেতনায় পরিবর্তিত হতে থাকে। রামমোহন কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য কেবল স্বদেশের প্রাচীন ভাবভাণ্ডারের উপর নির্ভর না করে প্রাগ্রসর প্রতীচীর চিন্তাসম্ভার থেকে দেশোপযোগী উপকরণের সন্ধান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এদেশের বিদগ্ধমণ্ডলীর একটি শাখা বিদেশের পরিবর্তে স্বদেশের ভাবাদর্শেই বিশ্ববিজয়ে কৃতসংকল্প হন। এঁদের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণে জাতীয় চেতনাকে উগ্র রূপদান করেন। বেদান্তেই তিনি সমাজতান্ত্রিক মানবতার সূত্র খুঁজে পান। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের পথ পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারের আদর্শে দেশের মৃতপ্রায় জনমনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিবেকানন্দের এই ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'His nationalism was a spiritual imperialism. He called on young India to believe in the spiritual mission of India...on which was subsequently built the orthodox nationalism of the de-classed young intellectuals, organized into secret societies advocating violence and terrorism for the overthrow of British rule.'[৩]

সমকালীন শিক্ষিত যুবমানস তাঁর এই আধ্যাত্মিক বিশ্ববিজয়ের আদর্শে উদ্দাম হয়ে ওঠে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই তারা ছিল নিরতিশয় বিড়ম্বিত। এই দুর্দশার জন্য তারা সমাজব্যবস্থাকেই দায়ী বলে মনে করত— যে-ব্যবস্থার মূলে তারা দেখেছিল বিদেশী শাসকদের অবস্থিতি। বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্রোহী যুবসম্প্রদায়ের মনে একাধারে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র স্বাজাত্যাভিমান দেখা দেয়। সে চেতনার পিছনে

সমাজের গতিপ্রবাহের সঠিক প্রত্যয় যত-না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদ আর অস্বচ্ছ সমাজতান্ত্রিক ভাবাবেগ। ফলে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পরিবর্তে প্রাচীন আধ্যাত্মিক গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ করে। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে অপরিসীম ত্যাগ ও ঐকান্তিকতায় তাঁরা জনমানসে যে আত্ম-প্রত্যয় ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানকে গতিসম্পন্ন করে তোলে। বিবেকানন্দের ভাবভূমিতেই জন্ম নিয়েছিল চরমপন্থী বিপ্লবী কর্মতৎপরতা।

ছোটবেলা থেকেই সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনে তাঁর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মানসিক গঠনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদী। তাঁর ছাত্র-জীবনকালে দেশের জাতীয় আন্দোলন ক্রমে দানা বেঁধে উঠছিল। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান ও 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনে' সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতামালা তাঁর মনে জাতীয় আবেগ সঞ্চার করে। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতসূত্রেই তিনি রামমোহনের বৈদান্তিক আদর্শ, দেশপ্রেমিকতা ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যচিন্তায় অনুপ্রাণিত হন।

তিনি ছিলেন দর্শন ও আইনের ছাত্র। আর্থিক অস্বাচ্ছল্য আর আধ্যাত্মিক অন্তর্জালা তাঁর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ঐ সময়ে তাঁর এক মানসিক রূপান্তর চলেছিল; সেকথা তাঁর সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের লেখায় জানা যায়: 'ব্রাহ্ম-সমাজের বহির্বর্তী অংশ থেকে তিনি যে বালসুলভ আস্তিকতা এবং সহজ আশাবাদ অর্জন করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের *Three Essays on Religion* তাতে বিপর্যয় এনে দিল। সৃষ্টির হেতুবাদী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খড়কুটোর মত নির্ভরের অযোগ্য হয়ে উঠল। তিনি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন।'[৪] হিউমের সন্দেহবাদ (Skepticism) আর স্পেনসারের অজ্ঞাবাদ (Agnosticism)-এর পরিচয় লাভ করে তাঁর দার্শনিক সংশয় ক্রমশঃ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ ঈশ্বর-বিবর্জিত বস্তুতন্ত্রী মুক্তির প্রত্যয় তাঁর মনে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে তিনি তাঁর অন্তর্বিরোধের কথা প্রকাশ করলেন। 'বলে গেলেন সংশয়ের যন্ত্রণার কথা, নিত্যবস্তু সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হতে না পারার নৈরাশ্যের কথা।'[৫] ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি 'শেলীর প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্বের বন্দনা, নৈর্বক্তিক বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব এবং গৌরব-

দীপ্ত চিরাশ্রয় মানবসমাজের ভাবদর্শন'[৬] পাঠ করলেন। ফলে ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে আর নিষ্প্রাণ, নিষ্করুণ যন্ত্রের মতো হয়ে রইল না; তিনি তার মধ্যে অনুভব করলেন জাগ্রত আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ। ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শেই তিনি 'সার্বিক হেতুরূপী (Universal Reason) পরব্রহ্মের অদ্বয়তত্ত্বের' অনুধ্যান করলেন। ফলস্বরূপ সংশয়বাদী ও বস্তুতন্ত্রী মনোভাব তাঁর কেটে গেল। কিন্তু তাতেও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শকাতর মন তৃপ্ত হল না। মরমী বোধের তাগিদে তিনি একজন আচার্য বা গুরুর সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে পড়েন। কারণ 'তাঁর স্বভাবধর্ম গ্রন্থ থেকে আহরণ করার চেয়ে অন্য জীবনের সহযোগ থেকে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহের পক্ষপাতী' ছিল।[৭]

মনের অতৃপ্তি নিবারণের তাগিদে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও এসেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের কোনও তত্ত্বেই তাঁর মন ভরে নি। অবশেষে তিনি 'আদর্শের দেহগত বাস্তবতা, সত্যের প্রত্যক্ষতা এবং পরিত্রাণশক্তির সম্ভাব্যে'র[৮] হদিশ পেলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। প্রথমাবস্থায় সেখানেও তাঁর দ্বন্দ্বসংশয়ের নিরসন হয় নি। গুরুর সান্নিধ্যে লব্ধ মানসিক প্রশান্তিও তাঁর কাছে মনে হয় যেন মায়া। অনেক পরে অবশ্য তাঁর সংশয় দূরীভূত হয়—'ধীরে এবং অলৌকিক শক্তির প্রশান্ত উন্মোচনের আশ্বাসে'।

কলেজের পড়াশোনা তাঁর অসমাপ্ত থেকে যায়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর (১৮৮৬) পরে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে উত্তর ভারত পর্যটনে যান। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে (১৮৯৩) যোগদানের পূর্বাবধি পরিব্রাজকরূপেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে। ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতা ও মননশক্তির পরিপুষ্টিসাধন করে। পরিব্রাজকজীবনে তিনি যেমন জ্ঞানঋদ্ধ বহু মনীষার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তেমনি অনেক রাজন্যবর্গের সখ্যতাও লাভ করেন। অধ্যয়ন ও ধর্মচিন্তার সঙ্গে যুগপৎ রাজনৈতিক অভিলাষও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারে। সিস্টার ক্রিস্টিনকে তিনি ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তি জোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাই নি! দেশটা মৃত!'[৯]

শিকাগোয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার পথে স্বামীজি প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। সতেরো দিন ধরে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলিতে এ-কথাই সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে—ধর্ম নয়, রুটিই ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

বিবেকানন্দের আমেরিকাযাত্রার পিছনে ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায় যত-না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাগিদ। দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা মোচনের উপায় অনুসন্ধানের জন্যই প্রধানতঃ তিনি বিদেশের পথে পাড়ি দেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন যে স্বামীজি আমেরিকাযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন: 'দেখ ভাই, এ দেশে যে রকম দুঃখ-দারিদ্র্য, এখানে এখন ধর্মপ্রচারের সময় নয়। যদি কখনও এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে পারি, তখন ধর্মকথা বলব। সেইজন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি; দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।'[১০] বেদান্তপ্রচারের কোনও অভিপ্রায় তখন তাঁর ছিল না। বিশ্বধর্ম সম্মেলন শেষ হলে তিনি মার্কিনদেশ পরিক্রম করেন। তাঁর ঐসময়কার বক্তৃতাগুলি থেকে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা সেখানকার এক সংবাদপত্রের মন্তব্যে বোঝা যায়: 'His patriotism was perfervid, The manner in which he speaks of 'My Country' is most touching. That one phrase revealed him not only as a monk but as a man of his people.'[১১]

কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতাকে সেসময়ে সযত্নে দমন করেন। প্রথম দিকে তাঁর যেটুকু দ্বিধা ছিল পরে তা সম্পূর্ণ কেটে যায়। ধর্মপ্রচারের পথই তিনি বেছে নেন। এবিষয়ে একটি চিঠিতে স্পষ্টতঃই লিখেছেন: 'I am no political agitator. I care only for the spirit...So you must warn the Calcutta people that no political significanco be ever attached falsely to any of my writings or sayings.'[১২]

মার্কিন দেশ সফরের পর (১৮৯৫) তিনি লণ্ডনে চলে যান। সেখানেও বহু সভায় বক্তৃতা দেন। একটি বৈঠকে মিস মার্গারেট নোবলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইনি পরে স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই দেওয়া নিবেদিতা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ধর্মপ্রচার ও সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা সমধিক উল্লেখযোগ্য। মাস তিনেক পর স্বামীজি লণ্ডন থেকে আমেরিকায় ফিরে যান এবং সেখানে

একটি বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। ঐ বছরেই স্বদেশে ফেরার পথে লণ্ডনে কিছুকাল থেকে বিভিন্ন সভায় ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বহু বক্তৃতা করেন। ইত্যবসরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পর্যটনকালে জার্মানদেশীয় প্রখ্যাত ভারততাত্ত্বিক মাক্স ম্যুলার ও কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিত ও দর্শনের অধ্যাপক ডয়সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। লণ্ডনেও তিনি একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৮৯৭ সালে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে কলোম্বো এবং দক্ষিণ ভারতের পথে তিনি কলকাতায় উপনীত হন। সর্বত্রই তিনি বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। কলকাতায় ফিরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাই হয় তাঁর প্রধান কাজ। মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল : ১. জনসাধারণের মানসিক ও বৈষয়িক কল্যাণসাধনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা ; ২. শিল্প ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষাদান ; ৩. জনসাধারণকে বেদান্ত ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহিত করা ;[১৩] মিশনের কর্মসূচী প্রসঙ্গে একথা স্পষ্টই বলে দেওয়া হয় : 'The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics.'[১৪]

১৮৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর মিশনের প্রধান দপ্তর বেলুড় মঠে স্থাপিত হয়। প্রচারকার্যের সুবিধার্থে স্বামীজি আলমোড়া থেকে নবপর্যায়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৮৯৯), কলকাতা থেকে 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) এবং মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' (১৮৯৫) নামে তিনটি সাময়িকপত্র প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠাও এইসময়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

মিশন প্রতিষ্ঠার পর সমাজসেবাই হয় তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু তাতে তাঁর একদল গুরুভাই আপত্তি তুললেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছেন যে প্রচার, অত্যধিক অধ্যয়ন ও শাস্ত্রপাঠ এবং সেবাকার্য না করে ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরভক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সেইসব কর্মীরা অভিযোগ করেন যে বিবেকানন্দের দেশব্যাপী সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, জনসেবা, সমাজোন্নয়ন ও দেশপ্রেমিকতার মনোভাব তাঁর পশ্চিমী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্যভ্রমণেরই কুফল ; অথচ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তিকামীদের কেবল ভক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। স্বামীজির সঙ্গে গুরুভাইদের এবিষয়ে তীব্র বাদানুবাদ দেখা দেয়। উত্তেজিত ভাবে তখন তাঁকে একথা বলতে শোনা যায় : 'I am not a servant of Ramakrishna or any one, but of him only, who serves and helps

others, without caring for his own Mukti'।[১৫] এ-বিতর্ক অবশ্য বেশি দূর গড়ায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণেরই নাকি নির্দেশ ছিল বিবেকানন্দের মতামত মেনে নেবার। এই ঘটনায় তাঁর জ্ঞান ও ভক্তির উভয়মুখী ধারার সমন্বয়ে জীবসেবার আদর্শ লক্ষ করা যায়।

বিবেকানন্দ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানমার্গকেই শ্রেয় মনে করতেন। এই চিন্তার পিছনে সেই একই অনুভূতি অর্থাৎ ঈশ্বরানুরাগ অপেক্ষা দেশ ও দশের প্রতি গভীর ভালবাসাই ছিল প্রবল। নূতন শক্তি ও আদর্শে দেশ গঠনের তাগিদেই তিনি ভক্তির পথ অনুসরণ না করে জ্ঞানের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। নির্গুণ অদ্বৈতবাদের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনানুসারে লোকের উপর ভক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতার বিষয় আমি সবিশেষ অবগত আছি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে—সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত হইয়া 'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না।"[১৬]

মাতৃভূমির দুর্দশায় বিবেকানন্দ সদাই এক তীব্র অন্তর্জ্বালা অনুভব করতেন। তাই সবকিছুর উপরে তিনি জনসেবাকে স্থান দিয়েছিলেন। মানুষের সেবা করতে হলে, এমনকি রাজনীতি করতে হলেও একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে যে যুক্ত রাখতেই হবে সেকথায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। কংগ্রেস প্রসঙ্গে একাধিক উক্তিই তাঁর সে-চিন্তার প্রমাণ। অবশ্য দলীয় রাজনীতি তাঁর সময়ে তেমন সুস্পষ্ট রূপ নেয় নি। নিজেও তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। কারণ তিনি চাইতেন মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ; ক্ষমতা দখল নয়।

১৮৯৭ সালে মে মাসে তিনি প্রচারের কাজে ভারতপরিক্রমণে যান। মিশনের সাংগঠনিক কাজও সেইসঙ্গে চলতে থাকে। পরের বছর অক্টোবরে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৯৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার আমেরিকাযাত্রা করেন। পথিমধ্যে লণ্ডনে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে কালিফোর্নিয়ায় উপনীত হন। সেখানে তিনি বেদান্ত শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ওকল্যাণ্ড এবং আলামেডাতেও দুটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।

আমেরিকায় ব্যস্ততার মধ্যে বছরখানেক কাটিয়ে তিনি প্যারিসে Congress

of the History of Religions (প্যারিস প্রদর্শনী নামে পরিচিত)-এর অধিবেশনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে তিনি দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শালগ্রাম-শিলা ও শিবলিঙ্গের প্রচলিত যৌন প্রতীক প্রত্যয়ের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় জানা যায় যে স্বামীজির সঙ্গে এইসময়ে রুশ বিপ্লবী ক্রপটকিনের সাক্ষাৎ ঘটে। সেসময়ে প্লেখানভ ও লেনিনের দল খুবই সক্রিয় ছিল— তবে স্বামীজির সঙ্গে তাঁদের সংযোগের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।[১৭]

ফ্রান্সে তিনমাস কাটিয়ে তিনি গ্রীস, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশ পর্যটন করে ১৯০০ সালে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। দেহ ও মনে তখন তাঁর তীব্র ক্লান্তি ও অবসাদ। দুটি বিষয়ে মন তাঁর অস্থির। প্রথমতঃ, জাগতিক বিষয়ে এক তীব্র অনাসক্তি দেখা দিয়েছিল; জীবনের উপরও তেমনি বিতৃষ্ণা। মিশনের সভাপতি পদ থেকে তাই তিনি ইস্তফা দেন। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় প্রথম বারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় সেখানকার সাম্য, গণতন্ত্র ও ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক শক্তি ও উন্নতি প্রত্যক্ষ করে তিনি যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন তা তাঁর দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় তিনি সেখানকার হিংসা, লালসা, শক্তিমত্ততা ও বেনিয়া মনোবৃত্তি প্রত্যক্ষ করেন। তাদের জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ এবং সামাজিক অনাচার তাঁকে ব্যথিত করে।[১৮] স্বাস্থ্য তাঁর আগেই ভেঙে পড়েছিল, সেইসঙ্গে ভগ্ন মন নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবু তাঁর কর্মব্যস্ততা কিছুমাত্র কমে নি।

বেলুড় থেকে বন্ধু সেভিয়ারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বামীজি মায়াবতী চলে যান। সেখান থেকে যান পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্যটনে। এই সময়ে তিনি এক সভায় দেশের যুবশ্রেণীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন 'you will be nearer to Heaven through football than through the study of the Gita।'[১৯] তাঁর মতে ধর্মচর্চার পূর্বে স্বাস্থ্যচর্চা অধিকতর প্রয়োজন।

শরীরের অবস্থা তাঁর ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। মানসিক যন্ত্রণারও উপশম হয় না। কিন্তু কাজকর্ম ও আলাপআলোচনা অব্যাহত থাকে। মাস কয়েক বেলুড়েই বিশ্রাম নেন। এই সময়ে জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ও দার্শনিক কাউণ্ট ওকাকুরা (১৮৬২-১৯১৩) স্বামীজিকে টোকিওতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। রাজনৈতিক চিন্তায় নিবেদিতার মতো তিনিও ছিলেন একজন বিপ্লবী। বাংলার সমসাময়িক বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে তাঁরও বিশেষ

সংযোগ ঘটে। তাঁর ইচ্ছা ছিল টোকিওতে শিকাগো ধর্মসম্মেলনের মতো একটি সম্মেলনের আয়োজন করা। কিন্তু স্বামীজির শরীরস্বাস্থ্য তখন সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ওকাকুরার অনুরোধে স্বামীজি তাঁর সঙ্গে বেনারস ও বুদ্ধগয়ায় যান। শরীরের উন্নতি না হওয়ায় বেলুড়ে ফিরে আসেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তাঁর জীবনাবসান হয়।

দুই : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

বিবেকানন্দের দর্শনে ভারতের শ্রেষ্ঠ দুজন দার্শনিকের চিন্তার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। একজন শংকর, অপরজন বুদ্ধ। শংকরের মায়াবাদ তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। বুদ্ধের চিন্তা স্বামীজিকে পুরোপুরি প্রভাবিত না করলেও বুদ্ধের বৈশ্বিক মানবতা তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। বিবেকানন্দের উপর শংকরের প্রভাব মূলতঃ দর্শনগত; পক্ষান্তরে বুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যবহারগত। বিশ্বপ্রপঞ্চের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞানের সন্ধান তিনি শংকরের দর্শন থেকে পান। অন্যদিকে বুদ্ধের চিন্তাকে তিনি ব্যাবহারিক দিক থেকে গ্রহণ করেন— অর্থাৎ ইহজীবনে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ।[২০] বিবেকানন্দের হৃদয় ছিল বুদ্ধের, আর মস্তিষ্ক শংকরের।

বিবেকানন্দ নিজস্ব কোনও দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন নি। শংকরের বেদান্তকেই তিনি হৃদয়গ্রাহী করে প্রচার করেছেন; মায়াবাদের ভাষ্য রচনা করেছেন। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের বৈদান্তিক চিন্তা একটি মৌল ও নতুন দিকের সন্ধান দেয়। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুময় বিশ্ব যেখানে অসার ও অর্থহীন, সেখানে মানবিক প্রবৃত্তি, সমাজসেবার প্রয়োজন ইত্যাদিও অনুরূপ অর্থহীন— তাহলে বিবেকানন্দের চিন্তা ও কাজের সঙ্গতি কোথায়? কেন তাঁর মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের এই সংঘাত?

মায়াবাদ সম্পর্কে সাধারণতঃ মনে করা হয়ে থাকে যে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। বস্তুতঃ এই ছোট্ট বিবৃতি থেকে বিষয়টির পরিপূর্ণ অর্থ ব্যক্ত হয় না। মায়াবাদের অর্থ এই নয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুবিশ্লিষ্ট ও বহুসমন্বিত দুনিয়াটা সর্বৈব মিথ্যা— সেটাও সত্য, তাতেও ব্রহ্ম বিরাজ করেন। দেখার ভ্রমেই কেবল তাকে বহুরূপ ও বৈচিত্র্যে দেখা হয়। বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও

বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিচ্ছেদ্যভাবে একই—ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে জগতের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।[২১] দর্শনের বাতবিতণ্ডায় বিষয়টি বরাবরই অত্যন্ত জটিল।

আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ব অসংখ্য অসম্পৃক্ত বহুর সমন্বয় মাত্র। কণাদ, ও গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস তাঁদের আণবিক তত্ত্বে বিশ্বকে বিশ্লেষণযোগ্য অণুর সমষ্টি-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। দীর্ঘদিনের জ্ঞানের আলোয় মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে যে দৃষ্টিগতভাবে যা বহু ও বিচিত্র তা মূলতঃ এক সুসংবদ্ধ, সুনিয়মিত ধারায় সমন্বিত। এই অভিজ্ঞতা মানুষকে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে—যার মর্ম হল বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক ও অখণ্ড। সে-একত্ব জ্যামিতিক সরলরেখায় রচিত নয়, বক্রজটিল পথে ঐক্যবদ্ধ।[২২] তার মধ্যে বহুত্ব লক্ষিত হলেও সেই বহুত্বের মধ্যে এক সুসংবদ্ধ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। প্রথমোক্ত বহুবাদ ও শেষোক্ত বিশিষ্ট জটিল একবাদ যাকে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয় তা শংকরের অদ্বৈয় প্রত্যয় থেকে ভিন্ন। শংকরের মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তা— তার মধ্যে কোনও ভাঙা-চোরা নেই। সেই সত্তাকেই তিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে অভিহিত করেছেন—যার প্রকৃতি হল চিৎশক্তিবিশিষ্ট। সেই চেতনা বা চিন্ময়রূপ নির্বিশেষ ও নিত্য বিরাজমান। সেই চিন্ময়, অবিভাজ্য ও একক সত্তাকে বহু ও বিচিত্ররূপে আমাদের কাছে তুলে ধরে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। সেগুলি সত্তার যে পরিচয় বহন করে তা অলীক ও ভ্রান্ত। প্রকৃত রূপ থেকে এই ভিন্নরূপে দেখাকেই মায়া বলা হয়। যেমন স্বপ্ন দেখা, কিংবা মরীচিকাকে জল মনে করা— তবে তাও যে ভিত্তিহীন বা সম্পূর্ণ অবাস্তব তা নয়— তার ভুল ব্যাখ্যা করা হয় মাত্র। যা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে এক তাকে বহুরূপে বিকৃত ও বিচিত্ররূপে দেখার কারণ এক বিশেষ শক্তির ক্রিয়াশীলতা। লাঠি জলে ডোবালে বাঁকা দেখায়— তার কারণ আর কিছু নয়, জলের মধ্যে আলোকে বিকৃত করার শক্তি থাকায় জলই এই বিভ্রম ঘটায়। উপলব্ধি যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার পিছনে থাকে ভুল ব্যাখ্যা। যে-শক্তির বলে একক ব্রহ্ম বহুধা বিভক্ত হয়ে আমাদের কাছে পরিদৃশ্যমান হয় তাকেই শংকর মায়া বলেছেন।[২৩] শংকরের অদ্বৈত বেদান্তকেই বিবেকানন্দ নানাস্থানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

অদ্বৈতবাদের মূল প্রত্যয় ত্রিবিধ : এক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি সত্তাই বিরাজমান, যিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ; দুই, তিনিই জ্ঞাতা— তাঁর কোনও রূপ ও নাম নেই ; তিন, বহুরূপে ও নামে যা আমাদের কাছে সদাই দৃশ্যমান তা সর্বময় ব্রহ্মের মধ্যেই আশ্রিত, ভিন্নরূপে স্বপ্নের মত দেখার কারণ হল মায়া। মায়াবাদকে বিবেকানন্দ

বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই দেখেছেন। তাঁর মতে বিশ্ব যদি অবিমিশ্র একই সত্তায় গঠিত হয়ে থাকে তাহলে ইন্দ্রিয়লব্ধ বহুত্বের ধারণা মায়া ছাড়া আর কিছু নয়।[২৪]

এবার বিবেকানন্দের দর্শনে ব্যাবহারিক দিকটা দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছে সংসারের প্রতি দৃষ্টিদান, মানুষের দুঃখ-মোচনের চিন্তা প্রভৃতি মায়াবাদী দর্শনের বিরোধী মনে হতে পারে। এখানে যেন যুক্তিবোধ ও হৃদয়দৌর্বল্যের এক বিরাট দ্বন্দ্ব।

বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তেই পৌচেছিলেন যে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ তখন সকলেই আপনজন। 'ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইব' বলে তিনি অনুভব করেন। ঈশ্বর সকল বস্তুতেই ছড়িয়ে বিরাজ করেন; সর্ববস্তু ও জীবেই ঈশ্বর আছেন এবং মানুষের কাছে তিনি মানুষরূপেই প্রকাশমান। এ-তত্ত্ব বেদান্তেরই। বেদান্তে সত্তাকে তিন ভাবে দেখা হয়েছে, যথা : ১. প্রাতিভাসিক, অর্থাৎ বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান, যেমন স্বপ্ন দেখা; ২. ব্যাবহারিক, অর্থাৎ অবাস্তব অথচ সাংসারিক বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্য আছে এমন; ৩. পারমার্থিক, অর্থাৎ পরম সত্য বা ব্রহ্ম সংক্রান্ত— যেটা ব্যাবহারিকের বিপরীত। সাধারণ মানুষের পারমার্থিক চেতনা বিশেষ দেখা যায় না।[২৫] শংকর তাই ব্যাবহারিক জীবনে বেদবিহিত পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেন। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ মানুষের নিষ্কাম কর্ম ও সেবাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে হিন্দু-দর্শনের ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সত্যের স্তরভেদ আছে— ব্যক্তিমানুষের ধীশক্তি অনুযায়ী তা ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়। তদনুযায়ী স্বামীজিও মনে করতেন যে জানার অধিকার সকলের সমান নয়।

বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সমন্বয় সাধন করে বিবেকানন্দ আরও দেখিয়েছেন যে বুদ্ধির দ্বারাই হৃদয়ের পরিমার্জন তথা মানবিক মূল্যবত্তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি দেখা দিলে বৈশ্বিক কল্যাণবোধ স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।[২৬] বুদ্ধের প্রেম, প্রীতি ও করুণার বাণীকে তিনি শংকরের অদ্বৈত প্রত্যয়ে সংমিশ্রিত করেন।

তিন : ইতিহাসচিন্তা

অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী বিবেকানন্দের উপর সাংখ্যের প্রভাবও কম ছিল না। তিনি মনে করতেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ধারা নিয়তই প্রবহমান, তার আদি বা অন্ত নেই। পশ্চাতে আছে তিনটি সত্তা। প্রথমটি হল অসীম ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। সমগ্র প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু তার ভিতরে চলে বিবিধ পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ আছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় শাস্তা। তৃতীয়তঃ আছে আত্মা, যা ঈশ্বরের মতোই অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত; কিন্তু সেই শাস্তার অধীন। ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের কার্য, কারণ ও উপাদান।[২৭] বিশ্বের বিকাশ ও অভিব্যক্তির কর্তা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যেন বিশ্ব প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। কারণ-বিহীন সৃষ্টিশক্তি নিয়তই ক্রিয়াশীল এবং মন ও বাহ্য প্রকৃতির গতি একই নিয়মে নির্দিষ্ট। অখণ্ড বিশ্ব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জড়রূপে, বুদ্ধির মাধ্যমে জীবরূপে এবং আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতি ও জীবের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় আত্মা বিকাশ লাভ করে। নিম্নতম পর্যায় থেকে মানব পর্যন্ত আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করে চলে।[২৮] বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় আত্মা নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য সংগ্রাম করে। সে সংগ্রাম প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে নয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষ বর্তমান অবস্থা লাভ করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা বা তার অনুগত না থেকে মানুষের এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই হল প্রগতি। মুক্তিপ্রবণতাই আত্মার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ—সে চায় অনন্ত মুক্ত সত্তার উপলব্ধি।[২৯]

অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে তিনি পরব্রহ্মের অঙ্গীভূত আত্মার গতিপ্রকৃতির দিক থেকে সবকিছু বিচার করেছেন। বৈদান্তিক দৃষ্টিতেই তিনি সভ্যতার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় দ্বান্দ্বিক প্রণালীতে (dialectical) শ্রেণী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সনাতন ধর্ম ও দর্শনের রক্ষক। দৃষ্টিতে তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বাঁধা লোকাচার, সামাজিক প্রথা, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির তাঁরাই ছিলেন ধারক ও বাহক। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়রা ছিলেন উদারনৈতিক সমাজব্যবস্থার পরিপোষক; মুক্তি ও উন্নয়নকামী অবদলিত মানুষের প্রতিভূ। ক্ষত্রিয় জাগরণের পথপ্রদর্শক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। রামচন্দ্র ও কৃষ্ণও ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত। কুমারিল, শংকর,

রামানুজ ব্রাহ্মণ্য-যাজকীয় আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। চতুর্বর্ণের প্রত্যয়ে স্বামীজি বিশ্বসমাজ বিবর্তনেরও ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য, রোমসাম্রাজ্য বিস্তারে ক্ষত্রিয়, ইংরেজের বেনিয়া আধিপত্য সম্প্রসারণে বৈশ্য এবং উদীয়মান মার্কিন গণতন্ত্রে তিনি শূদ্র আধিপত্যের লক্ষণ দেখতে পান।[৩০] স্বামীজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রগতিমূলক ভূমিকার উল্লেখ করেছেন : 'পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়-পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।'[৩১]

অন্যান্য দেশেও তাঁর মতে পুরোহিতরা অনুরূপ প্রগতিশীল ভূমিকা একসময়ে গ্রহণ করেছিল। পুরোহিতরাই মানুষকে সর্বপ্রথম অতিমানসের সন্ধান দেয়, দেখায় বিশ্বাতীত সত্তা।[৩২] কিন্তু ক্ষমতাই মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। তাই পুরোহিতরা ক্ষমতা পেয়ে নানা বিধিব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাহায্যে সকলকে পদানত রাখতে সচেষ্ট হয়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষত্রিয়রা জয়ী হয়। বাহুবল তাদের আগেই ছিল, এবার হল বুদ্ধিবল। তাদের অনেকেই যাগ-যজ্ঞাদির উপর সংশয়ী হয়ে ক্রমে বস্তুবাদী হতে শুরু করে।[৩৩]

ক্ষত্রিয়রাও বলদর্পী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে, তবে তারা পুরোহিতদের মতো ছুঁৎমার্গে অবস্থান করত না। বিজ্ঞান ও কলা ক্ষত্রিয়দের আনুকূল্যেই উৎকর্ষ লাভ করে। ক্ষত্রিয়দের পর শুরু হয় বৈশ্যদের আধিপত্য। অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গেই ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভাবের আদানপ্রদান বিস্তারলাভের সুযোগ পায়। কিন্তু বৈশ্যরা সাংস্কৃতিক বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকায় তাদের আমলে জ্ঞান ও কলার গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এরপর যে-শ্রেণীর আধিপত্যের তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেই শূদ্রদের আমলে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু মানবিক মূল্য-বত্তার অবনতি ঘটবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

স্বামীজি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কালক্রমে আধিপত্য ও অবক্ষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে চতুর্বর্ণের সমন্বয়ে এক আদর্শ সমাজব্যবস্থার কল্পনা করেন— তা হল এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে একাধারে থাকবে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান ও বিদ্যা, ক্ষত্রিয়দের সাহস, শৌর্য ও সংস্কৃতিবোধ, বৈশ্যদের ক্রিয়াকলাপে ভাবের বিনিময় ও সম্প্রসারণ এবং শূদ্রদের সাম্যের আদর্শ।[৩৪]

বর্ণাশ্রমের মধ্যে দিয়ে তিনি সামাজিক ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা

করতে চেয়েছিলেন। বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হলেও জাতির অনড় নিগড়ে মানুষকে আমরণকাল বেঁধে রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন— তিনি চাইতেন সবাই যেন ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে।[৩৫] যাজকতন্ত্রকে তিনি পরিহার করেন— কারণ তাতে মানুষ নিপীড়িত ও অবদমিত হয়। ভারতের সনাতন ধারা ও ঐতিহ্যের অনুরাগী হলেও বিবেকানন্দ রক্ষণশীল জাত্যভিমানের মূলে কুঠারাঘাত করেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অধিকারবাদেরও তিনি নিন্দা করেছিলেন; তাতে শূদ্রদের শাস্ত্রপাঠ ও পরমজ্ঞান অর্জন নিষিদ্ধ। এই অগণতান্ত্রিক ধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শংকর। অধ্যাত্মমার্গে বিবেকানন্দ চাইতেন সাম্যের প্রতিষ্ঠা— বলতেন যে, পরম তত্ত্বানুসন্ধানে মানুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার আছে। প্রচলিত ধারার বিপরীতে বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের চিন্তা প্রগতিবাদী মনের পরিচয় দেয়। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকারবাদ উপনিষদেও স্বীকৃত। বিবেকানন্দ প্রাচীন চিন্তার সবকিছুকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নি।[৩৬]

অস্পৃশ্যবাদেরও তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। হাঁড়ি ও হেঁসেলবাদ তাঁর কাছে পরিহাসের বিষয় ছিল। মানুষের আত্মোপলব্ধির আধ্যাত্মিক পরিশীলন, সংযম ও সর্বাত্মক মঙ্গলই তিনি কায়মনোবাক্যে কামনা করতেন। তিনি অনুভব করেন যে দুনিয়ায় পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মতাবলম্বী শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব নিত্যই বিরাজমান। নিজ দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে সমাজমঞ্চে সবাই যেন রণোন্মাদনায় মত্ত।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি ছিলেন নরমপন্থী। সামাজিক অনুশাসন মানুষের জীবন ও বিত্তরক্ষার প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে। ঐসব অনুশাসন মৌরসী স্বত্ব হয়ে গেড়ে বসে থাকলে সমাজের অবক্ষয় হয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অচল সমাজব্যবস্থার নিরসন সংঘর্ষের পথে হওয়াটা তাঁর মনঃপূত ছিল না।[৩৭] রাতারাতি আমূল ওলটপালটের পরিবর্তে সমাজের পরিবর্তন-প্রয়াস জৈব (organic) প্রণালীতে হওয়াই ছিল তাঁর কাম্য।

ভারতের দুর্গতির জন্য তিনি ইংরেজের উপর দোষারোপ না করে এদেশের সমাজপতি ও পূর্বপুরুষদের অভিযুক্ত করেছেন। অভিজাত বিত্তবানেরা সাধারণকে শোষণ ও নিপীড়নের সময় ভুলে যায় যে নির্বিত্ত দরিদ্রও মানুষ। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষকে পদানত রেখে তাদের মনে এই কথাই গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে দুঃখভোগের জন্যই তাদের জন্ম। সেই ভয়েই হয়তো তিনি বলেছিলেন যে

এদেশের ক্রীতদাসরা মুক্তি চাইছে অপরকে ক্রীতদাস করার জন্য।[৩৮] ভারতের অবনতির অন্যান্য কারণের মধ্যে অপর জাতের সঙ্গে মেলামেশা না করা, ঐক্যবদ্ধ কাজে অনীহা, নারীকে অবনত রাখা, নির্বিত্ত ও সাধারণ মানুষকে অবহেলা ইত্যাদি কৃতকর্মগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায় এগুলি 'প্রবল জাতীয় পাপ'।[৩৯]

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে আর্যাবর্ত থেকে পৃথক দ্রাবিড় সভ্যতার প্রচলিত তত্ত্ব ভ্রান্তিপূর্ণ। ভারতের সবাই আর্য; আর্যরা আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যেও গিয়েছিল; কাজেই সমগ্র ভারতই আর্যময়, এখানে আর কোনও জাত নেই। তাই তিনি একথাও মানতেন না যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উৎপন্ন ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাত থেকে স্বতন্ত্র। ভারতে আর্যদের আগমন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকেও তিনি ভ্রান্ত মনে করতেন; কারণ প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে ঐ মতের সমর্থনে কিছু পাওয়া যায় না। উপহাস করে তিনি লিখেছেন: 'ইউরোপীয় পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন— ও-সব আহম্মকের কথা।'[৪০]

স্বামীজি মনে করতেন মানুষের রঙ শাদাকালো হওয়ার কারণ মূলতঃ বংশগত —গরম দেশভেদে পার্থক্য সামান্যই। দৈহিক গঠন ও বর্ণস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ভারত-বহির্ভূত আর্য জাতির উৎপত্তির মতবাদ পরবর্তীকালে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে হিটলারী নাৎসিবাদে রূপ নিয়েছিল।

তাঁর মতে প্রাচ্য জীবনধারায় ত্যাগের যেমন প্রাধান্য, অন্যদিকে প্রতীচ্যের জীবনধর্মে সংগ্রাম ও উদ্দামতাই প্রবল। মঙ্গোলীয় জাতিকে তিনি শক্তি ও শৌর্যের জন্য প্রশংসা করেছেন; তেমনি ককেশিয় ও নর্ডিক উপজাতিদের সংঘবদ্ধতার তারিফ করেন। রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের জন্য চেঙ্গিজ খাঁকেও তিনি কৃতী পুরুষ বলে মনে করতেন। আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ খাঁ, নেপোলিয়ন প্রমুখ রণবীরদের তিনি বিশ্বঐক্যের সাধকরূপে অভিহিত করেছেন।[৪১] চীন ও জাপান ভ্রমণকালে সেখানকার অনেক মঠমন্দিরে তিনি প্রাচীন বাংলা লিপিতে সংস্কৃত পুঁথি দেখেছিলেন, এবং জাপানের মন্দিরগাত্রে বাংলা লিপিতে মন্ত্র লেখা দেখে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মধ্যযুগে এক সময়ে ভারত ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল।[৪২] বৈদিক ও রোমান ক্যাথলিক পূজাপার্বণে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে খ্রীষ্টানরা হিন্দুধর্মের শাখা বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে

আসায় ঐ সাদৃশ্য ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনে ভারতীয় প্রভাবের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আরবদের মাধ্যমে স্পেনেও ভারতীয় চিন্তার প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে স্বামীজি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান ইউরোপে জার্মানি চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের কাছে অনেকাংশে

চার : রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ নিজস্ব কোনও ধারা প্রবর্তন করেন নি। এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রত্যয়গুলি সম্পর্কেও তিনি নিজ মতামত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নি। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশের সুপ্ত আবেগকে তিনি সযত্নে দমন করেছিলেন। তবুও রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁর চিন্তায় বিক্ষিপ্ত অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে, জাতীয় আন্দোলনের উপর যার প্রত্যক্ষ প্রভাব অসামান্য। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা *Lectures from Colombo to Almora, East and West* এবং *Modern India* গ্রন্থ তিনটিতেই বিশেষ পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তার প্রণালী ছিল ঐতিহাসিক ও আরোহী (inductive)। ঐতিহাসিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। স্বতঃসিদ্ধ ও সাধারণভাবে তিনি কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন নি। অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তিনি ভারত ও বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচারবিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সুন্দর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যেগুলি উত্তরকালের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে নির্ভুল প্রমাণিত হয়।

বিবেকানন্দের মানসিক গঠন প্রক্রিয়ায় ত্রিবিধ উপাদান ও প্রভাব লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গভীরে অবগাহন করেন; ধর্ম ও দর্শনের মতো সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেও তাঁর সমধিক দখল ছিল। কথিত আছে যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রতিটি খণ্ড (সে সময়ে ১১ খণ্ড) তাঁর নখদর্পণে ছিল। ফলে তাঁর মনন ধারা পূর্ণতা ও পরিপুষ্টি অর্জন করে। দ্বিতীয়তঃ, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সবিশেষ প্রভাবিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি স্বচ্ছ ও সরল কথায় তাঁর বাণী ও উপদেশ প্রচার করেছিলেন— যেগুলি ছিল

বিবেকানন্দের মানসিক গঠনের মূল উপাদান। বস্তুতঃ গুরুর সরল কথাগুলিকেই তিনি দার্শনিক ভাষা ও ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয়তঃ, স্বলব্ধ আজীবন অভিজ্ঞতা তাঁর মননশক্তিকে উৎকর্ষ দান করে। বিশ্ব পরিক্রমায় তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাই তাঁর চিন্তা ও দর্শন দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বলা হয়ে থাকে যে দার্শনিক আলোচনা সাধারণতঃ বিমূর্ত ভাব ও ভাষার কচকচানিতে ভরা; প্রতীকি পরিভাষায় সেগুলি অতীব দুর্বোধ্য; জীবনের সঙ্গে সেগুলির সংযোগ ও সার্থকতা ক্ষীণ। সেদিক থেকে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সুস্পষ্ট, সজীব ও গতিসম্পন্ন।

রাষ্ট্রচিন্তায় বিবেকানন্দের উপর হেগেলের প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখা যায়। হেগেল ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে একীভূতরূপে বিবেচনা করতেন; মনে করতেন রাষ্ট্রই মানুষের একমাত্র কল্যাণসাধনকারী; কারণ মানুষের উন্নত বৃত্তি রাষ্ট্রেই প্রতিফলিত হয়; সেজন্যে রাষ্ট্রের কল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ। বিবেকানন্দও সেই দৃষ্টিতে লিখেছেন: 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য— জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।'[৪৪]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে বর্জন করেই একদিন ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ প্রভৃতি সমষ্টিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সমষ্টির প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেন নি। সমষ্টির ভাল চাই বলে ব্যষ্টির মন্দ করতে হবে এমন কথার তিনি বিরোধিতাই করেছেন। গ্রীন ও মিলের চিন্তার সঙ্গে নিজের মতকে তিনি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন।

হেগেলের আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের অধীনেই ব্যক্তি ও জনজীবনের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সমষ্টির বেদীমূলে ব্যক্তি সেখানে উৎসর্গীকৃত। বিবেকানন্দ ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণকল্পে সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগের কথা বলেছেন; সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন যে স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই সমষ্টি-কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে তিনি অনুভব করেন।[৪৫] ব্যষ্টিস্বার্থ তথা ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও মুক্তিই ছিল তাঁর কামনা। হেগেলের মতো তিনি ব্যক্তিকে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের যন্ত্রাংশ করতে চান নি। বিবেকানন্দ রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি ও সমাজের উপরই অধিক মূল্য আরোপ করেছেন। রাষ্ট্র তাঁর কাছে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার অন্যতম পথমাত্র। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র

প্রসঙ্গে তাই তাঁকে বলতে দেখা যায়: "'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি, সব দেখলুম···শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।"[৪৬]

হেগেলের মতো তিনিও নেশনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে করতেন। একটি সর্বব্যাপী সুরে সকল নেশনই যেন অনুরণিত; যে সুরে ভারতীয় ইতিহাসের তন্ত্রীগুলি বাঁধা তাহল ধর্ম। তাঁর কথায়: 'In each nation, as in music there is a main note, a central theme, upon which all others turn. Each nation has a theme, everything else is secondary. India's theme is religion. Social reform and everything else are secondary.'[৪৭]

জাতীয়তাবাদের যে আধ্যাত্মিক রূপ তিনি দর্শিয়েছেন তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়। জাতীয়তাবাদের আবেগময় আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি তিনিই প্রথম প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করতেন যে ভারতের আগামী দিনগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে চাই অতীত গরিমার অনুধ্যান। অতীতকে অস্বীকার করার অর্থ বর্তমান অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। বিগত দিনের ভাবভূমিতেই ভারতের ভাবীদিনের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ হবে। অতীতেও ভারতের গরিমা ও প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল আধ্যাত্মিক পথেই। আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় জীবনের ধারক। আধ্যাত্মিকতাই চিরদিন ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল এবং জনজীবনের বন্ধন কখনও শিথিল হয়ে পড়লে তাকে পুনরাবদ্ধ করত। তিনি মনে করতেন অন্তরের দিব্য অভিব্যক্তিই হল সভ্যতা এবং জাতীয় জীবনকেও ঐ দিব্য আদর্শে গড়ে তোলা দরকার। আধ্যাত্মিক জীবনাচার শাশ্বত আদর্শেরই অনুসরণ মাত্র— কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অসার প্রথা নয়— আধ্যাত্মিক ভূমিতে সমাজজীবন প্রতিষ্ঠিত— সেজন্য সামাজিক বিধিব্যবস্থার রদবদল জনচিন্তানুসারী আধ্যাত্মিক উপায়েই হওয়া সমীচীন।[৪৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দের হৃদয়পটেও মাতৃরূপে দেশের চিত্র কল্পিত। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা ও মাতৃশক্তির বোধনপ্রয়াস পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তাঁর মতে দেশকে মাতৃরূপে ভক্তি ও সেবা করলে একদিন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন ঘটবে। সেজন্যে তিনি বলেছিলেন: 'আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন

তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।'[৪৯]

বিবেকানন্দের মতে জাতীয়তাবাদের প্রচলিত চেতনা হল দ্বিবিধ। প্রথম, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ এবং দ্বিতীয়, অপর জাতির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। অন্ধ স্বজাতি-বাৎসল্য ও বিজাতি-বিদ্বেষকে তিনি আদৌ সমর্থন করেন নি। বিশ্বজনীনতাই ছিল তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান অঙ্গ। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ প্রত্যয় হলেও মানবিক সত্তার গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়ের পশ্চাতে বিরাজ করে প্রকৃত মানুষ। সে-মানুষ বিশ্বজনীন। সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি বৈশ্বিক চেতনার সহায়ক। সারা বিশ্ব যখন নেতিবাদ, জড়বাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি বাতবিতণ্ডায় মত্ত তখন বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষে সচেষ্ট হন। ভারতের মুক্তি ও নবজাগরণ একদিন বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর পথকে আলোকিত করে তুলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তিনি চাইতেন মানুষের সৎ ও শুভ প্রবৃত্তিগুলির যথোচিত কর্ষণ। সে-কর্ষণ পুরুষত্বের, মানবিক মূল্যবত্তার ও সম্ভ্রমবোধের। মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ পাড়া-পড়সির প্রতি সহৃদয় মনোভাব প্রদর্শন। নিঃস্বার্থ সেবার প্রবৃত্তি গড়ে তোলার আগে দেশ ও জাতির কল্যাণে গালভরা কথা না বলাই ভাল। তাই সর্বাগ্রে চাই নিজ স্বার্থের সঙ্গে দেশ ও জাতির স্বার্থকে মিলিয়ে দেওয়া। ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে জাতীয় প্রগতির পথ রচিত হবে। ব্যক্তিকে নিয়েই নেশন; তাই ব্যক্তির সুস্থ, নীতিনিষ্ঠ ও সহৃদয় মন গড়ে না উঠলে জাতির অগ্রগতি ও প্রাধান্যের প্রশ্ন অর্থহীন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ ও দেশের কল্যাণে নিঃস্বার্থ সেবার নীতিই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ। বিবেকানন্দ সেই আদর্শ ও নীতিগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রদর্শনে বিবেকানন্দের একটি মূল্যবান অবদান হল তাঁর স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির প্রত্যয়। এবিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ও মৌলিক। বিশ্বের অবিরাম গতির মধ্যে মুক্তির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সদাই নিহিত থাকে—মুক্তির কামনাই মানুষের বিকাশসাধনাকে বেগবান করে। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে তিনি মোক্ষ বা মায়ার বন্ধনমোচনই শুধু চান নি, উপরন্তু মানুষের বৈষয়িক ও

সামাজিক মুক্তিও তাঁর কাম্য ছিল। মুক্তিকে তিনি মানুষের জন্মগত অধিকার বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন: 'উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা, যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়াদাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক— যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকারের ইচ্ছা, সে প্রকারে ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের সমান সুবিধা যাহাতে সকল সামাজিক ব্যক্তির থাকে তাহাও হওয়া উচিত।'[৫০]

দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তথা পূর্ণাঙ্গ মুক্তির কথা উপনিষদেও লিখিত আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ঔপনিষদ দৃষ্টিতে মুক্তির প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলেও সাধারণতঃ শব্দটি মনে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাঁর মুক্তির বাণী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল।

দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বিবেকানন্দ সরাসরি বলেন নি এবং জাতীয় আন্দোলনেও নিজেকে তিনি জড়াতে চান নি। কারণ প্রথমতঃ, তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বাতবিতণ্ডা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক আলোকে মানুষের মনের অন্ধকারকে দূর করাই অধিক কার্যকর হবে বলে অনুভব করতেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি একথাও উপলব্ধি করেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা সরাসরি তুললে হয়তো তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হবে— ফলে সময় ও শক্তিক্ষয় ছাড়াও যে কাজে তিনি ব্রতী ও উদ্যোগী অর্থাৎ দেশবাসীর মনে নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষসাধন—তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংগ্রামী নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ না হলেও লাঞ্ছিত ও অবদমিত মানুষের দাবি তিনি নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধিকারের দাবিকে তিনি পরোক্ষে ত্বরান্বিত করে তোলেন। যে-প্রত্যয়টির ব্যঞ্জনায় তিনি সংগ্রামী আন্দোলনকে গতিসম্পন্ন করেন তাহল শক্তির সাধনা। শক্তিবিনা কোনও অধিকারই অর্জন করা যায় না। ব্যক্তি ও জাতির জীবনসংগ্রামে একাধারে চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও নিরন্তর অধ্যবসায়; এবং সকল বাধা চূর্ণ করে জাতীয় চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হল শক্তি। বিবেকানন্দ জনমনে শক্তি ও সাহসিকতার বীজ বপন করেন। বৈদান্তিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে

তিনি বল ও বীর্যের সঞ্চারে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে পরম সত্তার অংশ যে- আত্মা তা সর্বশক্তির আধার— তার কাছে পার্থিব সকল বাধাবিপত্তি নগণ্য। জাতীয় চরিত্রের ভিতকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি বেদান্তের পথ অনুসরণ করেন। 'অভয়ম' হল বেদ ও বেদান্তের মর্মবাণী ; গীতার মর্মও হল পুরুষত্ব ও শক্তির উন্মেষ ; আত্মার বল ও বিক্রমে মানুষের আত্মশক্তিকে অদম্য করে তোলা যায় ; শক্তির প্রতিষ্ঠায় জাতি শৌর্যেবীর্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। অত্যাচার ও উৎ-পীড়নের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হল আত্মশক্তি। সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নেতিবাচক নিন্দাবর্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি সংশয়ী ছিলেন। আত্মশক্তির উন্মেষপ্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পরাধীন দুর্বল জাতির মনে তাঁর সেদিনের বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশধারায় কেন্দ্রানুগ শাসনব্যবস্থা ও রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে অপরিণত অবস্থায় সমাজের পরিশাসন রাজার হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয় ; সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের সহিত সঙ্গতি রেখে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধও তাঁর মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি বলেছেন : "রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশু-সন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রযোজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার। সমাজ— গৃহের সমষ্টিমাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না ?"[৫১]

স্বামীজি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে সকল সমাজই একদিন যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং শক্তিমান শাসনকারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 'এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।' মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের সঙ্গে এর কিছুটা মিল দেখা যায়। ভারতের সামাজিক বিবর্তন ধারায় একটি বিপ্লব বারংবার দেখা গিয়েছে। ধর্মভিত্তিক ভারতীয় সমাজে সে-বিপ্লব স্বভাবতই ধর্মবিপ্লবের রূপ নিয়েছে। তাঁর কথায় : 'ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বার বার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ,

আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।'[৫২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বামীজিও মনে করতেন যে কি হিন্দু কি বৌদ্ধ আমলে ভারতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনীতির বিশেষ কোনও সংস্রব ছিল না। কাজেই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাদের অংশ গ্রহণেরও কোনও প্রশ্ন উঠত না। পরবর্তী কালে অনেক পণ্ডিত ও গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীন কালে 'সমিতি' নামে জনসাধারণের এক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা এবং তার শাখা হিসাবে 'সভা' নামক উপসমিতি রাষ্ট্রশাসনে নিযুক্ত থাকত। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে সমিতি শব্দটি সভাস্থল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে মামলামোকর্দমার জন্য ধর্মসভা, যজ্ঞের স্থানে কর্মসভা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চস্তরের রাজকীয় পুরুষ ও কর্মচারীদের নিয়ে রাজসভা বসত। এগুলির কোনওটিতেই স্বামীজির 'সাধারণ প্রজার' স্থান ছিল না। একথা রাষ্ট্রতত্ত্ব ও গণতন্ত্রের উৎস গ্রীসদেশেও প্রযোজ্য। সেখানকার রাজকার্যেও সাধারণ শ্রমজীবীদের কোনও স্থান ছিল না; কারণ তাদের প্রায় সবাই ছিল ক্রীতদাস পর্যায়ের।[৫৩]

জনগণের স্থান ও মান উঁচুতে তুলতে না পারলে রাজনৈতিক উন্নয়নপ্রয়াস তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অর্থহীন। নিজের মোক্ষলাভের প্রচেষ্টাও অর্থহীন যখন দেশবাসী সীমাহীন দুঃখ, দুঃসহ দুর্দশা ও নৈরাশ্যে মুহ্যমান থাকে। তিনি তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসকে সহানুভূতির সঙ্গেই সমালোচনা করতেন। কংগ্রেসের কার্যসূচীতে তিনি গণকল্যাণমুখী সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কাজের কোনও নিদর্শন দেখতে পান নি। তিনি অনুভব করতেন যে আইন বা রাজনীতির মাধ্যমে মানুষকে ধার্মিক করা যায় না। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের উপকারিতায় তাঁর অধিক আস্থা ছিল। ভারতের নবজাগরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বাইরের লোক সাধারণতঃ কংগ্রেসের আন্দোলন ও সমাজসংস্কার ক্ষেত্রেই নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রেই ঐ জাগরণ অধিক কার্যকর হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজনীতিকগণের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে অনেক যুগ লাগিবে।'[৫৪]

সমাজতন্ত্রের প্রত্যয়

বিবেকানন্দ নিজেকে 'সোসালিষ্ট' বলে ঘোষণা করেছিলেন।[৫৫] সেজন্যে তাঁকে এদেশের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করা হয়। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে

এদেশবাসীর পরিচয় এর বহু পূর্বেই ঘটেছিল। 'সোসালিজম' শব্দটি প্রথম যিনি ব্যবহার করেছিলেন সেই ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের সংযোগ ও পত্রবিনিময়ের কথা সুবিদিত (তৎকালীন ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী সিসমঁদি প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের সঙ্গেও রামমোহনের সংযোগ ঘটে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রও এবিষয়ে অবহিত ছিলেন— তাঁর লেখায় 'ইণ্টারন্যাশনালে'র উল্লেখও পাওয়া যায়। কাজেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের সংযোগই প্রথম ঘটেনি।) তবে সরাসরি নিজেকে 'সোসালিষ্ট' বলে ঘোষণা হয়তো তিনিই প্রথম করেন। এখন দেখা দরকার যে বিবেকানন্দ কি অর্থে, কি ধরনের এবং কি পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে সমাজতন্ত্র কথাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। 'সোসালিজম' কথাটিকে বিভিন্ন সময় ও স্থানে বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে। ১৮২৭ সালে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেন।[৫৬] নিজে মিল মালিক হয়েও মালিক-শ্রমিক সমবায় প্রবর্তনে তিনি সচেষ্ট হন। ব্রিটেনে ওয়েনের কর্মতৎপরতা কার্যকর হয়েছিল— শ্রমিকদের স্বার্থে বহু আইনকানুন বিধিবদ্ধ হয়। একই সময়ে ফ্রান্সে সিসমঁদি, ফুরিয়ার ও সাঁ সিমন শিল্প-বিপ্লব প্রসূত অর্থনৈতিক বৈষম্যকে নীতিগতভাবে দূরীকরণের জন্য লেখনী ধারণ করেন। ওয়েন ও সাঁ সিমন এ বিষয়ে পুঁজিপতিদের সহায়তা চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতীয়করণের প্রস্তাব ওঠে। উনিশ শতকের চল্লিশের কোঠায় লুই ব্লাঙ্ক ও প্রুধঁ উপলব্ধি করেন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা প্রয়োজন। প্রুধঁ ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। তিনি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যতিরেকেই ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যুগান্তকারী 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' প্রচার করেন। ইতিপূর্বে প্রচলিত সমুদয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকেই তাঁরা 'উটোপিয়ান' 'সেন্টিমেণ্টাল' 'পেটি বুর্জোয়া' 'ফিউডালিষ্ট' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ প্রবর্তন করেন। তত্ত্বগত বিচারে 'কম্যুনিজম' ও 'সোসালিজম'-এর প্রভেদ থাকলেও প্রচলিত ব্যবহারে শব্দদুটি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের মূলকথা হল: ১. দ্বান্দ্বিক (dialectics) প্রণালীতে এবং অর্থনৈতিক ও জড়বাদী নির্দেশনা প্রত্যয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা; ২. শ্রেণী সংগ্রাম প্রক্রিয়ায় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র; ৩. সর্বহারাদের

ক্রমবর্ধমান দুঃস্থতা হেতু পুঁজিবাদের অনিবার্য অবক্ষয় ও বিনাশ; ৪. সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের পথে সাময়িক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; শিল্পসাহিত্যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সর্বহারাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য; ৫. সমাজতন্ত্র সংস্কারের পথে আসে না; চাই বিপ্লব—প্রয়োজনে সশস্ত্র রক্তঝরা বিপ্লবও অপরিহার্য। বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার অধিকার একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীরই আছে— অবশ্য নিজ শ্রেণীসত্তা ঘুচিয়ে অন্যান্য শ্রেণীর সমাজসচেতন ব্যক্তিরাও তাতে অন্তর্লীন হতে পারেন; ৬. সমাজতন্ত্রে জাতীয়তাবাদী মনোভাব পরিত্যাজ্য; সারা বিশ্বের শ্রমিক বা সর্বহারাদের ঐক্য চাই।

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রকে প্রথমে প্লেখানভ ও বার্নষ্টিন এবং উত্তরকালে লেনিন অবস্থানুযায়ী কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যেও দেশীয় স্বার্থানুসারে প্রভেদ দেখা দিয়েছে। চীন ও আলবেনিয়ার কম্যুনিষ্টরা নিজেদের খাঁটি সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করেন এবং তাঁদের চোখে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কম্যুনিষ্টরা শোধনবাদী। তৃতীয় দলটি হল যুগোস্লাভীয়। এছাড়া রুশ বিপ্লবের পূর্বে সেখানকার কম্যুনিষ্টরা বলশেভিক ও মেনশেভিক দলে বিভক্ত ছিল। মার্কসের নানারূপ ব্যাখ্যা রুশ বিপ্লবোত্তর কালে দেখা দেয়। তন্মধ্যে ট্রটস্কি ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিচার-বিশ্লেষণ উল্লেখ্য। মানবেন্দ্রনাথই মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রকে ভারতে প্রথম প্রচার করেন। পরে অবশ্য তিনি মার্কসবাদ অতিক্রম করে নবমানবতাবাদ দর্শন প্রবর্তন করেন।

সমাজতন্ত্রের প্রকারভেদ এখানেই শেষ নয়। ব্রিটেনের লেবার পার্টির কার্য-ক্রমকে সমাজতান্ত্রিক বলা হয়। চাষআবাদে ইস্রায়েলও সমাজতন্ত্রের অনুগামী।[৫৭] ভারতের 'সোসালিষ্টিক প্যাটার্ন' তো আছেই। জাতীয় সমাজতন্ত্রের নামাবলী ধারণ করে হিটলারের নাৎসিতন্ত্রের কিছু সমাজতান্ত্রিক লক্ষণ ছিল। মিল-বেনথামের হিতবাদী সংস্কারচিন্তা সমাজতন্ত্রের সূচনা করে। শেষ দিকে সর্বাধিকারপন্থী (authoritarian) চিন্তার আধিপত্য দেখা যায়। সেজন্যে শব্দটির যথার্থ মর্ম কি তা দেখা যাক:

১. মার্কসীয় বস্তুতন্ত্রী দৃষ্টিতেই হোক অথবা ধর্মীয় দিক থেকেই হোক সোসালিষ্টরা সকলেই চেয়েছে মৌল মানবিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং সেজন্যে প্রতিকূল সর্ববিধ বৈষম্য ও অন্যায়ের অবসান।
২. সোসালিষ্টরা মনে করে যে মানুষ মূলতঃ নির্দোষ— মানুষ ভাল না হলে

(failings in human nature) সামাজিক সংস্কারপ্রচেষ্টা অর্থহীন। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গলদের মূলে ত্রুটি (failings of institutions) থাকলে মানুষ সেগুলিকে পরিবর্তন করতে পারে। পারস্পরিক সুখসুবিধার জন্য সকল মানুষ সৌহার্দ্য ও সমবায়ের মনোভাব পোষণ করে— এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত থেকেই সোসালিষ্টরা মনে করে যে, অপরাধ, অশান্তি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির মূলে থাকে ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ; সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই ঐসব অনভিপ্রেত দিকগুলির অবসান ঘটবে।[৫৮]

৩. সামাজিক রোগ নির্ণয়ের পর নিরাময়ের কি ঔষধ প্রযোজ্য ? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সবাই অসন্তুষ্ট। তার পরিবর্তন ও আদর্শ ব্যবস্থার প্রবর্তন কিরূপে সম্ভব সেবিষয়ে স্বপ্নবিলাসী (utopian) সোসালিষ্টরা কোনও কার্যকর পন্থা দেখাতে পারেন নি। শিল্প বিপ্লবের ফলে ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য, শ্রমিকদের সংহতি ও বৈপ্লবিক সংগঠন ইত্যাদির সম্ভাবনা নতুন পথের নিশানা দেখায়। সেজন্যে সর্বধরণের সোসালিষ্ট মতবাদে একটা কর্মপন্থা থাকে— সেটা শ্রমিক আন্দোলন হতে পারে, সমবায়ী (Co-operative) প্রচেষ্টা হতে পারে অথবা রাজনৈতিক গণদল, বৈপ্লবিক গোপনকার্য কিংবা গেরিলা যুদ্ধের প্রণালীও হতে পারে।[৫৯]

৪. সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকল্পে জনসাধারণের সক্রিয় সম্মতি বা ইচ্ছা থাকা চাই। কল্পনাবিলাসী বা অমার্কসীয় সোসালিষ্টরা মনে করেন যে, প্রচারের মধ্যে দিয়েই জনমত সৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সম্ভব। মার্কসবাদীরা পরিবর্তনের অনুকূলে material precondition-এর প্রয়োজন অনুভব করেন— অর্থাৎ পরিবেশ অনুকূল না হলে বৈপ্লবিক প্রয়াস অর্থহীন। আবশ্যিক পূর্বাবস্থা দেখা দিলে জনমত স্বতঃই সৃষ্ট হবে। ধনতন্ত্রের অবক্ষয় ও উৎপাদন হ্রাস পেলে অবস্থা বিপ্লবের অনুকূলে যাবেই ; যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক ভাঙন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে ; বিপ্লবকামী জনসাধারণকে সঠিক পথে চালনার জন্য চাই সমাজতান্ত্রিক মত ও পথের নিশানা দেবার উপযোগী সুগঠিত পার্টি।[৬০]

এককথায় সমাজতান্ত্রিকরা চায় পুঁজিবাদের অবসান, তথা উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান এবং ন্যায়নির্ভর শ্রেণীহীন

সমাজের প্রবর্তন। গোটা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন বহির্ভূত না হলেও মার্কসবাদী সোসালিষ্টরা কার্যতঃ ঐ-দুটি বিষয়কে বাদ দিয়েছে।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা তাঁর বিভিন্ন উক্তি ও দার্শনিক প্রত্যয়-গুলির মধ্যে পাওয়া যায়। রাজনীতির অঙ্গ বলেই হয়তো তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একত্র বিস্তারিতভাবে কিছু আলোচনা করেন নি। তবে সমাজতান্ত্রিক চেতনার যে লক্ষণগুলি উপরে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে তার কয়েকটি বিষয় বিবেকানন্দের চিন্তায় স্পষ্টই দেখা যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজির চিন্তাকে মার্কসের সমগোত্রীয় বলে মনে করতেন। মার্কসীয় সাহিত্যের সঙ্গে স্বামীজির কোন পরিচয় ছিল কিনা তা জানা যায় না। প্যারিসে অনুষ্ঠিত Congress of History of Religions-এর সময় তাঁর সঙ্গে ক্রপটকিন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটে। তখনও অ্যানার্কিজম, সোসালিজম, কম্যুনিজম কার্যতঃ মাতৃগর্ভে

মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক অমিল এই যে তিনি ধর্মকে লেনিনের ভাষায় 'opium of the people' বলে মনে করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক (dialectics) প্রণালীতে বস্তুতন্ত্রী বিচারবিশ্লেষণও তাঁর মতের পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ, প্রয়োজনে হিংসাত্মক কাজকে কিছুটা সমর্থন করলেও বিবেকানন্দের চিন্তায় মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম ও রক্তঝরা বিপ্লবের স্থান ছিল না। তবে মার্কসের সঙ্গে তাঁর কিছু মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ প্রাক-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা উভয়েরই মনকে স্পর্শ করে।

প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পর্যালোচনার পূর্বে ব্যাবহারিক দিক সম্পর্কে তাঁর কি মনোভাব ছিল তা প্রথমে দেখা যাক। তিনি লিখেছেন : 'যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোসালিজম, ব্যক্তিত্ব সমর্থক মতের নাম ইনডিভিজুয়ালিসম'।[৩১]

বিবেকানন্দ সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তির নিরঙ্কুশ বিকাশ ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতি যে অর্থহীন সেকথাও অব্যর্থ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তিনি যে সমর্থন করতেন ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়: 'For writing a few words of innocent criticism, men are being hurried to transportation for life, others,

imprisoned without any trial; and nobody knows when his head will be off.'[৬২]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে তাঁর প্রবণতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই অনুকূল ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে তবে কেন তিনি সমাজতন্ত্রের সমর্থক হয়েছিলেন। তার উত্তর তাঁর অপর একটি চিঠিতে মেলে: 'I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread.'[৬৩]

স্বামীজি ইউরোপের সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থার বহু ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর চোখে পড়েছিল। সেজন্যে তিনি ভারতেরই একটি প্রাচীন চিন্তা বেদান্ত দর্শনকে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয়, সমষ্টি ও ব্যষ্টি-স্বার্থের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য চেয়েছেন। তাঁর এই চাওয়ার মূলে ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মুক্তির অন্তরায়রূপে তিনি দারিদ্র্য, অনাহার, ধর্মীয় অনাচার ও শ্রেণীশোষণকে প্রত্যক্ষ করেন; এগুলির অবসানেই মানুষ স্বীয় সত্তায় ভাস্বর হয়ে উঠবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তামসিক জীবনের মোহমুক্তির জন্য তিনি সোসালিষ্ট হয়েছিলেন। পরাধীনতা ও সামাজিক অবিচার মানুষকে যে তামসিকতায় আবদ্ধ রাখে, তারই বিমোচনকল্পে আত্মসত্তার উন্মেষ ও রাজসিক সমাজকর্মের প্রতি তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বেদান্তকে তিনি ব্যাবহারিক ('Practical Vedanta') দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন বলে দার্শনিক প্রত্যয়েই তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উপনীত হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, অদ্বৈত বেদান্তে জীব ও ঈশ্বরে কোনও প্রভেদ নেই এবং এদেশের অধোগতিকে রোধ করতে হলে চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস; মানুষকে জানাতে হবে যে তারই মধ্যে ব্রহ্ম বিরাজ করেন—যেমন করেন সমস্ত জীবেরই মধ্যে; অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে জীবের শক্তি ও সম্ভাবনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক অনগ্রসরতা, অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানুষে মানুষে সংঘর্ষের ধ্বনি জীবকে সসীম জীবনে আবদ্ধ রেখেছে। বর্ণবৈষম্য, ধর্মের নামে ভণ্ডামি প্রভৃতি যাবতীয় অনাচার জীবকে ভুলিয়ে দিচ্ছে যে সে নিজেই পরম ব্রহ্মের অঙ্গ। সত্যের প্রতিষ্ঠা তথা জীবের স্বীয় অসীম সত্তা ও সম্ভাবনার উদ্ঘাটনের জন্য চাই সমাজের পুনর্গঠন। প্রাত্যহিক জীবনে ছন্দের স্পন্দন জাগানোর জন্য বিমূর্ত বেদান্তকে প্রাণবন্ত করে তোলা দরকার। তাই বিবেকানন্দ অকুণ্ঠ কণ্ঠে

ঘোষণা করেন যে মানুষই স্বয়ং ভগবান ; যে ভগবানকে মানুষ মঠমন্দির মসজিদ চার্চে খুঁজে মরছে, পর্বতগুহা নদী অরণ্যে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে সে ভগবান সে নিজেই— মানুষই ইতিহাসের নায়ক। এখানে মার্কসের সঙ্গে তাঁর আংশিক মিল লক্ষণীয়।[৩] হেগেল আত্মবিচ্যুতি ও আত্মাবিষ্কারের যে-তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করেছিলেন ফয়েরবাক তাকে তাঁর নৃতাত্ত্বিক ধর্মপ্রত্যয়ে বিশ্লেষণ করেন যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন। মার্কস সেই মানবিক প্রত্যয়কে আরও একটু এগিয়ে এনে বলেন যে মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদা দিতে হবে— সেজন্যে চাই সমাজ ব্যবস্থার নবরূপায়ণ। তাতেই আত্মবিচ্যুত মানুষ নিজেকে সঠিক সত্তায় খুঁজে পাবে—তাতেই হবে তার মুক্তি। মার্কসের মতে মানুষের এই আত্মবিচ্যুতি ঘটেছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে, তাই প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান— চাই সমাজতন্ত্র— তাতেই মানুষ নিজেকে আবার খুঁজে পাবে।[৬৪]

বিবেকানন্দ যে-নবজাগ্রত মাতৃভূমির কল্পনা করেছিলেন তার রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সমানাধিকার কামনা করেন। তিনি যে-বন্ধনমুক্ত মানুষের কল্পনা করেন সে-মানুষ জ্ঞানে, কর্মে, স্বাস্থ্যে, হৃদয়বৃত্তিতে মহান। মুক্ত মানুষের সমবায়ে গঠিত নতুন সমাজব্যবস্থা দেশপ্রেম, বিজ্ঞানচেতনা এবং সত্ত্ব ও রজের সংমিশ্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক— এই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তিনি মানুষকে জীবনবিমুখ ও বস্তুভোগ্য উপকরণে উদাসীন করতে চান নি। তিনি স্পষ্টই বলেন যে আমরা নির্বোধের মতো বস্তুবাদী সভ্যতার বিরোধিতা করি ; আঙুর ফল টক ; বস্তুবাদী সভ্যতা, এমন কি বিলাসিতারও প্রয়োজন আছে বিত্তহীনের অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে। রুটি চাই— যে-ঈশ্বর কেবল স্বর্গের চিরন্তন সুখের কথা বলে, অথচ রুটি জোগাতে পারে না তার প্রতি আমার কোনও বিশ্বাস নেই।[৬৫] তিনি মনে করতেন যে **'first bread and then religion'**। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের নীতিকথা শোনানো নির্বুদ্ধিতার সামিল। তিনি যে-জীবনবোধের কথা বলেন তাতে খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের নিশ্চয়তার প্রশ্ন নিহিত।

বিবেকানন্দ একথাও উপলব্ধি করেন যে দুনিয়ার বুভুক্ষু-মানুষের মন ও গতি সমাজতন্ত্রের দিকে নিবদ্ধ— এবং সেদিকে যে রাশিয়া ও চীনই প্রথম অগ্রসর হবে তাও ভবিষ্যদ্বাণী করেন।[৬৬] মার্কসীয় মতে কিন্তু শিল্পে প্রাগ্রসর দেশ-গুলিতেই সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রাদুর্ভাব হবার কথা। শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও দরিদ্রের আরও দরিদ্র হয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া তিনি নিজ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন

তার সঙ্গে মার্কসীয় মতবাদের মিল সুস্পষ্ট। নিরন্ন মানুষের দুঃসহ জীবন তাঁর মনে যে-বেদনার সৃষ্টি করে তারই ফলস্বরূপ তাঁর সাম্যচিন্তা দেখা দেয়।

পাঁচ : শিক্ষাচিন্তা

স্বামীজির চিন্তায় শিক্ষাতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তিনি অনুভব করতেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও চেতনা ব্যতিরেকে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য শিক্ষা বলতে তিনি পুঁথিগত বিদ্যা মনে করতেন না। মনের যথোচিত মার্জনা হলে মানুষের যুক্তিপ্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষ লাভ করবে— ফলে সৃষ্টি-শক্তির বিকাশ, সদাচার, ঔদার্য ও সমবায়ী মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। রাজনীতির সার্থকতা ও সুষ্ঠু সমাজবিন্যাসের মূলে শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে উত্তরকালে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকেরা অনুরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা তাঁর বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনা একত্র 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা হল : 'Education is the manifestation of the perfection already in man'।[৬৭] তিনি মনে করতেন : 'জ্ঞান মানুষে অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে⋯যেমন একখণ্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান মনের মধ্যেই রহিয়াছে, উদ্দীপক কারণটি ঘর্ষণস্বরূপে সেই অগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়'।[৬৮] মানুষের সহজাত জ্ঞানশক্তি ও সম্ভাবনা ছাই চাপা আগুনের মতো আবৃত থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সেই আবরণকে অপসারণ করা।

শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও শক্তিকে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য ; তার বেশি নয়— অর্থাৎ শিক্ষকের নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে গুঁজে দেওয়া অনুচিত। শিক্ষায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা স্বামীজির শিক্ষাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে যে thought control এবং cultural regimentation বর্তমানকালে কোনও কোনও রাষ্ট্রে চলেছে তার বিরুদ্ধ-মনোভাব বহুপূর্বেই বিবেকানন্দের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে : 'আমার

মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? আমার প্রভুর এইসব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এসব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে ঐগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা উহা না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ শিশুকে এইরূপে নষ্ট করা হইতেছে।'[৬৯]

ছোটবেলা থেকেই মানুষকে স্বাধীন চিন্তায় প্রবৃত্ত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটদের উপর অসঙ্গত শাসনেরও তিনি তীব্র নিন্দা করতেন। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়।

তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্রগঠন তথা মানুষ তৈরী করা। তিনি মনে করতেন যে সুখ ও দুঃখ উভয়ই মানুষের মহান শিক্ষক— সে শুভ হতে যেমন, অশুভ থেকেও তেমনি শিক্ষা পায়— সুখদুঃখ মনের উপর একটা চিত্র রেখে যায়— এই চিত্রের সমষ্টিফলই মানবচরিত্র— সুখদুঃখের উপাদানেই চরিত্র গঠিত হয়। সর্বশক্তিময় ইচ্ছা, মার্জিত সংস্কার ও সৎ অভ্যাস চরিত্রকে পুষ্ট করে।

মানুষ গড়তে স্বামীজি যে-পন্থা দর্শিয়েছেন তার প্রাথমিক উপাদান দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অটুট স্বাস্থ্য ও কুসংস্কারমুক্ত মন। ঘরকুনো মনোবৃত্তি ত্যাগ করে দেশবিদেশে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে বেরিয়ে পড়া উচিত। সর্বোপরি থাকা চাই স্বাজাত্যবোধ। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তিনি শ্রদ্ধাভাব-বর্জিত ও নেতিভাবপূর্ণ বলে মনে করতেন। বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল :[৭০]

১. আত্মনির্ভরশীল ও জীবনসমস্যা সমাধানকারী শিক্ষা চাই। বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারাকে এমনভাবে আয়ত্ত করা দরকার যাতে তা চরিত্রে ও জীবনে আদর্শ মানুষ গড়ার সহায়ক হয়। পাঁচটা ভাব হজম করে জীবন ও চরিত্র গঠন একটি আস্ত লাইব্রেরি মুখস্ত করার চেয়েও অধিক সার্থক ও কার্যকর। চাকুরিসর্বস্ব মুখস্ত বিদ্যাগত পরীক্ষা পাশের সামাজিক মূল্য নগণ্য।

২. পরার্থপরতা ও মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। স্বাধীনভাবে জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী ও বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা। কারিগরি বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার বিস্তার। বহির্বিজ্ঞান, দলগঠন ও পরিচালন দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশের শিক্ষারও উপযোগিতা আছে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও শিল্পবাণিজ্যে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য বিদেশভ্রমণ বিশেষ কার্যকর।

৩. সনাতন পদ্ধতির অনুসরণ। ভারতের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার

শিক্ষা আয়ত্ত করা সমীচীন। সনাতন শিক্ষা অপরের প্রতি ঘৃণা ও নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে সবল সহিষ্ণু চিত্তবৃত্তি গঠন করে।

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে সকল জাতিরই মেরুদণ্ডস্বরূপ একটা মৌল আদর্শ থাকে— কারো রাজনীতি, কারো সামাজিক উন্নতি, কারো মানসিক উন্নতি বিধান, কারো-বা অন্য কিছু। সেদিক থেকে ভারতীয় জীবনের মূলভিত্তি হল ধর্ম। ধর্মই শিক্ষার সার। ধর্ম অর্থে তিনি কোনও সম্প্রদায়গত মতামত বলে মনে করতেন না। তাঁর কথায়: 'মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব পূর্ব হইতেই বর্তমান তাহার প্রকাশসাধনকে বলে ধর্ম। যে ভাবধারা পশুকে মানুষ এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে তাহাই ধর্ম।'[৭১]

ধর্ম মানুষের অনন্ত শক্তি ও বীর্যের আধার। সুযোগসুবিধা পেলে সে শক্তি বিকশিত হয়। বিকশিত হোক বা না হোক সে শক্তি প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে। তিনি প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিষ্যের চারিত্রিক গঠন যে সুষ্ঠুই হয় তাই নয়— শিষ্য নিজ রুচি ও কৌতূহল অনুযায়ী গুরুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জনেরও সুযোগ পায়। সহানুভূতি, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি গুরুর সান্নিধ্যেই সহজে অর্জন করা যায়। সহজবোধ্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই ছিল স্বামীজির অভিমত। তাঁর মতে বিদ্যালয়ে ক্রমশঃ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

দেশের জনশিক্ষার বিষয়ে বিবেকানন্দের আগ্রহ খুব বেশি দেখা যায়। যে-সমাজের চিত্র তাঁর অহরহ অনুধ্যানের বিষয় ছিল তার সার্থক রূপায়ণ একমাত্র জনশিক্ষার মাধ্যমেই যে হওয়া সম্ভব সেসম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এবিষয়ে তাঁকে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী বলা যায়। জনশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা আজ যেন অতি বেশি জরুরী বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন: 'যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সমর্থও হই তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সেসব স্কুলে পড়িতে আসিবে না। কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া তাহার পিতাকে কৃষিকার্যে সহায়তা করিবে অথবা অন্য কোনরূপ জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সকল স্থানে পৌঁছিতে হইবে।'[৭২]

জনশিক্ষার সঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়েও স্বামীজির সজাগ দৃষ্টি ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি বৈদান্তিক চেতনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যখন একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিদ্যমান তখন নারীকে পৃথকভাবে দেখা অযৌক্তিক। বৈদিককালে অধিকারগত ব্যাপারে নারীপুরুষের মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষীরা মান ও মর্যাদায়, বিদ্যায় ও জ্ঞানে মুনিঋষিদের সমকক্ষ ছিলেন। প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদ সমূহেও বালক ও বালিকাদের অধিকার ছিল সমান। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা ব্রাহ্মনেতর জাতিকে কোণঠাসা করার সময় নারীকেও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। স্বামীজি মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন; তবে বিধবা বিবাহে তাঁর বিশেষ সমর্থন ছিল না। অন্যান্য বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত করার মতো বিবাহেও স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার নারীকে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণ সম্ভাবনা সদূর পরাহত বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। স্বামীজি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আদর্শ স্ত্রী-মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তিনি স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পুরুষের সংশ্রব চাইতেন না। তাঁর মতে স্ত্রীলোকদের গৃহকর্মেই নিযুক্ত থাকা ভাল। প্রয়োজনে যাতে তারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় সেশিক্ষাও মেয়েদের থাকা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ছয় : উপসংহার

দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকরূপে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত পরিচয় যে তিনি মূলতঃ একজন মানবদরদী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। প্রেমের সাধনাতেই তাঁর জীবন ও মননের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা ঘটে।

প্রচলিত ধর্মীয় অনাচার ও পৌত্তলিকতার অবসানকল্পে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি খ্রীষ্টান পাদরিদের বিরূপ সমালোচনাকে প্রতিরোধ করার জন্য রামমোহন বেদান্তপ্রচারে তৎপর হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি নবাগত পশ্চিমী সংস্কৃতির মূল্যবোধকেও সাদরে অভ্যর্থনা করেন। একদিকে স্বদেশের সনাতন ঐতিহ্য তথা ইহবিমুখ বৈদান্তিক মায়াবাদের আকর্ষণ, অন্যদিকে যুক্তিবাদী ঐহিক আদর্শের স্বাঙ্গীকরণ রামমোহনের অন্তর্বিরোধকে ফুটিয়ে তোলে। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা

তাঁর বিখ্যাত পত্রটিই একথার প্রমাণ। পক্ষান্তরে রামমোহনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সাধনায় পৌত্তলিকতাকে বর্জন করেন নি। উপরন্তু পাশ্চাত্ত্যের মূল্যবোধকে ইহসর্বস্ব ও বস্তুবাদী বলে একপ্রকার পরিহারই করেছেন। পশ্চিমকে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শে জয় করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য স্বদেশের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও হীনমন্যতা থেকেই তাঁর এই প্রবণতার উৎপত্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তাঁরই সহজ ও সরল উপদেশগুলিকে স্বামীজি দার্শনিক ব্যঞ্জনায় প্রচার করেছিলেন বটে, কিন্তু গুরুশিষ্যের মধ্যে দৃষ্টিগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। গুরু জীবের মধ্যে শিবকে দেখতে পেয়েছিলেন ; আর শিষ্য জীবসেবার মধ্যে দিয়ে শিবকে পেতে চেয়েছিলেন। গুরুর মধ্যে সেবাব্রতের স্থান ছিল প্রচ্ছন্ন ও গৌণ। কিন্তু শিষ্য সেই সেবাব্রতকেই জীবনের মুখ্য আদর্শ করে তোলেন। গুরু ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলতঃ পারমার্থিক। বুদ্ধের প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ শিষ্য মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য পারত্রিক চিন্তার পরিবর্তে বুদ্ধের মতো জীবের কল্যাণে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। স্বামীজি বলেন : 'I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven !'[৭৩]

মানবপ্রেমের জন্যই তাঁর মননধারায় প্রবল অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় ; সেইসঙ্গে গুরুনির্দিষ্ট আদর্শ ও নিজের আচরণেও। তাঁর মানবপ্রেমের মধ্যে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে তাঁর আদর্শে সবার উপর মানুষ সত্য একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয় নি। তিনি সর্বোপরি পরম সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুতঃ জীব-সেবার মধ্যে দিয়ে তিনি শিবকেই সেবা করতে চেয়েছিলেন। শিবকে পাবার জন্যই মানুষকে সেবা করা। সেক্ষেত্রে মানুষ একটা মাধ্যম (medium) মাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য (end) নয়।

যুক্তিতর্কে স্বামীজির বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু যুক্তিবাদকে তিনি পরিহার করেন। তাঁর কাছে যুক্তির সীমারেখা ছিল নির্দিষ্ট ; সেই সীমাকে অতিক্রম করে তিনি অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় চিন্তাকে প্রাধান্য দেন ; এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়কেই বড় করে দেখেন। শংকরের কঠোর মায়াবাদে সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়েও হৃদয়াবেগের ফলে তিনি মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে বেদান্তপ্রচার অপেক্ষা সেবাব্রতই তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে।

তিনি চাইতেন মোক্ষ (emancipation), মুক্তি (freedom) নয়। সেই কারণেই তিনি একসময়ে ঈশ্বর বিমুক্ত মানবকল্যাণ অসম্ভব উপলব্ধি করেই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। নিখাদ বস্তুতন্ত্রী যুক্তিবাদী প্রত্যয়ের আশ্রয়ে গঠিত নীতিতত্ত্ব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের শাশ্বত শুভ অভীপ্সার সঙ্গে মানবিক কল্যাণকে সমন্বিত করে তিনি মানুষের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশসাধনে বৃত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন ঐহিক উন্নতি ব্যতীত আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব নয়। সেই দৃষ্টিতেই তিনি সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে-ছিলেন ; কিন্তু স্বতন্ত্র মত ও পথে। তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও মানবতন্ত্রী আদর্শের মূলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিস্ফুট।

কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্বসূরীদের মতো স্বামীজিও মনে করতেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাৎপর্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করবে। মানুষের নীতিবোধ আর আত্মিক উন্নতির মূলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা নিহিত থাকে। তাঁর মতে যান্ত্রিক প্রণালীতে গঠিত জাতীয়তাবাদী কর্মতৎপতা স্থায়িত্ব লাভ করবে না ; নেশনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে জনচিত্তে ত্যাগ, নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও নিস্পৃহ মনোভাব সঞ্চার করা দরকার। স্বামীজি পরমতে সহিষ্ণু ছিলেন ; ধর্ম, লোকাচার বা শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য ও উৎপীড়নকে কখনই ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশে— সমাজ বা ধর্মের অনুশাসনে নয়।

স্বামীজির রাষ্ট্রচিন্তায় ভারতীয় সমাজবিবর্তনের এক নতুন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সমকালীন রাষ্ট্রীয় দুর্গতির তিনি নানা প্রতিকার দর্শিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী যেমন দেশের সংগ্রামী কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনি তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাব উত্তরকালে অরবিন্দ, টিলক, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জননেতাদের মনে প্রতিফলিত হয়েছিল। সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা না করলেও স্বামীজির আদর্শ ও আচরণ প্রকারান্তরে ইংরেজ শাসনেরই প্রতিকূল মনোভাব সঞ্চার করে। উত্তরকালে পরাধীনতার গ্লানি থেকেই দেশবাসীর ইংরেজ বিদ্বেষ পাশ্চাত্ত্যবিদ্বেষে পরিণত হয়। ক্রমে সেই বিদ্বেষ আধুনিকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

দেশ যখন আত্মগ্লানি, নিস্পৃহা ও হতাশায় নিমজ্জমান সেসময়ে বিবেকানন্দ লোকের বুকে আশা, আত্মশক্তি ও নির্ভীকতার ভাষা যুগিয়েছিলেন, নিশানা দিয়েছিলেন নতুন পথের। বিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের

গতি সহসা যে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে, তার পিছনে বিবেকানন্দের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস-গবেষণায় স্বামীজির চিন্তা ও ভূমিকা মূল্যবান উপাদান

নির্দেশিকা

Sister Nivedita. *The Complete Works.* 1967, vol. 3, p. 286.

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী'। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩০।

Manabendra Nath Roy. *India In Transition.* 1922, p. 193.

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। "বিবেকানন্দের রূপান্তর", অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত 'বিশ্ববিবেক'। ১৯৬৩, পৃ ৯৭।

পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৯৮।

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১০১।

৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১০. স্বামী অখণ্ডানন্দ। 'স্মৃতিকথা'। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ১০৮।

১১. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples, 1960, p. 331.

১২. *Letters of Swami Vivekananda.* p. 175.

১৩. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960, p. 501.

১৪. *Ibid.* p. 502.

১৫. *Ibid.* p 507.

১৬. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ৫, পৃ ২৬। ('ভারতে বিবেকানন্দ')।

১৭. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫।

১৮. R. C, Majumdar. *Swami Vivekananda : A Historical Review* 1965, pp. 84-85.

১৯. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 1960, vol. 3, p. 242.

২০. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ২, পৃ ১০৮। ('জ্ঞানযোগ')।

২১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬।

২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৯৫-৬।

২৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৪৪৬-৭।

২৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৫. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'। পৃ ১১-১২।

২৬. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ২, পৃ ২৩৫-৬ ('জ্ঞানযোগ')।

২৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩৪৫।

২৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩০৮।

২৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩৫১।

৩০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ৬, পৃ ২৩১-২৪৫ ('বর্তমান ভারত')।

৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৩২।

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৩১।

৩৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৮, ২৬।

৩৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩৭।

৩৫. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 1955, vol. 5, pp, 317, 406.

৩৬. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples, 1960, p. 624.

৩৭. *Ibid.* p. 619.

৩৮. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 1955, vol. 4, p. 368.

৩৯. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৭২।

৪০. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ৬, পৃ ২০৯। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')।

৪১. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960, p. 582.

৪২. *Ibid.* p. 291.

৪৩. *Ibid.* p. 586.

৪৪. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ৬, পৃ ২৩৮। ('বর্তমান ভারত')

৪৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৪৩।

৪৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৬১। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

৪৭. *The Complete Works of Swami Vivekananda,* 1955, vol. 5, p, 210.

৪৮. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960, p. 575.

৪৯. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৯৮-১৯৯।

৫০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ৭, পৃ ৯ ('পত্রাবলী' খণ্ড ১, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৮১-৮৩)।

৫১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ৬, পৃ ২৩৬। ('বর্তমান ভারত')

৫২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২৩৭।

৫৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ২০৮, ২২২-২২৪।

৫৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ৯, পৃ ৪৫১। ('কথোপকথন')

৫৫. স্বামী বিবেকানন্দ। 'পত্রাবলী'। খণ্ড ২, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৪৮।

৫৬. Norman Mackenzie. *Socialism : a Short History.* 1966, p. 12.

৫৭. *Ibid.*

৫৮. *Ibid.* p. 13

৫৯. *Ibid.* p. 14.

৬০. *Ibid.*

৬১. স্বামী বিবেকানন্দ। 'পত্রাবলী'। খণ্ড ২, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৪৮।

৬২. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 1955, vol. 8, p. 476.

৬৩. *Ibid.* vol. 6, p. 342.

৬৪. সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। "বিবেকানন্দ ও সোসালিজম", অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত 'বিশ্ববিবেক'। ১৯৬৩, পৃ ২৯২।

৬৫. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 1955, vol. 4, p. 368.

৬৬. রোমাঁ রোলাঁ। 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ. পৃ ১৪৪।

৬৭. স্বামী বিবেকানন্দ। 'শিক্ষা প্রসঙ্গ'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩।

৬৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১১।

৭০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৫৯-৬৩।

৭১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬৬।

৭২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৪৩।

৭৩. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 1955, vol. 8, p. 476.

এক : ভূমিকা

ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার দ্বিমুখী গতিপথে নরম ও চরমপন্থী নামে যে-দুটি দল ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে তার প্রথমটির উৎপত্তি ও বিবর্তনের কথা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে। চরমপন্থী ধারার অন্যতম প্রধান উৎস শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রচিন্তা প্রসঙ্গে উক্ত ধারার ইতিবৃত্ত এখানে একবার সংক্ষেপে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

রামমোহন মডারেট অর্থাৎ নরমপন্থী রাষ্ট্রচিন্তার প্রবর্তন করেছিলেন। তারই সূত্র ধরে উত্তরকালে দেশের মডারেট রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতা বিকাশ লাভ করে। রামমোহনের সমসাময়িককালে ডিরোজিওর নেতৃত্বে চরমপন্থী নামে অভিহিত যে এক দার্শনিক বিপ্লবী (Philosophical Radicals) গোষ্ঠী[১] গড়ে ওঠে তার সঙ্গে উনিশ শতকের শেষদিককার চরমপন্থীদের কোনও মিল নেই। ডিরোজিওপন্থীরা যুক্তি, স্বাধীন চিন্তা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদর্শনে অনুপ্রাণিত এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন উদিত হয়ে থাকলেও তা অর্জনের কোনও বিপ্লবী পন্থা তাঁরা অবলম্বন করেন নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারার ভগীরথ লাল-বাল-পাল ও অরবিন্দ প্রমুখ 'জাতীয়তাবাদীরা' ভক্তিবাদ, অবতারবাদ, লীলাবাদ, অলৌকিকত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেন। শক্তির বোধনকল্পে তাঁরা কালী, দুর্গা, ভবানী, বগলা প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন। শিবাজী ছিলেন তাঁদের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-৮৩) হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তাকে অনেকাংশে ভিত্তি করে এই ধারা গড়ে ওঠে।[২] বিদেশী শাসকদের বিতাড়নকল্পে এঁরা নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

'মডারেট' বা নরমপন্থীদের 'Constitutionalist' এবং 'এক্সট্রিমিস্ট' বা চরমপন্থীদের 'Nationalist' নামে উল্লেখ করা হত। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে চরমপন্থী চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত ঘটে থাকলেও, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশের 'জাতীয়তাবাদী' নামে পরিচিত কর্মীরা মডারেট নীতির বিপরীত

সংগ্রামী কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসেরই ভিতরে থেকে ১৯০৬ সালে প্রকাশ্যভাবে একটি দল গঠন করেন।[৩]

নরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজেরই পক্ষপুটে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন চাইতেন। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শে উদারতন্ত্রী মনোভাব, তথ্যনির্ভর চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্য ছিল, চিন্তায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছাড়াও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনাও ছিল সক্রিয়। অপরদিকে চরমপন্থীরা ছিলেন খাঁটি স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ; তাঁরা চাইতেন আপসহীন প্রতিরোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্বতন আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে তাঁরা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিমিশ্রিত করেন। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় (১৮৫৬-১৯২৮) ছিলেন মুসলমান-ও-অহিন্দু ধর্মবিরোধী আর্যসমাজে দীক্ষিত। মহারাষ্ট্রে হিন্দু অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক (১৮৫৭-১৯২০) গণপতি ও শিবাজী উৎসবের (১৮৯৩ ও ১৮৯৫) সঙ্গে গোরক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উদ্ভাবক বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু জাতীয়তাবাদে পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ না হলেও শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের অন্তরাত্মা মনে করতেন। লালা লাজপতের উপর বর্মায় অন্তরীন আদেশ (১৯০৭) জারি হওয়ায় বিপিনচন্দ্র ত্রস্তচিত্তে সারা দেশে রক্ষাকালী পূজা ও শ্বেতছাগবলীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত জগদ্ধাত্রীর ছবি। অন্যদিকে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত খড়্গসহ মা কালীর হাত। জনশক্তির বোধন ও শত্রুনিধনকল্পে বরোদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন (১৯০৩)। গুপ্ত সমিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি এক হাতে গীতা এবং অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল-বাল-পাল নামে অভিহিত এই তিনজন আর অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী দলের প্রধান চার স্তম্ভ। এঁদের মধ্যে অরবিন্দ ছাড়া আর কেউ হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না।

নরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত দৈনিক 'বেঙ্গলী' আর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'। অন্যদিকে চরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক ইংরেজি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'। এছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত দৈনিক 'সন্ধ্যা' ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' ছিল চরমপন্থীদের অন্যতম মুখপত্র।

চরমপন্থী রাজনীতির আদর্শ এবং কর্মপ্রণালীতে প্রকারভেদ দেখা যায়। উক্ত ধারার সবাই যে সন্ত্রাসবাদ, ডাকাতি ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। তাঁদের মধ্যে মৌল সমধর্মিতা ছিল এই যে তাঁরা প্রচলিত নরমপন্থী ধারায় পাশ্চাত্ত্য মনোভাব, ইংরেজ শাসনে আনুগত্য এবং সাধারণ মানুষের সমস্যায় উদাসীন মজলিশি রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা-কামী চরমপন্থীদের মধ্যে মোটামুটি তুটি দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যেত। একদল চাইতেন ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি। অপরদল চাইতেন সশস্ত্র সংগ্রাম। তবে স্বাজাত্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য উভয় দলই স্বদেশের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ও শরীরচর্চার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁদের কর্মতৎপরতা ছিল অসংবদ্ধ; দলগত নির্দিষ্ট কোনও মতবাদ (ideology) ছিল না। কাজেই কর্মপদ্ধতির মধ্যে অনৈক্য থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

চরমপন্থী রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিল হিন্দুপ্রধান শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়। এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক। দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন— সমাজবিপ্লব নয়। নির্বিত্ত বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। একাধারে তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের প্রগতিবাদী আদর্শের সঙ্গে নব্যইতালির রক্ষণশীল আদর্শের গুণগ্রাহী ছিলেন। বস্তুতঃ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁরা অন্য দেশের বাহ্য সংগ্রামী পদ্ধতিকেই কেবল কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সেসব দেশের সংগ্রামী চেতনার অন্তর্নিহিত নব জীবনবোধ গ্রহণ করেন নি।

রাজনারায়ণ বসুর 'সঞ্জীবনী সভা' (১৮৭৫) নামে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিকে বাংলা দেশে চরমপন্থী রাজনীতির সূত্রপাত বলা চলে। ইতালির 'কার্বোনারি' নামে গুপ্তসমিতির আদর্শে এই সভা গঠিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথও তার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি গুপ্ত সমিতি ও রুদ্ধদ্বার আলোচনাসভার কথা জানা যায়। পুরোপুরি নরমপন্থী হবার আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন। শতকের শেষ দিকে এইধরণের অনেক আধাপ্রকাশ্য সমিতি গড়ে ওঠে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশানুরাগ সঞ্চার ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা।[৪]

বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতির সংঘবদ্ধ প্রয়াসের সর্বোত্তম নিদর্শন হল 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠা। সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত (১৯০২) অনুশীলন

দলের[৫] প্রধান দুই সংগঠক ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) ও সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)। সমিতির প্রথম পাঁচ বছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শরীরচর্চা, আত্মরক্ষা ও স্বদেশপ্রেমে যুবসম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলা। অরবিন্দের প্রভাবে সমিতির কিছু সদস্য বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তাদের অন্যতম বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১) উদ্যোগে সমিতির মুখপত্রস্বরূপ 'যুগান্তর' (১৯০৬-০৮) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম থেকেই ক্রমে যুগান্তর দল (১৯০৬-৩৮) নামে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।[৫] প্রমথ মিত্র, সরলা দেবী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় অনেকেই গুপ্তহত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতেন না। সেজন্যে যুগান্তর গোষ্ঠী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। উত্তরকালে দেশের বহু খ্যাতনামা বিপ্লবী ও জননায়ক এই দুটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এইসব বিপ্লবীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নানা সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশীলন দলের পাঁচ শতাধিক শাখা ছিল। দলের মধ্যে মোটামুটি সুসংবদ্ধতা থাকলেও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ঐকমত্য ছিল না। পূর্ববঙ্গ শাখা একসময়ে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমিতির বিভিন্ন শাখা ১৯০৯ সালের মধ্যে একের পর এক বেআইনি ঘোষিত হয়। কিন্তু উভয় দলের গোপন কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকে। পরের দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দুটি বিপ্লবী দলের অনেক কর্মী ও নেতা কংগ্রেসের সদস্যপদ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধান এই দুটি বিপ্লবী দল তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কয়েকটি বার ছাড়া কোনওদিনই একত্রে কাজ করতে পারেনি। তাই গোপাল হালদার লিখেছেন: 'The history of revolutionary terrorism in Bengal is to a great extent the history of wasteful rivalry between these two principal groups, the Anushilan and the Jugantar, which even divided the Bengal Provincial Congress leadership after the demise of Deshabandhu Chittaranjan Das, more specifically from 1929 (the Subhas-Sengupta schism).'[৭]

চরমপন্থী আদর্শের প্রভাবাশ্রয়ে একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তার পুরোধা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮)। সতীশচন্দ্রের ইংরেজী মাসিক 'ডন' পত্রিকাটিকে (১৮৯৭-১৯১৩) কেন্দ্র করে 'ডন সোসাইটি'

নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এই সোসাইটি পরে জাতীয় শিক্ষা পর্ষদে অন্তর্লীন হয়ে যায় (জুলাই, ১৯০৬)। সোসাইটিতে অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, নিবেদিতা, প্রমুখ চরমপন্থীরা নানা বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন।

এদেশে প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার সুফল থেকে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ বঞ্চিত ছিল। বাংলাদেশে এই শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশেষ সুবাদ না থাকায় নরমপন্থীরা এই বৃহত্তর জনসমাজকে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করতে পারেন নি। অন্যদিকে চরমপন্থীদের আন্দোলন মূলতঃ হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের ফলে দেশের মুসলমান সমাজকে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর লোক সহজেই বিপথে নিয়ে যাবার সুযোগ পায়। নৌরজির সভাপতিত্বে যেসময়ে কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬) চলেছিল সে সময়ে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুমুসলমানের এই বিভেদকে ইংরেজ সযত্নে লালন ও সদ্ব্যবহার করে। স্বাজাত্যবোধ সঞ্চারের জন্য হিন্দুপ্রধান নেতারা হিন্দু অতীতকে আদর্শ করেছিলেন। মুসলমানদের কাছে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতে মুসলমান শাসনকালের ঐতিহ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি স্বতন্ত্র স্বাজাত্যবোধের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

রামমোহনের চিন্তা ও সাধনার ধারা উনিশ শতকের শেষ থেকেই শক্তিহীন হতে শুরু করে। অরবিন্দের চিন্তায় রামমোহনের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না, যদিও তিনি তিন পুরুষে ব্রাহ্ম ছিলেন। মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব তাঁর মনে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়। বিবাহ করার আগে তিনি হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। 'আনন্দ মঠে'র আদর্শে অরবিন্দ ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের যোগদর্শন ও বৈদান্তিক চিন্তা তাঁর মনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। অরবিন্দ বৈদান্তিক ভাবধারার সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনকে সংমিশ্রিত করেন। তাঁর রাজনৈতিক বৈদান্তিকতা শুধু উপনিষদের পুনরুক্তি নয়—উপরন্তু তাকে পরাধীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভ্যুন্নতির উপযোগী এক সুস্পষ্ট জীবনদর্শন বলে মনে করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য শৈশবেই অরবিন্দকে বিলাতে পাঠানো হয়। আই. সি. এস. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও অশ্বারোহণে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সার্ভিসে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মন তখন তাঁর রাজ-

নীতির প্রতি আকৃষ্ট। বিলাতে দাদাভাই নৌরজির পার্লামেণ্টে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মতো তাঁরও মন উদ্দীপিত হয়। কেমব্রিজের ভারতীয় মজলিশে তিনি রাজনীতির উপর বক্তৃতা দিতেন। ঐসময়ে তিনি সেখানে **Lotus and Dagger** নামে গঠিত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন।

প্রবাসজীবনের চোদ্দটি বছর তাঁর কাটে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যচর্চায়। ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর সমধিক জ্ঞান থাকায় তিনি সমুদয় ক্লাসিক গ্রন্থ মৌলিক রচনায় অধ্যয়ন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বরোদা রাজ্যে প্রথমে প্রশাসনকার্যে এবং পরে বরোদা কলেজের সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কলেজে তিনি ফরাসি ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন।

বরোদায় অবস্থানকালে (১৮৯৩-১৯০৬) তিনি দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি উপলব্ধি করে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় **'New Lamps for old'** শীর্ষক প্রবন্ধমালায় নিজের নাম গোপন রেখে লেখা শুরু করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেস তখন শৈশবাবস্থায়। তদানীন্তন কংগ্রেসের কর্মপন্থা তাঁর কাছে রুচিকর ছিল না। তাকে তিনি **'political mendicancy'** এবং কংগ্রেসকে **'unnational Congress'** বলে অভিহিত করেন। তিনি লিখেছিলেন: **'a body like the Congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class, could not honestly be called national'**।[৯]

সে সময়ে শুধু প্রবন্ধ লিখেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। ঠাকুর সাহেব নামে পরিচিত জনৈক রাজপুতের অধিনায়কত্বে গঠিত একটি গুপ্ত বিপ্লবী দলে অরবিন্দ যোগ দিয়েছিলেন। সেইসূত্রেই তিনি মধ্যভারত ও বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনকর্মে প্রবৃত্ত হন (১৯০২)। বরোদা থেকে ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)-কেও সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতার তিনটি দিক ছিল। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা-আদর্শের প্রচার ও সর্বহারাদের স্বার্থে কংগ্রেস দখল করা; দ্বিতীয়তঃ, বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস; তৃতীয়তঃ, বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন।[৮] আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের ফলে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রথম প্রয়াস (১৯০২-০৪) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

রাষ্ট্রচিন্তায় ইংরেজদের অনুসরণ না করে ফরাসিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণেরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আইরিশ বিপ্লবী চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল (১৮৪৬-৯১)-এর তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড আদর্শের দাবিতে গঠিত (১৮৯৯) 'সিন ফিন' আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তবে উক্ত আন্দোলনের পূর্বেই অনুরূপ চিন্তা তাঁর মনে অংকুরিত হয়েছিল এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি 'সিন ফিন' আন্দোলন থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, মধ্যযুগে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অনমনীয় মনোভাব এবং ইতালির মুক্তি সংগ্রাম থেকে অরবিন্দ প্রেরণা লাভ করেন। যোয়ান অব আর্ক ও মাৎসিনি ছিলেন তাঁর আদর্শ। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তা তাঁর মনকে বিশেষ আকর্ষণ করে ; তাঁর মতে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। বরোদায় অবস্থানকালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন (১৮৯৪)। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করে তিনি চিরায়ত শিল্পীর খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপনা ও সাহিত্যসেবার মধ্যে দিয়ে যে-সুর অনুক্ষণ তাঁর হৃদয়ে অনুরণিত হত তাহল দেশের জনশক্তিকে জাতীয় ঐতিহ্যে, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে ও স্বাধিকার অর্জনে উৎসাহদানের আবেগ। স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আগে স্ত্রীকে লেখা এক পত্রে (১৯০৫) তাঁর তখনকার মনোভাব জানা যায় :

১. 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত···ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা।···এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়··· ।'

২. 'আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার, কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই

দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দু-ধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি,…।'

৩. 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি; ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত…।'[১০]

বোম্বাই কংগ্রেসে (১৯০৪) যোগদান থেকেই অরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনীতিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। সেবারই চরমপন্থীদের অস্তিত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। চরমপন্থীরা একটি জাতীয় আবেগের ভিত্তিতে আরও প্রত্যক্ষ ও সংগ্রামী কর্মপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তখন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, শক্তিতে ক্ষীণ। বেনারস কংগ্রেস (১৯০৫)-এর পূর্বে তাঁদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও জনপ্রিয়তা নরমপন্থীদের সচকিত করে দেয়। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের সঙ্গে রণভঙ্গ দিয়ে অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। কলকাতা কংগ্রেসে অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের পুরোধা। চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেও তাঁদের চাপে চারটি বিষয়ে নরমপন্থীদের সম্মতি দিতে হয়েছিল। প্রস্তাবাকারে গৃহীত সেই বিষয়গুলি ছিল স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশী বস্তু বয়কট।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল (১৯০২-০৪)। বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে প্রজ্জ্বলিত বাংলার বৈপ্লবিক আবেগবহ্নি প্রত্যক্ষ করে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য তিনি বরোদায় ফিরে যান এবং 'ভবানী মন্দির' নামে এক পুস্তিকায় তিনি তাঁর কর্মপন্থা ব্যক্ত করেন (১৯০৫)। অতঃপর সেখানকার কাজে বরাবরের মত ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনাকার্যে যুক্ত হন এবং

বাংলার বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করেন (১৯০৬)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বহু ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমুদয় কলেজ বর্জন করে। তাদের জন্য 'জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ' গঠিত হয়। অরবিন্দ তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য সরকার কর্তৃক আনীত এক মামলার দরুন তিনি পর্ষদের অধ্যক্ষপদ কিছুকালের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। তার আগে বাংলাদেশে মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে একটা মহড়া হয়ে যায়। অরবিন্দ সদলবলে সুরাটে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি টিলক, খাপার্দে প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে একই মতাবলম্বীরূপে পান। সুরাট কংগ্রেস ভণ্ডুল হয়ে গেলে অরবিন্দের সভাপতিত্বে চরমপন্থীরা স্বতন্ত্র এক সম্মেলনে মিলিত হন। এখন থেকে অরবিন্দের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা ক্রমে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

সুরাট থেকে ফেরার পথে অরবিন্দ বরোদায় তাঁর দীক্ষাদাতা বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে ভক্তি, ত্যাগ ও সাহসিকতার মধ্যে দিয়ে আত্মোপলব্ধি ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখা দিলে ত্রিশ কোটি মানুষের ভিতর ঈশ্বর প্রকাশমান হয়ে উঠবেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মধারা থেকে পৃথক পথ রচনার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দেন। বন্দেমাতরমে (১২ জানুয়ারী, ১৯০৮) তিনি লেখেন: 'The old organizations have to be reconstituted to adapt themselves to the new surroundings. The death complained of is only a transition. The burial ground of the old Congress, as the Saxon phrase goes, only God's Acre out of which will grow the real, vigorous, popular organization'।[১১]

তবে তিনি কংগ্রেসের বিবদমান দুটি দলের মিলনসাধন চিন্তায় যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না তা তাঁর ঐসময়কার বক্তৃতাগুলি থেকে জানা যায়। নীতিগতভাবে তিনি শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু দেশের পুনরুজ্জীবনকল্পে হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তাঁর নীতির পৃষ্ঠপট ছিল গীতার 'ধর্মযুদ্ধ'।

বঙ্গভঙ্গোত্তর স্বদেশী আন্দোলন ক্রমেই যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন সরকারি নিপীড়ন ও দমননীতি নিরঙ্কুশ গতিতে এগিয়ে চলে। ফলে দেশের যুবশক্তি সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী কর্মনীতি গ্রহণ করে। কয়েকটি রাজ-

নৈতিক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে দেশের তিনটি রাজনৈতিক দলীয় ধারা লক্ষণীয় : ১. নরমপন্থী ধারা : নেতা—সুরেন্দ্রনাথ। লক্ষ্য—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অর্জন। প্রণালী—সভাসমিতি, বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদন ; ২. চরমপন্থী ধারা : নেতা— বিপিনচন্দ্র। লক্ষ্য— পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রণালী— নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ; ৩. বৈপ্লবিক ধারা। নেতা— অরবিন্দ ও নিবেদিতা। লক্ষ্য— ইংরেজ বিবর্জিত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রণালী— বোমারিভলভারযুক্ত বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি।[১২]

অরবিন্দ রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা কর্মতৎপরতার অধিনায়করূপে অভিযুক্ত হয়ে বৎসরকাল (১৯০৮-০৯) বিচারাধীনে কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁর এই কারাজীবন পরবর্তীকালের চিন্তাভাবনার দিক থেকে বিশেষ অর্থবহ। 'মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্র' নামে খ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ শেষাবধি নির্দোষ সাব্যস্ত হন।

কারামুক্তির পর অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করেন যে দেশের আগের সেই উদ্দীপনা আর নেই— দ্বীপান্তর, কারাদণ্ড, নির্বাসন, রাজনীতি পরিত্যাগ প্রভৃতি নানা কারণে পুরাতন সহকর্মীরাও পাশে অনুপস্থিত। তাই উত্তরপাড়া ভাষণে তাঁর কণ্ঠে এক করুণ সুর বেজে ওঠে : 'I looked round when I came out, I looked round for those, to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them. There was more than that. When I went to jail the whole country was alive with the cry of Bandemataram, alive with the hope of a nation, the hope of millions of men who had newly risen out of degradation. When I came out of jail I listened for that cry, but there was instead a silence'।[১৩]

দেশের তখনকার সেই নিস্তেজ ও নিস্তরঙ্গ পরিস্থিতি দেখে তিনি একটুও বিচলিত হন নি। ঐশ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্পর্কে বলেন যে দমননীতি যেন ঈশ্বরের হাতুড়ি— যা দিয়ে পিটিয়ে তিনি আমাদের একটি শক্তিশালী নেশনে পরিণত করতে চান এবং আমাদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে বিশ্বকে পরিচালনা করাই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আমাদের ধ্বংস চান না, ছাঁচে লোহা পেটানোর মতো তিনি আমাদের নবরূপে সৃষ্টি করতে চান।[১৪]

বাংলাদেশে চরমপন্থী 'ন্যাশন্যালিষ্ট' দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় অরবিন্দ নতুন কর্মসূচী হিসাবে ১৯০৯ সালে ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন' ও বাংলায় 'ধর্ম' নামে দুটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। কর্মযোগিনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন যে সাপ্তাহিক সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষা জাতীয় পরিস্থিতির পর্যালোচনাই হবে তার প্রধান কাজ। সমকালীন জনমন ও জাতীয় জীবন গঠনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল সংবাদই কেবল তাতে পরিবেশিত হবে আর কর্মযোগ প্রচারই হবে তার আদর্শ। জীবনে বেদান্ত ও যোগাদর্শ প্রয়োগই হল কর্মযোগ। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে প্রাত্যহিক জীবনে কর্মযোগ অভ্যাস করে সেই আদর্শ তুলে ধরাই হবে তার কাজ।

রাজনৈতিক বাতবিতণ্ডা থেকে তিনি সম্পূর্ণ সরে থাকেন নি। মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) প্রয়াস যে পরিণামে আরও অনৈক্য ও ক্ষতির কারণ হবে সে বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। দেশবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে তিনি ছয় দফা এক কার্যক্রম উপস্থাপিত করেন: ১. নিরন্তর প্রয়াস; ২. আইন মেনে চলা; ৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া; ৪. কংগ্রেসের ঐক্যসাধন ও তার নবরূপায়ণ; ৬. পূর্ব অনুসৃত বয়কট প্রভৃতি কর্মপন্থা অন্যান্য প্রদেশে সম্প্রসারণ।

দেশের মধ্যে বিশেষ সাড়া না পেয়ে তাঁর উৎসাহ নিষ্প্রভ হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও ১৯০৯ সালে হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি তাঁর অভিমত গ্রহণ করাতে সক্ষম হন। এই সময়ে অরবিন্দের উপর পুলিশের আবার বিষনজর পড়ে। প্রথমে কিছুদিন চন্দননগরে আত্মগোপন করে থেকে পরে সবার অলক্ষ্যে পণ্ডিচেরি চলে যান। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। সেখানে তিনি গভীর যোগসাধনায় নিমগ্ন হন এবং 'আর্য' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন (১৯১৪)।

অরবিন্দের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়াকে অনেকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন। বস্তুতঃ রাজনীতিকে আমরণকাল যথোচিত গুরুত্ব দিতে তিনি পশ্চাদপদ হন নি। গোড়া থেকেই তাঁর জীবনাদর্শ ছিল ভিন্ন এবং রাজনৈতিক জীবনেও তাঁর সেই আদর্শের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। মানসিক প্রবণতা তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রতিকূল ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের অন্তরালে থেকে নির্দেশদান ও মানুষ গড়াই ছিল তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতির নিষ্ফলতা ও জীবনাদর্শ পূর্তির ক্ষীণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তিনি

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করেন এবং বলেন যে, ভগবানই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবেন, আর যথাসময়েই স্বাধীনতা অর্জিত হবে ; এখন সকলের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কাজ করা— ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই হল যোগসাধনার প্রথম পদক্ষেপ। কারাগারে তিনি বাসুদেবের এই মর্মেই 'আদেশ' পেয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও তিনি খুব বড় করে দেখেন নি। স্বাধীনতা মানুষের যে একটি মৌল প্রয়োজন এবং সে-অধিকার যে ভারতীয়রা অচিরেই পাবে সে-সম্পর্কে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মন মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজন ও সমস্যার চিন্তায় নিমগ্ন থাকত। নিছক জৈব অস্তিত্বেই মানুষের জীবন পরিপূর্তি লাভ করে না ; তাকে আয়ত্তে এনে অতিক্রম করা এবং উন্নততর অতিমানসের পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই তাঁর মতে মানুষের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার জন্য অধিকতর কর্মশক্তি অর্জন-কল্পে তিনি বহু আগে থেকেই যোগসাধনার প্রয়োজন অনুভব করেন (১৯০৪)। তাই তাঁকে সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) থেকে ফেরার পথে গুরু বিষ্ণু ভাস্কর লেলে-র সঙ্গে পরিভ্রমণ ও যোগসাধনায় রত থাকতে দেখা গিয়েছিল। কারামুক্তির পর উত্তরপাড়া ভাষণেও তাঁর জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। তাছাড়া পশ্চিমী ধাঁচের রাষ্ট্রস্বাধীনতায় তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। আত্মার প্রকৃত মুক্তি ও প্রেরণার উৎসের সন্ধানই ছিল তাঁর কামনা। তিনি বলেন : 'We do not believe that by changing the machinery, so as to make our society the ape of Europe we shall effect social renovation... It is the spirit alone that saves, and only by becoming great and free in heart can we become socially and politically great and free'।[১৫]

আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয়ে গভীর অনুধ্যান এবং তাঁর 'দিব্যজীবন' দর্শন প্রচারই শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তীকালে প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৬ সালে পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি কোনও সন্ন্যাসধর্ম বা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র নয়। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের কোনও আদর্শ সেখানে প্রচারিত হয় না। যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই অনাড়ম্বর আশ্রমজীবনের উদ্দেশ্য। যোগসাধনায় শ্রীঅরবিন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামক এক প্রাচীন যোগী এবং বিষ্ণু ভাস্কর লেলের কাছে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরিতে শ্রীমার (মাদাম মিরা রিশার) সাহচর্যে সংগঠিত-প্রয়াসস্বরূপ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা

করেন। মৌলিক চিন্তাপ্রসূত, সুদূরপ্রসারিত ও জ্ঞানগর্ভ যেসব গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন সেগুলির অধিকাংশই তাঁর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর (১৯১০) গ্রহণের পর লিখিত। *Life Divine, Essays on the Gita, Synthesis of Yoga, Savitri* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম সুবিদিত। ভারতীয় দর্শনের আশ্রয়ে তাঁর মননজীবন গঠিত হলেও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাভাবনারও তিনি সমধিক গুণগ্রাহী ছিলেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে থাকলেও রাজনৈতিক আলাপআলোচনা ও পরামর্শদানে তিনি কোনও দিনই পরাঙ্মুখ হন নি। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে বিখ্যাত লখ্‌নৌ প্যাক্ট (১৯১৬)-এর অপরিণামদর্শিতা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মণ্টেগু সংস্কারের সময়ে (১৯১৯) তিনি তার শুভ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ক্রিপ্‌স প্রস্তাব গ্রহণের উপদেশ দিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁর শুভেচ্ছাবাণীতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে জীবনের চারটি স্বপ্ন তাঁর বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে :

১. ভারতের স্বাধীনতা ; ২. এশিয়ার মুক্তি ; ৩. বিশ্বসংঘের মাধ্যমে বিশ্বজনীন ঐক্যের প্রয়াস ; ৪. সারাবিশ্বে ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রসার।

তাঁর পঞ্চম ও শেষ যে-স্বপ্নটি ছিল তাহল জৈব বিবর্তনধারায় মানুষকে আর একটি ধাপে উন্নীত করা— অর্থাৎ, পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে বুদ্ধিজীবীর স্তরে উপনীত মানুষকে দিব্য প্রক্রিয়ায় অতিমানসের স্তরে বিকশিত ও উন্নীত করা।[১৬]

দুই : দর্শনচিন্তার প্ররিপ্রেক্ষিত

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ভারতের অতীন্দ্রিয় ভাববাদ যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি প্রতীচ্যের বস্তুতন্ত্রী চিন্তাও সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তাঁর মতে ভারতীয় দর্শনে একাধারে ভাববাদ ও চার্বাক প্রমুখ দার্শনিকদের বস্তুবাদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পার্থিব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তার অসংগতি ক্রমে ভারতীয়দের মনে জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের সৃষ্টি করে ; ইহজীবনের অনিত্য প্রত্যয় সেই

মনোভাবকে দৃঢ় করে তোলে। ফলে জনমন ও তার শক্তি হীনবীর্য ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে; বাস্তব দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশকে ক্রমে পেছিয়ে পড়তে হয়। মায়া, মোক্ষ, নির্বাণ প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্যে মানুষ জীবনযুদ্ধে রিক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি লিখেছেন: 'ভাবের উপর ভর করে চৈতন্যের ধর্ম্ম গড়ে উঠেছিল, কিছুদিনের জন্য চৈতন্যধর্ম্মের intensity খুবই প্রবল হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার অভাবে উহা টিঁকে নাই; বুদ্ধের ধর্ম্ম শুধু জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেখানেও ছিল না higher বিজ্ঞান'।[১৭]

পৃথিবীর প্রাচীন সকল সভ্যতাতেই ভাববাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ভারত-ভূমিই যেন এই চিন্তার উর্বরতম স্থান; ইউরোপে ডিমোক্রিটাস থেকে মার্কস্ অবধি বহু বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিককে পাওয়া যায়— তাঁদের মধ্যে সবাই নিরীশ্বর-বাদী ছিলেন না— তাহলেও বিজ্ঞানমুখী চিন্তার আধিক্যে পাশ্চাত্ত্যে নাস্তিক বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাভাবনারই আধিপত্য বেশি। একদিকে সেখানে চলেছে প্রকৃতিকে জয় করার অভিযান, অন্যদিকে যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। এই বিজ্ঞানচেতনা মানুষের কাছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের রহস্য ক্রমেই উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্ছে; সেই প্রণোদনাতেই সভ্যতার সম্পদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র প্রভৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ও মানবতন্ত্রী আদর্শের রথ এগিয়ে চলেছে; জয়যুক্ত ও বিকশিত হচ্ছে মানুষের সৃজনী ধর্ম। কিন্তু তবুও কেন যেন মানুষের অন্তরাত্মা সদাই কেঁদে মরছে। বস্তুতন্ত্রী মনস্তত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে যে জৈব বিবর্তনের সর্বোচ্চ ধাপ হল আত্মা— সেই আত্মার পবিত্র পরিতৃপ্তি বর্তমান পরিবেশ জনিত কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে। কই, আজ আরতো কোনও বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট জন্মাচ্ছেন না! শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন যে প্রতীচ্যের সঙ্গে ভারতও এখন অবক্ষয়ের পথে চলেছে। সেজন্যে তিনি চেয়েছেন এমন এক জীবনদর্শন যা হবে প্রতীচ্যের নাস্তিক বস্তুবাদ ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের হরগৌরীমিলনস্বরূপ। জড় ও আত্মা— উভয়কেই যা দেবে সমান গুরুত্ব। তিনি তাঁর যুগান্তকারী দর্শনে এই সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে আধ্যাত্মিকতা শুধুমাত্র এক স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন বিষয়ই নয়; তন্মধ্যে গতিশীল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের গুণও নিহিত। এক ও বহু উভয়ই সত্য। বিশ্বচরাচর চিরন্তনী সত্তার (Real Being) দ্বারা সৃজিত— তা কেবল অন্তর্মুখী কল্পনার ছায়া নয় কিংবা এক বিরাট শূন্যতা অথবা নিরস্তিত্বও নয়। তাঁর চোখে জড় ও আত্মা অভিন্ন। জড়

আত্মারই আধার। জাগতিক ও জৈব বিবর্তনের ধারায় সীমিত চেতনার ফলে আত্মা প্রথমে নিশ্চেতন রূপই নেয় এবং নিশ্চেতন বিবর্তন ধারায় ক্রমপর্যায়ে জড়, জীবন ও মনের উদ্ভব ঘটে। 'দিব্য-জীবন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

'জড়বাদও যেমন আজ দিব্য-পুরুষের দিব্য ক্রতুর-সাধন ; বৈরাগ্যবাদও যে একদিন তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সাধন ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে অকপটে। জড়বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে সংহরণ ও বর্জন করতে হবে ভবিষ্যতে, হয়তো বা ঘটাতে হবে তার আমূল রূপান্তর ; কিন্তু তবুও তার মাঝে যা কিছু সত্য ও শ্রেয়স্কর বৃহৎ-সাম্যের সাধনায়, তাকে বাদ দিলে তো চলবে না।'[১৮]

তাঁর মতে মানুষ সবকিছুকে খণ্ডদৃষ্টিতে দেখে বলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। জড়ের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মন প্রচ্ছন্ন থাকে তেমনি 'অতিমানস'ও নিহিত থাকে। ব্রহ্ম শুধু জড়ের আধারে আবরিত নন ; সেই আবরণে চেতনা ও আনন্দও আচ্ছাদিত থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ স্বজ্ঞায় (Intuition) বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য সেইসঙ্গে জ্ঞানোন্নতির জন্য বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে স্বজ্ঞার কাজ হল সত্য আবিষ্কার করা, আর যুক্তির কাজ ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা। বেদ-উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত এবং গীতার সাহায্যে তাঁর দর্শন রচিত হলেও বস্তুতঃ তাঁর দর্শনের মূলভিত্তি নিজজীবনের অনুভূতি। বিবর্তনের ধারায় একদিন যে পৃথিবীতে দেবমানবের আবির্ভাব ঘটবে এই প্রত্যয়ই তাঁর দর্শনের অন্যতম মূলকথা।

জগৎসৃষ্টির প্রসঙ্গে তিনি সাংখ্যের প্রকৃতিগত স্বভাবসৃষ্টি প্রত্যয়ের পরিবর্তে বেদান্ত ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের লীলা এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন লীলাবাদী। জগৎসৃষ্টি তিনি লীলাবাদী প্রত্যয়ে ব্যাখ্যা করেছেন ; অর্থাৎ সৃষ্টির পিছনে আছে পরমাত্মার আনন্দের খেলা। তাঁর মতে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বার্থে অজ্ঞেয় নন ; ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন ও জ্ঞেয়। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নির্ণয়ে শ্রীঅরবিন্দ শংকরের অদ্বৈতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি ; আবার দ্বৈতবাদে বিশ্বাস না করলেও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কিছুটা মিল আছে। বস্তুতঃ অদ্বৈত বেদান্ত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি মনে করতেন সত্তার দিক থেকে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; কিন্তু কর্মের দিক

থেকে ভেদ আছে ; কারণ প্রত্যেক জীব পরমাত্মার এক একটি পৃথক কর্মকেন্দ্র। সকল জীবের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অহংবুদ্ধি থাকে ; নদী যেমন পরিণামে সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনি পূর্ণজ্ঞান অর্জিত হলে জীবও ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় ; অহংবোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'পুরুষোত্তমে'র সঙ্গে অঙ্গীভূত হলে ভক্তিও সম্ভব হয়। শ্রীঅরবিন্দ শংকরের মতো জগৎকে মিথ্যা মনে করতেন না।[১৯]

তিনি সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি কোনো কিছুকেই তিনি ভোগ্য জীবন থেকে বাদ দেন নি। অবশ্য তাঁর মতে ব্যক্তিবিশেষের কাছে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণে বাধা নেই। তিনি মনে করতেন কর্মই সাধনার সবকিছু এবং মুক্তিরও উপায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রচলিত মানবধর্ম (Religion of Humanity) অর্থাৎ প্রেম, প্রীতি, পরার্থে আত্মত্যাগ, জনসেবা, কল্যাণকর্ম কাম্য হলেও মনের ঊর্ধ্বতর অতিমানসের বিষয় নয়। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জনকল্যাণকরকর্মে তিনি বিশ্বাস করতেন না। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজ করেন। যারা দরিদ্র, নিরন্ন, নিরক্ষর ও পাপী নয় তাদের কি মুক্তির প্রয়োজন নেই ? তাই এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখা অনুচিত। এখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর অমিল দেখা যায়। স্বামীজি চাইতেন জীবের সেবা আর শ্রীঅরবিন্দের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কাম্য ছিল দিব্য অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা। তাঁর কর্মযোগের প্রথম সোপান হল সকল কাজের মধ্যে দিয়ে অন্তরস্থিত পরমাত্মার অনুধ্যান এবং দ্বিতীয় স্তর হল কর্মের ফলাফলে আসক্তিত্যাগ। তৃতীয় সোপানে অহংবোধ বা কর্তৃত্বাভিমান চলে যায়।[২০]

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক চিন্তার প্রধান অবদান হল তাঁর 'অতিমানস' ('Supermind') তত্ত্ব। সচ্চিদানন্দের সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপলব্ধিকেই অতিমানস বলা চলে— সেই উপলব্ধির সাহায্যে জগৎ ও জীবনের ঈপ্সিত দিব্য পরিবর্তন সাধিত হয়। যোগী হিসাবেই শ্রীঅরবিন্দের প্রধান পরিচিতি। যোগের সহজ অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন সাধন। যোগসাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের অন্তরে পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি করে। ঐশ লীলার ফলে জীবাত্মা তার আপন স্থান ও উৎস পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যোগের কাজ উভয়কে আবার যুক্ত করা। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মার্গ ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় হঠযোগ, রাজযোগ ও তন্ত্রসাধনাও সমধিক স্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন যৌগিক সাধন প্রণালীর সমন্বয়ে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে 'Integral Yoga' বলা হয়েছে।[২১]

তাঁর যোগসাধনায় বিশেষ কোনো ধর্মমত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি কোনো নতুন ধর্মমত প্রচার করেন নি। এমনকি ঈশ্বরে নিস্পৃহ মানুষও যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হতে পারে। তবে সাধকের এইটুকু শ্রদ্ধা থাকা চাই যে মানুষই একদিন দেবমানব হয়ে উঠবে। তার অর্থ হল মনের আমূল পরিবর্তন। শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' প্রত্যয়ের তাৎপর্য এই যে, মানবমনের স্বভাবগত অহংবোধ ও ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে অর্থাৎ মানস-স্তর হতে অতিমানসের স্তরে উঠে চরম সত্য ব্রহ্মকে জানা। জীবনের আদর্শ কি সে-সম্পর্কে প্রচলিত দুটি ধারার তিনি উল্লেখ করেছেন। তার প্রথমটিতে মানুষের জৈব অস্তিত্বকে বড় করে দেখা হয়। তাদের মধ্যে একদল ঐহিক উন্নতিব আদর্শে মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি সমূহের ভারসাম্য পূর্ণ বিকাশ, আর সেইসঙ্গে বহির্জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবতন্ত্রী বিকাশে বিশ্বাসী। বস্তুবাদী এই আদর্শে দেহ, প্রাণ ও মনের পর চতুর্থ সত্তা আত্মার কোনো স্থান নেই। কাজেই এই জীবনাদর্শ তাঁর কাছে সমর্থনীয় নয়। দ্বিতীয় ধারায় ধর্মবোধ প্রণোদিত মানুষের স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শ তাঁর কাছে অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। কারণ দ্বিতীয়টিতে জৈব অস্তিত্বের সঙ্গে আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি স্বীকৃত।[২২]

তাঁর মতে 'দিব্যজীবন' লাভের প্রথম সোপান হল মনুষ্য স্বভাবের পরিবর্তন। জীব ঈশ্বরের অংশ; কিন্তু অজ্ঞানে তার মন আচ্ছন্ন থাকে; নিজেকে পাপী মনে করে নিরাশ হওয়া যেমন অর্থহীন তেমনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালের ভরসায় থাকাও অনুচিত। তিনি মনে করতেন এই বিশ্বেই মানুষ একদিন দিব্যসত্তা অর্জন করবে। পূর্ণ বা দিব্যমানব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন ও আচারানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা নেই। মানুষের অভীষ্ট বস্তু হল দিব্য-জীবনের পূর্ণতালাভ করা— কেবল দেহ, প্রাণ ও মনের উন্নতিই নয়। তাই মানুষকে একদিকে যেমন দিব্যজীবনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, তেমনি ইহজীবনেও দিব্যজীবনকে প্রকাশমান করে তোলা দরকার। দিব্যজীবন লাভের জন্য মানুষকে চারটি গুণ আয়ত্ত করতে হবে: ১. সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; ২. দেহ, প্রাণ ও মনের শক্তিবর্ধন; ৩. বীর্যের বিকাশ এবং ৪. পরমতত্ত্বে শ্রদ্ধা। দিব্য রূপান্তরের পথে শ্রীঅরবিন্দ তিনটি স্তর অতিক্রম করার কথা বলেছেন: **Psychic Awakening, Spiritual Awakening** এবং **Supramental Awakening.**

অন্তরাত্মা অর্থেই তিনি '**Psyche**' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রথম স্তরে অন্তরাত্মার সঠিক উপলব্ধি ঘটলে সাধক নিজেকে নিজের দেহ, প্রাণ ও মনের

অতিরিক্ত চেতনায় অনুভব করেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্মেষের স্তরে উন্নীত হলে এই চেতনা দেখা দেয় যে সর্বভূতে একই আত্মা বিদ্যমান। ফলে শান্তি ও আনন্দে সাধকের অহংবুদ্ধি আর থাকে না। তৃতীয় অর্থাৎ অতিমানসিক উন্মেষের স্তরে সাধকের আত্মসমর্পণের ফলে পৃথিবীতে দিব্যশক্তির অবতরণ ঘটবে ও মানুষ দেবত্ব লাভ করবে। অতিমানসের অবতরণে সমাজেরও রূপান্তর ঘটবে। তবে সবাই একসঙ্গে এবং সমগ্র সমাজ রাতারাতি রূপান্তরিত হবে একথা মনে করা ভুল। উন্নত মানুষ অপরের আদর্শ হয়ে ক্রমে সকলকে উন্নীত করবে।[২৩]

তিন : ইতিহাসচিন্তা

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে প্রগতি বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান ঊর্ধ্বাভিমুখী পথে আবর্তিত হয়। সেই বৃত্তের কেন্দ্র সদাই গতিশীল— কখনও পশ্চাতে ফেরে না। এই প্রক্রিয়ায় অতীত তার বেশ পরিবর্তন করে মাত্র— অবগুণ্ঠিত শক্তি ও সত্তার ক্ষয় হয় না— নিরন্তর ভবিষ্যতের পথে তা পদক্ষেপ করে।

তাঁর ইতিহাসচিন্তায় মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিচক্রের আবর্তনপ্রত্যয় জার্মান দার্শনিক কার্ল ল্যামপ্রেক্ট (১৮৫৬-১৯১৫)-এর দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ-চিন্তার অংকুর বেদান্ত ও পুরাণেও আছে। ইতিহাসাশ্রয়ী রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬)। ল্যামপ্রেক্ট ও র‍্যাঙ্কে উভয়ে একই পথে অগ্রসর হলেও ল্যামপ্রেক্ট ভিন্ন মত পোষণ করতেন। র‍্যাঙ্কের চিন্তাসূত্র ছিল— কিভাবে ঘটেছে (how it happened); পক্ষান্তরে ল্যাম-প্রেক্টের সূত্র ছিল কিভাবে রূপায়িত হয় (how it became)। ল্যামপ্রেক্ট জার্মানির রাষ্ট্রীয় বিবর্তনকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন: ১. আদিম প্রতীক যুগ; ২. মধ্যযুগের সূচনা; ৩. মধ্যযুগের সমাপ্তি; ৪. নবজাগরণের শুরু থেকে জ্ঞানোৎকর্ষ কালাবধি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ এবং ৫. রোমান্টিক যুগ থেকে শিল্প-বিপ্লবের যুগ পর্যন্ত অন্তর্মুখী চিন্তার যুগ। শ্রীঅরবিন্দ ল্যামপ্রেক্টের স্তরবিন্যস্ত ('typology') পদ্ধতি ভারতে প্রয়োগ করেন। ল্যামপ্রেক্ট তাঁর পদ্ধতিকে সর্বদেশে প্রযোজ্য মনে করতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *The Human Cycle* গ্রন্থে বৈদিক যুগকে প্রতীক যুগ বলেছেন। বর্ণাশ্রম প্রথাকে একটি 'typical

social institution' এবং জাতিভেদ প্রথাকে একটি সামাজিক ধারারূপে দেখেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে যুক্তিপ্রবণতা ও মুক্তিকামিতার সমন্বয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনাও প্রাচ্যে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সনাতন সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচ্য মানসে যুক্তিবাদ গ্রহণযোগ্য হয় নি; প্রাচ্য তার সনাতন ধারা অনুসরণ করতে চায়। ল্যামপ্রেক্ট বর্তমান যুগকে স্নায়বিক চাঞ্চল্যের (nervous tension) যুগ রূপে অভিহিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে সমকালীন অন্তর্মুখী যুগের স্থান আধ্যাত্মিক যুগে পরিণত হবে। তখন পরমাত্মার অঙ্গ মানবাত্মা মানবিক ক্রমবিকাশকে পথপ্রদর্শন করবে। ল্যামপ্রেক্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখেছেন; পক্ষান্তরে শ্রীঅরবিন্দ ঐ বিশ্লেষণ প্রণালীতে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দান করেছেন।[২৪]

সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্তরবিন্যস্ত-পারম্পর্যের (typology) প্রভেদপ্রত্যয় আধুনিক সমাজদর্শনের একটি বিশিষ্ট বিশ্লেষণ ভঙ্গী। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতি সমুদয় সামাজিক তৎপরতার সমষ্টি— আর সমষ্টিগত সমুদয় অস্তিত্বের উৎকৃষ্টতম বিষয়ের সমন্বয়েই হয় সভ্যতা। এদুটি শব্দের তারতম্য নির্ধারণে কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন যে সংস্কৃতি হল নীতি ও মুক্তির দর্পণ। আবার আর এক শ্রেণীর মতে মানুষের হৃদয় হতে সৃজিত সংস্কৃতি বৈষয়িক উন্নতি ও জনবর্ধনের চরমাবস্থায় ক্ষয় পেতে শুরু করে; জ্ঞান ও আত্মার বিকাশেই সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে, কিন্তু সভ্যতার মানদণ্ড স্থূল বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়ায় সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছে। অন্য এক দলের মতে সংস্কৃতির বনিয়াদ হল মানবিক মূল্যবত্তা; সভ্যতা জীবনে সৌষ্ঠব সাধন করে। মোটের উপর পশ্চিমী ইতিহাসচিন্তা অনুযায়ী ধর্ম, দর্শন ও সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপে সংস্কৃতির পথ রচিত হয়; এবং সভ্যতার মানদণ্ড শিল্পোন্নতি ও বৈষয়িক অগ্রগতির কষ্টিপাথরে বিবেচিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পশ্চিমী বিভক্তিকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন ঔপনিষদ দৃষ্টিতে। তাঁর মতে প্রাণের অভিব্যক্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনেই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত; সুখবাদ ও স্বস্তিপূর্ণ জীবনই সভ্যতার আদর্শ। পক্ষান্তরে মানসের সৃজনীসত্তাই হল সংস্কৃতির উপাদান।[২৫]

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে মন ও অন্তরাত্মার বিকাশ ও পরিবর্ধনেই সংস্কৃতির সার্থকতা নির্ভর করে। তবে বহির্জীবনকে সংস্কৃতি উপেক্ষা করে না; অর্থাৎ দৈহিক অস্তিত্ব থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে শক্তি ও নৈপুণ্য বৃদ্ধিও তার কাজ;[২৬] যূথবদ্ধ জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মনের

মিলন ঘটানোই হল সমাজের দায়িত্ব। আধ্যাত্মিক মানসপটে মানুষ প্রথমে নিজের আত্মার সঙ্গে সামাজিক আত্মার সাযুজ্যে সর্বাত্মক সমাজকাঠামো সৃজন করে। শ্রীঅরবিন্দের এই সমাজদর্শন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত। সনাতন ধারায় বিকশিত ভারতীয় সমাজ একদিকে যেমন কোনও আক্রামক নীতি কখনও গ্রহণ করে নি, তেমনি বহুবার আক্রান্ত হয়েও স্বীয় সনাতন ঐতিহ্য বর্জন করে নি। ভারতের স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক শৃঙ্খলমোচনই নয়, ধর্মের হারানো মানিক পুনরুদ্ধারও বটে। সার্বভৌম রাজশক্তি অপেক্ষা ধর্ম অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। ধর্ম, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি একযোগে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মের আধিপত্য পবিত্র ও চিরন্তন—তাই ভারতের রাজশক্তি অন্যান্য প্রাচীন দেশের মতো সর্বগ্রাসী হয় নি। এদেশে ব্রাহ্মণরা ধর্মের নীতি নির্ধারণ করতেন এবং সেগুলি জনজীবনে রূপায়িত হত রাজশক্তির মাধ্যমে। ধর্ম নিশ্চল নয়। সামাজিক বিবর্তনধারায় মানুষ স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মের পথ রচনা করেছে। তাই ভারতীয় গোষ্ঠীজীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও সার্বভৌমতা বিরাজ করত। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, নগর ও জনপদ সমূহ নিজের নির্দিষ্ট ধর্ম বা নিয়মে চালিত হত। তাই সেদিনের ভারতে এখনকার অর্থে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন ছিল। এখন অবশ্য সে-পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে; বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে পৌঁছলে এখনকার মানুষ আধ্যাত্মিক ভূমিতে তাদের পূর্বতন জনজীবনের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।[২৭]

শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাসে আধ্যাত্মিক নির্দেশ্যবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে নিরর্থক ও এমনকি পরস্পরবিরোধী ঘটনার পশ্চাতেও দিব্য সত্তার ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান থাকে এবং ইতিহাস পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। ফরাসি বিপ্লব ও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে ঐশ শক্তি তথা কালীর সক্রিয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বিপিনচন্দ্রের মতো তিনিও ভারতীয় গণঅভ্যুত্থানের পশ্চাতে পরমেশ্বরের অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরই জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইংরেজের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ ঐশ ইচ্ছায় সংঘটিত হয়—উদ্দেশ্য ভারতীদের সংহতি সাধন। ফরাসি বিপ্লবও ভগবৎ ইচ্ছায় ঐভাবে ঘটেছিল। ভারতে ইংরেজের আধিপত্য ও বঙ্গব্যবচ্ছেদকে তিনি 'মায়া' বলে অভিহিত করেন। ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের দ্বারাই সেই মায়াকে জয় করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।[২৮]

তাঁর এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ ঐতিহাসিক কার্যকারণকে আধিদৈবিক

আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস গীতার বাণী ও হেগেলীয় ভাববাদের সংমিশ্রণ বলে মনে করা হয়। গীতায় অধিনায়ককে ঈশ্বরের ক্রীড়নক বলা হয়েছে—তিনি কেবল ঈশ্বরের প্রতিনিধিই নন—ঐশ ক্রিয়ার মাধ্যমও বটে। বিশ্বইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিগণ যথা আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই মহাইচ্ছার (Idea) নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে তাকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করেন।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক (dialectics) প্রণালীকে শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। নয় ও প্রতিনয়ের দ্বন্দ্বে প্রকৃতির অন্যতম অভিব্যক্তি মানুষের ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী চেতনা সমন্বয়ের পরিবর্তে একটা আপসের রূপ নেয়। প্রগতি মননক্রিয়ারই ফল; সেটা কখনও প্রকাশমান এবং কখনও বা সুপ্ত থাকে। মনন সুপ্ত হলে মানবসমাজের অধঃপতন ঘটে; কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক তাগিদে মনন চাঙ্গা হয়ে ওঠে; তখন অন্তর্নিহিত মানবতার আদর্শ আলোকের সন্ধান পায়।[২৯]

তিনি মনে করতেন যে মানবসমাজ চরম বিকাশ লাভের পূর্বে বিবর্তনের তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে। প্রথমে আচারানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠীজীবন দানা বেঁধে ওঠে। জৈব বিকাশের মতো গোষ্ঠীজীবনের তাগিদে সমাজদেহ পরিপুষ্ট হয়—মনন ও চেতনার অস্তিত্ব তখনও নগণ্য ছিল। দ্বিতীয় স্তরে গোষ্ঠীমন ক্রমে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও সচেতন হয়ে ওঠে। চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবোধ সমাজবিকাশের সহায়ক হয়। মানুষ নিছক জৈব অস্তিত্বের দাবি অতিক্রম করে উন্নততর আদর্শ লক্ষ্যপথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। অবশ্য জীবনের ভোগ্যসম্ভার মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে সমাজেরও একটা জৈব বিকাশ আছে, সেটা শুধুমাত্র একটা যন্ত্র নয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দাপটে মানুষের আধ্যাত্মিক মন নিষ্পেষিত হয়। সামাজিক বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে মানুষের এই প্রবণতাও অতিক্রান্ত হয়। যুক্তিতর্ক ও জৈবতাড়নার পরিবর্তে ঐকবোধ, সংবেদনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির চেতনায় মানুষের মহত্তম অন্তরাবেগ ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীকে সুষ্ঠু ও সমন্বিত করে তোলে।[৩০]

চার : রাষ্ট্রদর্শন

শ্রীঅরবিন্দ প্রাকৃতিক বিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের বিবর্তন ধারায় লক্ষিত হয় যে মানবিক প্রগতি তিনটি উপাদানের নিরন্তর সাযুজ্যের উপর নির্ভর করে : ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও মানবসমাজ ; এগুলির প্রতিটি অপরের আনুকূল্যে নিজ পথে বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক প্রবণতায় ব্যক্তি তার জীবনের বাহির ও অন্তরকে গোষ্ঠীর সাহায্যে বিকশিত করে ; গোষ্ঠীও ক্রমে বৃহত্তর মানবসমাজে মিশে যায়। একদিকে ব্যক্তিমানুষ এবং অপরদিকে বৃহত্তর মানবসমাজ গোষ্ঠীকে পরিপুষ্ট করে। মানবসমাজ এখনও সচেতনভাবে সুসংবদ্ধ হয় নি বটে, কিন্তু তার অসংগঠিত রূপের পশ্চাতে সামগ্রিক বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভূমিকাই থাকে। সমগ্র মানবসমাজ সর্বজনের আনুকূল্যেই কেবল সুসংগঠিত পথে পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপ লাভ করে। প্রকৃতিও অনুরূপ তিনটি উপাদানের সাহায্য নেয়। একক, বহু ও সমগ্রের মধ্যে প্রকাশমান হয়ে প্রকৃতি তাদের সেতুবন্ধ রচনা করে। মনুষ্যজীবনে বিভিন্ন বিভেদের মধ্যে প্রকৃতি সংহতি সাধন করে—বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করে।[৩১]

একক, বহু ও সমগ্রের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার সম্ভাবনা অসীম। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সামঞ্জস্যের চাই নিরঙ্কুশ অবকাশ। এখনও চলেছে মানুষে মানুষে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু তা অতিক্রমের কোনও পথই মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। এখনও গোষ্ঠীর বেদীমূলে ব্যষ্টিস্বার্থের বলিদান চলেছে। গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্রমেই হরণ করছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : 'Freedom is as necessary to life as law and regime ; diversity is as necessary as unity to our true completeness. Existence is only one in its essence and totality, in its play it is necessarily multiform. Absolute uniformity would mean the cessation of life, while on the other hand, the vigour of the pulse of life may be measured by the richness of the diversities which it creatas'।[৩২]

বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই সব কিছুকে একই ছাঁচে গড়ার কল্পনা জীবনের প্রতিকূল। তবে ঐক্যেরও প্রয়োজন আছে। ঐক্য বিনা স্থায়িত্ব,

শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় : 'Unity we must create, but not necessarily uniformity. If man could realise a perfect spiritual unity, no sort of uniformity would be necessary ; for the utmost play of diversity would be securely possible on that foundation'।[৩৩]

প্রকৃতিও চায় ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাধীনতা। আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনও বিরোধ নেই। প্রকৃতি কোনও নিয়মকানুন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয় না। মানুষের অন্তর থেকেই তাকে উদ্ভূত হতে সাহায্য করে। প্রকৃতির নিয়মেই ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম ও জাতির স্বাধীনতা নির্ধারিত হয়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'All liberty, individual, national, religious, social, ethical, takes its ground upon this fundamental principle of our existence. By liberty we mean the freedom to obey the law of our being, to grow to our natural self fulfilment, to find out naturally and freely our harmony with our environment'।[৩৪]

নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতার যে-ঝুঁকি থাকে তার কারণ মানুষের অপরিণত ও ত্রুটিপূর্ণ মনোভাব। আবার অত্যধিক আইনের বন্ধনে মনুষ্যত্ব খর্ব হয়— সেদিক থেকে বরং নৈরাজ্যবাদও ভাল।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে সকলের সমবেত শক্তি ও বুদ্ধিবত্তার রূপ নিয়েছে রাষ্ট্র। তত্ত্বগতভাবে একথা চলে আসছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র সকলের মঙ্গল সাধনতো দূরের কথা উলটে সংঘবদ্ধভাবে দুষ্কার্য ও ক্ষতি সাধন করে। ক্ষমতাসীন দল বা শ্রেণী জনমনের প্রতিবিম্ব নয়, তাতে দেশের শ্রেষ্ঠ মনন ও চিন্তনের কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। রাষ্ট্রের প্রশাসনে কিছু উন্নত মস্তিষ্কের আগমন হয়তো ঘটে, কিন্তু রাষ্ট্রের যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে সেইসব উন্নত মস্তিষ্ক অবনত হয়। যূথবদ্ধ এই রাষ্ট্রীয় দাপটের পশ্চাতে না থাকে কোনও নীতিবোধ, না কোনও আত্মিক তাড়না। রাষ্ট্র চায় মানুষের স্বাধিকার হরণ করে গোষ্ঠীর যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দিতে ; ফলে সমাজবদ্ধ মানুষের আদর্শ ব্যর্থ হয় ; রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্যষ্টির নিষ্পেষণ পরিণামে ব্যষ্টিকে সমগ্র মানবসমাজের অংশীদার হতে বাধা দেয়। কাজেই রাষ্ট্রই প্রগতির একমাত্র ধারক ও বাহক নয়। ব্যষ্টি ও সমাজের মধ্যে সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সকল বাধা অপসারণের মধ্যেই রাষ্ট্রের সার্থকতা।[৩৫]

শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্রকে জৈব প্রত্যয়ে বিচার করেন নি। জীবের যা ধর্ম অর্থাৎ স্বাধীন, সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ—তার অবকাশ রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপস্থিত। রাষ্ট্রের আচরণ স্থূল, নিষ্প্রাণ ও নিষ্করুণ। তিনি বলেছেন: '...the state is not an organism ; it is a machinery, and it works like a machine, without tact, taste, delicacy or intuition. It tries to manufacture, but what humanity is here to do is to grow and create'।[৩৬]

ঐ-প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছককাটা বাঁধাধরা মৃতপ্রায় একটা সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে মাত্র, তাতে ব্যক্তি-মানুষের উদ্যম, বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ ব্যাহত হয়।

এযাবৎকাল যূথবদ্ধ জীবনের বৃহত্তর কাঠামো হিসাবে নেশন বিরাজ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে মানবিক সংগঠনের বিবর্তনে এটাই কি বৃহত্তম ও শেষ ধাপ? বিভিন্ন নেশনকে নিয়ে বৃহত্তর কিছু গড়ার কি সম্ভাবনা নেই? মানুষের প্রবণতা বৃহৎ মানব-সমাজে অঙ্গীভূত হওয়া। এতদিন দেখা গিয়েছে যে শক্তিসম্পন্ন নেশনগুলি দুর্বল নেশনগুলিকে দাবিয়ে রেখেছে। একই নেশনের দাপটে সারা দুনিয়াটা বিজিত ও একীভূত হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। কিংবা কম্যুনিজম বা ঐরকম কোনও মতবাদের অধীনে পৃথিবীটা সংঘবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু দুটি প্রণালীই বিনাশকর—তাতে ব্যর্থ হবে বিশ্বমানবতার আদর্শ।[৩৭]

তাঁর আশা ছিল যে সমাজতন্ত্র একদিন বিশ্ব-ঐক্য সাধন করবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রও সংকীর্ণ আবর্তে ঘূর্ণায়মান। সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা পেলে তাদের মধ্যেও জাতীয় অভিমান ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে; বিশ্বজনীন আদর্শকে তখন বিসর্জন দেওয়া হয়। অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের নানা মত ও পথ আছে। একশ্রেণীর সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিসত্তাকে বলি দিয়েছে; আবার আর এক শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ বর্জিত হয় নি। উভয়ের মধ্যে প্রকট বিরোধ বিশ্ব-রাষ্ট্র রচনার একদিন অন্তরায় হবে। কম্যুনিজম যে মূলতঃ মানবতাবিরোধী তা নয়; বরঞ্চ যৌথ সামঞ্জস্যের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক। তাঁর মতে: 'The already developed systems which go by the name are not really Communism but constructions of an inordinately rigid State Socialism. But Socialism itself might well develop away from the Marxist groove and evolve less rigid modes ; a co-operative Socialism, for instance, without any bureaucratic

rigour of a coercive administration, of a police state, might one day come into existence, but the generalisation of Socialism throughout the world is not under existing circumstance easily foreseeable...'[৩৮]

সারা বিশ্বে আদর্শ সমাজতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভাবের আশা না দেখে তিনি রাষ্ট্র-সংঘের (UNO) অধীনে ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সহাবস্থান নীতির যৌক্তিকতা দর্শিয়েছেন। দুইয়েরই দোষগুণ আছে, প্রভেদ ও বিরোধও আছে। সমবায়ী ব্যবস্থাও কার্যকর না হতে পারে; যদি তাতেও সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি-স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়। ব্যক্তির উন্নতি বিনা কোনও কিছুর স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হতে পারে না। ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যম, বিকাশ ও বৃদ্ধিকে সমষ্টির চাপে রুদ্ধ রাখলে পরিণামে মানবতার পরিপূর্ণতা বিঘ্নিত হবে। সমষ্টিবাদী প্রচেষ্টায় ব্যক্তিমানুষ ছককাটা পরিবেশে বন্দী হয়। এমনকি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপও সেদিক থেকে বিনাশকর।[৩৯]

অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনদেশগুলির গতি রোধ করছে। তাই এই অবস্থায় বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা অকার্যকর। এমতাবস্থায় পরস্পরবিরোধী দেশগুলিকে মানবতার কল্যাণে যতদূর সম্ভব ঐক্যবদ্ধ রাখাই মঙ্গল। ক্রমে তা থেকেই একদিন প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার বীজ উপ্ত হয়ে ব্যক্তিমানুষের শুভ প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিশক্তিকে পরিপুষ্ট করবে। তবে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও মতবাদ ক্রমান্বয়ে পূর্বের মতো ভবিষ্যতেও উদ্ভূত হবে এবং তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব থাকবে। এর একমাত্র উপায় মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মানবধর্মের উন্মেষসাধন। তারই প্রভাবে মানুষে মানুষে বিবাদের পরিবর্তে পরস্পর-গ্রাহ্য পরিবেশ গড়ে উঠবে।

শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ মানবসমাজের একটা সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, যেখানে রাজারাজড়া, যাজকসম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য থাকবে না। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রবাদের পরিবর্তে স্থাপিত হবে মানুষের সমানাধিকার। স্বাধীন সমবায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় যূথবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির আস্বাদ পাবে।[৪০]

বিবেকানন্দ ও টিলকের মতো শ্রীঅরবিন্দ গীতার মর্মবাণী সর্বভূতহিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বেনথাম প্রমুখ ইউরোপীয় হিতবাদীদের greatest good of the reatest number আদর্শের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। তবে হিতবাদীদের

পন্থায় সংখ্যালঘুরা উপেক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে গীতার মর্মানুসারী ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করতেন যে পরম দিব্য সত্তা যেখানে সর্বব্যাপী সেখানে সকল মানুষের প্রতি সমান দৃকপাত তথা সর্বাত্মক মঙ্গলসাধনই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। পার্থিব সুখদুঃখের প্রশ্নকেই শুধু বড় করে না দেখে তাঁরা হিতবাদীদের বিপরীতে আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী দৃষ্টিতে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবেছেন।

গীতার মর্মানুসারে তিনি মুক্তির প্রত্যয়কেও গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের স্বধর্মের প্রতি আনুগত্যই হল মুক্তি ; মানুষের অন্তর্নিহিত এই প্রবণতা কেবল একটা বাহ্যিক ও মানবিক সত্তাই নয়— বস্তুতঃ সেটা জৈব সত্তারই অঙ্গ— স্বধর্মের প্রতি আনুগত্যের অর্থ দিব্যধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন। তাঁর এ-প্রত্যয়ে একদিকে গীতার বাণী যেমন পরিস্ফুট, অন্যদিকে রুসোর প্রভাবও কিছুটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মুক্তিকে নৈতিক দৃষ্টিতে দেখে রুসো মনে করতেন যে তাতে নিজেদের জন্য রচিত রীতিনীতির প্রতিই আমরা আনুগত্য জানাই। শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বটিকে আরও স্পষ্ট করে দেখিয়ে বলেছেন যে স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যই মুক্তির উপাদান ; নিস্পৃহ ও আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে নিজ সত্তার প্রতি সমাদর ও সেইসঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে দিব্য চেতনাস্বরূপ মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন এই আত্মিক মুক্তির উপরই নির্ভর করে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতার দরুন বিবর্তনের যে সংকট দেখা দিয়েছে তার নিরসনকল্পে শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এক জনসম্প্রদায়ের উদ্ভব কামনা করেছেন। কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নয়ন আর গালভরা গণতান্ত্রিক কথায় সাধারণ মানুষকে সংকীর্ণ চিন্তা থেকে মুক্ত করা যায় না। তাঁর মতে কম্যুনিষ্টদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিণাম মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনের আধিপত্য। অসুস্থ মানুষের সমন্বয়ে সুস্থ সমাজ গড়া যায় না— তাই সে-অবস্থায় মানবতা ও মানবিকতার ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতোই শোনাবে। সুখবাদ বা সমাজতান্ত্রিক নীতিকথা স্থান ও কাল বিশেষে প্রযোজ্য— তাতেও কোনও চূড়ান্ত সমাধানের ইঙ্গিত নেই— পরম মঙ্গল সাধনতো দূরের কথা। ধর্মের বেলাতেও দেখা যায় যে মানুষের আত্মিক বিকাশের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা জনজীবনকে প্রাণবন্ত করতে অপারগ— কারণ ধর্ম প্রতিষ্ঠানগত হয়ে পড়ায় তা সংকীর্ণ মনোভাব, অন্ধ ভাবাবেগ ও আচারানুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে গিয়েছে।

তাই শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্মভাবে পরিমণ্ডিত এমন এক আদর্শ সমাজের কথা ভেবেছেন যা সকলের জীবনকেই করে তুলবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিক প্রেরণাই হবে তার সঞ্চালক। তবে তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কথাই শুধু ভাবেন নি। উপরন্তু চেয়েছেন বিশ্বের রূপান্তরের জন্য সর্বজ্ঞ ও বিশ্বচেতনাসম্পন্ন দিব্য অতিমানসের (Divine Supermind) অবতরণ। সেজন্যে মানুষকে মন অতিক্রম করে অতিমানসের দিকে বিবর্তিত হতে হবে। তখন অতি-মানসিক গুণসম্পন্ন একটা জাত বা গোষ্ঠী গড়ে উঠবে। অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ হবে অনেকটা পশু ও মানুষের পার্থক্যের মত। রূপান্তরিত এই প্রাজ্ঞ মানবগোষ্ঠী দিব্য ইচ্ছা ও মানবিক আকুতির তাগিদে নিশ্চল বিবর্তনের সংকট মোচন করবে। প্রকৃতি এখন পৃথিবীর সূতিকাগারে অতিমানস-শক্তির প্রসব-বেদনায় বিধুর।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব প্রত্যয়টির সঙ্গে নীটশের চিন্তার মিল আছে। কেশবচন্দ্র ও পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের মনেও নীটশের প্রভাব দেখা যায়। নীটশেকেই ফ্যাসিবাদের অন্যতম আদিগুরু বলা হয়। তবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পার্থক্য এই যে নীটশের অতিমানব (Ubermensch) দৈত্যের মতো নিষ্করুণ ও বলদর্পী— আর শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব দেবদূতের মতো রূপান্তরিত মানুষ। নীটশের চিন্তায় মানবিক প্রমূল্যের স্থান নেই ; সেক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ চেতনাকে পরম ও দিব্য মূল্যবত্তায় বিকশিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অন্তর্মুখী সমচেতনার দ্বারা যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবাদবিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি, সমন্বয় ও ঐক্য অর্জন করা যায়। তিনি আরও মনে করতেন যে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর সমন্বয় তথা মানবিক ও জাগতিক বিষয়াতীতে চৈতন্য সৃষ্টি করা যায়, তাতেই দিব্য সত্তার সঙ্গে নির্বিকল্পের উপলব্ধি সম্ভব। তিনি বিশ্বাতীত আধ্যাত্মিক সত্তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেগেলের মতো তিনিও জাতির অন্তরাত্মায় বিশ্বাস করতেন।

জা তী য় তা বা দ

জাতীয়তাবাদকে শ্রীঅরবিন্দ প্রচলিত আবেগসর্বস্ব অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার ও বিশ্বজনীন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ধাপ হল জাতীয়তা। জাতীয়তা-বাদকে তিনি নিছক দেশাত্মবোধের দৃষ্টিতেও দেখতেন না। তার পশ্চাতে তিনি

এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনার চিন্তা পোষণ করতেন। তাঁর ভাষায় : 'জাতীয়তা একটা রাজনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি নহে, জাতীয়তা ভগবানসম্ভূত ধর্ম্ম। জাতীয়তা কথনই বিনষ্ট হইবে না,…ভাগবৎ শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে, যে কোন প্রকার অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন। জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা মানবীয় জিনিস নহে। ভগবানই বাংলায় কাজ করিতেছেন। ভগবানকে মারা যায় না, ভগবানকে জেলে পাঠান যায় না'।[৪১]

রাজনীতিকে ধর্মের ব্যঞ্জনাদান সমকালীন প্রায় সকল রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তায় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতো তাঁরাও মাতৃভূমিকে একমাত্র উপাস্য ও মুক্তি সাধনাকে শ্রেষ্ঠ আরাধনা বলে মনে করতেন। বিবেকানন্দের মতো শ্রীঅরবিন্দও দেশ ও তার অধিবাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান-প্রয়াসী ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর এই ধর্মের সংমিশ্রণ-চিন্তাকে অনেকেই হিন্দু পুনর্জাগরণ প্রয়াস বলে মনে করেন।

নানাবিধ পার্থক্য থাকার দরুন ভারতীয়দের একই নেশন বলে অভিহিত করা যায় কিনা সে-সম্পর্কে একটা বহুদিনের বিতর্ক ছিল। এ বিষয়ে ভারতীয় নেশনের রূপকার সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা লক্ষণীয়। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিরুদ্ধে মামলা চলার সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ঐ পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধে তাঁর এই বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রথমটিতে ভারতের সার্বভৌমিকতা প্রসঙ্গে নিজেই প্রশ্ন করে তার জবাব দেন এই বলে : 'We answer that here are certain essential conditions, geographical unity, a common past, a powerful common interest impelling towards unity and certain political conditions which enable the impulse to realize itself in an organized government expressing the nationality and perpetuating its single and united existence.'[৪২]

সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দও দৃঢ় প্রত্যয়ে দাবি করেন যে এই গুণগুলি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক এন. এন. ঘোষ বলেন যে ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিমিশ্রণের অভাবে ঐ দাবি অচল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নেশন বিষয়ক চিন্তাকে যৌগিক রসায়ন পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনাবিল অনুরাগ ও আবেগ এবং তজ্জন্য আত্মোৎসর্গ নেশনরূপে ভারতকে সুসংবদ্ধ করে তুলবে। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি দেশপ্রেম প্রসঙ্গে বলেন : '…the pride in the past, the pain of

our present, the passion for the future are its trunk and branches. Self-sacrifice and self-forgetfulness, great service, high endurance for the country, are its fruits. And the sap that keeps it alive is the realization of the motherland of God in the country, the perpetual contemplation adoration and service of the mother.'[৪৩]

গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদির সংকীর্ণ চেতনার ঊর্ধ্বে উঠলে দেশমাতৃকার যথার্থ রূপ দর্শন করা যায়। দেশ সকলের ; সকলেই দেশবন্দনায় প্রবৃত্ত হলে বিভেদ ও অনৈক্য বলে কিছু থাকবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে যেমন সর্বাত্মক করে তুলতে চেয়েছিলেন, তেমনি ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোর চাইতেন সর্বজনমুখী বিকেন্দ্রিক গঠন। পল্লীভিত্তিক পুনর্গঠন ও জনচেতনার সমর্থনে তিনি বলেন : 'If we are to survive as a nation, we must restore the centres of strength which are natural and necessary to our growth, and the first of these, the basis of all the rest, the old foundation of Indian life and the secret of Indian vitality, is the self dependent and self sufficient village organism. If we are to organize Swaraj, we must base it on the village.'[৪৪]

জীবদেহের মতো পল্লীসমাজকে সারা দেশের সঙ্গে সুসংবদ্ধ করে মানুষের মধ্যে স্বাধীন উদ্যম, প্রাণচাঞ্চল্য ও যথোচিত সমাজচেতনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। সেজন্য পল্লী সংগঠনের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিশোরগঞ্জে 'পল্লীসমিতি' বিষয়ক ভাষণে (১৯০৮) তিনি বলেছিলেন যে প্রাচীন ভারতে পল্লীসমিতিগুলি ছিল জনজীবনের প্রাণকেন্দ্র— কালের প্রবাহে দেশের বুকের উপর দিয়ে কতই না ঝড়ঝাপটা বয়ে গিয়েছে— তবুও দেশ ও তার ঐতিহ্য বিনষ্ট হয় নি— কারণ তার মূলে ছিল ঐসব সমিতি। দেহের অসংখ্য :কাষের সঙ্গে গ্রামগুলি তুলনীয় ; দেহকোষ সুস্থ থাকলে যেমন শরীর সুস্থ াকে তেমনি গ্রামগুলি সুস্থ থাকলে দেশের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রাচীন ারতে কেন্দ্রীয় পরিশাসনের সঙ্গে যুগপৎ বিরাজ করত বিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজ- ্যবস্থা। কোনও কারণে কেন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও রাষ্ট্রের নিম্নতম াসন পর্যায়ে কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটত না। উৎপাদন, আত্মরক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় ামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। শ্রীঅরবিন্দের গ্রামীণ পুনর্গঠন চিন্তার সঙ্গে গান্ধীর

গ্রামোন্নয়ন ও সর্বোদয় আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কার চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[৪৫]

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় দেখা যায়। ইংরেজের আদালত বয়কট করে সালিসির মাধ্যমে তাঁর নিষ্পত্তির অভিমত ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে গৃহীত। আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন ফিন' আন্দোলনের তিনি অনুরাগী ছিলেন। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রধান অঙ্গ রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবন। এদেশে তদুপরি একটা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিদেশী বিদ্বেষ বর্তমান। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাদেশিক আবেগ প্রবল হয়। সমকালীন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্ক, মাৎসিনি, মিলের চিন্তায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় জননেতারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও মাৎসিনির অনুরাগী ছিলেন। মাৎসিনি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক চিত্র ছাড়াও তার এক নৈতিক ও বিশ্বজনীন রূপ দর্শিয়েছিলেন। সেই আদর্শেই রাজনীতির পিছনে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

ভারতের মুক্তিসাধন শ্রীঅরবিন্দের কাছে ছিল এক জৈব দায়িত্বস্বরূপ। সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর কল্পনা করেছিলেন। স্বরাজ বলতে তিনি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা মনে করতেন না। স্বরাজের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাঁর মতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কেবল দেশপ্রেমের দ্বারাই সম্ভব নয়; তদুপরি চাই আত্মদান। স্বরাজ সাধনার অঙ্গস্বরূপ তিনি আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার সাহায্যে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন কামনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধকে তিনি যজ্ঞের মতো মনে করতেন। যজ্ঞের আরাধ্য হলেন দেশমাতৃকা। আত্মাহুতির মাধ্যমে সেই দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তি চাই। বৈদান্তিক ভাবাদর্শে অন্তর্নিহিত দিব্যসত্তার উপলব্ধি ও মোক্ষ অর্জনকেই তিনি পরম আদর্শ বলে গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন: 'Our attitude is a political Vedantism. India, free, one and indivisible, is the divine realization to which we move,—emancipation our aim; to that end each nation must practise the political creed which is the most suited to its temperament and circumstances'।[৪৬]

শ্রীঅরবিন্দ চাইতেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। বিপিনচন্দ্র পালের নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধনীতিকে তিনি সাময়িক কার্যকারিতার দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধী নেতৃত্বের বহু পূর্বেই বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় বাংলাদেশে অহিংস অসহযোগ নীতির একবার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। তবে তিনি নির্বীর্য নীতিবাগীশতাকে পছন্দ করতেন না। সেকথার প্রমাণ তাঁর সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টাতেই সুপরিস্ফুট। তিনি যে কয়টি নীতি সমর্থন করতেন তা ছিল ইংরেজের পণ্য, ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের আদালত ও ইংরেজের প্রশাসনকে বর্জন করা। এগুলির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বদেশী পণ্য, জাতীয় শিক্ষা, সালিসি বিচার এবং জাতীয় চেতনা অনুযায়ী কার্যনির্বাহক ব্যবস্থার কথা তিনি চিন্তা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কর-বন্ধের প্রস্তাবও তিনি শেষ অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও আইন ভঙ্গের পথ তিনি অনুসরণ করেন নি। রাজনৈতিক সংগ্রামে অবিমৃশ্যকারিতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন।

একদিকে আবেদন-নিবেদন নীতি এবং অপরদিকে বৈপ্লবিক নীতির মধ্যপন্থা-স্বরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিকে তিনি অনুপযোগী মনে করতেন না। তবে শাসকরা যদি হিংসাত্মক নিপীড়ননীতি গ্রহণ করে তাহলে মুক্তিসংগ্রামীদেরও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর কথায় তখন : 'active resistance becomes a duty and passive resistance, for that occasion, suspended. But though no longer passive, it is still a defensive resistance'।[৪৭]

এখানে গান্ধীনীতির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি সম্পর্কে তাঁর পরস্পরবিরোধী মনোভাব দেখা যায়। একবার তিনি বলেছেন : 'If the instruments of the executive choose to disperse our meetings by breaking the heads of those present, the right of self defence entitles us not merely to defend our heads but to retaliate on those of the head breakers.'[৪৮]

আবার অন্য এক জায়গায় বলেছেন : "If we are persecuted, if the plough of repression is passed over us, we shall meet it, not by violence, but by suffering, by passive resistance, by lawful means, we have not said to our young man, 'when you are repressed, retaliate'. We have said, 'suffer.'"[৪৯]

পাঁচ : শিক্ষাচিন্তা

সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা সম্পর্কেও শ্রীঅরবিন্দ গভীর ও মৌলিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। এবিষয়ে তিনি মোটামুটি তিনটি মূল নীতি নির্ধারিত করেছেন।

প্রথম নীতিটি হল : 'nothing can be taught'। অর্থাৎ মানুষ বাইরে থেকে নতুন কিছু শেখে না। শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই তার অন্তরে নিহিত থাকে। শিক্ষার কাজ বহির্জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর্লোকের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। জ্ঞানের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত ; সূক্ষ্ম চেতনাই তার প্রধান উপাদান ; শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টাকে যথোচিত পথে পরিচালনাই শিক্ষার লক্ষ্য ; পরিচালনা মানে খবরদারি করা নয়। মনের ধারা যতই স্বতঃস্ফূর্ত হোক না কেন অবরোহী (deductive) প্রণালীতে তা স্ফুরিত হয় না। শিক্ষকের কাজ মানুষকে নিয়ে— কিন্তু তিনি মানুষকে কুমোরের মত খেয়ালখুশি অনুযায়ী গড়েপিটে তৈরী করতে পারেন না। যে উপাদান নিয়ে শিক্ষকের কারবার তার প্রকৃতি ভিন্ন। সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত সে-উপাদান আত্মনিয়ন্ত্রণের আবেগে প্রচ্ছন্ন থাকে। শিক্ষার্থীর প্রবণতা অনুযায়ী এবং তার ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই হল শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকের কাজ কুচকাওয়াজ করানো নয়, তিনি একজন পথপ্রদর্শকমাত্র।[৫০]

দ্বিতীয় নীতি হল : 'the mind has to be consulted in its own growth.'। সব মনের গড়ন সমান নয়। বরঞ্চ প্রত্যেক মনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও প্রবণতা থাকে। কাজেই শিক্ষককে ছাত্রের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তির সন্ধান রাখতে হবে। মনকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ছাঁচে মানুষ গড়া যায় না। তার ভাবী কর্মজীবনকে আগে থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ-নীতির ব্যতিক্রম পরিণামে বিষময় হয়ে ওঠে। ছোটদের ভবিষ্যৎ তাদের রুচি ও প্রবণতার উপর ছেড়ে না দিয়ে অভিভাবকেরা তাদের হয়ে লেখাপড়ার বিষয় বেছে দেন ও কর্মজীবন নির্ধারিত করে দেন। কারণ লক্ষ্যটা থাকে অর্থোপার্জনে। ফলে কামার হয় কুমোর, ডাক্তার হয় ইঞ্জিনিয়ার, স্বভাবশিল্পীকে করে তোলা হয় নিরস বিজ্ঞানীরূপে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : 'Everyone has in him something divine, something his own...the chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use.'[৫১]

তৃতীয় নীতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ হল : 'to work from the near to the far, from that which is to that which shall be'। প্রতিটি আত্মার একটা অতীত আছে আর পূর্বকৃত কর্মের ফলাফলেই বর্তমান জীবন গঠিত। অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত কর্মফলের ভিত্তিতে মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি রূপায়িত হয়ে এসেছে। অবশ্য বংশ, জাতি, দেশ, কাল ও পরিবেশ চরিত্রকে প্রভাবিত করে। নিজ প্রকৃতিসহ আত্মা মাতৃজঠরে দেহ ধারণ করে, পরে পিতা-মাতার মন সন্তানের মনে বিম্বিত হয়। পিতামাতার সত্তা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে ক্রমে মানুষ পরিবার, সমাজ ও জাতির গুণাগুণ অর্জন করে। তাই শিক্ষার্থীর মানসিক পশ্চাৎপটও বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের আনুপূর্বিক প্রভাব, পরিবেশ ও পরিবর্তন তথা তার অতীত কথা জানা না থাকলে শিক্ষার্থীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনপথ রচনা করা কঠিন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় : 'The past is our foundation, the present our material, the future our aim and summit.'।[৫২] শিক্ষা পরিকল্পনায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহের স্থান থাকা নিতান্তই আবশ্যক। তত্ত্বগত এই দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর কর্মপন্থা রচনা করেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতে চিন্তার যন্ত্রস্বরূপ মনের শক্তি বিপুল ও বৈচিত্র্যময়। সেই মনকে তিনি চারটি স্তরে বিন্যাস করেছেন : চিত্ত, মানস, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা।[৫৩]

স্মৃতির ধারক ও বাহক হল চিত্ত। সেখানে সঞ্চিত নিষ্ক্রিয় স্মৃতি থেকে সক্রিয় স্মৃতি উৎপন্ন হয়। নিষ্ক্রিয় স্মৃতি অতীত সম্পর্কে নিশ্চেতন একটা নথি বহন করে মাত্র ; মানুষের জীবনে তার প্রত্যক্ষ কোন ব্যবহার হয় না ; আবার মনের উপর অতীতের সেই অচেতন ছাপ মুছে দেওয়াও যায় না। সক্রিয় মনের বিকাশ সাধন তাঁর মতে সম্ভব।

মনের দ্বিতীয় স্তর মানসের ভিত্তি হল পঞ্চেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ানসের নিরন্তর পরিপুষ্টি হতে থাকে। শিক্ষার্থীকে কোনও কিছু শেখানোর ামেয়ে সেই বস্তুকে সরাসরি প্রদর্শন করলে বিষয়টা তার মনে গেঁথে যায়। মনের স্তুনিরপেক্ষ স্বাধীন একটা শক্তি আছে বলে তিনি মনে করতেন এবং সেই শক্তি ানসেরই সৃষ্টি। যৌগিক প্রক্রিয়ায় অতি দূরের অদৃশ্য বস্তুর অবস্থানও স্পষ্ট জানা ায়। শ্রীঅরবিন্দ তাই মানসের যথোচিত পরিশীলনের প্রয়োজন অনুভব করতেন। াজন্যে তিনি যোগসাধনার উপর গুরুত্ব দেন এবং ছোটবেলা থেকেই যোগাভ্যাসে ানুষকে প্রবৃত্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

মনের তৃতীয় স্তর বুদ্ধি। বুদ্ধির জোরেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়। বৌদ্ধিক স্তরেও কয়েকটি ক্রিয়া থাকে। তার মধ্যে কিছু সৃজনশীল ও সামঞ্জস্যবিধানকারী, অন্যগুলি অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক। যুক্তি ও সৌন্দর্য-বোধ এবং কল্পনাশক্তিরও উৎস সেইখানে। ছোটদের কল্পনাশক্তির বিকাশে উৎসাহদান শিক্ষকের কর্তব্য। প্রথমে তাদের দৃষ্টি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করে ক্রমে মননক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করা প্রয়োজন। অধীত জ্ঞান যদি মানুষের মনকে গড়ে তুলতে না পারে তাহলে সেটা একটা বোঝাস্বরূপ প্রতিপন্ন হয়; সেজন্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিতে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের সংযোগ থাকা উচিত।

মনের শেষ ও চতুর্থ স্তর স্বজ্ঞার (intuition) উপর শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বুদ্ধি মানুষের মনে বিস্তৃতিলাভের বিস্তর সুযোগ পায়; কিন্তু স্বজ্ঞা পায় না। অনন্যসাধারণ মানুষের মেধা ও মনীষার ভিত্তি হল স্বজ্ঞা। শিক্ষককে জানতে হবে শিক্ষার্থীর সুপ্ত মন ও প্রবণতাকে; তাঁর আত্মাভিমান থাকলে চলবে না; তাঁর চাই সহানুভূতিসম্পন্ন সংবেদনশীল মন।

তাঁর মতে শিশুকে ছ-বছর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। তৎপূর্বে শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠন অনুপযোগী থাকে। শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের সহজাত নীতিবোধ জাগ্রত করা বিশেষ প্রয়োজন— তবে সেটা পাঠ্যপুস্তক বা সিলেবাসের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় না। তার সঠিক প্রণালী হল ছাত্রদের সহজাত আবেগ, মেলামেশার অভ্যাস এবং সহজাত প্রকৃতি বুঝে তাদের ঐসব বিষয়ে উপযুক্ত পথের নিশানা দেওয়া। বাইরে থেকে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ক্ষতিকর। তাদের সামনে রাখতে হবে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র। আত্মত্যাগ, জ্ঞানতৃষ্ণা, নির্মলতা, সাহসিকতা, দেশাত্মবোধ, মহানুভবতা প্রভৃতি শিক্ষকের চরিত্রে থাকলে ছাত্রদের পক্ষে তা সহজে গ্রহণীয় হতে পারে। সেকাজ শুধুমাত্র গালভরা বক্তৃতায় হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের মতে ধর্মশিক্ষার চেয়ে ধর্মজীবন যাপন অধিক কার্যকর। তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে ধ্যান, উপাসনা ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেন নি। দেশের মাটির দিকে লক্ষ্য রেখেই যে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি রচিত হওয়া উচিত সেকথাও তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

ছয় : উপসংহার

শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন ধারার স্রষ্টা। শুধু ভারতই নয় বিশ্বের আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন দিকের সূচনা করেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ একাধারে ছিলেন কবি, শিল্পশাস্ত্রী, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতা থেকে তিনি ক্রমে যোগসাধনা ও দার্শনিক জীবনের দিকে সরে যান। তাঁর মোট রাজনৈতিক জীবনকাল বিশ (১৮৯০-১৯১০) বছরের অধিক নয়। গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রথম প্রয়াসের দু-বছর (১৯০২-০৪) ধরলে প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবনের (১৯০৬-১০) অভিজ্ঞতা ছ-বছরের মত দাঁড়ায়। রাজনৈতিক চেতনার গোড়ার দিকে অর্থাৎ বিলাতের প্রবাসজীবনে তিনি কংগ্রেস-নীতির বিরোধী ছিলেন না। পরে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রামী আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেসের তোষণ নীতির তীব্র সমালোচক হয়ে পড়েন। তাই দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কংগ্রেস-নীতির বিকল্প স্বরূপ ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ তুলে ধরেন। তদানীন্তন কংগ্রেসকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বলেই তিনি মনে করতেন এবং প্রলেটারিয়েট শ্রেণীস্বার্থ রক্ষণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর প্রলেটারিয়েটবাদ মার্কসীয় প্রত্যয় থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কারণ শ্রীঅরবিন্দ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রলেটারিয়েটদের মস্তিষ্ক জ্ঞান করতেন— যেটা মার্কসীয় চিন্তার পরিপন্থী।

বাংলায় তাঁর গুপ্ত সমিতি সংগঠনের প্রথম প্রয়াস (১৯০২-০৪) আভ্যন্তরিক বিবাদের ফলে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি বরোদায় ফিরে গিয়ে দেশশক্তির সুপ্তি-ভঙ্গকল্পে বগলা মূর্তির পূজা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অবস্থা অনুকূল উপলব্ধি করে আবার বাংলা দেশে ফিরে আসেন (১৯০৬)। নবোদ্যমে গুপ্ত সমিতি গঠন এবং চরমপন্থী বিপ্লবী পন্থা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টাও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ায় তিনি চন্দননগরে প্রস্থানের পূর্বে বিপ্লবীদের 'উদ্দাম আচরণ' থেকে নিবৃত্ত হবার ও তাঁদের 'শক্তিকে অন্তর্মুখী' করার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অগ্নি ও রক্তস্নানের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং শেষ দিকে অস্ত্রের অভাবে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। যখনি তাঁর লৌকিক উপায় ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে তখনি তিনি অলৌকিক পন্থা অবলম্বন করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপ্লবী আবেগের ইন্ধন হিসাবে সরকারের 'আরও বেশী অত্যাচার' কামনা করতেন। কিন্তু শেষ দিকে তিনি সরকারি উৎপীড়ন প্রশমনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (বিপিনচন্দ্রের) ও বিপ্লবী প্রচেষ্টার সমর্থক ছিলেন। অনেক পরে অবশ্য তিনি দ্বিতীয় পন্থাটিকে পরিহার করেন। বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সহসা তাঁর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোকে অনেকে তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন। বস্তুতঃ সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর মানসিক প্রবণতার বিরোধী ছিল। তাঁর প্রবণতা ছিল অন্তরালে থেকে মানুষের চেতনা সৃষ্টি করা— সক্রিয় রাজনীতি নয়। প্রকাশ্য রাজনীতিতে নামার আগে ও পরের উক্তিগুলি তাঁর এ-মনোভাবেরই সমর্থন জানায়।

সমসাময়িককালে জাতীয়তাবাদকে যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হত। তিনি সেই দৃষ্টিতে পবিত্র দেশানুরাগ ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের আবেগ সঞ্চারিত করেন। তিনি মনে করতেন সার্বজনীন ঐক্যের পথ অনুসরণ করে মানব প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর ভিন্ন সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হবে না। জাতিকে তিনি দিব্য অভিব্যক্তিরূপে দেখেছেন। জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করার জন্য তাঁর গণতান্ত্রিক স্বরাজের দাবিও সেই দিব্য প্রেরণায় মূর্ত হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ থেকে সুভাষচন্দ্র অবধি বাংলার জনমানসে শক্তি ও আশার যে উচ্ছ্বাস জাগে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তার একজন মন্ত্রদাতা।

তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক রূপায়ণ চেয়েছিলেন এবং মনে করতেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বহু নিগূঢ় তত্ত্ব আছে যা এখনও মানুষকে সঠিক পথের নিশানা দিতে পারে। ভারত কোনও দিনই আক্রমণকারী দেশরূপে গড়ে উঠবে না—সে তার সনাতন জ্ঞানভাণ্ডার মনুষ্য সমাজের সাম্য, ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য উন্মুক্ত রাখবে।

শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক ধনতন্ত্রবাদের বিরোধী ছিলেন। নৌরজি ও গোখলের মতো তিনিও বিদেশী শাসনজনিত কারণে দেশীয় ধনের নিষ্কাশন (drain) তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। একচেটিয়া মালিকানা ও কেন্দ্রীভূত ব্যবসায়ী জোটবদ্ধতাকে তিনি বিষনজরে দেখতেন। পক্ষান্তরে প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদকেও তিনি সর্বশক্তিমান মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনের রাজত্বরূপে দেখেছেন; ব্যবসায়বাণিজ্যে সরকারি অনুপ্রবেশ স্বভাবতই আমলাতন্ত্র ও ক্ষমতাসীনদের সৃষ্ট ফৌজি নিগড়ে সমাজকে আবদ্ধ করে রাখে। সমাজতন্ত্রবাদের এই প্রকৃতি জানা সত্ত্বেও তিনি সেটাকেই

প্রগতির প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সমাজজীবনকে সুষ্ঠুরূপ দিতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা ও নিরাপত্তা থাকা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি।

পশ্চিমী চিন্তাভাবনায় তিনি যথেষ্টই প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতোই তিনি পশ্চিমের প্রাধান্যকে স্বীকার করতেন না। তাঁর অধিবিদ্যা, সংস্কৃতি-তত্ত্ব, ইতিহাসচিন্তা, জাতীয়তাবাদের নব্যবিশ্লেষণ, মুক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক যুথ-বদ্ধতার চিন্তাভাবনা প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের নিপুণ সংমিশ্রণ। দর্শন, রাজনীতি সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষেত্রে তাঁর অলৌকিক বা দিব্য শক্তির প্রত্যয় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে কিছুটা বিসদৃশ ঠেকে; সেজন্যেই হয়তো বর্তমান জনচিত্তে তাঁর কোনও প্রভাব পড়ে নি। তাহলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও নবীন চিন্তার মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনার প্রয়াসী হয়েছেন।

দার্শনিকদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস নতুন কিছু নয়; বস্তুতন্ত্রীদের কাছে তাঁরা হয়তো প্রগতির অন্তরায়; আবার দিব্যসত্তায় আস্থাবান যাঁরা তাঁদের কাছে বস্তুতন্ত্রীরা অন্তঃসারশূন্যরূপে বিবেচিত। দিব্যশক্তিতে বিশ্বাসীদের নিকট শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শন মূল্যবান। বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাঁর কাছ থেকে পশ্চিমী আধুনিকতা ও প্রাচ্যের ভাবধারা সংমিশ্রিত একটা নতুন চিন্তার খোরাক পেতে পারেন। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল মানুষই যখন এক দার্শনিক সংকটের সম্মুখীন এবং ভাব ও বস্তুর মধ্যে দিয়ে একটি নতুন পথের সন্ধানে উন্মুখ তখন শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান-চর্চায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

নি র্দে শি কা

১. ডিরোজিও-র কিছু সংখ্যক বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন শিষ্যদের বিমানবিহারী মজুমদার ‘Philosophical Radicals’ নামে অভিহিত করেছেন। ‘পরিচয়’। তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪০, ১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. Amales Tripathi. *The Extremist Challenge*. 1967, p. 46.

৩. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*. 1953, p. 76.

৪. 'রবীন্দ্ররচনাবলী'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। খণ্ড ১০, পৃ ৬৭। ("জীবনস্মৃতি") যোগেশচন্দ্র বাগল। 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী'। ১৮৫৮, পৃ ৫১। Bipin Chanda Pal. *Memories of My Life and Times.* 1932, pp. 245-248.
৫. Kali Charan Ghosh. *The Roll of Honour.* 1965, p. 149.
৬. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৫।
৭. Gopal Halder. 'Revolutionary Terrorism', *Studies in the Bengal Renaissance,* ed. by A. C. Gupta. 1951, p. 243.
৮. H. Mukherjee and U. Mukherjee, ed. *Sri Aurobindo's Political Thought (1893-1908).* 1958, p. 76.
৯. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother.* 1953, p. 38.
১০. 'অরবিন্দের পত্র'। প্রবর্তক, চন্দননগর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬-১১।
১১. Quoted in : K. R. Srinivasa Iyengar. *Sri Aurobindo.* 1945, p. 165.
১২. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশীযুগ'। ১৯৫৬, পৃ ৪৪০।
১৩. Sri Aurobindo. *Speeches.* 1952, p. 52.
১৪. *Ibid.* p. 82.
১৫. Sri Aurobindo. *The Ideal of Karmayogin.* p. 7,
১৬. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother.* 1953, pp. 310-313.
১৭. শ্রীঅরবিন্দ। 'অরবিন্দ মন্দিরে'। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৫-২৬।
১৮. শ্রীঅরবিন্দ। 'দিব্য-জীবন'। ১৯৪৮, খণ্ড ১, পৃ ২৮।
১৯. শ্রীঅরবিন্দ। 'ধর্ম ও জাতীয়তা'। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ২১-২৫।
২০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১০-১৫, ২৩-২৫।
২১. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother.* 1953, p. 164.
২২. Sri Aurobindo. *Synthesis of Yoga.* p. 704.
২৩. *Sri Aurobindo on Himself and the Mother.* 1953, p. 233.
২৪. Sri Aurobindo. *The Human Cycle.* pp. 2-14.
২৫. *Ibid.* pp. 113-118.
২৬. Sri Aurobindo. *The Spirit and Form of Indian Polity.* 1947, p. 12,

২৭. *Ibid.* pp. 83-93.

২৮. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952, pp. 36-38.

২৯. Sri Aurobindo. *Ideals and Progress*, 1951, pp. 45-51.

৩০. Sri Aurobindo *The Spirit and Form of Indian Polity*. 1947, pp. 25-26.

৩১. Sri Aurobindo. *The Ideal of Human Unity*. 1950, pp. 171-179.

৩২. *Ibid*. p. 181.

৩৩. *Ibid*.

৩৪. *Ibid*. p. 184.

৩৫. *Ibid*. p, 26.

৩৬. *Ibid*. p. 27.

৩৭. *Ibid*. pp. 128-130.

৩৮. *Ibid*. p. 397.

৩৯. *Ibid*. p. 84.

৪০. *Ibid*. p. 130.

৪১. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952, pp. 6-7 (প্রমোদকুমার সেন। 'শ্রীঅরবিন্দ : জীবন ও যোগ'। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, ৭২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

৪২. Quoted in : K. R. Srinivasa Iyengar. *Sri Aurobindo*. 1945, p. 150.

৪৩. *Ibid*.

৪৪. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952, p. 41.

৪৫. প্রমদারঞ্জন ঘোষ। 'শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন'। ১৯৬৬, পৃ ১০৪।

৪৬. Sri Aurobindo. *The Doctrine of Passive Resistance*. 1948, p. 79.

৪৭. *Ibid*. p. 63.

৪৮. *Ibid*. pp. 62-63.

৪৯. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952, p. 120.

৫০. Sri Aurobindo. *A System of National Education*. 1953, p. 3.

৫১. *Ibid*. p. 5.

৫২. *Ibid*.

৫৩. *Ibid*. pp. 7-12.

চিত্তরঞ্জন দাশ ॥ ১৮৭০-১৯২৫

এক : ভূমিকা

প্রাকস্বদেশী-যুগের কংগ্রেসী রাজনীতির যে-চরিত্র ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে তা হল রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন নিয়মতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি। বস্তুতঃ স্বদেশী যুগ থেকেই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়: একদিকে উক্ত নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী ধারা, অপরদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকামী অতি-বামপন্থী ধারা; এবং ঐদুটি থেকে স্বতন্ত্র একটি মধ্যপন্থী ধারা দেখা দেয় যার মধ্যে প্রথমোক্ত ধারার তোষণনীতি যেমন স্থান পায় নি, তেমনি দ্বিতীয় ধারার সশস্ত্র পন্থাও গৃহীত হয় নি। এই মধ্যপন্থীদের অন্যতম শিরোমণি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব একদিকে যেমন বিলম্বিত অপর-দিকে তাঁর তিরোধানও তেমনি আকস্মিক ও অসময়োচিত। কাব্য ও সাহিত্য-চর্চার মধ্যে দিয়ে তিনি ক্রমে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় উপনীত হন— একই আবেগ ও প্রেরণায়— তা হল বাংলার বৈষ্ণব স্বভাবধর্মের পুনরুন্মেষ, তথা স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় বাঙালীর প্রতিষ্ঠা সাধন। আদিত্যহৃদয় চিত্তরঞ্জনের সরল সংবেদনশীল মন পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। পিতা ভুবনমোহনের অতুলনীয় ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবা দধীচি পুত্র চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

পরিণত বয়সে যে-মানুষ চিন্তা ও কাজে অনন্য প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দেন ছাত্রজীবনে তিনি তার বিশেষ স্বাক্ষর রাখেন নি। একাধিক প্রচেষ্টায় এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; বি. এ. পরীক্ষাতেও অনার্স লাভে ব্যর্থ হন; আসলে পরীক্ষাগত পড়াশুনায় তাঁর আদৌ রুচি ছিল না। আই. সি. এস. পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে তিনি সহাস্যে বলেছিলেন: 'I came out first in the unsuccessful list'।[১] পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর সময় ও মেজাজ ছিল না। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনায় কামাই দিয়ে তিনি দাদাভাই নৌরজির পার্লামেণ্টারি নির্বাচনে সহায়তা করেন; প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সেটাই হয় তাঁর হাতেখড়ি। তার আগে কলকাতার ছাত্রজীবনে তিনি আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের

'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনে' রাজনীতির আস্বাদ পেয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর মনে আইরিশ জননেতা চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল (১৮৪৬-৯১)-এর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। ব্যারিষ্টারি পাশ করে ১৮৯৩ সালে তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। আইনে পসার জমাতে না পেরে সাহিত্যকর্মে তিনি সময় অতিবাহিত করেন। 'মালঞ্চ' 'মালা' 'সাগর সঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর এই সময়ের রচনা। বস্তুতঃ রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের খ্যাতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। 'নারায়ণ' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বহু কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর কাব্যের প্রকৃতি ছিল বৈষ্ণবধর্মী। তিনি কয়েকটি বৈষ্ণব সংগীতও রচনা করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (১৯১৫) তিনি সভাপতিত্ব করেন।

চিত্তরঞ্জনের জন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে। বৈষ্ণবধর্মী কাব্যচর্চা সূত্রে তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থে তাঁর কিছুটা নাস্তিকতা ও ভোগবাদী মনোভাব ফুটে ওঠে। ব্রাহ্মদের বহু আচারবিচারই তিনি মানতেন না। গোঁড়া ব্রাহ্মরা তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করেন। শেষে তিনি সমাজ থেকে নিজের নাম কাটিয়ে নেন। ব্রাহ্মবিরোধী মনোভাবের পিছনে ছিল অরবিন্দের প্রভাব। পরবর্তী-কালের চিন্তায় তাঁর শাক্ত, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব ভাবের ত্রিধারা মিলিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম ও সাধনাই প্রাধান্য লাভ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি নিজের জীবনাদর্শের সন্ধান করেন— যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একদিন মহাপ্রভু মায়াময় সংসার ছেড়ে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। জীবের দুঃখে কাতর মহাপ্রভুর অনুভূতি চিত্তরঞ্জনের মনে যে আবেগ সঞ্চার করে তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর চিন্তা ও সাধনায়। তাঁর মানসিক গঠনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি পাবনায় অনুকূল ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

কার্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) পূর্বতন ভারতীয় রাজনীতির পটভূমি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দৃশ্যের উন্মোচন ঘটে ১৮৫৮ সালে কোম্পানির ভারত শাসনের অবসানে। ইংরেজের আধিপত্য ও আক্রামক নীতির ফলে নীরবে ও পরোক্ষে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক পর্ব সমাধা হয়; ভারতীয়

সামন্ততন্ত্র শক্তিহীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার ও শাসন সংস্কার প্রচেষ্টা ; সুপ্ত জনশক্তির ক্রমজাগরণ শুরু হয়— জাতীয়তাবাদী চেতনাও ক্রমে দানা বাঁধতে শুরু করে— প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস। তৃতীয় দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করেন লর্ড কার্জন। দেশবাসীর মনে বিদেশী শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্তির আবেগ ও উদ্দীপনা অভিব্যক্তি লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনে অভিযুক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থনে মামলা এবং বিশেষ করে অরবিন্দের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনার সাফল্য চিত্তরঞ্জনের আইন ব্যবসায়ের পথ সুগম করে দেয়। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগও তাঁর এইসময় থেকে আবার শুরু হয়। ইতিপূর্বে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল (১৯০২) থেকে তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি হিসাবে সমিতির সঙ্গে বছর পাঁচেক যুক্ত ছিলেন। পরে তার সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন একজন সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর প্রায় বার বছর তাঁকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অনুপস্থিত দেখা যায়। এই অনুপস্থিতি বিশেষ অর্থবহ ছিল। সমকালীন দুটি প্রধান দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি মনের মিল ছিল না। নরমপন্থীদের আধিপত্যে কংগ্রেসী রাজনীতি ছিল নিয়মতান্ত্রিক সংগীত ও রক্ষণশীল সুরে বাঁধা। স্বদেশী যুগের বয়কট নীতি কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো যায় নি। চরমপন্থী নেতা ও কর্মীদের সংখ্যা ও শক্তি ছিল নগণ্য। পরের বছর সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরমপন্থীদের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচারে চরমপন্থীরা হটে আসেন। সেইসময়ে দেশব্যাপী রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের ফলে সরকারী দমননীতি প্রবল হয়ে ওঠে। চরমপন্থীদের কেউ গেলেন কারাগারে, কেউ নির্বাসনে, আবার কেউ-বা মঠমন্দিরে। চিত্তরঞ্জন 'মডারেট কনভেনসন' বা 'মেটা মজলিশ'-এ যেমন হাজিরা দিতেন না, তেমনি নিরালায় নিশ্চিন্তচিত্তে ধর্ম-চিন্তায় মগ্ন হন নি। দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাবের তখনও বিস্তর দেরি এবং টিলক, লালা লাজপত ও বিপিনচন্দ্র অনুপস্থিত। চিত্তরঞ্জন সাহিত্য-চর্চার ফাঁকে ফাঁকে সমাজসেবায় তৎপর থাকেন, রাজনীতিতে রাখেন সজাগ দৃষ্টি। বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন এবং 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনায় স্বরাজসাধনার পথ অন্বেষণ করেন।

১৯১৭ সাল থেকে চিত্তরঞ্জনের জীবনধারা সহসা নতুন খাতে বইতে শুরু করে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। সমগ্র জীবনেই তাঁর এই ভাবপ্রবণতার

আধিক্য দেখা যায়। অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)-এর উপর সরকারের অন্তরীণ আদেশ জারি হলে তাঁর সংবেদনশীল মনে নাড়া লাগে। তখন থেকেই তিনি রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। তখন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) চলেছিল। ভারতের জাতীয় চেতনাও পরতে পরতে উন্মোচিত হচ্ছিল ; মুক্তি আন্দোলনের মত ও পথ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশঃ নতুনতর রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফিরোজ শাহ মেটা ও গোখলের জীবনাবসান এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সরকারি পরিশাসনে যোগদানের ফলে ঐদলের আধিপত্য হ্রাস পায়। সুরেন্দ্রনাথই তখন মডারেটদের সর্বশেষ ও একমাত্র প্রতিনিধি। কিন্তু তখন তাঁর মন রাজনীতির সাংগঠনিক তৎপরতা অপেক্ষা মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯) প্রতি অধিক নিবিষ্ট। এই অবস্থায় জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব অনেকাংশে চিত্তরঞ্জনের উপর এসে পড়ে।

চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণ আভাষ ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৭) প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণ থেকে সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। সেই ভাষণে তিনি গতানুগতিক রাজনৈতিক সমস্যায় আবদ্ধ না থেকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিশেষতঃ পল্লীসমাজের নবরূপায়ণকল্পে একটি আদর্শ চিত্র উপস্থাপিত করেন। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা প্রসূত বিশ্ব মহাযুদ্ধের পাশব রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি আধুনিক বাণিজ্যশিল্পপ্রবণ বস্তুতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেন। ভারতের নিজ অন্তরে নিহিত ধারায় তার ভাবী সমাজের রূপের সন্ধানে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে তিনি বলেন যে, আবহমানকাল যাবৎ ভারতীয় সমাজ পল্লীকেন্দ্রিক— সেজন্যে এদেশের পুনর্গঠনের প্রয়াস পল্লীভিত্তিক হওয়া উচিত। একথাও তিনি বলেন যে, দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভারত একদিন বিশ্ববাসীকে আলোক প্রদর্শন করেছিল ; সেই ভারতই আবার বিশ্বের দিশাহারা মানুষকে আলোকিত পথে নিয়ে যাবে।

মণ্টেগু কমিশনের কাছে দেশের শাসন সংস্কার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন। তিনি চেয়েছিলেন অর্থ ও পরিশাসনে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তাধিকার। রেলপথ এবং নৌ ও স্থলবাহিনীর ক্ষমতাই কেবল ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন।

অতঃপর তিনি সারা দেশ পরিক্রমা করে নিজ আদর্শের প্রচারে তৎপর হন। দক্ষিণপন্থীদের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তখনও এদেশের রাজনীতিতে

গান্ধীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিশ্বমহাযুদ্ধের সমাপ্তির পরেও ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহীদের দমনের ব্যবস্থাস্বরূপ ভারতরক্ষা আইনকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। সরকার রাজদ্রোহের আনুপূর্বিক গতিপ্রকৃতি নিরূপণের জন্য জাষ্টিস রৌলাটকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরই সুপারিশ অনুযায়ী পরে দুটি বিল বিধিবদ্ধ হয়। একটির সাহায্যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার দেওয়া হয় এবং অপরটির দ্বারা ভারতীয় ফৌজদারি আইনকে আরও কঠোর করে তোলা হয়। ১৯১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে রৌলাট বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তার পিছনে চিত্তরঞ্জন সক্রিয় নেতৃত্বের সঙ্গে অর্থবলও যুগিয়েছিলেন। সেই বছর ডিসেম্বরে মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিল্লী কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে রৌলাট বিল আইনে পরিণত হলে দেশব্যাপী এক গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়। মার্চ মাসে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ নীতি ও আন্দোলন প্রবর্তন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ঐপন্থা ইতিপূর্বে পরীক্ষা করেছিলেন। এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ-বিষয়ে নিযুক্ত কংগ্রেসের এক তদন্ত কমিটিতে সদস্য হিসাবে চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ডিসেম্বরে মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কার বিল বিধিবদ্ধ হয়। সেই মাসেই মতিলাল নেহরুর (১৮৬১-১৯৩১) সভাপতিত্বে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন 'Total Obstruction'-এর পন্থা সুপারিশ করেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভারত সচিবকে (মণ্টেগু) ধন্যবাদ প্রদান-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য অগ্রাহ্য হয়।

রৌলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা ও মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের ত্র্যহস্পর্শে ভারতের প্রগতিবাদী শক্তি আবার নবোদ্যমে দানা বাঁধতে শুরু করে। এই সময় থেকে চিত্তরঞ্জন রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে যোগদান করেন। চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীর যুক্ত নেতৃত্বে দেশের উদীয়মান গণশক্তি সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপিত হয়।

১৯২০ সালে গান্ধী খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। সেপ্টেম্বরে লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে 'সহযোগিতা বর্জন নীতি' গৃহীত হয়। সেই অধিবেশনে গান্ধীর প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়

স্থাপন, সালিসি আদালত প্রতিষ্ঠা ও কাউন্সিল বর্জননীতি চিত্তরঞ্জন পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি ; কিন্তু পরে সেই বছরেই নাগপুর কংগ্রেসে তিনি গান্ধীর কর্মপন্থা বহুলাংশে মেনে নেন। তখন থেকে তিনি তাঁর আইন ব্যবসায়ে বিপুল অর্থাগমের পথ পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের (১৯২০) পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাউন্সিল বয়কটের সঙ্গেই আদালত ও স্কুলকলেজ বর্জন শুরু হয়। সারা ভারতে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুযায়ী 'কাশী বিদ্যাপীঠ', 'গুজরাট বিদ্যাপীঠ', 'মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ', 'আলিগড় মুসলিম বিদ্যাপীঠ' এবং কলকাতায় 'ন্যাশন্যাল কলেজ' স্থাপিত হয়।

১৯২১ সালে সারা দেশ অসহযোগ আন্দোলনে উদ্দাম হয়ে ওঠে। নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও ছ-মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। ঐ বছর আহমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁর সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে সরোজিনী নাইডু চিত্তরঞ্জনের ভাষণ পাঠ করেন। এর কিছুকাল পরে অসহযোগ আন্দোলন বিপথগামী হয়ে পড়ায় এবং বিশেষ করে চৌরীচৌরা হত্যাকাণ্ডের (১৯২২) ফলে গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন ; তাতে তীব্র হতাশার সৃষ্টি হয়। চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রত্যাগতিতে সায় দিতে পারেন নি।

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভানেত্রী বাসন্তী দেবী 'কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। লোকে বুঝতে পারে প্রকারান্তরে সেটা চিত্তরঞ্জনেরই প্রস্তাব। চারিদিকে তার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি দেখা দেয়। চিত্তরঞ্জন তখন কারাগারে। কারামুক্তির পর নিজ আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন (জানুয়ারী ১৯২৩)। সেই বছরেই তিনি গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কাউন্সিল প্রবেশনীতির পশ্চাতে তাঁর মনোভাব তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করেন : 'Reformed Councils are really a mask which the bureaucracy has put on. I conceive it to be our clear duty to tear this mask from off their face'।[২] গয়া কংগ্রেসে সভাপতি চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব গান্ধীর অনুগামীদের বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। গান্ধী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশপন্থার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী। একটি ধ্বংসাত্মক, অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করে বাধা ('obstruction') দিয়ে তাকে বিকল করে দেওয়া ; এবং অপর পন্থাটি ছিল গঠনমূলক অর্থাৎ পল্লী সংগঠনের মাধ্যমে

ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস সাধন। আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন ফিন' আন্দোলনের আদর্শে এই কর্মপন্থা অনুসৃত হয়।

গয়াতে চিত্তরঞ্জনের এই কর্মপন্থাটির রূপায়ণকল্পে কংগ্রেসেরই ভিতরে 'স্বরাজ্য দল' গঠিত হয় (ডিসেম্বর, ১৯২২)। মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ অনেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হন। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরু যথাক্রমে তার সভাপতি ও কর্মসচিব হন। কাউন্সিলে প্রবেশ করার বিষয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল পূর্ব অনুসৃত নীতির পরিবর্তন চাইলেন। রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পূর্ণ অসহযোগ ও বয়কট নীতিতে অটল রইলেন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও নতুন শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসনের (diarchy) প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে নি। কাউন্সিলে প্রাধান্য লাভ করে চিত্তরঞ্জন বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি সাধনকল্পে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি কার্যকর চুক্তিপত্র রচনা করেন। তার বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :

১. 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান নির্বাচন লোকসংখ্যানুপাতে হইবে। কিছুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

২. ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতে ৬০ ও ৪০ অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, অর্থাৎ যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যা বেশী হইলে শতকরা ৬০ জন হিন্দু নির্বাচিত হইবেন।

৩. বাঙ্গালার মুসলমানগণ লোকসংখ্যানুপাতে চাকুরী পাইবেন।

৪. আইনের দ্বারা ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয় বদ্ধ হইবে না। যে-সম্প্রদায়ের ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে, সে-সম্প্রদায়ের শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন লোক অনুমোদন করিলে তবে উহা হইতে পারিবে।

৫. (ক) ধর্মের জন্য যদি গোহত্যার প্রয়োজন হয়, তবে হিন্দুগণ উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না। আর মুসলমানগণও হিন্দুর প্রাণে ব্যথা লাগে এমন ভাবে অথবা এমন স্থানে গোবধ করিবেন না।

(খ) নামাজ পড়িবার সময়ে মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত হইতে পারিবে না।'[৩]

চিত্তরঞ্জনের এই চুক্তিপত্র ঐসময়ে হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ তিনি এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। তিনি

মনে করতেন যে মুসলমান সম্প্রদায় সর্বদিক থেকে হিন্দুদের মতো সমান যোগ্যতা অর্জন করলে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বতঃই চলে যাবে।

কোকনদ কংগ্রেসে (১৯২৩) স্বরাজ্য দলের কর্মসূচী অনুমোদন লাভ করে; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের উপর্যুক্ত চুক্তিপত্র সম্পর্কে প্রচণ্ড বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। বিষয়টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কতদূর উপযোগী তা বিবেচনা ও সকলের অভিমত জানার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়।[৪] চিত্তরঞ্জনের উক্ত কর্মপন্থা শেষাবধি অনুমোদিত হয় নি। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে (১৯২৬) চুক্তিটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে এবং অন্যত্রও স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে সরকারপক্ষের যাবতীয় প্রস্তাব প্রতিরোধনীতিস্বরূপ নাকচ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সংশোধিত মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী নির্বাচনে স্বরাজ্যদল কলকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভার ক্ষমতা দখল করে। চিত্তরঞ্জন কলকাতার প্রথম মেয়র (১৯২৪) নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র হন চীফ একৃজিকিউটিভ অফিসার। তার কয়েক মাস পরে কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের অধিবেশন হয়। এই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার প্রথম বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করে স্বরাজ্য দলের সত্তর জন নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করেন। চিত্তরঞ্জন তখন সিমলায় ছিলেন। তিনি অবিলম্বে ফিরে আসেন। গান্ধী ও মতিলাল নেহরুও কলকাতায় উপনীত হন। স্বরাজ্যদলের শক্তি ও নৈপুণ্য এবং কর্মপন্থার সাফল্যে গান্ধী চমৎকৃত হন। কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের নেতারা কলকাতায় একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে অসহযোগ আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। অতঃপর বোম্বাইতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেলগাঁও কংগ্রেসে (১৯২৪) গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে মতপার্থক্য অপসৃত হয়। অবিশ্রাম কর্মব্যস্ততার ফলে চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল। তা সত্ত্বেও ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ঐবছরেই জুন মাসে দার্জিলিঙে তাঁর জীবনাবসান হয়।

—

দুই : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

পৈতৃক সূত্রে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে মন ভরেনি বলে তিনি বৈষ্ণব ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হন। বৈষ্ণব চিন্তার প্রভাবে তিনি জগৎকে ঈশ্বরের লীলাস্থান বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জীব ও জড়ের মধ্যেই প্রকাশমান এবং ইতিহাস সেই পরমেশ্বরেরই অভিব্যক্তি। স্বভাবতই জগতের সামগ্রিক অস্তিত্ব ঐ সুরে অনুরণিত; জগৎ ও জীবের সর্ববিধ বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা পরিদৃশ্যমান। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন : 'the truth of all truth is that the outer Leela of God reveals itself in history. Individual, Society, Nation, Humanity are the different aspects of that very Leela'।[৫]

বৈষ্ণব চিন্তানুসারে ইতিহাসে পরিব্যাপ্ত ঐশ সত্তাই চিত্তরঞ্জনের মুক্তিতত্ত্বের উৎস; মানুষ নির্বিশেষে সবাই এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বা ঐশ লীলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর স্বরাজচিন্তাও পরোক্ষে এই তত্ত্বের উপর রচিত।

তাঁর দৃষ্টিতে কালাকাশ পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি এবং জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, একটির পরিবর্তে অপরটির উপলব্ধি সম্ভব নয়। তিনি একথাও মনে করতেন যে, যুক্তির ছকে সত্যকে যাচাই করা যায় না। একমাত্র উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সত্যকে জানা যায়। সত্যই ঈশ্বরের স্বরূপ, সেজন্য ঈশ্বরও অনির্বচনীয়। ঈশ্বর যেমন মানুষের মধ্যে প্রকাশমান, তেমনি ব্যক্তি জাতি ও মানবতা পরস্পরের পরিপূরক রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে। গয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন : 'I look upon the attainment of freedom and Swaraj the only way of fulfilling, oneself as individuals, as nations. I look upon all national activities as the real foundation of the service of that greater humanity which again is the revelation of God to man'।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দের প্রভাবে তিনিও ভারতীয় জাতীয়তায় দিব্য প্রভাব উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে জাতীয়তা এমন একটি ক্রমবিকশিত রূপ যাকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন পরমেশ্বর। জাতির স্বার্থে আত্মোৎসর্গ প্রকারান্তরে মানবতারই সেবা এবং মানবসেবাই ঈশ্বরের উপাসনা। মানবতার আদর্শকে চরিতার্থ করতে হলে চাই জাতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। ব্যক্তি ও জাতির কল্যাণেই মানবতার সার্থক সমুন্নতি ঘটে।

তিন : রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়ে চিত্তরঞ্জন সুসংবদ্ধ কোনও তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন নি। বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে সে-সম্পর্কে তাঁর চিন্তার বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের আদর্শে তিনি প্রভাবিত হন। অবরোহী (deductive) প্রণালী ছিল তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তের পদ্ধতি। তাঁর মতে সমাজ ও জীবনের প্রতিটি দিক সম্পৃক্ত, এবং সেই বোধের অভাবকে তিনি পশ্চিমী প্রভাবের কুফল বলে মনে করতেন। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৭) তিনি বলেন: 'To look upon life not as a comprehensive whole but as divided among many compartments was no part of our national culture and civilization...Will anyone tell me that this portion of our national life is the subject of Politics, that other portion is the subject of Economics, while a third portion is the subject of Sociology ? Must we divide life bit by bit like this' ?[৭]

চব্বিশ পরগনা জেলা সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি এই কথারই পুনরুক্তি করেন: 'ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোনটা যে আগে ও কোনটা যে পশ্চাতে তাহা বলা দুরূহ'।[৮]

আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি বিভিন্ন কথার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) সভাপতির ভাষণে স্বাধীনতা (freedom) শব্দটির তিনি অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেন যে প্রথমতঃ, স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে তার কোনও বাধা থাকবে না; তার একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাই, এবং যে-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পশ্চাতে জনসমর্থন থাকে তার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনও বিরোধ নেই। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতার অর্থ একথাও নয় যে তাতে অধীনতা বলে কিছু থাকবে না। সমাজে বসবাস ও নিরাপত্তার সুযোগ গ্রহণ মানেই অধীনতা। যে-অধীনতা মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নেয় তার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনও অসংগতি নেই। উভয় ক্ষেত্রে জনসমর্থনই একমাত্র মাপকাঠি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মর্ম হল: 'as that state, that condition, which makes it possible for a nation to realize its own individuality and to evolve its own destiny'।[৯]

ভারতের ক্ষেত্রে ঐ লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য চাই পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন

পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে আহ্বান জানানোর তিনি বিরোধী ছিলেন,[১০] কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত সুদৃঢ় না হলে অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা যায় না। পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে তিনি সমান চোখে দেখতেন ; কারণ দেশের নিজস্ব ধারায় তার বিকাশ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পথ তিনটি : ১. সশস্ত্র প্রতিরোধ ; ২. আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা ; ৩. অহিংস অসহযোগ পন্থা। নীতিগত-ভাবে তিনি প্রথমটিকে বর্জনীয় মনে করতেন।

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যয়গুলি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিরই ক্রমবিকাশ ঘটে চলে ; ব্যক্তি থেকেই সুসংহত রাষ্ট্রের উৎপত্তি—তার নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত থাকে। সার্বভৌমতা কথাটিকে তিনি আপেক্ষিক বলে মনে করতেন। ব্যক্তির সার্বভৌমতা তার নিজেরই উপর বর্তায় এবং স্বরাজসাধনায় ব্যক্তির নানামুখী শক্তি ও সৃজনসত্তা পরিপুষ্ট হয়। ব্যক্তি হতেই সুসংবদ্ধ প্রতিবেশিকতা গড়ে ওঠে—যার পরিণতি হল সুসংহত রাষ্ট্র—তারপর আসে বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শ। এই সুসংবদ্ধ প্রতিবেশিকতা কেবল এক পাড়ায় দৈহিক অবস্থান থেকেই উদ্ভূত হয় না—তার জন্য চাই প্রতিবেশিসুলভ চেতনা। প্রতিবেশী জীবনচেতনায় সঞ্জাত শক্তির সমন্বয়ে জাতীয়জীবন রূপ লাভ করে—সেখানেই শুরু হয় গণতন্ত্রের কাজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের এই গতি ও প্রকৃতিকে তিনি যূথবদ্ধ চেতনার ('collective will') ফল বলে মনে করতেন। সেই দৃষ্টিতে বর্তমান গণতন্ত্রের প্রকৃতি হল জুড়ে জুড়ে একটা সর্বজনগ্রাহী চেতনার সৃষ্টি করা। তাতে ভিন্ন চেতনার সংঘাত ঘটে—সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় তার নিষ্পত্তি হয়। চিত্তরঞ্জনের নব্যগণতন্ত্রের আদর্শ হল এভাবে জোড়াতালি না দিয়ে, প্রতিবেশিক সম্পর্কের মধ্যে একটা মৌল সুরের সন্ধান করা, যেটা পরিণামে যৌথ চেতনাকে সার্থক ও সফল করে তুলবে। এ প্রক্রিয়া গণিতের যোগবিয়োগ নয়—এ-প্রক্রিয়ায় নবজাগ্রত প্রতিবেশিক চেতনার সত্তা ও সম্ভাবনা বিকশিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। একই প্রণালীতে জাতীয় চেতনা সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। এইভাবে বিশ্বরাষ্ট্র রূপায়িত হয়। এই দার্শনিক বিশ্লেষণের মর্ম হল—'ব্যক্তির শক্তি ও সত্তার মুক্তি সাধন'।

গয়া কংগ্রেসের ভাষণেই চিত্তরঞ্জন ইউরোপীয় উদারতন্ত্রের অবক্ষয় ও পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের অসারতার কথা উল্লেখ করেন। গণতন্ত্রের আদর্শ রূপ

সম্পর্কে বলেন : 'The foundation of real democracy must be laid in small centres—not gradual decentralisation which implies a previous centralisation—but a gradual integration of the practically autonomous small centres into one living harmonious whole. What is wanted is a human state, not a mechanical contrivance'।[১১]

চিত্তরঞ্জনের বিশ্বজনীন চিন্তা নিছক আদর্শপ্রবণ কবিকল্পনা ছিল না। অবশ্য তাঁর আগে অনেকেই বিশ্বসঙ্ঘ বা পার্লামেণ্ট অব নেশনস ইত্যাদির কথা ভেবেছেন। বস্তুতঃ পূর্বসূরীদের প্রভাবেই সারা দুনিয়ার মানুষকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা তাঁর দেখা দেয়। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন : 'if at some dim and distant day, the Federation of Humanity is established in this world, that will be because the different nations of the earth will each have reached the full development of its distinctive peculiarities; and it is my firm and deliberate belief that when things have reached that state, kings and kingdoms will be no more necessary for the good of the world than nations and nationalities'।[১২]

১৯১৭ সালে বরিশালে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি তাঁর Federation of Humanity চিন্তাকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত ঐ-চিন্তার রূপরেখা হল : ১. প্রাদেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা; ২. একটি নেশন হিসাবে ভারতীয়দের স্বীকৃতি অর্জন; ৩. (ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় ফেডার্যাল সরকার গঠন—যেখানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন; ৪. সকল নেশনকে নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন।

বিশ্ব ফেডারেশনের পূর্ব পর্যায়ে একটি এশিয়াটিক ফেডারেশন স্থাপনের চিন্তা তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। গয়া কংগ্রেসেই তিনি সেই ভাবনাটিকে ব্যক্ত করেন। কিছুকাল যাবৎ 'প্যান ইসলাম' আদর্শে মুসলমান রাষ্ট্রগুলির যে জোটবদ্ধতার চেষ্টা চলেছিল তাই থেকেই তাঁর মনে সেই চিন্তা আসে। 'প্যান ইসলামে'র জিগির ছিল সংকীর্ণ। তিনি তাকে বৃহত্তর আদর্শের ব্যঞ্জনায় এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের একটি সংগঠন রূপে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। জানা যায় যে চিত্তরঞ্জন তাঁর এক বন্ধুর মারফৎ রবীন্দ্রনাথকে ভারতে একটি এশিয়া সম্মেলন আহ্বানের

অনুরোধ জানান।[১৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ ধরণের প্যান-এশিয়াটিক মিলনের বিরোধী ছিলেন।

সর্বেশ্বরবাদী চিত্তরঞ্জন অধিকার (Rights) সম্পর্কিত প্রত্যয়ে গ্রীনের মতো ভাববাদী মত পোষণ করতেন। অধ্যাত্মমুখী মন তাঁর ভক্তিরসে আপ্লুত ছিল। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরই মানুষকে অধিকার দিয়েছেন— অধিকারের স্রষ্টা মানুষ নয়। ঈশ্বরদত্ত অধিকারগুলি নিয়েই সমাজসংস্থা (institution) সমূহ কাজ করে। আইনানুগ বিধিব্যবস্থা 'simply recognize rights which exist' বলে তিনি মনে করতেন।

চিত্তরঞ্জনের জীবনীকার পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁকে সোসালিষ্ট হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং মানবকল্যাণ চিন্তা ও তত্ত্বগত দিক থেকে চিত্তরঞ্জন মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে জীবনীকার অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৪] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আহমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রাক্কালে কম্যুনিষ্ট ইনটার-ন্যাশন্যালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য মানবেন্দ্রনাথ রায় মস্কোয় অবস্থান করছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে দেখেন যে দেশবন্ধু ও গান্ধী একমত নন। দেশবন্ধুর সংগ্রামী চেতনা ও তৎপরতাকে সঠিক পথনির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ আহমেদাবাদ কংগ্রেসে একটি কার্যসূচী প্রেরণ করেন। লেনিন ও স্টালিন কার্য-সূচীটি সংশোধন করে দেন। মানবেন্দ্রনাথের দৌত্যকর্মে মস্কো থেকে নলিনী গুপ্তকে ভারতে পাঠানো হয়। হজরত মোহানি সেই কর্মসূচী অনুযায়ী আহমেদাবাদ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করেন। গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালেও মানবেন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর নিকট এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটি সরকার হস্তগত করেন। রয়টার সেই সময়ে ঐ পত্রটিকে কেন্দ্র করে মানবেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর গোপন ষড়যন্ত্র হিসাবে সারা বিশ্বে তা ফলাও করে প্রচার করে।[১৫]

মার্কসবাসী কার্যপ্রণালীতে চিত্তরঞ্জনের সমর্থন ছিল না। তিনি রুশ বিপ্লবের চরমপন্থী হিংসাত্মক কার্যকলাপে সায় দিতে পারেন নি। তিনি অনুভব করেন যে তলস্তয়, পুস্কিন, ক্রপটকিন জীবিত থাকলে হয়তো বৈপ্লবিক শক্তির দাপটে দেশে মার্কসবাদকে চাপিয়ে দেবার তাঁরা বিরোধিতা করতেন। চিত্তরঞ্জনের কথায় :

> 'The recent revolution in Russia is very interesting study. The shape which it has now assumed is due to the attempt to force Marxian doctrines and dogmas on the unwilling

genius of Russia. Violence will again fail. If I have read the situation accurately I expect a counter-revolution. The soul of Russia must struggle to free herself from the Socialism of Karl Marx.'[১৬]

জাতীয়তাবাদকে চিত্তরঞ্জন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতেন। জাতীয়তা মানবাত্মারই এক ক্রমবিবর্তিত রূপ, যাকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ মানবতার মঙ্গলবিধানে পরিণতি লাভ করে এবং মানুষের সেবাই হল ঈশ্বরোপাসনা। তাঁর আবেগময় অন্তরে সদাই যেন 'আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপরিপূর্তির' সুর ধ্বনিত হত। তাই তিনি জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে চাইতেন মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ। গয়া কংগ্রেস ভাষণে তিনি জাতীয় আন্দোলনের এক দার্শনিক চিত্রপট তুলে ধরেন :

'From the national point of view the method of Non-co-operation means the attempt of the nation to concentrate upon its own energy and to stand on its own strength. From the ethical point of view, Non-co-operation means the method of self purification, the withdrawal from that which is injurious to the development of the nation, and therefore to the good of humanity. From the spiritual point of view, Swaraj means that isolation which in the language of sadhana is called 'pratyahara'—an isolation and withdrawal which is necessary in order to bring out from our hidden depths the soul of the nation in all her glory'.[১৭]

জাতীয়তাবাদের এই বৈদান্তিক ব্যাখ্যায় পূর্বসূরী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক গান্ধীরও দৃষ্টি তখন এত গভীর ও অন্তর্মুখী ছিল না। দেশবন্ধুর জাতীয়তা চিন্তায় আক্রামক মনোভাব ও আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আহমেদাবাদ ভাষণে তিনি বলেন যে, কাননে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো প্রতিটি নেশন নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী অভীষ্ট লক্ষ্যপথ রচনা করে—পরিণামে যাতে সবাই একটি পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন ও সংস্কৃতির পরিপূরক হয়; মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিটি নেশনের যে-বৈশিষ্ট্য বিরাজ করবে তা হল তার শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন বিকাশ। তাঁর মতে :

'The essence of the doctrine of nationalism...is not an aggressive assertion of its individuality, distinct and separate

from the other nations, but it is a yearning for self fulfilment, self determination and self realization as a part of the scheme of universal humanity.'[১৮]

ইউরোপের বেনিয়া মনোভাবাপন্ন জঙ্গি জাতীয়তাবাদকে তিনি সভ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তিনি যে-জাতীয়তাবাদের কল্পনা করেন তা বিশ্ব-শান্তির সহায়ক; তার মূলসূত্র হল প্রতিটি নেশনের স্বীয় বিকাশ, আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। ভারতের সমকালীন রাষ্ট্রনায়কদের মতো চিত্তরঞ্জনও মাৎসিনির জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রভাবিত হন।

স্বরাজ ও স্বাধীনতা

১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নৌরজি 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর শব্দটি দেশবাসীর কাছে অতি পরিচিত ও প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। বিপিনচন্দ্র, টিলক, গান্ধী প্রমুখ অনেক নেতাই শব্দটির ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন— সেকথা আগেই এ-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। স্বরাজ বলতে সাধারণতঃ Self Government বলে মনে করা হত এবং স্বাধীনতা অর্থে বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি বলে মনে করা হত। চিত্তরঞ্জন শব্দটির একটি ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য দর্শিয়েছেন। গয়া ভাষণে তিনি বলেন :

'Swaraj is indefinable, and is not to be confused with any particular system of government. There is all the difference in the world between Swarajya and Samrajya. Swaraj is the natural expression of the national mind. The full outward expression of that mind covers and must necessarily cover, the whole life history of a nation...The question of nationalism, therefore, looked at from another point of view, is the same question as that of Swaraj.'[১৯]

ঐ-ভাষণেই তিনি স্বরাজসম্মত আদর্শ সরকারের একটি চিত্র তুলে ধরেন। জনসাধারণের অবগতি ও সমর্থনের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রকাঠামোর চিত্র দর্শানোর প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। অনুরূপ চিন্তা ও প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে একমাত্র মানবেন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখা যায়; তিনিও স্বাধীন ভারতের একটি খসড়া সংবিধান (১৯৪৪) প্রচার করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বনিম্নে ভারতের গ্রামীণ সংগঠনের মতো স্থানীয় সংস্থার কথা বলা হয়, যেগুলির সমন্বয়ে পিরামিডাকারে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হবে; ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত

থাকবে না। প্রচলিত পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের সঙ্গেও তার বিস্তর পার্থক্য ছিল। তিনি বলেন :

'No system of Government which is not for the people and by the people can ever be regarded as the true foundation of Swaraj. I am firmly convinced that a parliamentary government is not a government by the people and for the people. Many of us believe that the middle class must win Swaraj for the masses. I do not believe in the possibility of any class movement being ever converted into a movement for Swaraj...How will it profit India, if in place of the white bureaucracy that now rules over her, there is substituted an Indian bureaucracy of the middle classes ?'[২০]

চিত্তরঞ্জন এ-কথাই মনে করেছিলেন যে শ্রেণী-বিশেষের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন পরিণামে সেই শ্রেণীরই কুক্ষিগত হয়ে দাঁড়ায়। বুর্জোয়া সরকার এইভাবেই যে গড়ে ওঠে সেকথা তিনি অদ্ব্যর্থ ভাষায় প্রকাশ করেন।

পরাধীনতার অবসানেই যে স্বরাজ আসবে তা তিনি মনে করতেন না। তিনি স্বরাজের সংজ্ঞায় নতুন তাৎপর্য দান করেন। গয়া কংগ্রেসের পর স্বরাজ্য দলের কলকাতায় অনুষ্ঠিত (আগষ্ট, ১৯২৪) প্রথম সাধারণ সভায় তিনি সেই অভিমতই ব্যক্ত করেন এবং ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫) তিনি তাঁর মনোভাবকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন :

'কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজ লাভ হইবে না। স্বরাজের আদর্শ আরও মহত্তর। ইংরাজ চলিয়া গেলে অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। পক্ষান্তরে ইংরাজ থাকিয়াও যদি জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশলাভে কোন বাধা না জন্মে, তবে ইংরাজ থাকুক, তাহাতে আপত্তি কি ? স্বরাজ আর স্বায়ত্তশাসন এক নহে। আমার স্বরাজের আদর্শের সহিত শাসন প্রণালী— তাহা ঘরেরই হউক অথবা পরেরই হউক— কোন রূপেই সংশ্লিষ্ট নয়। তবে যে স্বায়ত্তশাসন আত্মকল্যাণের জন্য বিধিবিধান, তাহা কতকটা স্বরাজের আদর্শের নিকটবর্তী। জাতীয় সর্বাঙ্গীন বিকাশলাভের অবাধ প্রয়াসই খাঁটি স্বরাজসাধনা।'[২১]

চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুর ভাষণকে লোকে ভুল বুঝেছিল। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর

Future of Indian Politics (1926) গ্রন্থে তার তীব্র সমালোচনা করেন।[২২] বস্তুতঃ চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন দেশবাসীর আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্ম-পরিপূর্তি। যদি এই লক্ষ্যবিষয়গুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই অর্জন করা যায় তাহলে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করবে; কিন্তু যদি ইংরেজ ভারতের বিনাশ সাধনে তৎপর থাকে তাহলে ভারত সাম্রাজ্যের বাইরে থাকবে। এ-ধরণের প্রস্তাব বহুপূর্বে বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন আমলাতন্ত্রের হৃদয়ের পরিবর্তন ও শাসনরীতির সংশোধন কামনা করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ণ স্বরাজদানে সম্মত হতে অনুরোধ জানান। কিন্তু ইংরেজ তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি দেশবাসীকে দ্বিগুণ উদ্দীপনায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানান। তিনি 'ট্যাক্স বন্ধ কর' আন্দোলনের কথাও চিন্তা করেন। মোটের উপর ফরিদপুর সম্মেলনে তিনি সরকারের সঙ্গে যে-সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন তাতে দেশের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন আদৌ উপেক্ষিত হয় নি।

স্বাধীনতা অর্জনকল্পে হিংসাত্মক বৈপ্লবিক পদ্ধতি বা সন্ত্রাসবাদী পথকে তিনি অনুমোদন করেন নি। ১৯২৪ সালে দেশে যখন হিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তিনি তার নিষ্কুণ্ঠ নিন্দা করেন। তবে বিবেক ও বাস্তববোধ থাকায় তিনি আদর্শনিষ্ঠ উদ্দাম তারুণ্যের হিংসাত্মক কার্যকলাপের পিছনে দেশপ্রেম ও হৃদয়াবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি। স্বরাজ্য দল অনুসৃত রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করে সংবাদপত্রে (মার্চ, ১৯২৫) বিবৃতি দিয়ে রাজনৈতিক হত্যা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। সেইসঙ্গে সরকারকেও তিনি হুঁশিয়ার করে দেন এই বলে যে সরকারের চণ্ডনীতির ফলেই সন্ত্রাসবাদ বিস্তার লাভ করছে।

চার : আর্থনীতিক চিন্তা

চিত্তরঞ্জনের চিন্তা শুধু যে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই আবদ্ধ ছিল তা নয়। অর্থনৈতিক বিষয়েও তিনি সমধিক সজাগ ছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে সমাজতন্ত্রী আখ্যা দেয়; অন্যদিকে সমাজতন্ত্রীরা তাঁকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তা বলে মনে করত।

তাঁর স্বরাজ সাধনার মধ্যে শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শও নিহিত। মার্কসবাদী সোসালিজমের প্রয়োগ-পদ্ধতি তাঁর ঐ মতবাদের প্রতি আস্থা ভঞ্জন করে দেয়। প্রায় সকল বক্তৃতাতেই তিনি দেশের আর্থিক দুর্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক ইউরোপীয় অর্থনীতির 'Industrialism'-এর তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।[২৩] ভারতের নিজস্ব মৌলিক ধারায় দেশের গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর জীবনের পুনর্গঠনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

তিনি যে বিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন তার প্রাথমিক ভিত্তি সুসংগঠিত পল্লীসমাজ; গ্রামীণ অধিবাসীদের শিক্ষা ও চেতনার সঙ্গে তিনি চাইতেন আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পঞ্চায়েতী পরিশাসন ও সমবায়ী প্রণালীতে পল্লীসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। কৃষির উন্নয়ন ও কুটিরশিল্পের বিস্তারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি ভারতের প্রাচীন ধাঁচে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন—সেজন্যে চাইতেন কিছুটা বিলাসিতা বর্জন ও আত্মসংযমের প্রয়াস। বিদেশী বস্তু যথাসাধ্য ব্যবহার না করাই ছিল তাঁর অভিমত—সেজন্যে তিনি নিজে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে তৎপর হয়েছিলেন। শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্রকাঠামোকে তিনি সমর্থন করতেন না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি 'Co-operation and Integration'-এর ভিত্তিতে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন।

পশ্চিমী ধারায় দেশের শিল্পোন্নয়ন পছন্দ না করলেও স্বদেশী ব্যবসায়ে তিনি আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে একেবারে বর্জন করেন নি। লাভজনক ব্যবসায়ে সুলভ মূলধন বিনিয়োগে তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন। দেশের কৃষক অভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দান করেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (১৯২৩) অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি কারখানা শ্রমিকদের জন্যে আইনানুগ বিধিব্যবস্থা ও তাদের ইউনিয়ন গঠন প্রচেষ্টার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই অধিবেশনেই তিনি বলেছিলেন যে স্বরাজের সুফল যদি মধ্যবিত্তরা একচেটিয়া করে নেয় তাহলে তিনি চাষীমজুরের স্বার্থেই লড়বেন। গয়া ভাষণেও তিনি চাষীমজুরের সংগঠন প্রস্তুতির বিষয়কে যথোচিত গুরুত্ব দান করেছিলেন।

পাঁচ : উপসংহার

মৌলানা আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু না হলে এদেশের রূপ হয়তো অন্যরকম হত ; হয়তো দেশবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিত না।[২৪] বাস্তবিকই চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির উগ্র বাম ও অতি দক্ষিণ কোনও দলেই না ভিড়ে চিত্তরঞ্জন স্বতন্ত্র এক তৃতীয় পথ রচনা করেছিলেন। রাজনীতির মধ্যে তিনি অলৌকিকত্ব ও সাম্প্রদায়িকতাকে যেমন টেনে আনেন নি, অন্যদিকে তেমনি নির্বিবেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে সায় দেন নি, রক্তঝরা বিপ্লবের পথও অনুসরণ করেন নি। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচারণকেও জাতিবিদ্বেষে পরিণত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। অন্ধবিশ্বাসে কোনও কিছুকে যেমন তিনি আঁকড়ে থাকতেন না, তেমনি স্বভাবসুলভ ভাবাবেগের বশে তিনি বিনা বিচারে কোনও কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতেন না। রাজনীতির অলিগলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন ; কার্যকারিতার তাড়নায় কর্মপন্থা রচনা করলেও নীতিবোধকে তিনি কোনও দিন বিসর্জন দেন নি। বৈষ্ণবচিন্তার প্রভাবে তিনি মূলতঃ মানব-প্রেমিক ছিলেন ; মানুষের কল্যাণচিন্তায় তিনি তাই নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের অনুবর্তী ছিলেন। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে অসহযোগ আন্দোলন, কাউন্সিল-বয়কটনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গান্ধীর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে ; কিন্তু পরিশেষে তিনি গান্ধীর আদর্শ ও কর্মপন্থা বহুলাংশে মেনে নেন।

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক সত্তায় দুটি ধারার সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। একটি হল নিপুণ আইনজ্ঞ এক আধুনিক রাজনীতিকের এবং অন্যটি হল একনিষ্ঠ স্বরাজ-সাধক এক রোমান্টিক অধিনায়কের। তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণ মনের পশ্চাতে সদাই যেন 'আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপরিপূর্তির' সুর অনুরণিত হত। স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ভিন্ন হলেও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল। স্বরাজকে তিনি কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই দেখেন নি। মননশীল ও আত্মিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে তিনি স্বরাজের চিত্র কল্পনা করেন।

গয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির অভিভাষণ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। সেই ভাষণে তিনি এক অভিনব রাষ্ট্রদর্শনের ইঙ্গিত করেন,

যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তার বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায়। বৈষ্ণব চিন্তার প্রভাবে তিনি জগৎকে ঈশ্বরের লীলাস্থান মনে করতেন; ঐ প্রভাবকে হেগেলীয় প্রত্যয়ে এই বলে প্রসারিত করেন যে ইতিহাস ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সত্তায় ইতিহাস তাঁর কাছে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ইতিহাসচিন্তায় তিনি মাৎসিনির আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদী-দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটান; মাৎসিনির দৃষ্টিতে মানবতার আদর্শকে চরিতার্থ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতির পূর্ণ বিকাশ, নাগরিক চেতনার পুনরুজ্জীবনকল্পে প্রয়োজন সুস্থ প্রতিবেশিসুলভ মনোভাবের উন্নয়ন। রাষ্ট্রপরিচালনায় নাগরিকদের অংশ গ্রহণের প্রাথমিক ক্ষেত্র হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও তার পরিবেশ। মানবগোষ্ঠীর সম্যক মঙ্গল বিধান জাতির মৌল উপাদান ব্যষ্টির উপর বর্তায়। সমকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থেকেই তিনি তাঁর ক্রমবিন্যস্ত বিশ্ব-মহাজাতি সংঘের পরিকল্পনা রচনা করেন। একটি সুস্পষ্ট ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি 'এশিয়াটিক ফেডারেশন' এবং 'ফেডারেশন অব হিউম্যানিটিজ'-এর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন; সে-ভাবনা সেদিন নিঃসন্দেহে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।

ভারতের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনকল্পে গণতান্ত্রিক তৃণমূলস্বরূপ দেশব্যাপী গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার প্রস্তাব তাঁর অনুরূপ দূরদৃষ্টি ও চিন্তার গভীরতা প্রমাণ করে। কেন্দ্রাভিগ রাষ্ট্রকাঠামো তাঁর মতে যান্ত্রিক নিষ্প্রাণতায় পরিণত হয়। ভিত থেকে অট্টালিকা নির্মাণের মতো বিকেন্দ্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থাও অনুরূপ পদ্ধতিতে গঠিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। দেশময় ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট প্রশাসনিক অধিকারগুলির সমন্বয়ে একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠবে— এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন প্রস্তাবটিকে সবিস্তারে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাতে গ্রাম ও জেলাভিত্তিক প্রতিনিধি সভার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; সেটাই ছিল তাঁর কাছে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁর অভিমত। সম্প্রতিকালে দেশে যে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টা চলেছে তার ভাবনা চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক গয়া ভাষণে পাওয়া যায়। তার আগে অবশ্য বিপিনচন্দ্র পালই এবিষয়ে চিন্তার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের চিন্তাভাবনা শুধু যে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই আবদ্ধ ছিল তা নয়। অর্থনৈতিক বিষয়েও তিনি সমধিক সজাগ ছিলেন। গয়া কংগ্রেসেই

তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে স্বরাজ সর্বজনের, মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয়। দেশের সর্বাত্মক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তাও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। অবহেলিত অনুন্নত মানুষের নিজ অধিকার অর্জনের জন্য তিনি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সেজন্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অহিংস নীতিকে বর্জন করেন নি।

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি ছিল তাঁর অহোরাত্রের চিন্তা। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। ঐক্য ও সহযোগিতার তাগিদে রচিত তাঁর কর্মপন্থা 'Das Formula' নামে পরিচিত। ঐ কর্মপন্থার জন্য তাঁকে যথেষ্ট অপ্রিয়ভাজন হতে হয়।

বাঙালীর নিঃস্ব মনন ও দৈন্যজীবনদশার জন্য তিনি পশ্চিমী নকলনবিশিকে অভিযুক্ত করেন। তিনি চাইতেন ভারতের প্রাচীন আদর্শের নবরূপায়ণ এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নিঃস্বার্থ হৃদয় চিত্তরঞ্জনের চিত্ত ছিল অদম্য। প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের দূরদৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তাশক্তি তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করে। তাঁর বিভিন্ন রচনা ও ভাষণে দেশবিদেশের রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ থেকে চিত্তরঞ্জনের যুক্তিনিষ্ঠ রাষ্ট্রচিন্তার এবং তীক্ষ্ণ মনন-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নির্দেশিকা

১. সুকুমাররঞ্জন দাশ। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৬, ৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. H. N. Mitra, ed. *The Indian Annual Register*. 1923, p. 835.

৩. সুকুমাররঞ্জন দাশ। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৬, পৃ ২০২-২০৩।

৪. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle : 1920-42*. 1964, p. 92.

৫. H. N. Mitra, ed. *The Indian Annual Register*. 1923, p. 833.

৬. *Ibid*. p. 839.

৭. *Deshbandhu Chittaranjan* : Brief Survey of Life and Work,

Provincial Speeches, Congress Speeches. Published by Rajen Sen and B. K. Sen, Vol. 1, 1926, p. 3.

৮. সুধাকৃষ্ণ বাগচী। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৩, ১০১-১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯. H. N. Mitra, ed. *The Indian Annual Register*. 1921, p. 27. (Appendix)

১০. *Ibid.* p. 28.

১১. *Ibid.* 1923, p. 831.

১২. *Deshbandhu Chittaranjan*...Published by Sen and Sen, Vol. 1, 1926, p. 23.

১৩. Prithwis Chandra Ray. *Life and Times of C. R. Das*. London, O. U. P., 1927, p. 230.

১৪. *Ibid.*

১৫. M. N. Roy. *Memoirs*. 1964, p. 545.

১৬. H. N. Mitra, ed. *The Indian Annual Register*. 1923, p. 825.

১৭. *Ibid.* p. 823.

১৮. *Ibid.* 1922, p. 39. (Appendix)

১৯. *Ibid.* 1923, p 823.

২০. *Ibid.* p. 830.

২১. সুকুমাররঞ্জন দাশ। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৬, পৃ ২৩০-২৩১।

২২. M. N. Roy. *The Future of Indian Politics*. London, 1926, p. 72.

২৩. *Deshbandhu Chittaranjan*...Published by Sen and Sen, Vol. 1, 1926, pp. 1-83. (ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৭) প্রদত্ত ভাষণ)

২৪. Maulana Abul Kalam Azad. *India Wins Freedom*. 1959, p. 21.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬১-১৯৪১

এক : ভূমিকা

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণ ধর্ম ও রাজনীতির দ্বিমুখী ধারায় দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে অভিহিত দুটি উপধারার কথা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে শতাব্দীর শেষদিকে তিনটি উপধারা দেখা দেয় : বৈদিক, পৌরাণিক ও ঔপনিষদ। বৈদিক স্বর্ণময় যুগের পুনরাবর্তনে উৎসাহিত হয়েছিলেন আর্যসমাজ-আন্দোলনের প্রবর্তক দয়ানন্দ সরস্বতী। পৌরাণিক আদর্শের অনুরাগী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দ। শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে-ঔপনিষদ বা বৈদান্তিক ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল রামমোহনের প্রচেষ্টায়— সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। চিন্তা ও সাধনায় বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে পৌরাণিক ধারায় আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় ভাবাদর্শেই অধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তা-নায়কদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল ইউরোপের রেনেসাঁস। বিবেকানন্দ বিপরীত চিন্তা পোষণ করতেন। তাঁর মতে ভারতই বিশ্বকে প্রেরণার সন্ধান দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথও কতকটা সেই মতে বিশ্বাসী ছিলেন ; অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও মনে করতেন যে পশ্চিমের কাছে ভারতের যেমন এক 'মিশন' আছে ভারতেও পশ্চিমের অনুরূপ 'মিশন' আছে।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই প্রায় একই 'মিশনে' বিদেশ পর্যটনে যান। পশ্চিমী সমাজ রামমোহনের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা প্রত্যক্ষ করেছিল ; কিন্তু তাঁর স্বাদেশিক চিন্তার কোনও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে নি। ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের ভারতীয় আদর্শ অপেক্ষা পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবই অধিক লক্ষিত হয়। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম নিজ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রাধান্য দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তবে পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের সেই বিজয় অভিযান সেখানকার জনচিত্তে যতটা না প্রতিফলিত হয় তার চেয়ে বহুলাংশে

অধিক কার্যকর হয় ভারতীয় জনমানসের সুপ্তিভঙ্গে ; দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির উন্মেষসাধনে তিনি সফল হন। কিন্তু ভারতীয় ও পশ্চিমী চিন্তার মিলনসাধনে তাঁর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। হিন্দুধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই পশ্চিমের কিছুসংখ্যক মানুষকেই কেবল তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ কোনও ধর্মমতের বাহক হিসাবে অন্য দেশের মানুষের মনে সংঘাত সৃষ্টি করেন নি। তাঁর আবেদন ছিল মানুষের হৃদয়ে—দেশ, কাল, ধর্মের ঊর্ধ্বে সহজাত শাশ্বত মূল্যবোধে। ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য তথা বিশ্বমানসের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মিলনসাধনের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব-হৃদয়ে স্থায়ী আসন দান করেছে।

সাধারণতঃ দুটি দিক থেকে স্বাদেশিকতা দানা বেঁধে ওঠে। একটি স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত আদর্শে প্রেরণার সন্ধান করে এবং স্বভাবতই এই পশ্চাৎ-মুখী দৃষ্টি কিছুটা রক্ষণশীল ও প্রথানুসারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে মানুষ সামনের দিকে তাকায় ; মন তখন আর ইতিহাস-ভূগোলের সীমানা মানে না ; একই সঙ্গে স্বদেশ ও বিদেশের ভাবাদর্শ সমন্বিত হয়। প্রথানুসারিতার বিপরীত এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রগতির পরিচায়ক। বস্তুতঃ দুটি দৃষ্টির সমন্বয়ে সুস্থ সমাজ ও জীবনবোধ গড়ে ওঠে। অতীতের গ্রহণযোগ্য চিন্তা ও বর্তমান জীবনাদর্শ, দেশ ও বিদেশের যা-কিছু যুক্তিবহ তার সংমিশ্রণে সঠিক জীবনবোধ দেখা দেয়। মানসিক বিবর্তনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রমানসে প্রথমোক্ত চিন্তারই প্রাধান্য ছিল। পরের দিকে দ্বিতীয় মনোভাবের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত জীবনবোধ প্রবল হয়।

আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং স্বাদেশিক চিন্তায় প্রত্যক্ষভাবে পিতার ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁর মন গড়ে ওঠে। কৈশোরে অগ্রজদের সঙ্গে হিন্দু-মেলায় যেতেন। চোদ্দ বছর বয়সের লেখা কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' হিন্দু-মেলায় পঠিত হয় (১৮৭৫)। আধা রাজনৈতিক উপলক্ষে প্রকাশিত এই কবিতাটি স্বনামে ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম রচনা।[১] তখনও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ও রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে গঠিত সঞ্জীবনী-সভার রুদ্ধদ্বার গুপ্ত অধিবেশনগুলি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে উত্তেজনার সঞ্চার করত। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত কবির বিভিন্ন রচনা সমসাময়িক বিদ্বৎ সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমে তিনি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। সে-সময়ে দেশে যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলেছিল তাতে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না।

তৎপরিবর্তে তিনি তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে বৃত হন। এ-বিষয়ে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে (১২৯১ বঙ্গাব্দ) তিনি ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের ধারাকে নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলেন। সে-সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দু বর্ণাশ্রম আদর্শের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তাই দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ আন্দোলনেও 'মহৎ আশার কারণ' প্রত্যক্ষ করেন। প্রাচীন বৈদিক ভারতের আদর্শেই তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। হিন্দু রক্ষণশীলতার উগ্র সমর্থক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। 'নববর্ষ' 'হিন্দুত্ব' 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর তখনকার রক্ষণশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ দুবার বিলাতভ্রমণ (১৭৭৮ ও ১৮৯০) করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের তখনকার জীবনসমস্যা ও সাধনা তাঁর মনকে স্পর্শ করে নি। সেখানকার ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা কবিমনের হৃদয়াবেগ, গভীর অনুভূতি ও কাব্যসাধনার অনুকূল নয় বলেই তাঁর মনে হয়েছিল।

১৮৮৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি স্বরচিত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়ে শোনান। ১৮৯৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে তিনি 'বন্দেমাতরম্' গানটি স্বয়ং-যোজিত সুরে গেয়ে শোনান। তখন থেকে তাঁরই দেওয়া সুরে গানটি গাওয়া হয়ে আসছে।[২] সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে ভারত সরকার সিডিশন বিল বিধিবদ্ধ করেছিলেন (১৮৯৮)। সেইসময়ে টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ-সভায় কবি 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের নাটোর অধিবেশনে (১৮৯৭) সভাপতিত্ব করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতির ভাষণ বাংলায় দেবার জন্য কবি সে-সময়ে প্রথম দাবি তোলেন। সেই বছরে রাজদ্রোহের দায়ে টিলক কারারুদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ টিলকের মামলা পরিচালনার জন্য একটি অর্থভাণ্ডার খোলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করে। ভারতেও অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে মানুষের অশেষ দুর্গতি দেখা দেয়। শাসকদের ঔদাসীন্য ও উৎপীড়নে দেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের মনেও

তখন চলেছিল দুটি ভিন্ন ধারার দ্বন্দ্বসংঘাত : একদিকে কোলাহলমুক্ত পরিবে
সাহিত্যসাধনার আবেগ, অপরদিকে নতুন সমাজবোধ ও স্বদেশের কল্যাণ বাসন
রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' (১৯০১) আর 'সাধনা' পত্রিব
(১৮৯১-৯৫) 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' 'রাজকুটুম্ব' 'ঘুষাঘুষি' 'ধর্মবোধের দৃষ্টা
প্রভৃতি প্রবন্ধে কবির যুগচেতনা ফুটে ওঠে।

ফরাসি রাষ্ট্রবিদ্ ও ঐতিহাসিক ফ্রাঁসোয়া গিজো (১৭৮৭-১৮৭৪) লিখি
পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি 'প্রাচ্য
পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে এক প্রবন্ধে উভয় সভ্যতার মৌল পার্থক্য তুলে ধরে
'নেশন কী' এই প্রবন্ধে তিনি ফরাসি ঐতিহাসিক এর্নেস্ত রেনাঁ (১৮২৩-৯২)
নেশন-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন সাম্রাজ্যবাদ নেশনবাদেরই পরিণাম এ
রাষ্ট্রধর্মে মানবধর্মের স্থান নগণ্য।

'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ রবীন্দ্রমানসের ধারা পরিবর্তনে
সূচনা করে। তার আগে 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪) কবিতাটি যেন তা
পূর্বঘোষণা। বিশ শতকের প্রাক্কালেই কবি জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বি
ব্যাপী তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে ইউরোপীয় উদারতন্ত্রে আ
হারিয়ে ফেলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে বিশ্বজনীন চেতনা ঘন হতে
করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' 'রাজনীতির দ্বিধা' 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃ
নানা রচনায় তাঁর এই নব্যচেতনা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

কার্জনের ইউনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবকে (১৯০৩) উপলক্ষ ক
বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন সৃষ্ট হয়। সেই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথে
ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবির দেশাত্মবোধক বিখ্যাত গানগুলি
অধিকাংশই সেইসময়ে রচিত হয়। 'ইম্পিরিয়ালিজম' প্রবন্ধে কবি সাম্রাজ্যবাদে
স্বরূপ উদঘাটিত করেন।

১৯০৪ সালে কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' একটি স্মরণীয় ঘটনা। উৎসবে
প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। মোগল আধিপত্য থেকে দেশ
স্বাধীন করার যে ব্রত শিবাজী গ্রহণ করেছিলেন সেই আদর্শেরই পুনরুজ্জী
ছিল উৎসবের লক্ষ্য। সেই উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় কবি
'শিবাজী উৎসব' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উৎসবে তাঁর সংযোগ ও সমর্থন
আংশিক ; কারণ শক্তিপূজা ও রাষ্ট্রীয় সাধনায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবে
ঘটানোর তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহযোগিতায় 'রাখীবন্ধন' উৎসবের আয়োজন করেন এবং 'ফেডারেশন হল' গ্রাউণ্ডে (মিলন-মন্দির) আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে এক জনসভায় কবি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করেন। সেইদিন বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে এক বিশাল জনসমাবেশে কবির আবেগময় ভাষণের ফলে জাতীয় ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এইসময়ে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে কবির সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বক্তৃতা, গান ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে জনচেতনা সৃষ্টির সঙ্গেই তিনি জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনেও সক্রিয় হন; বিশেষ করে যখন বঙ্গভঙ্গের সপ্তাহখানেক পর বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী কার্লাইল স্কুলকলেজের অধ্যক্ষদের কাছে ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ সে-সময়ে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন চরমপন্থী ও নরমপন্থী কোনও দলেরই মতে তিনি সায় দিতে পারেন নি। নরমপন্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। অপরদিকে চরমপন্থীরা রাজনৈতিক তৎপরতাকেই অতি বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় প্রকৃত দেশগঠনে তাঁরা অবকাশ পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ডাকাতি গুপ্তহত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের বিরোধী ছিলেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে বিপ্লবীদের বীরত্বের প্রশংসা করেন, কিন্তু হিংসাত্মক গোপন কর্মতৎপরতা সমর্থন করেন নি। পরবর্তীকালে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী আদর্শের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বীতশ্রদ্ধ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি অনুভব করেন সমাজচিত্তের বিকাশ ও পল্লীকেন্দ্রিক সামাজিক পুনর্গঠনের প্রয়াস ব্যতিরেকে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, দেশবাসীর চেতনা ও নৈতিক নবজাগরণ ভিন্ন নিছক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ঈপ্সিত ফললাভ ঘটবে না।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি (১৯০৪) রচিত হয়। এই প্রবন্ধটিকেই তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের পূর্বাভাষ বলা যায়। তাতে তাঁর দেশ-গঠনের এক সুস্পষ্ট ও মৌলিক পরিকল্পনার রেখাচিত্র পাওয়া যায়। কবি রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজগঠনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদেশী শাসক পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের একটি কাঠামোর ইঙ্গিত তিনি সেই পরিকল্পনাটিতে দিয়েছিলেন। কবির মতে নিজেদের

শিল্প-বাণিজ্য নিজেরাই গড়ব; শালিসি প্রথার সাহায্যে নিজেদের বিবাদবি
বাদের নিষ্পত্তি করব; শান্তিরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল থাকবে; শিক্ষাব্যব
হবে সরকারি প্রভাব থেকে মুক্ত; বিদেশী শাসকদের সঙ্গে এই সমাজের কো
সম্বন্ধ যেমন থাকবে না, তেমনি তার সঙ্গে সংঘর্ষেরও প্রয়োজন দেখা দেবে ন
আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি অনুরূপ সমান্তর
এক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেম
একটি সমান্তরাল পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—যার শ
ক্রমে ইংরেজ শাসকদের নিঃসহায় ও নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। তাতে এই কথা ব
হয় যে কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এক একটি মণ্ডল তাদের মণ্ডপে ব
গ্রামীণ উন্নয়ন ও হিতকর্ম পরিচালনা করবে। জেলা ও গ্রামীণ পর্যায়ে ক্রমবি
সংস্থাগুলির সর্বশীর্ষে থাকবে প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র
চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ দেশব্য
পিরামিড-আকারে যে-গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন তারও লক্ষ্য ি
ঐভাবে বিদেশী শাসনের মূলোচ্ছেদ ঘটানো। কবি কর্তৃক কল্পিত উক্ত সমা
রূপায়ণকল্পে সদস্যসংগ্রহ ও প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সমান্তরাল সমাজ ও শাসনব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনা দেশব
গ্রহণ করে নি। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাপ গঠনমূলক পথে অগ্রসর না
জ্বালাময়ী বক্তৃতা, উত্তেজনা ও সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভের রূপ নেয়। রাজনৈি
ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে তাঁর সমর্থন ছিল না। তবে ঐ
যেতে গিয়ে দেশের জন্য যেসব যুবক মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের দেশভক্তির প্র
শ্রদ্ধা জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

নৌরজির সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসের (১৯০৬) পর দেশের জা
আন্দোলনে নরম ও চরমপন্থীদের বিভেদ প্রকট হয়ে উঠলে রবীন্দ্রনাথ দু-দ
মিলনসাধনে তৎপর হন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস নিষ্ফল হয়। তোষণনীতির স
না করলেও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তিনি দেশবাসীকে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ে
নেবার আহ্বান জানান। সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) পণ্ড হয়ে যাবার পর প্র
রাজনীতি থেকে তিনি কিছুটা সরে দাঁড়ান। ১৯০৮ সালে পাবনায় ব
প্রাদেশিক সম্মেলনে উভয়পক্ষের মিলনসাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি
হয়। পাবনা সম্মেলনের ভাষণও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়
করে। রাজনৈতিক বিতণ্ডার পরিবর্তে আগামী দিনের গঠনমূলক দেশে

নতুন পথের ইঙ্গিত তাঁর সেই ভাষণে পাওয়া যায়। এরপর কবির জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দেয়; সাহিত্যসাধনায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্যে দেশের অন্যান্য বিশেষ করে চরমপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও কিছুটা দায়ী ছিলেন। আন্দোলনের শেষভাগে তাঁর নতুন চেতনা দেখা দেয়। কবি এই সময় থেকে বিশেষভাবে অনুভব করেন যে সংকীর্ণ ধর্মবোধ ও অন্ধ দেশাত্মচিন্তা থেকে মুক্ত বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই নতুন চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 'গোরা' উপন্যাসটিতে (১৯১০)। রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল বিষয়কেই তিনি নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারততীর্থ' 'দীনের সংগীত' 'অপমানিত' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর নব্য-দেশাত্মবোধ ও বিশ্ব-মানবতন্ত্রী মনোভাব দেখা দেয়। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন যে দেশকে অনভিপ্রেত পথে নিয়ে চলেছিল সে সম্পর্কে তিনি স্থিরনিশ্চিত হন। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাঁর নতুন চিন্তা দেখা যায়। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিধবাবিবাহ দেওয়া (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকে কবি কুসংস্কারাচ্ছান্ন হিন্দু ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের অনড় সমাজকে ভাঙার ইঙ্গিত করেন। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে এতকাল প্রধানতঃ ঔপনিষদ প্রার্থনারই স্থান ছিল। অতঃপর বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হল। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের উপদেশমালায় (১-৮ খণ্ড, ১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্দ) তিনি সনাতন হিন্দুয়ানি বা আদি ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ আধ্যাত্মিক গণ্ডি অতিক্রমের সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপরীতে নিখিল বিশ্বমানবের বাণী প্রচার করলেন।

সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে কবি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা (১৯১১-১৪) ও পল্লীসংগঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তৃতীয়বার তিনি ইউরোপ পর্যটনে যান। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তার পরের ঘটনা (১৯১৩)। তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী' সমাজোন্নয়নের এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করে (১৯১৫)। প্রাক্তন বিপ্লবী অতুল সেন ও তাঁর সঙ্গীদের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে গ্রামাঞ্চলে রূপায়ণের প্রয়াসী হন। অতুল সেন অকস্মাৎ গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হয়ে পড়ায় কবির সে-প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যায়।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন লেখায় তার প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে। 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে তিনি যুদ্ধের কারণ ও পরিণতি বিশ্লেষণ করেন। বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ইউরোপে রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারবুস, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ বিদ্বৎবর্গ বিশ্বের স্বাধীন বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের এক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁরা 'Declaration of Independence of Spirit' নামে একটি প্রচারপত্র কবির স্বাক্ষরের জন্য পাঠান। কবি তাতে সাক্ষর করে নিজেকে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন।

বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রস্বরূপ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা (১৯২২) কবির নবজীবনবোধের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। দেশ ও বিদেশের বহু গুণীর সাহায্যে কবির নিখিলমানব চিন্তা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই সময়ে দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থায় লোকে ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যার উপর 'অসন্তোষের কারণ' 'বিদ্যার যাচাই' 'বিদ্যাসমবায়' নামে তিনটি প্রবন্ধে এক নতুন আলোকপাত করেন।

১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে অ্যানি বেসাণ্টকে সভানেত্রী করার প্রস্তাব নিয়ে যখন তুমুল মতবিরোধ দেখা দেয় তখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন চরমপন্থীদের সমর্থন করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নাম প্রস্তাব করে নরমপন্থীদের তুষ্ট করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা ঐক্য সাধিত হয়। এই সময় থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে ঐ বছর ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি পরিত্যাগের কথা সুবিদিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথমদিকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই অগ্রণী হয়েছিলেন।[৩]

১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে Rural Reconstruction বা পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। তার প্রথম পরিচালক ছিলেন লেনার্ড কে. এল্‌মহার্স্ট। ব্যয়নির্বাহের জন্য আমেরিকা থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিমন একদিকে যেমন চাইত কোলাহলমুক্ত নিভৃত পরিবেশে শিল্পসাধনায় আত্মসমাহিত হয়ে থাকতে, অপরদিকে একঘেঁয়ে গৃহজীবন থেকে

মুক্ত হয়ে দেশ ও বিদেশের মাটি ও মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে। তার মধ্যে অবশ্য বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যও থাকত। বারো বার বিশ্ব পরিক্রমায় একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া বাকি পাঁচটি মহাদেশের অধিকাংশই তিনি সফর করেন। সে-সব দেশের বহু জননেতা ও মনীষীর সংস্পর্শে আসেন, লাভ করেন বিপুল সংবর্ধনা। রাশিয়ায় স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নি; ইতালিতে মুসোলিনির আতিথ্যগ্রহণ পরে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর কবি ফ্রান্সে রণাঙ্গন পরিদর্শন করেছিলেন। বিশ্বপর্যটনকালে প্রদত্ত বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও দিনলিপিগুলি *Religion of Man*, *Sadhana*, *Personality*, *Nationalism*, 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে নানাস্থানে কবি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৯১৬-১৭) তারই কয়েকটি একত্রে 'ন্যাশন্যালিজম' গ্রন্থে সংকলিত হয়। তার প্রথম রচনাটিতে তিনি পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্বিরোধ তুলে ধরে দেখিয়েছেন, পশ্চিমী সভ্যতায় একদিকে চলেছে মুক্ত মানসের অবাধ বিকাশ ও জ্ঞানের অভিযান, যার ফলে ইউরোপ সারা বিশ্বের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে; অন্যদিকে পশ্চিমী সভ্যতা জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে ব্যক্তিকে উৎসর্গ করে নির্বিবেক ক্ষমতালোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিঅর্জনে মত্ত হয়ে পড়েছে। কবির মতে জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী, যার ক্রমবিস্তারী আক্রমণে মানবসভ্যতা বিপন্ন; পশ্চিমে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ সেখানকারই সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ আত্মঘাতী পশ্চিমী সভ্যতার অনুগামী জাপানে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিমানুষকে চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দান করে যে-ইউরোপ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছে, সেখানে চলেছে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান, ক্ষমতার লালসায় ন্যায়নীতির বিসর্জন। ইউরোপীয় সভ্যতার অমৃতধারার আস্বাদ না নিয়ে তার হলাহল পানে জাপানকে উদ্যত দেখে রবীন্দ্রনাথ জাপানের চিন্তাশীলদের সতর্ক করে দেন। তৃতীয় রচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমী সভ্যতা একদিকে ভারতের তমসাচ্ছন্ন জড়তা দূর করে মঙ্গলালোকের পথনির্দেশ করেছে; কিন্তু অপরদিকে সৃষ্টি করেছে জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতের ঐতিহ্য হল বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও মতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। সহিষ্ণুতার পথ ত্যাগ করে আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতের আকৃষ্ট

হওয়ার অর্থ সংঘাতকে অনিবার্য করা ছাড়া আর কিছু নয়। জাতিবিদ্বেষের পরিবর্তে ভারত সারা বিশ্বকে এমন এক পথ দেখাতে পারে যা ব্যক্তির বিকাশ ও সার্বজনীন ঐক্যের সাধনায় সমগ্র মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বজনীন মনোভাব তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার বিষয় হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ নেশন-তন্ত্রে সচেতন হয়ে বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের পথ পরিত্যাগ করবে বলেই তিনি আশা করেছিলেন। ১৯১২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর বিশ্বজনীন আদর্শ প্রচার করেন।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে নীতিগতভাবে সায় দিতে পারেন নি। লালা লাজপতের সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ-নীতি রবীন্দ্রনাথের কাছে নঞর্থকরূপে প্রতিভাত হয়। তিনি বিদেশী পণ্য বয়কটের পরিবর্তে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য ও বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে দেশীয় ঐতিহ্যবহ শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিলেন। চরকা-তত্ত্ব ও অহিংস রাজনীতির ফাঁকাবুলি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। চৌরি-চৌরায় (১৯২২) দেশের নামে জনতার উন্মত্ততা ও চৌকিদারদের হত্যাকাণ্ডের পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ একটি খোলা চিঠিতে তৎকালীন নেতাদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে অহিংসা মন্ত্রের প্রয়োগে বিপদ অনেক ; লোকের মনকে প্রস্তুত না করে আন্দোলনে নামানো আর রণপ্রস্তুতির পূর্বে যুদ্ধে সৈন্য পাঠানো একই। ক্রোধকে উত্তেজিত করে অহিংসার মন্ত্রে তাকে বশ করা যায় না। ক্রোধ তার ইন্ধন খোঁজে।[৪]

১৯৩১ সালে হিজলী বন্দীশালায় রাজবন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় বিভিন্ন জনসভায় তিনি সরকারি আচরণের নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নি বটে, তবে ১৯৩২ সালে গান্ধীর আমরণ অনশন প্রচেষ্টায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গান্ধীকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন যে ইংরেজ যতদিন এদেশকে তাদের মুঠোর মধ্যে রাখতে চাইবে ততদিন তাদের পক্ষে ভারতীয়দের শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আশা করা নিষ্ফল। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ শুরু হতে বছর চারেক বাকি। চীনের বিরুদ্ধে সেইসময়ে জাপানের অভিযানকেও তিনি নিন্দা করেন।

১৯৩৬ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে ভারত শাসন আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে আহূত জনসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিপূর্ণ ও আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালান্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 'কালের যাত্রা' নাটিকায় তিনি ধর্মমূঢ়তাকে ধিক্কার জানান এবং হিন্দুমুসলমানের সামাজিক বৈষম্যের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে হিন্দুমুসলমানের মিলনের ফাঁকাবুলি আওড়ালে চলবেনা—চাই উভয়ের সর্বাঙ্গীণ সমকক্ষতা। খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মধ্য-যুগোচিত ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করে গান্ধীপন্থী নেতারা মুসলমানদের দলে ভেড়ানোর যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না। পরিণামে সেই ধর্মচেতনা ধর্মান্ধতায় রূপান্তরিত হয়—দেখা দেয় নানা বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মতবিরোধ। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে জট পাকানোর সমালোচনা করে তিনি 'সমস্যা' ও 'সমাধান' প্রবন্ধ দুটি লেখেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যার পর তিনি লিখেছিলেন: 'ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুটি মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে, অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত'।[৫]

রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে মানতেন, ধর্মতন্ত্রকে নয়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমতাবোধ ও সম্প্রীতির বিষয়ে তাঁর উপর রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। দেশের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও দেশ ও বিদেশের রাজ-নৈতিক নেতারা আলাপআলোচনা ও পরামর্শের জন্য কবির কাছে অহরহ যাতায়াত করতেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের (১৯৩৯) পর সুভাষচন্দ্রের উপর যে শাস্তিবিধান হয় তা প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। গান্ধী জানান যে তা সম্ভব নয়। তৎকালীন কংগ্রেসের কর্মধারা সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি এক পত্রে লিখেছিলেন: 'কংগ্রেসনামধারী যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি; স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল

বাইরেকার উপরওয়ালার দিকে···কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য— যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে ; এই ব্যবহারবিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্ধার প্রভাব'।[৬]

এরপর রাজনৈতিক দলাদলি ও সংঘর্ষে বাংলাদেশের দ্রুত অবনতি দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথা প্রকাশ করেন। একদিকে দেশে দলাদলি, রেষারেষি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির প্রাবল্য, ওদিকে দেশের বাইরে বিশ্বমহাযুদ্ধ লেগে গেছে। রবীন্দ্রনাথ মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হবার জন্য এক তারবার্তা পাঠান। রাজনীতি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ লেখা হল (৫ জুন, ১৯৪১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা শ্রীমতী রাথবোর্নের ভারতীয় নেতাদের বিশেষ করে জওহরলাল সম্পর্কে লিখিত এক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। অধিকাংশ দেশনেতা ও জওহরলাল তখন কারারুদ্ধ ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ ব্যথা লাগে।

জীবনের শেষ জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সারা বিশ্বে প্রসার্যমাণ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মানব সংস্কৃতির চরম বিনাশের আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং সমগ্র মানবসমাজকে শোনান তাঁর শেষ সাবধানবাণী।

দুই : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

রবীন্দ্রদর্শনে মানবসভ্যতার দুটি বিরাট ঐতিহ্যের মিলন দেখা যায়। একটি হচ্ছে ভারতের ঔপনিষদ ঐতিহ্য— যার প্রভাবে প্রাচীন মুনিঋষিদের মতো তিনিও মনে করতেন যে বিশ্বচরাচর বিশেষ এক কল্যাণকর সত্তার অভিব্যক্তি— সর্ববিধ বিষয়ের পিছনে এমন এক চৈতন্যময় পুরুষ বিরাজ করেন যিনি বহু ও বিচিত্র সবকিছুকে সদাই সামঞ্জস্যময় ও সংগতিপূর্ণ করে তোলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসধর্মী মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য— যার মুখ্য উপাদান যে স্বয়ং মানুষ তা ঐকথাটিতেই সুপরিস্ফুট। প্রোটাগোরাসের 'মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি' কিংবা

চণ্ডীদাসের 'সবার উপর মানুষ সত্য'—মানবতন্ত্রের মূলকথা। মানবতন্ত্রে বুদ্ধির চর্চা ও মুক্তির সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মানবতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মানুষ কেবল সব-কিছুর মাপকাঠি নয়, মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস; মানুষের সবকিছু অর্থাৎ তার উৎপত্তি, অবস্থান ও পরিণতির পশ্চাতে কল্পিত কোনও শক্তি বা সত্তা নেই। তা বলে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয় যে মানবতন্ত্রের পূর্বসূরীরা সবাই নাস্তিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরে আসক্তি ও ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন নি। সেইসঙ্গে অবশ্য একথাও মানতে হবে যে তাঁদের চিন্তাভাবনা মূলতঃ পার্থিব বিষয়েই আবদ্ধ থাকত এবং তাঁদের চেতনা ও কর্মতৎপরতা যতই দৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ততই তাঁদের মধ্যে মঠমন্দির ও চার্চের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমনি একজন আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী।

পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত একেশ্বরবাদী চিন্তায় তিনি সর্বেশ্বরবাদী ব্যঞ্জনা প্রদান করেছিলেন। একেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হেতু তাঁকে জগতের সংস্পর্শ থেকে পৃথকরূপে কল্পনা করা হয়। সর্বেশ্বরবাদীর দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন ও এক; সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা বিরাজ করেন। বিরাজমান সবকিছুই পরব্রহ্মের অন্তর্গত—জন্মমৃত্যু সেই ব্রহ্মেই ঘটে থাকে—সমগ্র কালাকাশ ব্রহ্মেরই অঙ্গ। তাঁর কথায়: 'দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোন কালে নূতন নহে, কোন কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান অথচ ইহার মহৎ ঐক্য ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছেন'।[৭]

পরম সত্তা মানুষের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের কাছে সেই পরম সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপ হল বিশ্বমানবের রূপ। নিখিল মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা সবচেয়ে নিকট। বিশ্বমানবরূপী দেবতার সেবা এবং কর্মক্ষেত্রেই মানুষ পরমাত্মার মিলন ও উপাসনার সুযোগ পায়। সকল কাজের লক্ষ্য বৈশ্বিক কল্যাণ—সেই নীতিনির্দিষ্ট কর্ম এবং সেই পথেই একদিকে বৈশ্বিক মঙ্গল সাধন ও অন্যদিকে পরম সত্তার উপাসনা বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রদর্শনে পরম সত্তার সর্বব্যাপিত্ব যেমন স্বীকৃত, তেমনি প্রেমের পাত্ররূপে ঈশ্বরের বিশ্বনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যও স্বীকৃত। এখানে তাই একটা দ্বৈতভাব লক্ষণীয়। সর্বব্যাপী ঈশ্বর দুভাবে প্রকাশমান—

একদিকে ব্যক্তিমানুষ, অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব। ব্যক্তি ও বিশ্বকে নিয়ে পরম সত্তার লীলা— তারই মাঝে রূপ রস গন্ধ ও বৈচিত্র্যেভরা এই জগৎপ্রবাহ। যে-শক্তি বিশ্বলীলার কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি দেশ ও কাল, জীব ও জড়কে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। বৈচিত্র্যময় বহুর মধ্যে সেই একই সত্তা বিরাজ করেন। বাহ্যতঃ যিনি লীলাময়, অন্তরে তিনি প্রাণের মানুষ। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। উভয়েই প্রেমের বন্ধনে পরম সত্তাকে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাই শংকরের মায়াবাদী অবিমিশ্র অদ্বয় দৃষ্টিভঙ্গী উভয়েই গ্রহণ করেন নি।[৮]

বিশ্ব বহু বিশ্লিষ্ট বস্তুর উপাদানে গঠিত নয়, বিশ্ব একই বিরাট সত্তার বিচিত্র প্রকাশ এবং সেই একক সত্তা ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট; আবার ব্যক্তিমানুষ থেকে স্বতন্ত্র বিশ্বও ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। সত্তায় এরূপ ব্যক্তিত্বের প্রত্যয় তাঁর চিন্তার একটি অভিনবত্ব। পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা প্রেমধর্মী অনুভূতিমার্গের অধিক অনুরাগী ছিলেন।[৯] প্রজ্ঞার অতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমের উপলব্ধি সম্ভব। তাঁর কাছে পরম সত্তা নিরাকার, নির্বর্ণ ও নিগূঢ় বিষয়, যা কেবল প্রেমেরই আধার। চূড়ান্ত সত্যরূপে তিনি মানুষ ও তার মনকেই দেখেছেন— শুধু নিয়মনিগড় ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তাই নয়। তাই তাঁর দর্শনে একেশ্বরবাদের সঙ্গেই সর্বব্যাপী সর্বেশ্বরবাদের যুগপৎ অবস্থান দেখা যায়। শাশ্বত পরম সত্তার অনন্ত সৃজনীশৈলীর প্রকাশ এবং সত্য ও সুন্দরের অভিব্যক্তিরূপেই তিনি ইতিহাস ও প্রকৃতিকে দেখেছেন। কবির দৃষ্টিতে অতীন্দ্রিয় পরম সত্তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সৃজনপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।[১০]

রবীন্দ্রনাথের দিব্যপ্রেম ধরাছোঁয়ার অতীত নয়; তিনি সর্বব্যাপী প্রেমময়তার জয়গান করেছেন এবং বিশ্বজনকে সেই প্রেমসাগরে অবগাহনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেম ও প্রজ্ঞার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। প্রেমই বরং জ্ঞান ও চেতনার পরিণতি। প্রেমের দ্বারাই সর্বজ্ঞ পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। দান্তের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে দুনিয়ার যত পাপ ও পঙ্কিলতার কারণ হল এই দিব্য প্রেমানুভূতির অভাব। আত্মার সকল জ্বালাযন্ত্রণার নিরসন ঘটে প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে। প্রেমেই মুক্তি।

বিশ্বহৃদয়চ্যুত আত্মাভিমানেই অশুভের উদ্ভব হয়। তাই তিনি মানুষকে দর্প, দ্বেষ, লোভ ও রোষমুক্ত হয়ে সর্বব্যাপী দিব্য প্রেমের ধারায় মগ্ন হতে বলেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন যে জ্বালাযন্ত্রণা, পাপ ও তাপের উৎপত্তিও ঐশ

ক্রিয়াকানুনে ঘটে। মানবাত্মাকে পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়াস্বরূপ সেগুলি বিধিরই বিধান। এখানে রবীন্দ্রচিন্তায় কিছুটা যেন খ্রীষ্টীয় প্রভাব দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র এবং জগতের সঙ্গে মানবজীবনের বাঁধন অচ্ছেদ্য। সেই কারণেই জাগতিক বিধিব্যবস্থার লঙ্ঘন ক্ষতিকর। বৃক্ষলতার মর্মরধ্বনি, নদীর নিরন্তর প্রবাহ, আকাশভরা সূর্যতারা, নিদাঘের দ্বিপ্রহর বিধাতারই অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নিয়মনির্দেশের নিগড়ে বাঁধা প্রকৃতির অন্তরালে দিব্য ইচ্ছাই ক্রিয়াশীল থাকে। কালাকাশ ক্রমাগতি বা তাপগতিবিজ্ঞানও যেন নিরন্তর সৃজনশীল শাশ্বত সত্তার নিয়মনির্দিষ্ট সমন্বয় ও মৌল জাগতিক ঐক্যের সুরে সুর মেলাচ্ছে। জগতের যা কিছু বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তা বিধাতার অসীম সৃজনময় প্রাচুর্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। সৃষ্টিই পরম সত্তার নিরন্তর অভিব্যক্তি। সূর্যচন্দ্র, নদীপর্বত, ঝড়বাদলা সবই ঐশ আনন্দের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি নিছক জড় ও শক্তির যান্ত্রিক একটা যোগফল নয়।

বিশ্বের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের উদঘাটন একা বিজ্ঞানের কাজ নয়। জগৎ একটা আত্মাবিশেষ— শাশ্বত সর্বব্যাপী ঐকতানে তা সদাই মুখরিত— তারই মধ্যে পরম সত্তা বিরাজমান। জগৎচরাচরের গভীরে আত্মার অবস্থান-কল্পনা সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের একটি অনন্য অবদান বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। সকল বস্তুতে আত্মার এই অবস্থান প্রত্যয় তাঁকে ঔপনিষদ চিন্তা থেকে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে নিয়ে গেছে। প্রকৃতিকে তিনি জীবনসঙ্গী করেছিলেন— তাই বৃক্ষের মর্মরস্বর, নদীর কলতান, পাহাড়ের গুঞ্জনধ্বনি ও বিহঙ্গের সংগীত তাঁর মনে স্পন্দন জাগাত। রবীন্দ্রচিন্তায় প্রকৃতির এই অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য তাঁকে অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছে।[১১]

বৈসাদৃশ্য, বিশৃঙ্খলা ও শ্রীহীনতার বিরুদ্ধে তাঁর কবিমন বিদ্রোহ করে। সমন্বয়ই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তিনি চাইতেন এক দিব্য ঐকতান— সমন্বয়কারী পরম সত্তার উপলব্ধিতে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ববিধুর মানবশক্তির মিলন। সৃজনশীল অতিমানসের অনুধ্যায়ী দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয় বিশ্বচরাচরের অর্থপূর্ণ, আনন্দময়, সুসদৃশ নিগূঢ়তা। গুণগত বিচারে শিল্পীর দৃষ্টি নৈয়ায়িক বিজ্ঞানীর দৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়ের মূলে এই ঐকতানের সুর ঝঙ্কৃত— সেই সুরই তিনি শুনিয়েছেন আজীবনকাল। বিধাতার বিশ্বাতীত স্বর্গপুরের সঙ্গে মানুষের ধরাছোঁয়ার এই মর্ত্যলোকের মধ্যেও তিনি সমন্বয়

উপলব্ধি করতেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর্লোকের সর্বত্র বিরাজমান ও প্রকাশমান পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়; বাহিরের ও অন্তরের মিলনদৃশ্য ছিল তাঁর কাছে পরম শ্রেয় বিষয়। প্রকৃতিকে নির্দয়ভাবে খর্ব করার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন মানুষের সৃজনশীলতার অনাবিল সুখের সঙ্গে পার্থিব জগতের সাযুজ্য সাধন। শাশ্বত অতিমানস একদিকে প্রকৃতি ও অন্যদিকে মনুষ্যচেতনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান; দিব্যমিলনের পথনির্দেশ প্রকৃতিই দিতে পারে।[১২]

মার্কসবাদী শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়কারী চিন্তার প্রভেদ সুপরিস্ফুট। ইতিহাসের বিচারবিশ্লেষণে তিনি সংঘাত বিরোধ ও অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন না। সামাজিক মূল্যায়নে তিনি মানবিক হৃদয়-বত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন; কল্পনা করেছেন সমুদয় সমাজ ও গোষ্ঠীর স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসংবদ্ধতা; নগর ও গ্রামের সমবায়ী সম্পর্ক। বর্তমান সমাজ-সংঘর্ষ ও নিরন্তর জয়াভিযানের পরিবর্তে চাই শান্তি, মৈত্রী, সম্প্রীতিমূলক সমন্বয় তথা আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য। সমন্বয়ের পথেই জড়তা, নৈরাশ্য, ভগ্নমনোবল ও সংশয়ের অবসান ঘটে। সমন্বয়ের পথেই পাওয়া যায় শুভ, সুন্দর, সুসদৃশ এই পৃথিবীকে, যেখানে সকল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অস্তিত্ব অবর্তমান। তাঁর মতে নিছক বাস্তবেই সত্য বর্তায় না—বাস্তবের সুষম সামঞ্জস্যেই সত্য বিরাজ করে। প্রেম ও সুন্দরই হল সমন্বয়ের একমাত্র রূপ।[১৩]

মানুষের সদাচার বিশ্বব্যাপী মহাজাগতিক নিয়মনীতির অঙ্গ বলে তিনি মনে করতেন; জীব ও জগতের প্রতি হানিকর যে-কোনও আচরণ মঙ্গলময় দিব্যবিধানের পরিপন্থী। সাম্রাজ্যবাদ, স্বেচ্ছাতন্ত্র, অত্যাচার, উৎপীড়ন নির্দয়তা প্রভৃতি অনাচারের ক্ষতিপূরণ মানুষকে একদিন করতে হবে—সেটাই বিধির অমোঘ বিধান; দর্প, ঔদ্ধত্য ও লালসার শাস্তি অনিবার্য।[১৪]

মানবতাবাদ

ইতিহাসে মানবতন্ত্রী চিন্তার যে-দুটি ধারার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি আধ্যাত্মিক এবং অপরটি বস্তুবাদী। মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র শেষোক্ত পর্যায়ের। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী সংগীতের সুর ছিল আধ্যাত্মিক। মধ্যযুগের রেনেসাঁসধর্মী মানবতন্ত্রীদের মতো তিনি মানুষকে দিব্যদৃষ্টিতে বিচার করেছেন; যেখানে ব্যক্তিমানুষ সৃজনশীল পরম সত্তার প্রতি-বিম্ব মাত্র; মানুষই ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক; মানবদেহ ঈশ্বরের সৃজনশীল পরীক্ষা-

নিরীক্ষার আধার; বিধাতা তাঁর নিরন্তর সৃষ্টিকর্মকে বাহ্য জগৎ ও মানুষের মধ্যে দিয়ে মুক্তি দেন।[১৫] চিরন্তনের পরিপ্রেক্ষণিকায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের মূল্যায়ন করেন; ব্যক্তিত্বের অন্তরে অন্তর্যামী পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত। গুণগত বিচারে বহির্লোক অপেক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাই অসীমের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; সীমার মধ্যেই অসীমের বিচিত্র রূপ বিধৃত। কবি মানুষের আত্মিক শক্তির উন্মেষ ও মুক্তি চাইতেন; তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে আত্মাকে দেশ ও বিদেশের রাষ্ট্রশক্তি অবিরাম অবদমিত করে চলেছে, নানারূপ শক্তিমত্ত সংস্থা নিষ্পেষণ করছে। শুভ ও সুন্দরের উপলব্ধি আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে। ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়ের সম্যক ধারণা ও চেতনাই মানুষকে তার নিত্যদহনকারী আইন ও শৃঙ্খলার বিভ্রান্তি এবং সামাজিক অনাচার ও অবক্ষয় থেকে অব্যাহতির নিশানা জানায়। জাতি, ধর্ম, ভাষাগত দৈনন্দিন মনোমালিন্য ও সংঘাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল মানবতন্ত্রী মনোভাব। মানুষের ভিতরে অনাবিষ্কৃত বহু গুণ ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে—পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষে সেগুলি নিষ্ফল হয়, অনাঘ্রাত কুসুমের মতো।[১৬]

ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ মানবিক মূল্যবত্তা নিরূপণ করেছেন; তাঁর 'মানব' প্রত্যয় ও শ্রীঅরবিন্দের 'অতিমানব' এক নয়। অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের মধ্যে তিনি প্রেম, শান্তি ও ঐক্যের সন্ধান করেন। পক্ষান্তরে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের বিশ্বাতীত ও দিব্য মূল্যবোধ অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কবির মানবতন্ত্র ধরাছোঁয়ার অতীত নয়; অসীম সত্তা নিরন্তর সৃজনশীল এবং সেই সত্তা মানুষের মধ্যে সীমারূপে বর্তমান; অসীমকে নিজ কর্মশক্তি ও সৃজনীসত্তা দ্বারা প্রকাশ করা ব্যক্তিমানুষের কাজ। আধ্যাত্মিক সত্তার স্পন্দন ও গতির মধ্যেই জগতের যাবতীয় শুভ ও সুন্দরের জন্ম। সৃজনপ্রক্রিয়ায় নিহিত পরম সত্তা শিল্পসাহিত্যে পরিণতি লাভ করে; সেই রসাস্বাদেই মানুষের তৃপ্তি ও সার্থকতা।[১৭]

সত্তার আদিতত্ত্ব বিশ্লেষণকল্পে নিখাদ দার্শনিক বাকবিতণ্ডায় তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না; সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরের মহানুভবতা উপলব্ধি করানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে নিরুত্তাপ নৈয়ায়িক যুক্তিতর্কের কুজ্‌ঝটিকায় প্রবেশবিমুখ ঈশ্বর নিরভিমান সাধারণ মানুষের হৃদয়েই প্রবেশ করেন; অতি সাধারণ জীবিকাকর্মেও সৃষ্টিশক্তিধরের প্রাণোচ্ছ্বাস দেখা যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম থেকে শিল্পকলার সাধনা অবধি যাবতীয় কাজ ঈশ্বরোপাসনার

মতো পবিত্র। তাঁর কাছে কী রাজপ্রাসাদ কী পর্ণকুটির সবই সমান। ঈশ্বরের আরাধনা মন্দির, মসজিদ, গির্জায় সীমিত রাখা অর্থহীন; ক্ষেতখামার ও কল-কারখানার কাজও তাঁর উপাসনাবিশেষ।[১৮]

ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি মানুষকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে; সৃজনশীল আত্মোৎকর্ষই অসীম পরম সত্তার প্রকাশ। মানুষ বহুবিধ গুণ ও শক্তির আধার; তার সহজাত প্রকৃতি হল অন্তর্নিহিত দিব্য সৃজনসত্তার বিকাশ সাধন। মানুষের অনুভূতি পবিত্র ও মহান—রাষ্ট্রশক্তির সেখানে কোনও অধিকার নেই; রাজা ও রাজশক্তির নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে দাবি করাটা সঙ্গত নয়।

কবির সত্যের প্রত্যয় ছিল মানবতন্ত্রী; সত্যপ্রিয়তা মানুষের একটি সহজাত গুণ। সেই দৃষ্টিতে তিনি বিবেকের নির্মলতা কামনা করতেন; বিবেকই ন্যায়-পরায়ণতার উৎস আর নীতিবোধ স্বজ্ঞায় (Intuition) নির্ভরশীল। এবিষয়ে বস্তুবাদী মানবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে সহজাত যুক্তিপ্রবণতা থেকে মানুষ নীতিনিষ্ঠ হয়। লোকাচার বা শাস্ত্রীয় অনুশাসন নৈতিক আদর্শের একমাত্র উৎস যে নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন।[১৯]

ভারতীয় জনমনে আবহমানকাল যাবৎ বৈরাগ্য ও জীবনবিমুখিতার যে-ধারা বয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করেন নি। মানুষের সহজাত শুভ ও সুন্দর প্রবণতাগুলিকে অনুশাসনের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন করার তিনি বিরোধী ছিলেন; মানুষের সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ বিকাশই ছিল তাঁর কাম্য। পাহাড়ের গুহায় অথবা অরণ্যের গভীরে গিয়ে ভগবৎ মহিমা অন্বেষণের কোনও প্রয়োজন নেই; হাসিকান্না ও আশানিরাশার মধ্যেই তিনি জীবনকে গ্রহণ করেন। সমাজ-সংসার ছেড়ে নিভৃতস্থানে পরমার্থের সাধনায় তাঁর আস্থা ছিল না। ত্যাগ ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন স্বাভাবিক জীবনের অন্তরায়। ভগবান মঠমন্দিরে যেমন বিরাজ করেন, তেমনি ভগ্নগৃহেও অবস্থান করেন।[২০]

কবির দৃষ্টিতে পারস্পরিক সংযোগ ও বিনিময়েই সমাজের সার্থকতা নির্ভর করে। তাই দরকার সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ মনোভাব। অবহেলিত ও অসহায় মানুষের প্রতি দরদ ও সাহচর্য মানবতন্ত্রী নীতির অন্যতম মূলকথা। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও ইহমুখীন কর্মের মাধ্যমেই অসীম পরমার্থকে পাওয়া যায়। মানবতন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ জলটুঙ্গির ঘরে বসে, পারিপার্শ্বিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দুঃখী প্রতিবেশীর প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করেন নি।

তিন : ইতিহাসচিন্তা

ইতিহাসকে কবি প্রচলিত প্রত্যয় থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেছেন ; সে-দৃষ্টিতে ইতিহাস নিছক রাজারাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহ ও বিজয়-অভিযান অথবা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের উত্থানপতন নয়। তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষের মুক্তির আবেগ ও নিরন্তর সৃষ্টির প্রয়াস তথা জীবন ও মননের পরিপূর্তির সঙ্গে মানুষে-মানুষে ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে যাবতীয় নৈসর্গিক বাধাবিপত্তির লঙ্ঘন ও গতিশীলতাই ইতিহাস ও মানবসভ্যতার লক্ষণ।[২১]

মানুষকে নিয়েই ইতিহাস রচিত—সে-ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত এক একটি খণ্ডচিত্র। ইতিহাস হল আত্মোপলব্ধিকল্পে অজানা যাত্রাপথে মানুষের পদচারণা। রাষ্ট্রের উত্থানপতন, ধনৈশ্বর্য আহরণ ও তার নির্বিবেক অপচয়, স্বপ্ন ও আকাঙ্খার বস্তু গড়া ও ভাঙার খেলা, সৃষ্টির রহস্যালোক উদ্‌ঘাটনের নানাপথ আবিষ্কার, নতুনের নেশায় বহুশ্রমলব্ধ পুরাতনের পরিহার প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে—নিজের উপলব্ধি ও পরিপূর্তির তাগিদে ; যাবতীয় সঞ্চয় ও চিন্তাভাবনার মূলে থাকে আত্মার ক্ষুধা—তাই সে সকল বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে— অনন্ত যাত্রাপথে মানুষের ভুলভ্রান্তি ও জ্বালাযন্ত্রণা পর্বতপ্রমাণ— প্রসববেদনার মতোই তা দুঃসহ ; পরিবর্তে মানুষ যে পরিপূর্তি লাভ করে তার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা অপরিমেয়। অন্তরাত্মার এই তৃপ্তি ও পূর্তির তাগিদ না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ অর্থহীন ও অসহ্য প্রতিপন্ন হত। ইতিহাসে মানুষ পুরুষানুক্রমে সত্যের সন্ধানপথে চেতনার ক্রমবিস্তৃতি সাধন করেছে এবং উচ্চতর পর্যায়ে সর্বাত্মক ঐক্য ও মহাসত্যের নিকটতর হয়েছে।[২২]

স্থান ও কালের পশ্চাৎপটে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখেছেন, যার মর্ম হল বহু ও বিচিত্রের মিলন। নানা দেশ ও কালের ইতিবৃত্ত বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অতীতের পটভূমিকায় মানবসভ্যতার বিচার, বর্তমানের পর্যালোচনা এবং অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে মানবাত্মার উন্নয়নকামী বিবর্তনের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জীবাত্মা একের পর এক জড়প্রকৃতির নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে নতুন বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছে। সেই বিঘ্নগুলি কর্ম-

কুশলতার ফলে যথারীতি অতিক্রান্ত হয়েছে, বলপ্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে নি। প্রকৃতির নিয়মনির্দিষ্ট গতিপথে জীবাত্মার গঠন ও বিকাশ রহস্যাবৃত। অস্তিত্বের সংগ্রামে জয়ী হয়ে জীবাত্মা ক্রমে মানুষের মধ্যে চরিতার্থ হয়েছে মননের উদ্ভবে। মানবজীবনে মননের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। জীবন ও মননের প্রকৃতি এক নয়। পশুরও সীমিত মানসিক ক্রিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মননশীলতা নিরঙ্কুশ বিকাশের সুযোগ পায়— সেখানে তা সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তির আবেগ ও শক্তি সঞ্চার করে। জৈব বিবর্তন ধারায় উৎপন্ন মননশীল মানুষের মধ্যে স্থান ও কালাতীত এক চিরন্তন মূল্যবত্তা আছে যার উপলব্ধি অধুনা কালে সদাই ব্যাহত হচ্ছে।[২৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় হারবার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩), টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫) ও অঁরি বের্গসঁ-র (১৮৫৯-১৯৪১) প্রভাব লক্ষিত হয়। স্পেনসার জাগতিক সবকিছুকে তাঁর অভিব্যক্তিবাদের (evolution) প্রত্যয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারাকে তিনি প্রচলিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত করেন। কবি সেই অভিব্যক্তিবাদকে সাহিত্যতত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যের প্রেরণা সেই আদর্শেই তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু স্পেনসারের অজ্ঞাবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন নি। ইতিহাসের বিবর্তনকে তিনি বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার সার্থকতা ও অমোঘ শক্তির লীলারূপে দেখেছেন। হাক্সলির বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও কবির রচনায় প্রতিফলিত হয়। বের্গসঁ-র সৃজনশীল বিবর্তনবাদ (Creative Evolution) কবিমানসে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। বের্গসঁ-র মতে জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল; সবেরই রূপান্তর ঘটে ও ঘটবে; তাকে তিনি becoming বা হওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুর অন্তরালেও গতি ছাড়া আর কিছু নেই। অনাদি অনন্ত ধারায় পরম শক্তিস্বরূপ এই গতি চিরন্তন। চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত সে শক্তির বিপরীত গতি হল বস্তু। বস্তু গতিরই এক অবস্থান। বস্তুর গতিধারা খণ্ডরূপে মানুষের দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে বর্তমান ক্ষণিকের এক কালবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ বেগর্সঁ-র গতিবাদকে আপনার স্বভাবসুলভ কবিদৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে নয়। 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে কবি বলেছেন যে যা অনন্ত সত্য ও স্থিতি তা অনন্ত গতির মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কবি আস্থাবান ছিলেন। ভবিষ্যতের পথ যতই

সংকটময় হোক না কেন মানুষ নিজ শক্তিবলে তার সঠিক লক্ষ্যপথ রচনা করে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, মানুষের মধ্যে মননশীল শক্তির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণে সেই শক্তির ব্যবহারে যথোচিত তৎপর নয়। এটিকে তিনি মানবসভ্যতার কাছে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেছেন। সেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার জন্য তিনি ভারতীয় চিন্তার শাশ্বত ধারার অনুধ্যানে বিশ্বাসী ছিলেন।

ভারতীয় ইতিহাসকে তিনি ভাবের ইতিহাস বলে মনে করতেন। নানা সংঘর্ষ ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ভারতীয় ভাব ও ঐতিহ্য নানা জাতির সঙ্গে দেওয়ানেওয়ার মধ্যে দিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে এবং রচনা করেছে সমন্বয়ের পথ। অন্য দেশকে অনুকরণ না করে ভারতের নিজস্ব ভাবেতিহাসের ধারা অনুসরণ করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।[২৪]

তাঁর মতে মানুষের মধ্যে প্রেমই সভ্যতার মাপকাঠি—ধনৈশ্বর্য নয়। তিনি যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখতেন তা বিশ্বের সকল জাতি ও ধর্মের নিষ্কর্ষে গঠিত এক বিশ্বজনীন মানবতন্ত্রী সংস্কৃতিরূপে কল্পিত। প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন ও বৈজ্ঞানিক বিজয়ে পশ্চিমী সভ্যতার অবদান ও প্রচেষ্টাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। মন তাঁর প্রকৃতই উদার ও গুণগ্রাহী ছিল। তাই পশ্চিমী সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির সমবায়ে রচিত যুক্তিবাদ মানবতাবাদ ও জ্ঞানের আশীষে লব্ধ সৃষ্টিশক্তির মুক্তি তথা সংস্কৃতির বিকাশ তাঁকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা তাঁর ঐ সভ্যতার প্রতি অনুরাগ ভেঙে দেয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ প্রসার ও উৎপীড়ন তাঁর কবিমনে তীব্র আঘাত হানে। জীবনের অন্তিমকালে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সেকথাই যেন ব্যক্ত করেছেন।

প্রতীচ্যের হাতে প্রাচ্যের অবদমন ও লাঞ্ছনা এবং বিজিতদের হীনবীর্য ও হতবুদ্ধি করে তোলার ফলে সমন্বয়ধর্মী মনুষ্যত্বেরই অবমাননা ঘটে। গভীর বেদনায় তিনি প্রাচ্যের মুনিঋষিদের প্রদর্শিত শান্তি মুক্তি ও আলোর পথকেই বেছে নেন; উপলব্ধি করেন যে প্রেম প্রীতি শুভ সুন্দর সত্য ও ঐক্যের কথা একমাত্র ভারতই শোনাতে পারে। অনুভব করেন যে আফ্রোএশিয়ার দেশগুলিকে ক্রমান্বয়ে পদানত করে রাখার ফলে একদিন ইউরোপের বিনাশ ঘটবে। তাঁর মতে প্রাচ্যই মুক্ত আকাশের সন্ধান দিতে পারে যেখানে প্রতীচ্য সুখে তার পাখা মেলবে। তাই উভয়ের চাই ঐক্য ও সমন্বয়।[২৫] এখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিল দেখা যায়।

কবির দৃষ্টিতে সামাজিক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই ভারতের সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে ; সমাজজীবনে রাজনীতির প্রাধান্য ছিল না। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্নগুলিই ছিল বড়। এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় ; সেখানে এক একটা রাজ্য প্রাচীরবেষ্টিত সংকীর্ণ পরিবেশে গড়ে ওঠে, রাজশক্তির দাপটই ছিল বেশি। পক্ষান্তরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুর সমন্বয়ে বা বিবিধ ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। আর্যরা এদেশের মাটিতে ধর্ম ও কাব্যের বীজ বপন করে। দ্রাবিড়রা তাতে ভাব ও আবেগের বারি সিঞ্চন করে। বৌদ্ধরা নৈতিক আদর্শে ভারতীয় জীবনতরুকে মহামহীরুহে পরিণত করে। এমনিভাবে ভারতের মাটিতে আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। ভারতভূমিতে অতিমানসের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সমন্বয়ের সাধনাই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে— বিবিধের মাঝে মহান মিলনের সাক্ষ্য বহন করে।[২৬]

চার : রাষ্ট্রদর্শন

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক ও সামাজিক জীব হিসাবে দেখেছেন। সমাজেরই একটি আংশিক ও পেশাগত বিষয় হল রাজনীতি। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকেই তিনি অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সমাজকে জৈব (organic) প্রত্যয়ে বিচার করেছেন। মানুষের দুটি প্রবণতা তাঁর চোখে ছিল বড় ; একটি আত্মতৃপ্তি এবং অপরটি আত্মোন্নতি। মানুষ বিষয়আশয়ে সুখের সন্ধান করে আত্মকেন্দ্রিক জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায়। তাছাড়াও মানুষের মধ্যে আর একটি বৃত্তি নিহিত থাকে— সেটা হল সকলের শুভকামনা তথা সমাজের মঙ্গলচিন্তা। বংশ ও জাতি রক্ষার্থে এই পরার্থপরতার উৎস হল সহজাত জৈব প্রবৃত্তি। মনুষ্যপ্রকৃতির এ-দুধারা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : **'We have a greater body which is the social body. Society is the organism, of which we as parts have our individual wishes. We want our own pleasure and licence. We want to pay less and gain more than anybody else. This causes scramblings and fights. But there**

is that other wish in us which does its work in the depths of the social being. It is the wish for the welfare of the society' ।[২৭]

সামাজিক কাঠামোয় মানুষ বুদ্ধি ও বিবেক সংযোগ করে এবং সেই কাঠামোটা পারস্পরিক চিন্তা ও অনুভূতির সাযুজ্য বজায় রাখে। মানুষের শুভ ও সুন্দর বোধের উৎস হল সমাজ; সমাজের প্রয়োজন তার কাছে স্বভাবগত। মানুষের অহং ভাবকে সমাজই অতিক্রম করে এবং তার প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে। সমাজের মধ্যে দিয়েই সকল মানুষের মিলন ঘটে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'Society as such has no ulterior purpose. It is an end itself. It is a spontaneous self-expression of man as a social being. It is a natural regulation of human relationships, so that men can develop ideals of life in co-operation with one another. It has also a political side, but this is only for a special purpose. It is for self-preservation. It is merely the side of power, not of human ideals. And in the early days it had its separate place in society, restricted to the professionals' ।[২৮]

সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীস্বরূপ— সমষ্টিগতভাবে মানবিক মূল্যবত্তা একদিন সমাজের আত্মারূপে প্রতিভাত হয়। সমাজ দিব্যমানসের অভিব্যক্তি। মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে তার অন্তর্নিহিত সত্তার সাহায্যে সে বিকশিত হয়ে মহানুভবতা প্রদর্শন করতে পারে। সমাজের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ মানুষ এক নিগূঢ় ঐক্যের প্রাবল্য অনুভব করে। তিনি বলেছেন: 'For man, the best opportunity for such a realisation has been in men's society. It is a collective creation of his, through which his social being tries to find itself in its truth and beauty....In this large life of social communion man feels the mystery of unity, as he does in music' ।[২৯]

কার্যকারিতার দৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের মূল্যবিচার করেছেন। সমাজের কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসই সামাজিক উৎপীড়নের কারণ। আদিমকালে সামাজিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে কাজের বিভাগ-প্রয়োজনে জাতিবিন্যাসের উৎপত্তি ঘটে। আর্য ও দ্রাবিড়দের সংঘর্ষ এড়িয়ে একটা সমন্বয় ও সংহতি সাধনে সেই প্রথা কার্যকর হয়েছিল। সময়ের পরিবর্তনে ঐ প্রথায় ভাঙন ধরেছে। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল

মননের পুষ্টি সাধন, তাঁরা সেকাজে মৌরসিস্বত্ব ভোগ ছাড়াও অব্রাহ্মণদের জন্মগত-ভাবে পদানত করে রেখেছিলেন। তাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীবিশেষের উপর দেবত্ব আরোপের নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়; বর্ণাশ্রম তাই ক্রমে হৃদয়হীন ও হানিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁড়ামির যূপকাষ্ঠে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, অনুভূতি ও কর্মক্ষমতাকে বলি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করতেন মুক্তির আস্বাদ গ্রহণে মানুষ তখনই সক্ষম হবে যখন সামাজিক ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতার মোচন ঘটবে। সেজন্যে তিনি বলেছেন : 'It is evident that the caste-idea is not creative ; it is merely institutional. It adjusts human beings according to some mechanical arrangement. It emphasises the negative side of the individual— his separateness. It hurts the complete truth in man'।[৩০]

বংশানুক্রমিক মানমর্যাদার অধিকারের পরিবর্তে মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সামাজিক সকল সুযোগসুবিধায় সমানাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। আবহমানকালের এই অপ্রতিরোধনীয় নিয়মনিগড়ে সমাজ স্রোতহীন জলাশয়ের ন্যায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে— হারিয়ে ফেলেছে তার স্থিতিস্থাপকতা। জাতিভেদ শুধু পুরুষানুক্রমকেই বজায় রাখে এবং সমাজের স্বাভাবিক গতি ও পরিবর্তনশীলতাকে রোধ করে। জাতিভেদ-প্রথার বিরোধিতায় তিনি লিখেছেন : 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'।

বিচিত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার অন্যতম মানদণ্ড বলে মনে করতেন। ইউরোপে ঐক্য অর্জিত হয়েছে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। সেজন্যে ইউরোপে রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্যই শ্রেয়। ভারত বিচিত্রকে গ্রথিত করেছে সমাজের সূত্রে। নেশনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ যাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে তারা সবর্ণ, ভারত যাদের একত্র করেছে তারা অসবর্ণ। রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্য অন্যায় নয়, তবে ভারতের কাছে তা গৌণ। ইউরোপে রাষ্ট্রই প্রধান, ভারতে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ। ইউরোপে চরমস্বরূপ রাষ্ট্রকে জানার ফলে নেশনকে মানতে হয়েছে। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতর নেশন রূপ পরিগ্রহ করে এবং নানা তাগিদেই নেশন-স্টেট গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শক্তির উপর নির্ভর করে, সহযোগিতার উপর নয়। রাষ্ট্র জাতিকে বলবান করে ; আর মানুষকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সমাজ। নেশনবাদের পরিপোষণ করে নেশন-স্টেট। ভারতের জীবন সমাজ-কেন্দ্রিক ; সেক্ষেত্রে ইউরোপের জীবন নেশন-স্টেটকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ মনে

করতেন মানুষ সার্থক হতে চায় নিজেকে সবার স্বার্থে বিলিয়ে দিয়ে, মানুষ কল্যাণকামী, সে চায় সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন, মানুষের সমাজবোধের সার্থক পরিণতি বিশ্বমানবতায়। সেখানে সকল জাতি হয় একাত্মবোধে আবদ্ধ। কবি সেই মঙ্গলদায়ক সমাজ গড়তে চেয়েছেন ; এ-চাহিদা নেশন-স্টেট মেটাতে অক্ষম। বিরোধিতাকে ভারত অপাঙক্তেয় করে নি, পরকে শত্রু মনে করে নি, বহুমুখী পথ ও বিচিত্র মতকে সমাজে ঐক্যবদ্ধ করেছে ; সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে সকলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নেশন-স্টেট ভারতীয় ভাবধারার পরিপন্থী এবং শক্তির দম্ভে মত্ত ; মিলনের পরিবর্তে নিরঙ্কুশ জবরদখলেই তার তুষ্টি ; সেখানে প্রেমের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ যে-স্বদেশী সমাজের চিত্র তুলে ধরেন সেখানে ব্যক্তিমানুষের সত্তাকে সকলের সমবায়ে শক্তিশালী করার কথাই বলা হয়েছে। তাঁর মতে সমাজদেহের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির সত্তা বিচ্ছুরিত হয়। সমাজবন্ধনের শিথিল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে চাই সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ রূপ। সমাজজীবন প্রকৃতই প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠবে যদি তার অধিবাসীরা নিজেদের কর্তব্য নিষ্ঠা-সহকারে পালনের সঙ্গে পারস্পরিক সমতাবোধ পোষণ করে।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী রাষ্ট্রদর্শনে মানুষের নীতিপ্রবণ সমবায়ী সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হেগেল ইতিহাসকে march of the absolute এবং রাষ্ট্রকে Divine Idea রূপে দেখেছিলেন। তদনুসারে যাবতীয় কল্যাণ-প্রয়াস ও নৈতিকতার ধারক ও পরিপোষক হল রাষ্ট্র ; মানুষের ভূমিকা কেবল রাষ্ট্রের কাছে অনুগত থাকা। উচ্চাসনে আসীন মুষ্টিমেয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি সেখানে ইতরজনের শিক্ষক ও গুরুরূপে কাজ করেন। তাঁরাই রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা এবং সমাজের প্রণম্য। হেগেলের উত্তরসাধক মার্কস উৎপাদনাশ্রয়ী শ্রেণী সম্পর্কের পটভূমিতে রাষ্ট্রের চরিত্র ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্রকে মার্কস উৎপীড়নকারী (coercive) বলে মনে করতেন। শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং ক্রমে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধিত হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি না চাইলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পৃথকরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৩২]

অধিকারতত্ত্ব

মানুষের অধিকারকে রবীন্দ্রনাথ যথোচিত মূল্য দিয়েছেন। তবে অধিকার কেবল নিঃশর্ত ভোগের জন্য নয়— উচ্চতর মূল্যবত্তায় নিঃস্বার্থ অবদানেই অধিকারের

সার্থকতা নির্ভর করে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছেন : 'In fact, the only true human progress is coincident with this widening of the range of feeling. All our poetry, philosophy, science, art and religion are serving to extend the scope of our consciousness towards higher and larger spheres. Man does not acquire rights through occupation of larger space, nor through external conduct, but his rights extend only so far as he is real, and his reality is measured by the scope of his consciousness'।[৩৩]

প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জীবনের আস্বাদ পেলে মানুষকে কতকগুলি অধিকারের জন্যে অনর্থক যুঝতে হয় না— তার অধিকারগুলি অন্তরাত্মার অমর অধিকারস্বরূপ দৃঢ়তা ও স্বীকৃতি অর্জন করে। জাত্যভিমান ও শক্তিমত্ততায় মনুষ্যত্বের যে-অবমাননা ঘটে কবি তার প্রতিকারস্বরূপ ঐশ বিধানকে সুবিচার ও স্বাধিকারের রক্ষকরূপে দেখার নির্দেশ দেন। ভোগের লালসা ও দুর্নিবার শক্তিলিপ্সা প্রবল হলে ঐশ শান্তিও বিঘ্নিত হয়।

বিবেকানন্দের মতো তিনিও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগতভাবে অধিকার অর্জনের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। পরাধীনতার গ্লানি অন্তরের ঐশ প্রভাকে নিষ্প্রভ করে তোলে— সেটা অসত্য ও অবিচারের কাছে মাথা নত করার সামিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিদেশী শাসকদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারকে রুখতে হলে প্রথমে নিজেদের নৈতিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলা দরকার।

তাঁর মতে পরাধীনতা মানুষের নৈতিক অধঃপতন শুধু ঘটায় না, মানুষের আত্মাকেও অবমানিত ও অবদমিত করে। বস্তুতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেই মানবিক অধিকার নির্ভর করে। ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

মুক্তির প্রত্যয়

মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্রকে মাপকাঠি করেছেন। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে দুটি দিক আছে। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত।[৩৪] এর একটিকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে তা অবাস্তব। তিনি উভয়ের সমন্বয় চেয়েছিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনে যাকে 'ফ্রিডম' বলা হয় রবীন্দ্রনাথ তাকে চঞ্চল, ভীরু স্পর্ধিত ও নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়েছেন।[৩৫] ভারতীয় ভাবানুসারে

'ফ্রিডম' বা মুক্তির তিনি ভিন্ন রূপ নির্দেশ করেন— তার মর্ম হল আত্মার বিকাশ ও তার চরম উপলব্ধি ; কোনও সংকীর্ণ মতবাদে তা আবদ্ধ নয়। পূর্ণাঙ্গ মানব-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পিত এই মুক্তির উৎস মূলতঃ ঔপনিষদ দৃষ্টিভঙ্গী ; পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদর্শনের পরিধি অপেক্ষা তা বহুলাংশে বৃহত্তর। পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তায় মানুষ কিছুটা স্বার্থান্বেষী ও আত্মকেন্দ্রিক। সেখানে কখনো দৃষ্টবাদ এবং কখনো বা বস্তুবাদের প্রাবল্য— আত্মার স্থান সেখানে গৌণ। আবার সমষ্টিবাদী চিন্তায় মুক্তির কোনও স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের মুক্তমানুষ অহংবাদী নয়— বিরাটবিশ্বের সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ। মুক্তির জন্য মানুষের চেতনা ও সংগ্রামের প্রয়োজন যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন, তেমনি লব্ধ মুক্তিকে মানবিক কল্যাণার্থে দায়িত্ব ও কর্তব্যে যুক্ত করতে চেয়েছেন।[৩৬]

প্রকৃতি ও ইতিহাসের নির্দেশনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে জৈব তাগিদে মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাহ্যজগতের বন্ধন থেকে মুক্তি যদি পাওয়া না যায় তাহলে মানুষের আধ্যাত্মিক জগতে বাধাহীন বিচরণ অসম্ভব। একমাত্র মুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ সৃজনসত্তার অনুকূল। অতিমানস-শক্তির অপরিসীম সৃজন-প্রবাহ আর্টের উৎকর্ষ সাধন করে। সৃজনসত্তায় আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত থাকে— মুক্তি সেই বীজোদ্গমেরই ফল। কবির মতে জৈব তাগিদের বন্ধন থেকে মানুষ ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।[৩৭]

মানুষের কর্মতৎপরতার অবাধ অধিকার যেমন তাঁর কাম্য ছিল, তেমনি মননেরও তিনি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কামনা করেছেন। কেন্দ্রীভূত শক্তিকে তাই তিনি নিন্দা জানিয়েছেন ; সংকীর্ণ সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও যান্ত্রিক আচারবিচারও মুক্তির পরিপন্থী বলে মনে করতেন।[৩৮] মানবাত্মার অনাবিল স্বাধীনতাই ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর মতে প্রেমই হল মুক্তির পথ। আত্মোপলব্ধির দ্বারা উদ্ভাসিত অন্তরই মুক্তির বাণী বহন করে। সহৃদয় সাহচর্য, হৃদয়গভীর সমবেদনা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অহংবোধ মানুষের জীবনকে নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীনতায় আচ্ছন্ন করে তোলে এবং মুক্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সমবেদনা ও সমন্বয়ের পথে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি মুক্তি ও মিলনের দিকে অগ্রসর হয়। সর্বব্যাপী অসীম সৃজনীশক্তির আধার ঈশ্বরের নিষ্কাম উপলব্ধিতেই মুক্তির পথ সুগম হয়ে ওঠে।[৩৯]

কবির নিগূঢ় মুক্তির প্রত্যয় ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে একটি বিশেষ অবদান। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য নয়। স্বাধীনতার দ্বারা আনন্দময় সামাজিক

সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সর্ববিধ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবিধি ও নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে তিনি মুক্ত, সৃজনশীল জীবনের জয়গান করেছেন। যে-যূথবাদী সভ্যতায় ব্যষ্টিকে গোষ্ঠীর বেদীমূলে বলি দেওয়া হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তিসত্তাকে দমন করা হয় তার তিনি তীব্র নিন্দা করেন।[৪০]

সকল দেশেরই রাজনৈতিক মুক্তির দাবি তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়। তাঁর মতে ভারতের স্বাধীনতা একদিকে যেমন এদেশকে উজ্জীবিত করবে অন্যদিকে তেমনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশকে পূর্ণ করে তুলবে। ১৯৩২ সালে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতের মৌলিক অধিকারস্বরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেন এইজন্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভারতের নিশ্চল জীবনে গতি সঞ্চার করবে, দেশবাসীর মনে গণতান্ত্রিক চেতনার সহায়ক হবে। পূর্বে তিনি স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশ নীতিকেও সমর্থন করেছিলেন ; কিন্তু শাসন সংস্কার বানচাল করে দেবার যে-পন্থা ঐদল অবলম্বন করে তাতে তিনি সায় দিতে পারেন নি। গান্ধীর রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগদানকে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সহযোগী সম্পর্ক গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন তা সমপর্যায়ভুক্ত বন্ধুত্বের। মুক্তি ও সমানাধিকারের প্রশ্ন স্বতঃসিদ্ধ।

দ ণ্ড নী তি

রবীন্দ্রনাথ 'দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে' বর্বরতা মনে করতেন। হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিকার হয় না বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। এমনকি নির্জন কারাকক্ষ-বাস, দ্বীপান্তর ও নির্বাসনেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডদান তাঁর কাছে অকল্পনীয় অমানুষিকতা হিসাবে বিবেচিত। তাঁর মতে প্রচলিত শাস্তিবিধানের দানবিক দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে যেন সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে। শাস্তিদানের নির্দয় প্রণালী এদেশে পাঠশালা থেকে পাগলা গারদ পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কারণ মানুষের মনে বর্বরতা রয়ে গেছে, নির্দয়তায় সে তৃপ্তি পায়। সভ্য দেশে এই প্রথা কিছুটা রহিত হয়েছে।

সাধারণতঃ অপরাধীদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারে মন বাধা পায় না। ধরে নেওয়া হয় তারা সকলের মতো নয় ; তাই তাদের প্রতি আচরণ নির্মম অত্যাচারের রূপ নিলে সারা

সমাজের সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজের অন্তরে সুপ্ত নির্দয় প্রবৃত্তি এদের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তি সংশোধন করা কর্তব্য। কারাশ্রয়ী দণ্ডবিধির দুর্বিসহ উগ্রতা আপন সীমা অতিক্রম করে। তাই তাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। জেলখানাগুলিকে তিনি 'হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক ফ্যাসিজমের জন্মভূমি' বলে অভিহিত করেন।

কাজির বিচারের দিন চলে গেছে। এখন অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্যে প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের মাধ্যমে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর নিয়োগ প্রচলিত হয়েছে। তবুও অপরাধের যথোচিত মীমাংসা হয় না, নির্দোষ মানুষ দণ্ডভোগ করে। নিঃসন্দেহে দোষ প্রমাণের অসুবিধা থাকলে শাস্তিবিধানে করুণার স্থান রাখা বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক খুনজখম, লুটপাটের জন্যে যারা দায়ী তারাও অন্যান্য অপরাধীদের চেয়ে কম ঘৃণ্য নয় বলে তিনি মনে করতেন।[৪১]

স্বরাজ ও স্বদেশপ্রেম

স্বরাজ শব্দটি সম্পর্কে ভারতের তৎকালীন বিভিন্ন জননেতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। স্বরাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরও একটি নিজস্ব মনোভাব ছিল। তিনি মনে করতেন: 'বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়'।[৪২]

এই সৃষ্টিকর্ম আনন্দ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মশক্তির পরিবর্ধক—সকলের সমবায়ে সকলের মঙ্গলবিধানই তার লক্ষ্য। মঙ্গলকর্মকে তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন: 'স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে।' স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকেই তিনি দেখতে চেয়েছেন।

স্বরাজসাধনায় চরকা তত্ত্বের তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে চরকা কেটে যিনি স্বরাজসাধনা করেন তিনি যন্ত্র, নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন; সেই কাজে সামগ্রিক অভ্যুন্নতির কোনও আশা নেই। তিনি বলেন: 'যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে

সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে ; তার পরে একটা দীপের থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না ; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবুদ্ধির পথে'।[৪৩]

স্বদেশপ্রেম সম্পর্কেও তাঁর বৈপ্লবিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশকে তিনি গভীরভাবেই ভালবাসতেন। দেশের জন্যে তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজের পরিমাণ অপরিমেয়। কিন্তু তাঁর ভালবাসার পিছনে কোনও অন্ধ আবেগ ছিল না। দেশকে ভালবাসতেন তিনি দেশের অধিবাসী হিসাবে নয় ; মানুষ হিসাবেই তিনি দেশবাসীর যাবতীয় দুর্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বন্ধু এণ্ডরুজকে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন : 'I love India, but my India is an Idea and not a geographical expression. Therefore I am not a patriot—I shall ever seek my compatriots all over the world'।[৪৪]

জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর যে সুস্পষ্ট দর্শন ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বরাজ ও স্বদেশচিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। স্বদেশপ্রেমের জন্যে তিনি অপরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি ; চেতনাকে সংকুচিত করেন নি। তাই নেশন হিসাবে ইংরেজের আচরণকে গর্হিত মনে করলেও উন্নতমনা ইংরেজের প্রতি ভালবাসা জানাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। যে কোনও দেশের হিংসা, লোভ, অত্যাচার ও আধিপত্য বিস্তার-প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষকে তিনি যেমন নিন্দা করেন তেমনি কোরিয়ায় জাপানি সাম্রাজ্যবিস্তারী ক্রিয়াকলাপকেও ধিক্কার জানান।

জাত্যভিমান না থাকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ বলে কিছু ছিল না বললেই চলে। সারা বিশ্বই তাঁর স্বদেশ। ১৯২০ সালের পর গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে জাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে তিনি তা সমর্থন করেন নি। আবার ভারতীয়দের উপর ইংরেজের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেও কোনও দিন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অন্ধ দেশহিতৈষার অন্তরালে তিনি স্থূলতা, নির্বিবেক লালসা এবং মানবিকতার পরিবর্তে আত্মম্ভরিতা প্রত্যক্ষ করেন। অন্তরের ন্যায়, নীতি ও যুক্তির মানুষটিকে কবি স্বদেশপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন ; সমকালীন স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যধারায় তিনি বিশ্ববিমুখ মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল বিশ্বমানবতার প্রাথমিক স্তর। সমগ্র

মানবসমাজেরই তিনি মুক্তি ও উন্নতি কামনা করেছিলেন; ভারতপ্রেম তার খণ্ডচিত্র।[৪৫]

ন্যাশন্যালিজম

যে সমাজচিত্রপটে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটেছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সে পটভূমিকায় জন্মায় নি। উভয়ের উদ্ভব, পরিবেশ ও কারণগুলি ছিল ভিন্ন। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ, বিশ্বব্যাপী বাজার দখল, পররাজ্য গ্রাস ও শোষণের তাগিদে উদ্ভূত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঐ আধিপত্য থেকে মুক্তির প্রেরণায় উৎপন্ন হয়। তাই ভারত ও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ বন্ধুত্বের নয়, বৈরিতার। সামনের দিকে তাকালেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মন ছিল পিছনটানে বাঁধা— কারণ সাহস, শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য ভারতকে অতীতের দিকে মনোনিবদ্ধ করতে হয়েছে; সেজন্য অন্ধ বিশ্বাস, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও সংকীর্ণ মনোভাবে ভারতীয় চিন্তা আবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত পরিবর্তনশীল, বিশ্বপ্রগতির দিক থেকে সংকীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল। রামমোহনের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ এদেশের জাতীয়তাবাদী আদর্শে সায় দিতে পারেন নি।

'ন্যাশন্যালিজম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেছেন যে জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার মনুষ্যত্বকে অবরুদ্ধ করে। কাল্পনিক এক সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সৃজনশীল সত্তার বিকাশকে ব্যাহত করে। নেশনের দাপটে ব্যক্তি যে শুধু যন্ত্রে পরিণত হয় তাই নয়, তার গতি ও প্রকৃতি নিরঙ্কুশ শক্তিমত্ততা ও ভীতির উপর অবস্থান করে। সেজন্য তিনি বলেন যে মানবতার প্রয়োজনে আজ আমাদের শক্ত সোজা দেহে সরব হতে হবে এই বলে যে জাতীয়তা এক নির্মম মহামারী; তার পাপপঙ্কিল সংক্রামক ব্যাধি আজ মানবসমাজে ঘুণ ধরিয়ে মানুষের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে তুলছে।[৪৬]

দেশেবিদেশে জাতীয়তাবাদের যে-চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার তিনি তুলনা করেছেন। অপরের স্বাধিকার খর্ব করে নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। অকাট্য যুক্তি ও ঔদার্যের সাহায্যে তিনি এমন এক আদর্শ সমাজচিত্র তুলে ধরেন যেখানে কোনও দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকবে না— ঐক্য ও মিলনই একমাত্র লক্ষ্য ও পরিণতি। এই

মিলনের মাঝখানে রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সীমার কোনও স্থান নেই। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অনুগামী বলা যায়।

স্বদেশকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবেই ভালবাসতেন। যে-মাটিতে তাঁর জন্ম ও যেখানকার জলহাওয়ায় তিনি পরিপুষ্ট তার প্রতি তাঁর সানুরাগ আবেগ ও আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। তবে দেশ বলতে তিনি কোনও ভৌগোলিক গণ্ডিকে মনে স্থান দেন নি, দেশ তাঁর কাছে মানসিক ; সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের কোনও দেশ নেই, সারা বিশ্বই তাঁর দেশ ও বিচরণক্ষেত্র, সকল দেশই তাঁর জীবনসাধনার পুণ্যভূমি। সমগ্র মানব সমাজ তাঁর চোখে এক ও অখণ্ড। তাই তিনি বিশেষ কোনো দেশের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী গণ্ডিতে বিচরণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

মানুষের আত্মিক সৌহার্দ্য ও সংযুক্ত বিশ্বরাষ্ট্রই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তাঁর কাছে জাতীয় সরকারের বিশেষ আবেদন ছিল না। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, যার রুদ্ররূপদৃষ্টে মানবসভ্যতা সংকটাপন্ন। জাতীয় গরিমা সংকীর্ণ চিন্তার পরিচিতি বহন করে এবং আধ্যাত্মিক মন ও অনুভূতির অভাব দর্শায়। সাম্রাজ্যবাদের অংকুরও অন্ধ দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদে নিহিত। তাঁর কাছে জাতির চেয়ে মানুষই ছিল বড়। ভারতের শাশ্বত ভাবধারায় তিনি সেই প্রেরণাই পান ও তাকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসী হন। তিনি বলেন : 'স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে, বিশ্ব-নেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে'।[৪৭]

জাতিপূজা তাঁর কাছে ছিল বর্জনীয়। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদের নেশায় আচ্ছন্ন মানুষ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে স্বীয়সৃষ্ট দানবের ক্রীড়নক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ক্রমে উপনিবেশ বিস্তারের লালসায় নিজের সমূহ শক্তিকে বিনিয়োগ করে। জাতীয়তাবাদের সংঘশক্তির দাপটে নিজ অস্তিত্বের শুভ উদ্দেশ্য মানুষ ভুলে যায়— প্রেম, প্রীতি, মুক্তি ও নৈতিক আদর্শ বলে আর কিছু থাকে না।

জাতীয়তাবাদ আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রণহুঙ্কারে মুখরিত; মানুষের শুভসত্তাকে খর্ব করে শাসকেরা মানুষকে যুদ্ধের পুতুলে পরিণত করেছে।[৪৮]

জাত্যভিমানের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে ঐশ রাজ্যের নাগরিক করে তুলতে চেয়েছেন। বিশ্বমানবকে তিনি সংঘবদ্ধ, সর্বগ্রাসী জাতীয়তাবাদী যন্ত্র-দানবের সঙ্গে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন; মানুষের সুপ্ত শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে মানুষের মননশীলতার যথোচিত কর্ষণেই জাত্যভিমান মোচন করা যায়।

পশ্চিমী সভ্যতায় বেনিয়া মনোভাব ও তারই তাগিদে পররাজ্য গ্রাসের প্রবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানান। সেইসব অত্যাচারী দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতিতেও বিদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতির মনোভাব পরিস্ফুট। সেখানে প্রেম ও প্রীতির স্থান নিয়েছে যুদ্ধের উপকরণ।

পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান ও গবেষণায় তিনি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান ছিলেন; সেখানকার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও উদারতার মন্ত্রে তিনি প্রেরণা সঞ্চয় করেন। পশ্চিমী রাজনীতিতে মানুষের সামাজিক অধিকার, নাগরিক বোধ ও চেতনারও তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের নামে পশ্চিম যে সংঘবদ্ধ দানবশক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ তীব্র কশাঘাত হানেন। আফ্রোএশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির রক্তশোষণ ও নিপীড়নে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ লোভ ও লালসা পরিণামে মানবতা ও সভ্যতার পক্ষে চরম বিপদ বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সাম্রাজ্যবাদের রক্তলোলুপ দৃষ্টির সম্প্রসারণ শান্তিকামী নিরীহ প্রাচ্যের নিকট ভয়াবহ সংকটরূপে উপস্থিত। প্রতীচ্যের এই দানবীয় আচরণকে অনুসরণের জন্যে তিনি জাপানেরও নিন্দা করেছিলেন।[৪৯]

কবি অনুভব করেন যে রুসো, বার্ক প্রমুখ দার্শনিকদের প্রভাব ইউরোপে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে; বিজ্ঞানের যূপকাষ্ঠে সেখানে মানবতাকে উৎসর্গ করা হয়েছে; রাজনৈতিক আধিপত্যের তাগিদে সামাজিক মূল্যবত্তাকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমী মনোভাবে মানবিক আদর্শ ও সমবেদনা অপস্রয়মান; অপর দেশকে অর্থনৈতিক শোষণের অভিসন্ধি তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অবনত করেছে। এই যান্ত্রিক ও নির্মম প্রবৃত্তি একদিন হীনবীর্য হয়ে পড়বে— রবীন্দ্রনাথের সে-সতর্কবাণী আজ প্রমাণিত হয়েছে।

গান্ধীর রাজনৈতিক পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ তেমন গ্রহণ করতে পারেন নি।

কারণ তিনি মনে করতেন গান্ধীনীতি সংকীর্ণ চিন্তাপ্রসূত জাতীয়তাবাদে প্রতিষ্ঠিত— ভারতের সনাতন বৈশ্বিক ভাবধারা থেকে গান্ধীনীতি পৃথক। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোয় জাতিবিদ্বেষই প্রকাশ পায়— তাই সে-নীতিকে তিনি সমর্থন করেন নি।[৫০]

ক মি উ নি জ ম

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হল রুশ বিপ্লব, যা তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবীর সংগ্রামে কবির সহানুভূতি ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর অনুকূলে। তাই বলে তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেন নি। আত্মকেন্দ্রিক নির্বিবেক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তাঁর যেমন রুচি ছিল না, তেমনি অন্ধ সাম্যবাদেও তাঁর সমর্থন ছিল না। লক্ষ্য ও পদ্ধতির (end and means) মধ্যে সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী ছিলেন বলে রক্তঝরা বিপ্লবের পথ তিনি অনুমোদন করেন নি। অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও জাতিগত বিদ্বেষবন্ধন থেকে মুক্তির বাণী রুশ বিপ্লবে ধ্বনিত হয়েছিল। তাই মানবতন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রথমে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু রুশ দেশ ভ্রমণে তাঁর ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে গোড়ার দিকে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাচন আছে, কিন্তু শেষের দিকটা ক্রমেই সংশয়মিশ্রিত হয়ে ওঠে।

খোলা মন নিয়েই তিনি সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে যান; দেখার 'প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক'।[৫১] কিন্তু সেখানকার অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি; প্রত্যক্ষ করেন: 'আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই'।[৫২] বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের নামে যে 'যথেষ্ট জবরদস্তি আছে' তাও তিনি লক্ষ করেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন; তাই রাশিয়ায় সমষ্টির নামে ব্যক্তিস্বার্থের বলিদানকে নিন্দা করেছেন। দ্বাদশ চিঠিতে লিখেছেন: 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিষ্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে'।[৫৩]

সমাজকে নবরূপে গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই উপযুক্ত শিক্ষা—একথা রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই উপলব্ধি করে সেই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সোভিয়েত দেশের একনায়কতন্ত্র তাঁর পছন্দ না হলেও সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরাট উদ্যোগ ও অগ্রগতি তাঁর মনকে বিশেষ স্পর্শ করে। সেখানে গিয়ে তিনি রাজনীতির কথা বিশেষ তোলেন নি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কেই তিনি আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা করেন।

পুঁজিবাদীদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলেই কমিউনিজমের উদ্ভব ; তার ভিতরে মানবিক মূল্যবত্তাগুলি ক্রমে একদিন যে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেই আশা তিনি ব্যক্ত করেন। সোভিয়েত দেশ দেখে এসে লেখা তাঁর প্রশংসাপত্র পড়ে স্বদেশের লোক যাতে কোনও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হয় সেজন্যে যেন উপসংহারে তিনি সবিস্তারে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ভাল ও মন্দ উভয় দিকের একটা ভারসাম্য ব্যাখ্যা করেছেন : 'সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি···যেখানে আশুফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না।··· সেখানকার পলিটিকস মুনাফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া-রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে'।[৫৪]

সম্পত্তির যৌথ অধিকার প্রত্যয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য পুঁজিবাদী দেশে সম্পত্তিতে সর্বনাশা একচেটিয়া স্বত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাহলেও গ্রীন বা হেগেলের মতো তিনিও মনে করতেন যে সম্পত্তি ব্যক্তিত্বেরই একটি চাহিদা। মানুষের রুচি, কল্পনাশক্তি ও সৃজনসত্তা সম্পত্তির বাহ্য রূপ পরিগ্রহ করে। তবে রবীন্দ্রনাথ লালসার সম্ভাররূপে সম্পত্তিকে দেখেন নি—শাশ্বত সত্তার স্ফুরণে সহায়কস্বরূপ সম্পত্তির প্রয়োজন ও সার্থকতা অনুভব করতেন। কমিউনিজমের বৈপরীত্যে প্রকারান্তরে তিনি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক ছিলেন। সমবায়ী প্রণালীতে শ্রমজীবীদের স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হবার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন। সব কিছু বিষয়ে সরকারের উপর নির্ভরতার মনোবৃত্তি তাঁর মতে অসঙ্গত। উৎপাদিত বস্তুর অসম

বণ্টন এবং ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের নীতিবিবর্জিত মতিগতিকে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে নিন্দা করেছেন।[৫৫]

ফ্যাসিজম

১৯২৬ সালে মুসোলিনির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইতালি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তার আগে মুসোলিনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে বিস্তর গ্রন্থ দান করেছিলেন। সোভিয়েত দেশ দেখবার যেমন 'প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোর দিক', ইতালিকেও তিনি অনুরূপ দৃষ্টিতে দেখে মুসোলিনির প্রশংসা করেন। সারা ইতালি ঘুরেও সেখানকার বীভৎস রূপ তাঁর চোখে পড়ে নি। ফেরার পথে রোমাঁ রোলাঁ, অধ্যাপক সালভাদোরির স্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারেন কী চিন্তা ও কর্মপন্থায় ফ্যাসিবাদ সভ্যতা ও মানবতার আমূল পরিপন্থী। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সেইসময়ে এণ্ডরুজকে লিখিত এক পত্রে ফ্যাসিবাদের নগ্ন চিত্র তিনি উদঘাটিত করে দেন। সেইসময়ে তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত ভ্রান্তি নিরসনকল্পে সেই পত্রে তিনি লেখেন: '...The methods and the principle of this Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience and walks through a blood stained path of violence...That barbarism is not altogether incompatible with material prosperity may be taken for granted but the cost is terribly great — it is fatal'।[৫৬]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তাঁর অন্যতম প্রিয়পাত্র সুভাষচন্দ্রের মনে রবীন্দ্রনাথের এই চেতনা আদৌ রেখাপাত করে নি। সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। মুসোলিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের আদর্শ। কবি সে-বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেন নি। কবি বিশ্বের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

বিশ্বজনীনতা

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা আজকালকার ফাঁকাবুলির মতো ছিল না। তাঁর চিন্তার পিছনে ছিল সুস্পষ্ট দার্শনিক প্রত্যয়। মানুষকে তিনি চিরন্তন পথিকরূপে

দেখেছেন ; পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে পথিক পাকা বাসা বাঁধার প্রয়াসী হলে তাকে পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হতে হয়। অন্তরের অসীম অনায়ত্তের অনুসন্ধানে সে ঐ পথের পথিক। উক্ত অনুসন্ধান বৈষয়িক কোনও সুখের দ্বারা তাড়িত নয় ; স্বরচিত স্থূল বাধাবিপত্তিগুলিকে অতিক্রম করে অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে উদ্ধার তথা জনারণ্যে বৈশ্বিক মানবকে প্রকাশমান করার তাগিদে মানুষ সর্বশক্তি প্রয়োগে উদগ্রীব। মানুষের জীবনসাধনার লক্ষ্য শৃঙ্খলিত আত্মার বন্ধন মোচন দ্বারা মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া— এই সাধনার বিষয়বস্তু হল মানুষ ও তার বিশ্বপরিবেশ। মানুষের জৈব অস্তিত্বের কাল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার মনুষ্যত্বের মেয়াদ সীমাহীন। মানুষ চায় সর্বজনস্পর্শী ও সর্বকালব্যাপী হতে— সেজন্যে যে-সত্যের প্রকাশ সে কামনা করে তা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন। জৈব অস্তিত্বের অতিরিক্ত প্রাচুর্যে মানুষ নিজের স্থূল সত্তা অতিক্রম করে অসীম বৈশ্বিক মানুষে উপনীত হতে চায়।[৫৭] আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'My religion is in the reconciliation of the Super-personal Man, the universal human spirit, in my own individual being'।[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ অনুশোচনা করেছেন যে, চেতনা ও উপলব্ধির অভাবে বৈশ্বিক মানুষের বিকাশ সদাই ব্যাহত হয়। মানুষে মানুষে নৈকট্য সাধিত হলেও তার মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমবায়ী মনোভাব অনুপস্থিত। নৈতিক বিকার মহামারীর মতো পরিব্যাপ্ত। সারা দুনিয়া জুড়ে বিরাজ করছে অসূয়া, লোভ, ঘৃণা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও জাতিবিদ্বেষ। মানুষের এই পাশব শক্তির পরিহার ও আত্মার মুক্তির জন্যে কবি মানবসমাজের উদ্দেশে বলেছেন : 'claim the right of manhood to be friends of men and not the right of particular proud race or nation'।[৫৯]

যে-সময়ে সারা বিশ্ব জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষ ও বিভেদ প্রসূত হলাহল পানে উন্মত্ত সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসমাজকে একই মালায় গাঁথতে চেয়েছিলেন ; তিনি এই বলে সতর্ক করে দেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকলে পরিণামে তা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। মানুষের ধর্ম তার ঐক্যের মধ্যে নিহিত। শ্রীঅরবিন্দও সেই একই কথা বলেছিলেন। পৃথিবীটাকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক রেষারেষি ও কলহের আধার হিসাবে না দেখে মানুষের শাশ্বত আত্মার পবিত্র বাসভূমিরূপে দেখেছেন ; হৃদয়গভীর আবেগে তিনি কামনা

করেন বিশ্বজনীন মিলন; সেই বিশ্বজনীন মিলনের পথ হল সকল জাতির শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন বিকাশ। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মাঝে যে-প্রাচীর গাঁথা হয়েছে তার আশু অপসারণ চাই, যাতে অবাধ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে সম্প্রীতি, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমরাঙ্গনে মানুষের মনোমালিন্যের নিষ্পত্তির প্রয়াস তার দেউলিয়া মনেরই পরিচয় দেয়।[৬০]

তিনি উপলব্ধি করেন আধ্যাত্মিক বোধ ও অনুভূতির উপর বিশ্বমানবতন্ত্র রচিত হবে। সেজন্য চাই বর্বর রীতিনীতির পরিবর্তে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা; যাতে ভয়, অবিশ্বাস, বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অতিক্রম করে শান্তি, মৈত্রী, সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়। ভারতের শাশ্বত বাণীর প্রতীক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধরূপে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা তাঁর সেই চিন্তারই নিদর্শন।

পাঁচ : আর্থনীতিক চিন্তা

অর্থনীতির তত্ত্বগত চিন্তা রবীন্দ্রসাহিত্যে বেশি কিছু পাওয়া না গেলেও সে-সম্পর্কে তাঁর কালোপযোগী চেতনা ও সুস্পষ্ট মনোভাব ছিল। তাঁর জীবনকালে দেশের শিল্পোন্নয়ন ধীর গতিতে দেখা দেয়; প্রধানতঃ অনুন্নত কৃষিকর্মেই দেশের অর্থনৈতিক ধারা ছিল প্রবাহিত। আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের প্রশ্ন স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ কাটিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতির গোড়াপত্তন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই শুরু হয়।

আধা সামন্ততান্ত্রিক বংশোদ্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারি প্রথাকে সুনজরে দেখেন নি; মনে করতেন ঐ সব কায়েমী স্বার্থান্বিত শ্রেণীর লোকেরাই বিদেশী শাসনকে বাঁচিয়ে রেখেছে; তাছাড়া পূর্বের সামন্ততান্ত্রিক অধিপতিদের শৌর্যবীর্যের বিন্দুমাত্র পরিচয় সমসাময়িক জমিদার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে অবর্তমান বলে তিনি অনুভব করেন; তারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত— সমাজের মঙ্গলবিধানে তাদের কোনও চিন্তা নেই। পরাশিত (parasite) এই শ্রেণীর লোকদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৬১] দেশ ও সমাজের নবরূপায়ণ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বেও যে সম্ভব নয় সে কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর

মতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীই সমাজোন্নয়নের নেতৃত্ব দেবে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা তিনি বলেন নি। ফিউডাল, বুর্জোয়া ও সোসালিষ্ট অর্থনীতির কোনটিকেই গ্রহণ না করে তিনি চতুর্থ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন তা হল সমবায় অর্থনীতি।

আইরিস কবি জর্জ রাসেলের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের কিছু আত্মীয়বর্গ সমবায় প্রথার রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের অনুগামীরূপে ঐ প্রথাকে তত্ত্বগত-ভাবে প্রচার ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে তিনি তৎপর হন। সোভিয়েত দেশ ভ্রমণেও তিনি সেই আদর্শের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শ্রীনিকেতন কবির সেই প্রচেষ্টার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ ও নিরানন্দ জীবন থেকে সমবায় প্রথার সাহায্যে মুক্তি পাওয়া যায়। 'সমবায়নীতি' পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন: 'আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যবসা বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিতে শস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক এক জায়গাকেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরি কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।'[৬২] অর্থনীতির ক্ষেত্রেই শুধু আবদ্ধ না রেখে সমবায়নীতিকে তিনি সর্বব্যাপী ও সুসংবদ্ধ সামাজিক কাঠামোর বনিয়াদরূপে কল্পনা করেন; সর্বক্ষেত্রে সংঘাতের পরিবর্তে চান সহযোগিতা—বিভেদ ও শোষণের পরিবর্তে সমবায়। সমবায়ের মধ্যে দিয়েই ধন-বৈষম্য ও শোষণ বিদূরিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তবে সেইসঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করতেন যে 'শক্তি উদভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে'।[৬৩] অবশ্য পরিমাণ লঙ্ঘনকারী সেই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে বিধিসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেছেন। আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে 'ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই

দুয়ের কোনটাই মানবসমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়' বলে তিনি মনে করতেন। রক্তঝরা বিপ্লব পরিণামে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল দেখা যায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ; এখানকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রধানতঃ কৃষিকর্মের উন্নয়নেই যে নির্ভর করছে সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথোচিত অবহিত ছিলেন। কৃষি-অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জমির মালিকানা প্রসঙ্গে তিনি মনে করতেন যে শুধু জমিদারি প্রথার অবসানে এ-সমস্যার সমাধান হবে না ; জমির অবাধ হস্তান্তরের অধিকার কৃষকের থেকে গেলে দারিদ্র্যহেতু ক্রমে সমস্ত জমি মহাজন ও জোতদারের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। তাই লাঙল যার জমি তার এ-নীতিকে সাবধানতার সঙ্গে রূপায়িত করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। কৃষিকর্মে সমবায় প্রথার সঙ্গেই উন্নত প্রণালীতে উৎপাদনের তিনি সমর্থক ছিলেন। শ্রমের লাঘব ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন চাইতেন। গ্রামীণ সংস্কৃতি, কুটিরশিল্প ও সমবায় প্রণালীতে গুরুত্ব দিলেও ভারী শিল্পোন্নয়নেও তিনি সমধিক উৎসাহী ছিলেন। গান্ধীর চরকানীতি এবং গ্রামনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক ও যুক্তিবাদী— দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নগর ও গ্রামীণ জীবনের ভারসাম্য বিকাশই ছিল তাঁর কাম্য। গ্রামে ফিরে চল নীতিকে তিনি গ্রহণ করেন নি।

বিদেশী শাসকদের যোগসাজশে দেশীয় পুঁজিপতিদের একচেটিয়া স্বত্বে সাধারণ মানুষের যে দুরবস্থা ঘটবে সে বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক বসাতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বহুপূর্বে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন : 'দেশীয় কলওয়ালা এবং রাষ্ট্রনীতিকেরা গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে শুল্ক স্থাপিত হইলে দেশীয় শিল্পের সুবিধা হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে ইহার ফলে কাপড়ের দাম চড়িবে এবং সেই চড়া দাম বস্ত্রক্রেতা দিবে, ব্যবসায়ী দিবে না'।[৩৪]

মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল বিত্তের সঞ্চয় ও মুনাফাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনুষ্যত্বের অবনতি সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। পারস্পরিক বিশ্বাস সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার

মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো ছিল তাঁর কামনা। তাঁর মতে বিত্তবণ্টন ও ত্যাগের সাহায্যে ধনবৈষম্য দূরীকৃত করা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ তিনি চাইতেন না।[৬৫]

প্রাক-স্বাধীন আমলে মনে করা হত যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়— সেজন্যে রাজনৈতিক আন্দোলনকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগঠনমূলক প্রচেষ্টা বিশেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র। সমাজ সংস্কারের অঙ্গস্বরূপ তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জনচেতনাকে দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন না করে ধর্মান্ধ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ঘাড়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চাপিয়ে দিলে তা নিষ্ফল হবে।

ছয় : শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা কেবল লেখা ও ভাবনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতেকলমে প্রযুক্তও হয়েছে। দূর থেকে মূলনীতি নির্দেশ ও উপদেশ বর্ষণ না করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। মননের বিকাশ, সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সেই ব্যবস্থা রচিত হয়।

কবির দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তির প্রকৃত রূপ হল অবিদ্যা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি। জ্ঞান ও সত্যের উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ জীবনলাভের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। অবিদ্যাপ্রসূত যাবতীয় বন্ধনমোচন একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত কিছু গলদের প্রধান কারণ তা জীবন ও সমাজের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত নয়। কবির শিক্ষাতত্ত্ব তাঁর জীবনদর্শনেরই অঙ্গ। প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই মানুষের জীবনে নৈরাশ্য দেখা দেয়— বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন হয়ে পড়ে শূন্য— জীবন হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন।

মনের বিকাশ ও মার্জিত সমাজাচারের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বজ্রআঁটুনিতে শিশুমনকে রুদ্ধ করা হয়। শৈশব থেকে যে শিক্ষা শুরু হয় তার পরিবেশ স্বাধীন, দরদী ও ভাবোদ্দীপক হওয়া চাই। ছোটবেলা থেকে নানা

নিয়মনিগড় ও সিলেবাসের নিষ্পেষণে শিশুমনের নাভিশ্বাস ওঠে। আনন্দের পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থা তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় আতঙ্কের বিষয়। শান্ত সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল মন গড়ার জন্য তিনি চাইতেন অনুকূল মুক্ত পরিবেশ। মানবিক ব্যক্তিত্বের আদর্শেই তাঁর শিক্ষানীতি রচিত হয়।[৬৭]

পুঁথিগত বিদ্যা ও অর্থকরী শিক্ষায় তাঁর উৎসাহ ছিল না। বিদ্যার্থীর সুস্থসবল মন, সক্রিয় স্বভাব, মার্জিত আচরণ ও জানার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে, দায়িত্বে ও কর্তব্যে আদর্শ নাগরিকরূপে তিনি তাদের গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিত্বের চরম উৎকর্ষ দানই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমষ্টিগত প্রয়োজনের ছাঁচে শিক্ষাদানের তিনি বিরোধী ছিলেন। নাগরিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেতনা অবশ্যই সঞ্চারিত করা দরকার—তারই সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে ব্যক্তিমানুষের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীন বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ থাকা দরকার। জনৈক শিক্ষাব্রতীকে তিনি এক পত্রে লেখেন: 'বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো'।[৬৮]

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাতে বলেছেন বিদেশী ভাষার মাধ্যম আদৌ কার্যকর নয়। ইংরেজী ভাষাশিক্ষাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও সাধারণ ও প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষা এদেশে অনুপযোগী ও শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় বলে মনে করতেন। জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় না রেখে শিক্ষাকালে কতকগুলি বাঁধা কথা ও শব্দ মুখস্ত করানোর রীতি তাঁর মতে খুবই ক্ষতিকর।

অধীত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের আদর্শ ও কাজেরও কোনও মিল না থাকায় পরিণত জীবনে নতুন ও জটিল অবস্থা ও সমস্যার সামনে লোকে অসহায় হয়ে পড়ে। দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৯০১)।

সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও তিনি মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতেন—তাতে ভারতীয় সমাজমনের প্রতিফলন দেখা যায় না। সেখানে ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ ঘটে না; রুচিবোধ ও সৃজনীসত্তারও বিকাশ হয় না। এদেশে পশ্চিমের প্রভাব কেবল মস্তিষ্কেই ঘটেছে, এখানে তার

হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনিত হয় নি। অথচ হৃদয়ই সুকুমার বৃত্তি ও সংস্কৃতির উৎস। নানা দেশ ও জাতির মিলন এবং চিন্তার আদানপ্রদানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈচিত্র্যময় সত্যোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনকে জানা; প্রাচ্য সংস্কৃতির ঐক্যগত বিভিন্ন ধারার অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন; প্রাচ্যের জীবন ও মননের সেই ঐক্যের মনোভাব নিয়ে পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং উভয় গোলার্ধের মানবমনে শান্তি ও স্বাধীন চিন্তার মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলা।

সোভিয়েত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে চমৎকৃত করে। সেখানকার জনশিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন এবং সুদীর্ঘকালের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অগণিত মানুষের মানবিক অস্তিত্বের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের জ্ঞানবিস্তারের প্রয়াসকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দিত করেন। পরে অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থায় সেখানকার মানুষগুলিকে একই ছাঁচে গড়ে তোলার পদ্ধতি তাদের ক্রমে যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ করে তুলবে, স্বাধীন মন ও চিন্তাশক্তি খর্ব হবে।[৬৯]

ভারতে দীর্ঘকালীন যাবতীয় দুর্গতির কারণস্বরূপ তিনি শিক্ষার অভাবকেই অভিযুক্ত করেন। মুক্ত আকাশের নীচে পড়াশুনা, বজ্রকঠিন নিয়ম-নিগড়ের অবসান, প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান, পরীক্ষার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না দেওয়া, অধ্যয়নকালে বৈচিত্র্য ও কৌতূহল-প্রবণতায় উৎসাহ দান, ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ, সৃষ্টিকর্মে সহায়তা, বিশ্বজনীন মনোভাব গঠন ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এ-সব বিষয়ে তাঁর উপর বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর সরল নিরাড়ম্বর শিক্ষার এই পদ্ধতি প্রচীন তপোবনের আদর্শে রচিত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধীর নির্দেশানুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্র পরিত্যাগকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি শিক্ষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা দর্শিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশকে তিনি রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা এবং গতানুগতিক ছাত্রবিক্ষোভ থেকে মুক্ত রাখতেন।

গ্রামীণ ও সমষ্টি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা ইদানীং এদেশে রূপায়িত হয়েছে তার উদ্ভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা বহু পূর্বেই তিনি করেছিলেন তাঁর শ্রীনিকেতন পল্লীশিক্ষাকেন্দ্রে। গ্রামীণ সংযোগ, গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতা, সমবায় প্রথায়

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ এই কেন্দ্রটি শান্তিনিকেতনের অদূরে এক গ্রামে পত্তন করেন।

সাত : গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বের চোখে আধুনিক ভারত যে-দুটি মানুষের নামে পরিচিত তাঁরা হলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। যদিও দুজনেই ছিলেন ভারতের সনাতন ধারার অনুরাগী তাহলেও দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ দাদু, কবীর ও নানকের ধারা বহন করেছেন। অপরদিকে গীতার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী গান্ধী তুলসীদাসের পথ অনুসরণ করেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নীতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবত্তায় সর্বাধিক প্রাধান্য দেন এবং সর্ববিধ শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য, শক্তিমত্ততা ও হিংসাবৃত্তিকে নিন্দা করেন। দুজনেই ভারতের গ্রামীণ জীবন ও কৃষিকর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দুজনেই শহর থেকে দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে আশ্রম গড়েছেন এবং কৃষি ও কুটিরশিল্পের প্রসারে যত্নবান হয়েছেন। দুজনেই ছিলেন বিকেন্দ্রিক প্রশাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধী সংগ্রামী পথ অনুসরণ করেন, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রমানস ছিল সংগ্রামবিমুখ।

গান্ধীর নিষ্ঠা, সততা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রেমিকতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্তর থেকে যেমন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তেমনি 'সত্যের আহ্বান' 'সমস্যা' 'চরকা' 'স্বরাজ সাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি গান্ধীকে কঠোর সমালোচনাও করেছেন। খিলাফৎ, চরকা, অসহযোগ, পশ্চিমী বিদ্বেষ, ঐশী প্রেরণা, জাতীয়তাবাদ, জীবনবিমুখিতা, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি বহু বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর সমালোচনা করেন। গান্ধী ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের পিছনে অস্পৃশ্যতাজনিত পাপকেই কারণস্বরূপ দেখেছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করেন।

দুজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্প ও সুন্দরের সাধক। সমন্বয়ই ছিল তাঁর চিন্তার মর্ম। পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তিনি বর্জন করেন নি। অপরদিকে গান্ধী ছিলেন রক্ষণশীল। পশ্চিমী সভ্যতাকে তিনি অন্তঃসারহীন, বাহ্যজীবনসর্বস্ব ও জড়বাদী বলে মনে করতেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী ধারার প্রতি বহুলাংশে আকৃষ্ট হন। তলস্তয় ও

রাস্কিনের চিন্তায় গান্ধী প্রভাবিত হন। দারিদ্র্যকে তিনি মহত্ব দান করেছেন। যিশুর মতো তিনিও দারিদ্র্যের ছাড়পত্র নিয়ে রামরাজ্যে প্রবেশাধিকার চান। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটি ও তার পর্ণকুটিরকে মর্যাদা দিয়েছেন—জীবনকে মুক্তির মানদণ্ডে আধুনিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। দারিদ্র্যকে তিনি জয় করতে চেয়েছেন, বরণ করতে নয়।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আধ্যাত্মিক সুরে মানবতন্ত্রের জয়গান করেন। গান্ধী ভোগ বিরোধী ও জীবনবিমুখ ছিলেন; সেদিক থেকে কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ইহমুখীন। গান্ধী সত্যের তাগিদে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ও শহিদের পথ বেছে নেন। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয় ও সহিষ্ণুতার পথে সৃষ্টিধর্মী সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

আট : উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ভারতের একটি অলংকার, অঙ্গ নন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশের জনমানসে কবি যে-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সেরূপ স্বীকৃতি পান নি। তাঁর রচিত গান যদিও আজ দেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ভারতীয়েরা গ্রহণ করে নি। ভাষা, প্রদেশ, ধর্ম ও জাতীয়তার ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতাই তার প্রমাণ। রাজনীতি কবিমনের বিচরণক্ষেত্র ছিল না, তাহলেও আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রদর্শনের ভাণ্ডারে তাঁর অবদান অসামান্য।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শন তাঁর আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী দর্শনের অঙ্গ। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিবর্তে তিনি মানুষকে শাশ্বত, সৃজনশীল পরম সত্তার আধারস্বরূপ নিরন্তর সৃষ্টি ও আনন্দের প্রতীকরূপে কল্পনা করেছেন। বিভেদ, বিদ্বেষ, শক্তি-মত্ততা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি যাবতীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি সাম্য, মৈত্রী ও সমন্বয়কারী যে সমাজদেহের কল্পনা করেন তার উৎস ছিল তাঁর সেই মানবতন্ত্রী দর্শন। ভীত, ত্রস্ত মানবসমাজকে তিনি প্রেমের অভয়বাণী শুনিয়েছেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন শিল্পী; জাত্যভিমানের পরিবর্তে সহজাত সৃজনশক্তির পরিপূর্তি ও প্রকাশের জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন; জয়গান গেয়েছেন শান্ত শিব ও সুন্দরের।

প্লেটো ও গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় মিল যে তিনিও তাঁদের মতো রাজনীতিকে নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। আশু রাজনৈতিক কার্যকারিতার তাড়নায় যে-কোনও উপায় অবলম্বন বা সুবিধাবাদী ও অশুভ পথ অনুসরণের তিনি বিরোধী ছিলেন। নীতিকে বিসর্জন দেওয়া এযুগের এক ভয়ংকর প্রবণতা ; বিজ্ঞান সেখানে ব্যর্থ। তাই রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশকেই অবলম্বন করতে চেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমষ্টির নামে ব্যষ্টির অবদমন সভ্যতার অন্তরায় ; গণতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই জাতির শক্তি ও সম্ভাবনা নির্ভর করে। যুক্তিবহ চিন্তা ও নীতিনির্ভর আচরণ ইতিহাসেরই শিক্ষা ; অন্যথায় দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রজীবনে ন্যায়নীতির বিসর্জন ভীষণাকারে প্রত্যাগত হয়ে নির্বিচারে সকলকেই শাস্তিদান করে, ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী কেউই রেহাই পায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই কেবল অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদেরই অন্যায়ের পথ ত্যাগ করতে বলেন নি, উপরন্তু এদেশের সন্ত্রাসবাদীদেরও সে-পথ পরিহারের আবেদন জানান। নীতি-বিবর্জিত রাজনীতিতে তাঁর আদৌ রুচি ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় তিনি যেমন পঞ্চমুখ ছিলেন, তেমনি জাতীয়তাবাদী অন্ধ আবেগেরও অনুরূপ নিন্দা করেছেন।

উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কষাঘাত করেছেন। কোনও কোনও সমালোচকের মতে তাঁর এই মনোভাব কিছুটা কবিসুলভ—জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা সেখানে উপেক্ষিত। তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদকে সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত ; জাতীয়তাবাদের শুভ দিকও আছে ; জাতীয়তাবাদ সামন্ততন্ত্র থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে ; স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যবাদেরও প্রতিষেধক হল এই মতবাদ ; সুপ্ত ভাবাবেগেরও উৎস জাতীয়তাবাদ ; সেই মতবাদইতো মানুষকে শ্রেণী, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর ও মহত্তর কর্মক্ষেত্রে উন্নীত করেছে। সেইসব সমালোচকের মতে জাতীয় ধন, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য ব্যতিরেকে বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীন মহানুভবতা ফাঁকাবুলির সামিল।

রবীন্দ্রনাথ সমাজকে রাজনীতির উপর স্থান দিয়েছেন। হবহাউস, ম্যাকাইভার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরাও সামাজিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বস্তুতঃ রাজনীতি সমাজেরই একটি ক্রিয়া। একথা ঠিক যে, আজকের দিনে পার্টি-পলিটিক্স ও রাষ্ট্রক্ষমতা-দখল একটা নোংরামিতে পর্যবসিত হয়েছে— সেখানে সুরুচি, সহিষ্ণুতা, নৈতিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপেক্ষায় পরিণত। সেজন্যে হয়তো

অন্যান্য অনেক দার্শনিকের মতো তাঁরও রাজনীতিতে নিস্পৃহা জাগে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবাসীরা নগর থেকে দূরে অবস্থান করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও উত্তাপকে এড়িয়ে চলত। রাজনীতি ছিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের কাজকারবার। কিন্তু বর্তমানকালে সমাজ ও জীবনের সঙ্গে রাজনীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। রাজনীতির প্রতি তাই নিস্পৃহ নিশ্চেতন মনোভাব নিজেরই পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্যে প্রয়োজন রাজনীতির সঠিক পথনির্ধারণ।

সমাজের উপর এই গুরুত্বদানের অর্থ রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশকে তিনি কেবল নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতো রবীন্দ্রনাথও মাতৃত্বের ব্যঞ্জনায় দেশের উপর পরমত্ব আরোপ করেছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তাঁর মধ্যেও ধর্ম ও জাতীয়তার ভেদবুদ্ধি দেখা যায়। অবশ্য তিনি তা কাটিয়ে ওঠেন। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা বিরোধমূলক ও ভারতীয় সভ্যতা মিলনমূলক বলে চিহ্নিত করেছেন। ঠিক এইভাবে কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে অপরিবর্তনীয় বলা যায় না; বস্তুতঃ প্রত্যেক দেশের সামাজিক ধারায় জীবনের উপযোগী আচারগত বৈশিষ্ট্য থাকে। আর ভারতীয় সভ্যতায় যথেষ্ট হানাহানি ও বিরোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রামমোহন ও দ্বারকানাথের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন দেশকে ভিক্ষানীতি ছাড়াতে আর দেশবাসীকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে— সে-সমাজ হল স্বদেশী-সমাজ বা পল্লীসমাজ, অভিজাত শ্রেণী-শাসিত সমাজ নয়। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর মনে ইংরেজের লিবার‍্যাল আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল; কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের অত্যাচারী রূপ তাঁর সেই আদর্শে অনাস্থা সৃষ্টি করে।

তিনি চিরকালই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অপেক্ষা গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর অধিক বিশ্বাসী ছিলেন; নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি কিংবা ক্ষমতা অর্জনকে বড় করে দেখেন নি। স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রয়োজন সম্পর্কে যথোচিত অবহিত থেকেই তিনি অনুভব করেন যে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের শিক্ষা ও চেতনা না থাকলে স্বাধীনতা পাওয়াও যেমন কঠিন তেমনি স্বাধীনতা পেলেও তা নিষ্ফল হবে। স্বাধীনতা বাইরে থেকে পাওয়া যায় না, জাগ্রত ব্যক্তিত্বের বুদ্ধি, অনুভূতি ও সক্রিয় ইচ্ছার সাহায্যে তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক

মুক্তির জন্যে প্রকাশ্য আন্দোলন ও সংগ্রামেরও যে-প্রয়োজন থাকে কবি সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতির বেশ প্রভাব দেখা যায়। পার্নেল, ডি ভ্যালেরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আদর্শ এবং 'সিন ফিন' কর্মপদ্ধতি অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করে। অপরদিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের জর্জ রাসেল, হরেস প্ল্যাঙ্কেট প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রামীণ সংগঠনচিন্তা ও সমবায় আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, রাষ্ট্রনায়কের সংগ্রামী ভূমিকা তাঁর জীবনে দেখা যায় না। কথাটি যদি রাজনৈতিক দলাদলি, ক্ষমতাদখল, চরকা-কাটা আর সংকীর্ণ দেশপ্রেমিকতার অর্থে বলা হয় তাহলে তাঁর রাষ্ট্রনায়কের কোনও ভূমিকা নেই। বস্তুতঃ কবিত্ব জীবন ও সমাজেরই একটি অঙ্গ। কবিও একজন মানুষ ও সামাজিক জীব। তাঁর নিরঙ্কুশ আত্মপ্রকাশের জন্য গতিশীল সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে। মানুষের সহজাত সৃষ্টিশক্তির বিকাশ অর্থাৎ শিল্পিমনের প্রকাশ ও তার উপভোগ যাবতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনে যে অসম্ভব এ-চেতনা তাঁর চিন্তায় সুপরিস্ফুট। কবি তাঁর সাধনায় নেতিবাচক সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে শিক্ষাবিস্তার, সমবায় সংগঠন, হাসপাতাল পরিচালনা, পুকুর কাটানো প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণকর্মে নিজের নিষ্ঠাকে প্রমাণিত করেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নিজের আদর্শ অনুযায়ী দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করা।

ফ্যাসিজমের জন্মের বহু আগেই কবির 'ন্যাশন্যালিজম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। আজকাল সাধারণতঃ যাকে Totalitarianism বলা হয়ে থাকে কবি সে-সময়ে তা 'Statism' নামে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম ধ্বনি তুলেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ একই। তিনি তার কোনও অর্থনৈতিক বিচারবিশ্লেষণ না করলেও ওজন তার কিছু কম নয়।

ভারত বৈদেশিক শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাহ্যতঃ কিছুটা গৃহীত হয়েছে। ভারতের গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েতী প্রশাসন, সমবায় প্রথার বিস্তার ইত্যাদি তারই প্রমাণ। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থাদিও প্রলেপ দিয়ে রোগ ঢাকার মত হয়ে চলেছে। প্রকৃত রোগ নিরাময়ের কোনও লক্ষণ নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রেরই রূপ নৈরাশ্যজনক। লব্ধ স্বাধীনতা

ফলপ্রসূ হয় নি। মানুষ যে-তিমিরে ছিল সেখানেই রয়েছে। এর কারণ মানুষের যথোচিত শিক্ষা ও চেতনার প্রশ্ন অবহেলিত হয়েছে। জনজীবনে অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, স্বার্থবুদ্ধি ও মানসিক জড়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথচ তাঁর নামে দেশে ঘটার অন্ত নেই। গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি উপভোগের সঙ্গে তাঁর ভাবুক জীবনকে যদি কবির অনুরাগীরা অনুধ্যান ও তাঁর আদর্শকে সাধ্যমত রূপ দেবার প্রয়াসী হন তাহলে দেশের বর্তমান অনভিপ্রেত গতির মোড় ফেরানো সম্ভব হয়। কবি কর্তৃক প্রদর্শিত পথে শুধু ভারতই নয়, সারা বিশ্বের মানবসমাজ পারস্পরিক বিশ্বাস, সামঞ্জস্য ও শান্তির সন্ধান লাভ করতে পারে।

নির্দেশিকা

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'। খণ্ড ১, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৫।

২. প্রফুল্লকুমার সরকার। 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৬।

৩. অমল হোম। 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮১।

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনকথা'। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৬২।

৫. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। পঃ বঙ্গ সরকার। খণ্ড ১৩, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৫৯। ('কালান্তর')

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩৮২।

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ১৪, পৃ ৭৫৩।

৮. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রদর্শন'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৪।

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩১।

১০. Rabindranath Tagore. *Personality : Lectures delivered in America*. 1959. p. 65.

১১. *Ibid.* p. 74.

১২. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958, p. 15. (Hibbert Lectures)

১৩. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959, p. 32.

১৪. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958, p. 235,

১৫. *Ibid.* pp. 112-113.

১৬. Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957, pp. 98-100.

১৭. Rabindranath Tagore. *Personality.* 1959, p. 32.

১৮. *Ibid.* p. 70.

১৯. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958, pp. 92, 102, 236.

২০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। পঃ বঙ্গ সরকার। খণ্ড ২, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৯১। ('গীতাঞ্জলি') এবং খণ্ড ১২, পৃ ৬১২। ('মানুষের ধর্ম')

২১. Rabindranath Tagore. *Nationalism.* 1917, p. 13.

২২. Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957, pp. 33-34.

২৩. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958, pp. 25-28.

২৪. Rabindranath Tagore, *Nationalism.* p 128.

২৫. *Ibid.* p. 26,

২৬. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩, ১৩৬৮, বঙ্গাব্দ, পৃ ১৫৪-১৫৫। ('পরিচয়')

২৭. Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957, p. 83.

২৮. Rabindranath Tagore, *Nationalism.* 1917, pp. 19-20.

২৯. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959, pp. 21-22.

৩০. *Ibid.* p. 96.

৩১. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১২, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৯৭। ('স্বদেশী সমাজ')

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৭০৩।

৩৩. Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957, pp. 18-19.

৩৪. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১০, পৃ ৭৩০। ('রাশিয়ার চিঠি')

৩৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ১২, পৃ ১০২৫। ('ভারতবর্ষ ও স্বদেশ')

৩৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৬১৩। ('মানুষের ধর্ম')

৩৭. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958, pp. 183-185.

৩৮. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩৩।('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')

৩৯. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958, Ch. 13.
৪০. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959. pp. 144-145.
৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "দণ্ডনীতি", 'প্রবাসী'। আশ্বিন, ১৩৪৪।
৪২. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩, পৃ ৩৪২। ('স্বরাজ সাধন')
৪৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩৪৩।
৪৪. Rabindranath Tagore. *Letters to a friend.* 1928, p. 80.
৪৫. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959, p. 38-39.
৪৬. Rabindranath Tagore. *Nationalism,* 1917, p. 28.
৪৭. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১২, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮৮৪। ('সমূহ')
৪৮. Rabindranath Tagore. *Nationalism.* 1917, p 58.
৪৯. *Ibid.* p. 70.
৫০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩, পৃ ৩০৩। ('কালান্তর')
৫১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। খণ্ড ১০, পৃ ৭০৪। ('রাশিয়ার চিঠি')
৫২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৫৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৭১৭।
৫৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৭২৮-৭২৯।
৫৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৭৩১-৭৩২।
৫৬. *The Visva-Bharati Quarterly.* V. 4, No. 3, October, 1926, p. 276.
৫৭. Rabindranath Tagore. *Man.* 1937, pp. 42-48.
৫৮. Rabindranath Tagore, *The Religion of Man.* 1958, Appendix.
৫৯. *Ibid.* p. 163.
৬০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩, পৃ ২১৬। ('কালান্তর')
৬১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৪২৯। ('সমবায়নীতি')
৬২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৪১৮।
৬৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৪২৯।
৬৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'। খণ্ড ১, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৭৯।
৬৫. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১০, ১৩৬৮, পৃ ৬৯০। ('রাশিয়ার চিঠি')
৬৬. Rabindranath Tagore, *Sadhana.* 1957, pp. 72-74.

৬৭. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১১, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৩৩। ('শিক্ষা')

৬৮. অনাথনাথ বসু। ৮ম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, 'গ্রন্থাগার'। সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

৬৯. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১০, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৭৬। ('রাশিয়ার চিঠি')

সুভাষচন্দ্র বসু ॥ ১৮৯৭-

এক : ভূমিকা

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে সতের বছর বয়সে তিনি এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত কোনও ধর্মগুরুর সন্ধান লাভ। সারা উত্তর ভারত ঘুরেও তেমন কোনও গুরুর সাক্ষাৎ পান নি। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। সেই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন।[১]

ছাত্রজীবনে ধর্ম ও দর্শনেই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানে পড়াশোনার সুযোগ ঘটে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সময়ে। ছাত্রহিসাবে বরাবরই তিনি ছিলেন কৃতী ও মেধাবী। ১৯২০ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন। সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশি ছেড়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত ধনীর গৃহে জন্মেও ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পথই তিনি বেছে নেন; রাজনীতিকেই জীবনের ধ্যানধর্ম করে তোলেন; কষ্টসহিষ্ণুতার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসীম। বার দশেক দণ্ডাদেশের মধ্যে বছর আষ্টেক তাঁর কারাগারেই কাটে। ভারতের মুক্তিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন—সেকাজে না ছিল ক্লান্তি, না কোনও বিরতি।

একাধারে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক। তিনি চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপসবিহীন সংগ্রাম। তাই আচরণেও দেখা যেত তাঁর অদম্য মনোভাব। লেনিন, মুসোলিনি, ডি ভ্যালেরা, কামাল পাশা প্রমুখ বিচিত্র মানুষ ছিলেন তাঁর আদর্শ।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা ও সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব নয়। তাই লেনিনের আদর্শে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অনুকূলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করাই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি চেয়েছিলেন দক্ষিণপন্থী-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসকে একটি সর্বাত্মক গণদলে পরিণত

করতে। সে-চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়। তাই কংগ্রেসের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে বামপন্থী দল গঠন এবং জাতীয় মুক্তির সঙ্গে যুগপৎ সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে তৎপর হন।

কলকাতা ও কেমব্রিজের ছাত্রজীবনে তিনি প্রধানতঃ দর্শন ও সেইসঙ্গে রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠনে সহায়ক হন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজে কোনও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদর্শন রচনা অথবা তত্ত্ব আলোচনার দিকে বিশেষ যান নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মাত্র দুটি: আত্মজীবনী *An Indian Pilgrim* (১৯৪৮) ও *The Indian Struggle : 1920-42* (১৯৬৪)। ঐ দুটিতেই তাঁর মৌল চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও বাংলায় বিখ্যাত 'তরুণের স্বপ্ন' ও 'নূতনের সন্ধান' বই দুটিতে রাজনীতিসহ নানা বিষয়ের উপর পত্র, বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী সংকলিত হয়েছে। বহু পত্র, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পরবর্তীকালে 'পত্রাবলী', *Crossroads, Correspondence, Selected Speeches* প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন কাজের মানুষ; তত্ত্বকথার চেয়ে কাজকেই তিনি বড় মনে করতেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপেই তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র ছিলেন সুবক্তা; বলিষ্ঠ লেখনীর অধিকারী হয়েও লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে তিনি তেমন প্রকাশ করেন নি। যথার্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন; রাষ্ট্রদর্শন অনুসারী বিচারবিশ্লেষণও করেছেন।

বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিতে প্রবেশ করার (১৯২১) পর তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম পদক্ষেপ দেশবন্ধুর অনুগামী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। বছর দুয়েক ধরে 'জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে'র অধ্যক্ষতা, 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা পরিচালনা ও কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে দেশবন্ধুর কাছে শিক্ষানবিশি করেন। ক্রমে গান্ধীরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনার দায়ে তাঁর সর্বপ্রথম মাস ছয়েকের মত কারাদণ্ড হয়। এতদিন তিনি যে গুরুর সন্ধান করছিলেন, কারাগারে তাঁর সম্যক পরিচয় ও দীক্ষা লাভ করলেন। সেই গুরু হলেন চিত্তরঞ্জন।

১৯২২ সালে গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার অনুযায়ী প্রাদেশিক কাউন্সিল বয়কট না করে বরং তাতে ঢুকে কাউন্সিলকে অচল করার নীতিই ভাল ছিল। তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী প্রচারকার্যের সুযোগে সুভাষচন্দ্র ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

গয়া কংগ্রেসের (১৯২২) পর চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র হন তাঁর প্রধান সহকারী। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে সাফল্যলাভ ও শক্তিশালী দল হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কর্মতৎপরতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে লেবার স্বরাজ্য পার্টি গঠনও এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই বছরে চিত্তরঞ্জন কলকাতার প্রথম মেয়র হন এবং সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতা বেড়ে ওঠে। স্বরাজ্যদলের মুখপাত্র হিসাবে সরকারিভাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও সুভাষচন্দ্রের মন ঐসব বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর কাছে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনায় তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হন। ফলে বছর দুয়েকের মতো তাঁকে বর্মায় নির্বাসিত করা হয় (১৯২৫)।

মুক্তির পর এক নতুন চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দীক্ষাদাতা চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলে থাকাকালে পুরানো অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে পত্রে ধর্মযোগী ও কর্মযোগীর চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁর একটা বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। এখন মন তাঁর নিজস্ব মত ও পথে প্রস্তুত : কাজ ও সেবাই জীবনের ব্রত—জনকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে কর্মের দিকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—দুরারোগ্য নিশ্চেষ্টতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে দরকার উপযুক্ত কর্মিদলের ; পরমার্থ নিয়ে চিন্তা করবেন একদল বাছা বাছা লোক— কর্মীদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব থাকবে তাঁদের।

এখন থেকে বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর এই মনোভাব ফুটে ওঠে যে, কংগ্রেস সংগঠনকে বিকল্প সরকারের মতো গড়ে তুলে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে ; শ্রমিকদের প্রস্তুতি ও জনশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে ; জাতীয় আন্দোলনকে সাধারণ ধর্মঘট ও আইন অমান্যের পথে চালিত করতে হবে ; দেশের শাসন

ব্যবস্থা ক্রমে নিশ্চল হয়ে পড়লে সরকারের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে; সরকারি কর্মচারীদের উপর ভরসা রাখতে না পেরে আমলাতন্ত্র জনপ্রতিনিধিত্বের দাবি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোই ছিল তাঁর কামনা, ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়। জাতি, ধর্ম ও অর্থের বৈষম্য থাকবে না। নারী পাবে সমানাধিকার। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য ভাঙতে হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সমকালীন অন্যান্য নেতাদের মতো তিনিও বিদেশী শাসকদের কারসাজি বলে মনে করতেন; সমস্যাটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মধ্যেই তার সমাধান পাওয়া যায় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

১৯২৬ সালের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র আইন সভায় প্রবেশ করেন এবং তার-পরই পুনরায় কারারুদ্ধ হন। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ইউরোপে চিকিৎসা করাতে যাবেন বলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে দেশের রাজনীতিতে একটা শূন্যতা চলেছিল। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্র সেই শূন্যতার অবসান ঘটান। ১৯২৭ সালের শেষদিকে জওহরলালের সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশে ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণে সম্মতি থাকায় তিনি জওহরলালের সঙ্গে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে 'ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগ' গঠন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমে এক সংকটজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে মুক্তি মিছিল পরিচালনার জন্য বছর খানেকের মতো তাঁর কারাদণ্ড হয়। জেলে এইসময়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। জেলে থাকাকালেই তিনি কলকাতার মেয়রপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুক্তির পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। মাস তিনেক পর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্বাধীনতা দিবসের (১৯৩১) মিছিল পরিচালনার জন্য আবার কারারুদ্ধ হন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে মাস ছয়েকের মধ্যে মুক্তি পান। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে গান্ধী বিলাতে 'গোল টেবল বৈঠক' সেরে ফেরার পর দেশের রাজ-নীতিতে আবার এক নতুন সংকট ঘনিয়ে আসে। যথারীতি গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র সঙ্গীগণসহ গ্রেপ্তার হন (১৯৩২)। এবার তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। ভিয়েনায় চিকিৎসা করাতে যাবেন এই শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভিয়েনায় চিকিৎসার সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা অব্যাহত থাকে। সেই সময়ে সেখানে বিঠলদাস জাভেরি প্যাটেলও (১৮৭৩-১৯৩৩)

চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তুজনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন ও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যান। ১৯৩২ সালে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন মুলতবী রাখলে সুভাষচন্দ্র ও বিঠলদাস এক যুক্ত বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করে বলেন : '...আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষ যে কাণ্ড করলেন তাতে মেনেই নেওয়া হোল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হলে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার...'।[২]

১৯৩৩ সালের ১০ জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র 'সাম্যবাদী সংঘ' গঠনের ঘোষণা ও তার কর্মসূচী প্রচার করেন :

১. পার্টি দাঁড়াবে কিষাণ-মজতুরদের স্বার্থ নিয়ে, স্থিতস্বার্থ (vested interest) অর্থাৎ জমিদার, পুঁজিদার ও মহাজন শ্রেণীর স্বার্থ নিয়ে নয়।
২. ভারতীয় জনগণের পূর্ণ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক মুক্তির জন্য এই পার্টি দাঁড়াবে।
৩. এর আদর্শ হবে সর্বভারতীয় একটা ফেডার‍্যাল গভর্ণমেণ্ট, কিন্তু ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য কিছুদিন অন্ততঃ একনায়কী ক্ষমতাসম্পন্ন একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করতে হবে।
৪. কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রবর্তিত পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন।
৫. অতীতের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা এবং জাতিভেদ প্রভৃতির উচ্ছেদ।
৬. আধুনিক প্রণালীর মুদ্রানীতি এবং মহাজনী ব্যবস্থা।
৭. জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং সর্বভারতীয় নতুন ভূমিব্যবস্থা।
৮. অরাজকতা দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র নয়, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার।
৯. আন্তর্জাতিক প্রচার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য গ্রহণ।
১০. একটি জাতীয় কর্মপরিষদের অধীনে সবগুলি অগ্রগামী দলের ঐক্যের চেষ্টা, যাতে কাজের সময় বহু ফ্রণ্টে একই কালে কাজ চলতে পারে।[৩]

'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থটিতে জাতীয় সংগ্রামের আনুপূর্বিক ইতিহাসের পট-

ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র যুগপৎ নিয়মতান্ত্রিক সহযোগিতা ও গান্ধীর আপসপন্থী অচল নীতির সমালোচনা করে একটি অভিনব মধ্যপন্থা তুলে ধরেন। সে-পন্থা গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মাঝামাঝি কোনও পথ নয়। নির্ভেজাল একনায়কতন্ত্র—ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়ে রচিত তৃতীয় একটি পথ প্রদর্শন করেন। তিনি চেয়েছিলেন : 'বছর কয়েকের জন্যে ডিক্টেটরী ক্ষমতাযুক্ত একটি জবরদস্ত কেন্দ্রীয় সরকার···সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি জবরদস্ত পার্টির দরকার'। তাহলেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র সুদৃঢ় হবে।

সেই বছরেই সুভাষচন্দ্র স্বল্প কালের জন্য ভারতে এসে সরকারি নিষেধাজ্ঞার দরুন আবার ইউরোপে ফিরে যান। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে তিনি সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য করে ভারতে চলে আসেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ সালের নব প্রবর্তিত ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সরকার গঠনে উদ্যোগী হলে সুভাষচন্দ্র সে-সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকেন। হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সভাপতির পদ গ্রহণের পূর্বে তিনি কিছুকালের জন্য একবার ইংলণ্ড ঘুরে আসেন। লেবার পার্টির অ্যাটলি, বেভিন, ক্রীপস প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সে-সময়ে সহৃদয় আলাপ-আলোচনা হয়।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও গান্ধী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে থাকলেও তা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ছিল ভিন্ন। কংগ্রেসকে এক পালটা সরকারে পরিণত করে, জনসমর্থনের সাহায্যে প্রবল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে সরকারি শাসন অচল হয়ে পড়বে এবং ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে এসে যাবে বলে তিনি মনে করতেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস আবেদননিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে নেয় এবং তদনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার গঠনে প্রবৃত্ত হয়। সুভাষচন্দ্র তাতে তীব্র অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালে দীর্ঘ অন্তরীণ ও কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি রাজনীতিতে যখন ভালভাবে নামলেন তখন গান্ধীর সঙ্গে তাঁর এক গভীর আলোচনা হয়। বিষয় : দুজনের মত ও পথের সামঞ্জস্য বিধান। গান্ধীর প্রস্তাবেই তিনি প্রথমবার কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। কিছু কিছু বিষয়ে দুজনের অমিল মিটল। কিন্তু সেটা ছাই চাপা আগুনের মতো। ক্রমে নানা বিষয়ে দুজনের মতবিরোধ বেড়ে চলল।

সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন ইউরোপে যুদ্ধ লেগে গিয়েছে; ইংরেজ পড়েছে বেকায়দায়। এ-সুযোগ ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামীদের গ্রহণ না করা নির্বুদ্ধিতা; গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের ভরসাতেও থাকা যায় না; কংগ্রেসীরা তখন বিভিন্ন প্রদেশে

সরকার গঠন করে ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছে; তারা তা ছাড়বে না; চাইবে ইংরেজের দরবারে দরদস্তুর করতে; কারণ ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনেকেরই কাছে বিশেষ আপত্তিকর ঠেকে নি। কাজেই সরাসরি অবিলম্বে সংগ্রামে না নামলে ভবিষ্যতের কোনও আশা নেই বলে তিনি অনুভব করেন। ওদিকে গান্ধী উপলব্ধি করলেন যে আইন অমান্য শুরু হলে আবার অরাজকতা ও হিংসাত্মক আবহাওয়া প্রবল হয়ে উঠবে। তাই গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের বিরোধ ছিল মূলগত।

সুভাষচন্দ্র সার্বভৌম নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে পুনর্নির্বাচিত হয়ে। দ্বিতীয়বারের তাৎপর্য ছিল যে তিনি গান্ধী মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচনে পরাজিত করেন। সমগ্র দক্ষিণপন্থীদেরই কাছে ছিল সেটি এক মস্ত পরাজয়। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল যে যদি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় মুক্তির দাবিকে স্বীকার করে না নেওয়া হয় তাহলে ইংরেজ সরকারকে একটি চরমপত্র দেওয়া হোক। বিঘ্ন পড়ে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের একটি প্রস্তাবে। তাতে বলা হয়েছিল যে কংগ্রেস সভাপতিকে গান্ধীর পরামর্শ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করে কংগ্রেসেরই ভিতর ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলেন।

একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বামপন্থী দলের প্রয়োজন তিনি অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে একটি পাঁচমিশালী দল হিসাবে তিনি দেখতেন। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি ও মতবাদকে গোঁজামিল দিয়ে একত্র রাখা নিষ্ফল চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। পার্টির আদর্শ রূপ ও রীতি সম্পর্কে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তা ব্যক্ত করেন।

দেশের অন্যান্য বামপন্থী দলকে তিনি ঐক্যের আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাঁর উপর তাদের আর আস্থা ছিল না। তারা সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও দক্ষিণ-পন্থীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার বিরোধী ছিল। তাই সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে বোম্বাইতে লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন, কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি ও কমিউনিস্টদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৪০ সালে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনকালে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে একটি আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে গঠিত একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব ও তার উপর ক্ষমতা অর্পণের

দাবি জানালেন এবং দেশব্যাপী সংগ্রামের নির্দেশ দিলেন। তাঁর সংকল্প তখন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি। অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতিস্তম্ভ (হলওয়েল মনুমেণ্ট) অপসারণের দাবির আন্দোলনসূত্রে তিনি কারারুদ্ধ হন (জুলাই ১৯৪০)। কারাগারে তিনি এবার বিশেষভাবে অনুভব করেন যে শুধু আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদ যথেষ্ট নয়; চাই বাইরের সাহায্য। ঠিক করলেন জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বাইরে চলে যাবেন।

১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারী স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থায় সরকারি দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কাবুল হয়ে বার্লিনে চলে যান। সেখান থেকে বেতারযোগে তিনি দেশবাসীর কাছে প্রস্তুতির নির্দেশ দিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে জাপানে চলে যান। জাপানিদের হাতে ধৃত ভারতীয় বন্দী সেনাদের নিয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ সেনাদলের তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গেই আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। জাপানিদের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র আশানুরূপ সাহায্য পান নি। জাপানিরা তাঁকে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাতে চেয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের সেনাবাহিনী ভারতের ভিতর কিছুটা অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হওয়াতে তাঁকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এই সময়টাই তাঁর জীবনে সবচেয়ে চমকপ্রদ। সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন কিনা এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তিনি এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে সেইসময়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

দুই : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

ছাত্রজীবনের প্রথমাবস্থায় শংকরের দর্শনকেই সুভাষচন্দ্র হিন্দুদর্শনের সারবস্তু বলে মনে করতেন। কিন্তু পরে শংকরের মায়াবাদী দর্শনে তার আস্থা হারিয়ে যায়। মায়াবাদের পরিবর্তে তিনি জাগতিক অস্তিত্বের প্রত্যয় গ্রহণ করেন। বিবর্তনবাদী প্রগতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এবিষয়ে তিনি তিনটি যুক্তি দর্শিয়েছেন:

১. নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে প্রগতি সর্বত্র বিদ্যমান; ২. স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে যে কালক্রমে

আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই; ৩. জৈবিক ও নৈতিক উভয়বিধ দিক থেকেই প্রগতির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।[৪]

আত্মার অভিব্যক্তি সম্পর্কে সাংখ্যের বিবর্তনবাদ আধুনিক মনকে স্পর্শ করবে না বলে তিনি মনে করতেন। তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে স্পেনসারের সরল থেকে জটিলতাভিমুখী বিবর্তনবাদ ও হার্টম্যানের 'অন্ধ ইচ্ছা' প্রবণতার তিনি উল্লেখ করেছেন এবং শোপেনহাওয়ারের জাগতিক ইচ্ছা ('Cosmic Will') প্রত্যয়কে তাঁর কিছুটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। বের্গসঁর স্বজন-মূলক বিবর্তন (Creative Evolution)-তত্ত্বে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করলেও হেগেলের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন তাঁর কাছে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ প্রতিভাত হয়েছে। কালাকাশের অভিব্যক্তির দিক থেকে স্পেনসার ও বের্গসঁ অপেক্ষা হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রগতি তাঁকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য কোনটিকেই তিনি সর্বাংশে গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন: 'হেগেলের মতই যে সত্যের প্রায় একেবারে নিকটে পৌঁছিয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অন্য যে-কোনও মত অপেক্ষা উহা অধিকতর সন্তোষজনকভাবে আসল বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। আবার অখণ্ড সত্য বলিয়াও উহাকে স্বীকার করা যায় না, কারণ যে-সকল বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি ঐগুলির সঙ্গে উহা মিলে না'।[৫]

হেগেলের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বে কিছুটা অনুপ্রাণিত হলেও সুভাষচন্দ্র হেগেলের বস্তুসত্তার যুক্তিবিচারকে গ্রহণ করেন নি। যদিও উভয়েই ব্রহ্মবাদী, কিন্তু হেগেল সত্তার সারবত্তারূপে 'Reason'-কে প্রত্যক্ষ করেন; পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র সারবত্তাকে প্রেমের লীলারূপে প্রত্যক্ষ করেন— দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সেই প্রেমময় লীলা নিরন্তর আত্মোদ্ঘাটিত করে চলে— সেই প্রক্রিয়ার অন্তরালে নিহিত আবেগ পরিণামে মানুষকে প্রেমময় ঐক্যে আবদ্ধ করে। তিনি লিখেছেন: 'আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং মানবজীবনের মূলনীতি'।[৬]

বস্তুসত্তাকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখার পিছনে সুভাষচন্দ্রের বাস্তবের প্রতি মানবতন্ত্রী মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়। হেগেলের দৃষ্টিতে সত্তার সারবত্তা প্রেম নয় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে কেমব্রিজের ম্যাকটাগার্ট প্রমুখ নব্যহেগেলীয়দের চিন্তায় প্রেমের স্বীকৃতি সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকবে। মোজেস হেসের মতে সমাজজীবনে প্রযুক্ত প্রেমের বিধিব্যবস্থাই হল সাম্যবাদ এবং সুষ্ঠু ক্রিয়াকলাপেই প্রেমের পরিণতি। আবার ফয়েরবাক মনে করতেন যে মানুষ পারস্পরিক

বিভেদ ভুলে যে শক্তির সাহায্যে সংঘবদ্ধ হয় প্রেমই থাকে তার মূলে। প্রেমেই মানুষের যতকিছু নৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়—ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ সুসমন্বিত হয়। 'হেগেলের ভাববাদী ইতিহাসদর্শনকে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি।'[৬] তাঁর সমন্বয়চিন্তায় জীবনের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক তাগিদ সমান স্থান পেয়েছে। চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে সুভাষচন্দ্র বৈষ্ণব অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হন। বৈষ্ণব দর্শনের সারমর্ম প্রেম ও প্রীতি—সেদিক থেকেও তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রজীবনেই তাঁর মনে নানা দ্বন্দ্ব ছিল। প্রথমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং পরে শ্রীঅরবিন্দের রচনা পাঠ করে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের লীলা-স্থান এবং মনুষ্যজীবনের প্রকৃষ্ট আদর্শ হল আত্মমুক্তি ও মানবতার মঙ্গলবিধান। বিবেকানন্দের বাণীতেই সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনদর্শন গড়ে তোলার প্রয়াসী হন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে তিনি বীরোচিত জ্ঞান করতেন। সুভাষচন্দ্রের দার্শনিক চেতনা শ্রীঅরবিন্দের ভাবাদর্শেও কিছুটা পরিপুষ্ট হয়। শ্রীঅরবিন্দের 'যোগের সমন্বয়' চিন্তা তাঁকে সবিশেষ আকৃষ্ট করে। তবে পরমার্থে অটল বিশ্বাস থাকলেও পার্থিব বিষয় ও বাস্তবজীবন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র সজাগ ছিলেন। তাই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল যে আদর্শ গুরু হিসাবে মানব সমাজকে পরিচালনার জন্য শ্রীঅরবিন্দের সক্রিয় জীবনে ফিরে আসা দরকার।[৭]

সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে 'এই জগৎ আত্মার প্রকাশ এবং আত্মা ঠিক যেরূপ অবিনশ্বর এই সৃষ্টির জগৎও তদ্রূপ।' সৃষ্টির বিনাশ নেই। জগতের সৃষ্টি কোনও পাপ থেকে নয়; কিংবা তা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের ফল নয়। কথাটা শংকরপন্থী চিন্তার বিপরীত। তাঁর মতে সৃষ্টি ঈশ্বরের শাশ্বত লীলার অভিব্যক্তি। তাঁর কথায়: 'সত্য হইতেছে আত্মা—যাহার সার প্রেম, উহা পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ ও ঐগুলির সমাধানের নিত্য লীলার মধ্য দিয়া নিজকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছে'।[৮]

সুভাষচন্দ্রের আত্মা বা পরম সত্য কোনও বিমূর্ত কল্পনা নয়। তিনি চারি-দিকে যেমন ঐশ লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি লীলার মধ্যেও অন্তর্নিহিত প্রেমময়তাকে উপলব্ধি করেছেন। এ-সিদ্ধান্তে যুক্তি অপেক্ষা ব্যাবহারিক (pragmatic) তাগিদই প্রবল। তাতে সত্যের স্বরূপ সফল রূপায়ণ লাভ করে, অন্যদিকে প্রেমময় পরমই সত্যের স্বরূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়। আপাতবিরোধী এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'জীবনের সকল দিকের যুক্তিসঙ্গত

পর্যালোচনা করিয়া— এবং কিছুটা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা হইতেও এই সিদ্ধান্তে' তিনি উপনীত হয়েছিলেন। ব্যাবহারিক জ্ঞানতত্ত্বে সত্যের মাপকাঠি হল কার্যকারিতা এবং সেই দৃষ্টিতেই সত্য বলে প্রমাণিত কোনও কাজ ফলপ্রসূ না হলে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সুভাষচন্দ্র সেই ব্যাবহারিক জ্ঞানতত্ত্বে নিজেকে জড়ান নি। তাঁর মতে মানবিক জ্ঞান আপেক্ষিক এবং চিন্তারও পরিবর্তন ঘটে; সেজন্যে পূর্বে যেটা সত্য বলে মনে হয়েছে সেটা কার্যতঃ নিষ্ফল হলে মিথ্যায় পর্যবসিত হয় না। কারণ তিনি অসত্য থেকে সত্যের পরিবর্তে সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে অগ্রসর হবার মত পোষণ করতেন।

সুভাষচন্দ্রকে কিছুটা অজ্ঞাবাদী বলে মনে করা যায়। 'সত্য এত বৃহৎ যে আমাদের ক্ষুদ্র বোধশক্তির সাহায্যে উহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়' বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে যৌগিক প্রক্রিয়া অথবা স্বজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে; ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণাও সেদিক থেকে আপেক্ষিক—অর্থাৎ জ্ঞাতা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সাহায্যে ব্রহ্মের ভিন্ন ধারণা করে থাকেন— বিভিন্ন ধারণার অমিল ও বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও সেগুলি সমান সত্য। এমনকি একই ব্যক্তির সময়ের ব্যবধানে ধারণার ব্যতিক্রম হতে পারে। সেজন্যে কোনও ধারণাকেই অসার মনে করার কারণ নেই। বিবেকানন্দের কথায় 'অসত্য হইতে সত্যে নয়, বরং সত্য হইতে উচ্চতর সত্যের দিকে মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে'— এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীকে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন; তাতে সব মতকেই সহ্য করার একটা ক্ষেত্র থাকে।[৯]

তিন : ইতিহাসচিন্তা

প্রথম জীবনে বৈদান্তিক মনোভাবে আচ্ছন্ন সুভাষচন্দ্র পরিণত বয়সে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী হয়ে পড়েন। তিনি হেগেলের অনুরাগী ছিলেন। হেগেলের ইতিহাসদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কোথাও তেমন না করলেও স্থানবিশেষে তাঁর মতামত হেগেলীয় চিন্তাকেই সমর্থন জানায়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: **'One that appeals to me most and which in my view approximates to reality more than any other— is the**

Hegelian Dialectics. Progress is neither unilinear, nor is it always peaceful in character. Progress often takes place through conflict'।[১০]

নয় (thesis) প্রতিনয় (antithesis) ও সমন্বয়ের (synthesis) পথ অনুসরণ করে প্রগতি অগ্রসর হয়। কি চিন্তারাজ্য কি বস্তুজগতে বিবর্তনের প্রকৃতি হল একের পর এক বিরোধ ও সেগুলির সমাধানের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়া। দ্বান্দ্বিক (dialectic) প্রক্রিয়ায় পরম সত্তা ক্রমান্বয়ে আত্মোৎঘাটিত করে চলে। সুভাষচন্দ্র সেই ধারায় সকলকে বিলীন হতে আহ্বান জানান। প্রতি যুগকে তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে সমন্বয় খুঁজে নিতে হবে। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে তিনি নতুন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

নিজ প্রকৃতির তাগিদে তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'জড় জগতের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়' আছে।[১১] এবং একথাও মনে করতেন যে 'বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত আছে' তা আকস্মিক, অদৃষ্টসম্ভূত বা দুর্দৈব নয়।[১২] অবরোহী ও নির্দেশ্যবাদী এই প্রত্যয়ের পিছনে পরমব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধি সাপেক্ষ।

তাঁর মতে মনুষ্যজীবনের মতো সভ্যতারও একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল থাকে। আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেলেও বিশেষ কোনও সভ্যতার পুনর্জন্ম ঘটতে পারে, যদি তার অন্তর্নিহিত প্রাণরস বিদ্যমান থাকে। ভারতীয় সভ্যতায় সেই প্রাণরস থাকায় তা বারংবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে; প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা চিরনবীন।[১৩]

পৃথিবীর আগামী দিনের ইতিহাসে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক চিন্তার উৎকর্ষে ইংলণ্ড মানবসভ্যতায় একটি মূল্যবান অবদান সৃষ্টি করেছিল। তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসিদেশ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতায় সর্বোত্তম অবদান হল জার্মানির মার্কসীয় দর্শন। বিংশ শতকে বিশ্বসংস্কৃতি ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ সংযোজন রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা সংস্কৃতি। এরপর মানব সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানের দায়িত্ব নির্ভর করছে ভারতের উপর।[১৪]

রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলনে (১৯৪০) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন: 'The age of Imperialism is drawing to a close and the era

of freedom, democracy and socialism looms ahead of us. India, therefore, stands today at one of the crossroads of history. It is for us to share, if we so will, the heritage that awaits the world'।[১৫]

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শ ভারত কোনও দেশ থেকে ধার করে নি, সেগুলি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অঙ্গ ছিল। 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি ভারতীয় ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ইংরেজ আসার ফলেই যে ভারতের ঐক্য সাধিত হয়েছে তা মনে করা ভুল।[১৬] ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঐক্য ও সমন্বয় যথেষ্টই বিরাজ করত। ইদানীং দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ঐক্যের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে পরাধীনতার গ্লানিবোধে। মুসলমানেরা আসার পরও দেশের ঐক্য বিনষ্ট হয় নি। তারাও ভারতীয় ধারায় সমন্বিত হয়েছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্যকে কৃত্রিম বলে তিনি মনে করতেন। সমন্বয় হয় নি কেবল ইংরেজের সঙ্গে—যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচারবিচার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতীয় ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারা বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন :

১. একটি যুগের উত্থানের পর আসে পতনের যুগ এবং আবার উত্থান ঘটে ;
২. দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ও জড়তাই হল অধঃপতনের কারণ ;
৩. নতুন চিন্তা ও নতুন রক্তের সঞ্চারে প্রগতি ও নব ঐক্য গড়ে ওঠে ;
৪. উন্নত মননশীল শক্তি ও উৎকৃষ্ট সমরকুশলী মানুষের নেতৃত্বেই নবযুগের বোধন সম্ভব ;
৫. সারা ভারতের ইতিহাসে বিদেশ থেকে আগত সবাই এদেশের সমাজে মিশে গেছে ; ইংরেজই তার প্রথম ও একমাত্র ব্যতিক্রম ;
৬. কেন্দ্রীয় শাসনের যতই পরিবর্তন ঘটে থাকুক না কেন, এখানে মানুষ চিরকাল অবাধ স্বাধীনতার অধিকার পেয়েছে।[১৭]

ভারতের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক অধোগতির তিনি কয়েকটি কারণ দর্শিয়েছেন : ১. ভাগ্য ও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর অধিক নির্ভরতা ; ২. আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর উন্নয়নে ঔদাসীন্য ; ৩. সমরবিজ্ঞানে অরুচি ও পশ্চাৎপদতা ; ৪. অহিংসা দর্শন প্রসূত নির্বিরোধ জীবনে আসক্তি।

তাঁর মতে বিদেশীরা এদেশে বাণিজ্যিক কাজে প্রথমটা যখন তৎপর ছিল তখন বিশেষ বৈরিতার ভাব দেখা যায় নি। কিন্তু ক্রমে ক্ষমতাসীন হয়ে শাসন-

শৃঙ্খল দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ এদেশে চাপিয়ে দিতে গেলে সংঘাত শুরু হয়। বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় আত্মার বিদ্রোহ রামমোহনের কণ্ঠে প্রথম ঘোষিত হয়েছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক জনকরূপে দেখেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অবহেলিত হয়েছে বলে সুভাষচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৯]

চার : রাষ্ট্রদর্শন

মানুষকে সুভাষচন্দ্র সামাজিক জীব হিসাবে দেখেছেন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মবিকাশ অসম্ভব। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, সার্থক পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। কিন্তু সমাজের উন্নতি ব্যতিরেকে উন্নতি অর্থহীন।[২০] সমাজজীবনের প্রেরণা ও আদর্শ হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ সকল প্রকার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মানুষ নির্বিশেষে সকলেরই সহজাত একটি অধিকার আছে—সে অধিকার হল নিজেকে বিকশিত করে তোলার অবাধ সুযোগ। সেই সুযোগ দেওয়াটাকেই তিনি স্বাধীনতা বলে মনে করতেন।[২১]

চিন্তায় ও কাজে মৌলিকতা এবং সৃজনীশক্তিই জীবনের লক্ষণ। সেজন্যে চাই অন্তরের জাগরণ। জনজীবনে ক্লান্তি ও জড়তা এলে চাই তার আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সংস্কার পদ্ধতিতে সাধিত হয় না; চাই বিপ্লব। বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে মজ্জাগত কোনও প্রভেদ তিনি অনুভব করেন নি। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যে-বিবর্তন ঘটে তাকে তিনি বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে যে-বিপ্লব সম্পন্ন হয় সেটা তাঁর মতে বিবর্তন। উভয়ের গোড়ার কথা বিবর্তন। বিপ্লব ও বিবর্তন উভয়েরই সামাজিক প্রয়োজন আছে।[২২] বিপ্লব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে ভাবজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইংরেজ এদেশে আসার ফলে ভারতীয়দের চিন্তাজগতে ঐরূপ একটা বিপ্লব

ঘটেছিল।[২৩] সেই নবজাগরণের ফলে ভারতীয়দের মনে অতীত ঐতিহ্যবোধ ও জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়। সেই বোধ ও চেতনা থেকেই তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ উদ্ভূত হয়েছিল। নিজের স্বপ্ন ও আদর্শ কী সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ-মুক্তি সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র; যে-সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না···সর্বোপরি যে-সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে'।[২৪]

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন। জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ, স্বার্থান্বিত ও আক্রমণাত্মক নীতি হিসাবে বৈশ্বিক মানবতার অন্তরায় বলে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সেজন্যে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এই বলে: 'My reply to the charge is that Indian nationalism is neither narrow, nor selfish, nor aggressive. It is inspired by the highest ideals of the human race, viz, Santyam (the true), Shivam (the good), Sundaram (the beautiful). Nationalism in India has instilled into us truthfulness, honesty, manliness and the spirit of service and sacrifice. What is more, it has roused the creative faculties which for centuries had been lying dormant in our people and, as a result, we are experiencing a renaissance in the domain of Indian art'।[২৫]

সুভাষচন্দ্র প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের মত অনুন্নত দেশের কোনও উপকার হবে না বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর কথায়: 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। এ-কারণে আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে'।[২৬] পশ্চিমী ধাঁচের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে তাঁর আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সোভিয়েত বা চীনের কেন্দ্রাভিগ এবং দলীয় একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর মনোভাবের মিল দেখা যায়।

সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনে একটি পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আধ্যাত্মিক ভাববাদী থেকে তিনি ক্রমে বাস্তববাদীতে পরিণত হন। সেজন্যেই হয়তো রাজনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সংমিশ্রণ তিনি পছন্দ করতেন না। গান্ধীর রাজনৈতিক

মত ও পথের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে গান্ধীবাদে রাজনীতিকে সঠিক স্থানে বিচার করা হয় না। তাঁর মতে : 'We have to render unto Caesar what is Caesar's।'[২৭] প্লেটো, সিসেরো, গ্রীন প্রমুখ অনেকেই রাজনীতিকে তত্ত্বগতভাবে নীতিশাস্ত্রের দ্বারা পরিমার্জনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। এদেশেও গান্ধী, গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্যাবহারিক দিক থেকে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তা চাইতেন না। রাজনৈতিক বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্রের মতে সিজার ও খ্রীষ্টের স্থান স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। রাজনৈতিক রীতিনীতিকে তিনি সুবিধা আদায়ের একটি পদ্ধতি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই ১৯৩১ সালে 'রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে' গান্ধীর সরল ঘোরপ্যাঁচহীন কথাবার্তার তিনি তারিফ করতে পারেন নি। ঝোপ বুঝে কোপ মারাই ছিল সুভাষচন্দ্রের মত। তিনি চেয়েছিলেন রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গান্ধীর কণ্ঠে একটু কঠোরতা বেজে উঠুক।

সুভাষচন্দ্র বুঝতেন যে দেশ গড়তে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। চাই ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা— সুবিধামত সহজ পথে দেশের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। সেজন্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বা এডমণ্ড বার্কের সহজপন্থী নীতিতে সায় দিতে পারেন নি। হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপসহীন নীতিই ছিল তাঁর এ বিষয়ে আদর্শ।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি ঐ-পদ্ধতি সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক ধারায় প্রয়োগ করে একটি অভিনব বিচারবিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে যে-কোনও প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে একটি স্ববিরোধী (antithesis) শক্তি থাকে যাকে তিনি বামপন্থী আখ্যা দেন। অন্তর্নিহিত এই বিরোধী শক্তি কালক্রমে বল ও বিস্তার লাভ করে। বিশেষ অবস্থায় এই শক্তির বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য যথোচিত রাজনৈতিক ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। অনেক সময়ে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে রফা ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বামপন্থী ধারা শক্তিসঞ্চয় ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তখন স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় ও অনুগতদের সুসংবদ্ধ রাখা উচিত। ক্রমে বাম ও দক্ষিণের সংঘাত উপস্থিত হয়। সে-সংঘাত যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন মূলতঃ সেটা প্রগতির পরিপূরক। পরে উভয়পক্ষের সমন্বয় ও সহ-যোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। অভীষ্ট ফললাভের পর ক্রমে সেই-বামপন্থী শক্তিরও সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ঘটে ইতিহাসে পুনরাবর্তন অর্থাৎ নতুন বামপন্থী শক্তির উদ্ভব। পুরাতন বামপন্থী শক্তি হীনবল হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯২০ সালের

পর গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের ছিলেন বামপন্থী। ক্ষমতার শীর্ষে উঠে তাঁদের শক্তি ও সম্ভাবনা পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক কারণেই ক্ষয় পেতে শুরু করে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনও তাদের ফুরিয়ে যায়। দেশে আবার নতুন বামপন্থী শক্তি দেখা দেয়। ১৯৩৬ সালের আগে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে নতুন বামপন্থী শক্তি ক্রমশঃ দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৩৮ সালে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে একত্র চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে সচেতন হয়ে শক্তিবৃদ্ধি ও ঐক্যের জন্য তৎপর হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বামপন্থী ঐক্যকে তিনি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন বলেই অভিহিত করেন।[২৮] বামপন্থীদের সেই ভূমিকা তাঁর মতে আদৌ নেতিবাচক নয়। তিনি বলেন : **'The role of the antithesis in the History is not a negative one. It is something positive and dynamic which has to carry us swiftly along the path of progress'**।[২৯]

সুভাষচন্দ্র তাঁর বামপন্থী মতবাদকে একাধারে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁকে মার্কসবাদী মনে করা ভুল। সুস্পষ্টভাষায় তিনি মার্কসবাদী কমিউনিজমকে পরিহার করেন :

১. কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় সংগ্রাম মূলতঃ একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।
২. কমিউনিস্টরা বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। রাশিয়া তার ঘর গোছাতেই ব্যস্ত। পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়া মিতালি করছে।
৩. কমিউনিস্টরা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক। রাশিয়ায় প্রাকবিপ্লবকালে জারের স্বেচ্ছাচারকে চার্চ সমর্থন করত বলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে চার্চ ও ধর্মের বিরোধিতা। ভারতে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক না থাকায় মানুষের সঙ্গে ধর্মের কোনও সংঘাত নেই।
৪. কমিউনিস্টরা ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে অতি বেশি বিশ্বাসী। কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা গুণগ্রাহী হলেও ভারত ইতিহাসকে কেবলমাত্র অর্থনীতির দিক থেকে দেখে না।
৫. কমিউনিস্ট অর্থনীতির কিছু গুণ থাকলেও আসলে তা গতানুগতিক। মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কে তার বিশেষ কোনও অবদান নেই।
৬. কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রমিকদের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়। ভারত

শ্রেণীসংঘর্ষ চায় না এবং কৃষিপ্রধান দেশ বলে এখানকার চাষীদের স্বার্থ শ্রমিকদের সমতুল্য।[৩০]

তবে কমিউনিজমের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বগত প্রভেদ থাকলেও মার্কসবাদকে তিনি মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গ্রহণ করেছেন। লেনিনও ছিলেন সুভাষচন্দ্রের কাছে একজন আদর্শ পুরুষ। সোভিয়েত দেশের পরিকল্পিত অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পাঁচ : আর্থনীতিক চিন্তা

সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় অর্থনীতির গুরুত্ব দেখা যায়। এবিষয়ে মৌলিক কোনও অবদান তাঁর না থাকলেও মনে তাঁর তত্ত্বগত কৌতূহল ও উৎসাহ বেশ সজাগ ছিল। মার্কসীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অর্থ নৈতিক নির্দেশ্যবাদকে সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেন নি এবং মুদ্রাতত্ত্বে মার্কসীয় অর্থনীতির দুর্বলতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র; তাত্ত্বিক আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেন নি। তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা দেশের সমস্যা ও প্রয়োজনের দিক থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁর কথায় 'ভারতবর্ষে রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে—এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক প্রভুত্ব নয়, অর্থ নৈতিক শোষণও। তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে মূলতঃ অর্থ নৈতিক প্রয়োজনেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা দরকার'।[৩১]

প্রসঙ্গতঃ সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী রাজনীতির দুটি ধারা লক্ষণীয়। তৃতীয় দশকে তিনি ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাই শুধু করেছেন। চতুর্থ দশকে তাঁর চিন্তা অর্থনীতির ব্যঞ্জনা লাভ করে। সেই সময়ে সমাজতন্ত্রের প্রশ্নকে আশু বিষয় মনে না করলেও সমাজতান্ত্রিক প্রচারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন—যাতে দেশবাসীর মন স্বাধীনতার পর দেশগঠনের কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তুত থাকে। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে স্বাধীনতার পর কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন 'have' যারা তারা 'have not'-দের অনুকূলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগী হবে না এবং হয়তো ইংরেজের সঙ্গে মিতালি করবে। তাই স্পষ্টই বলেন : 'The logic of history will, therefore, follow its inevitable course. The

political struggle and the social struggle will have to be conducted simultaneously. The party that will win political freedom of India will be also the party that will win social and economic freedom'।[৩২]

দেশ যতদিন পরাধীন থাকবে ততদিন অন্নবস্ত্র, শিক্ষাস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্যার সুরাহা হবে না বলে তিনি মনে করতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প-সম্প্রসারণের চিন্তাকে তিনি ঘোড়ার আগে গাড়ী যোতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অথচ ১৯৩৮ সালে যখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন তাঁরই নেতৃত্বে 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি' গঠিত হয়েছিল দেশের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রচনার জন্য।

দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে এর কারণ হল প্রথমতঃ ইংরেজের স্বার্থে স্বদেশী শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়তঃ কৃষিকার্যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ইংরেজ আসার আগে ভারত শিল্পবাণিজ্যে উন্নত ছিল। ইংরেজের স্বার্থে এদেশের শিল্পবাণিজ্য বিনষ্ট হয়েছে; কাঁচা মাল রপ্তানিতেই ভারতের বহির্বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একই কারণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসও ব্যাহত হয়েছে; তাই জনসাধারণ দুঃসহ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। শতকরা সত্তর ভাগ ভারতীয় কৃষক ছ-মাস বেকার থাকে, প্রতিকারস্বরূপ তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন।

শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, ন্যায্য সুযোগসুবিধাদি, কর থেকে রেহাই ও তাদের জন্য উপযুক্ত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। অর্থনৈতিক যোজনাই দ্রুত দেশোন্নয়নের একমাত্র পথ এবং সেজন্যে তিনি সোভিয়েত প্ল্যানিং ব্যবস্থার তারিফ করেন। প্ল্যানিং-এর সঠিক রূপায়ণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ইংরেজশাসন এদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়কে নিঃশেষ করে দিয়েছে— তাই দরকার স্বর্ণমান ত্যাগ করে জাতীয় শ্রম, উৎপাদন ও ধনের ভিত্তিতে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন। তাঁর মতে বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত। ১৯৩৩ সালে জার্মানির আদর্শ অনুসরণ করে পণ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য ব্যবস্থার নবরূপায়ণ পন্থার সমর্থন করেন।[৩৩]

'উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পূর্ণ বিলোপের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ভূমি ব্যবস্থার আশু পরিবর্তনকল্পে তিনি জমিদারি প্রথার অবসান দাবি করেন। চাষীদের ঋণের বোঝা মকুব করে দিয়ে স্বল্প সুদে

কৃষিঋণ ব্যবস্থার উপরও তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একসময়ে সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণের বিষয়েও তাঁর উৎসাহ ছিল।

ছয় : শিক্ষাচিন্তা

নিজের ছাত্রজীবন থেকেই সুভাষচন্দ্র শিক্ষা সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং উত্তরকালে শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ ও অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি অনুভব করেছেন যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি মস্ত দৈন্য হল ভাবের দৈন্য। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শের বীজ বপনের চেষ্টা অনুপস্থিত। সেজন্যে তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের দায়ী করেন। তাই তিনি সখেদে বলেছেন : 'অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন— তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন— তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে'।[৩৪]

সাংস্কৃতিক উজ্জীবন ও বৈশ্বিক মনোভাব সৃষ্টিকেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায় : **'In order to facilitate cultural rapprochement a dose of secular and scientific training is necessary. Fanaticism is the greatest thorn in the path of cultural intimacy, and there is no better remedy for fanaticism than secular and scientific education'**।[৩৫]

নিরক্ষরতাকে সুভাষচন্দ্র জাতীয় অগ্রগতির সর্বপ্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। তাঁর মতে দেশের শিক্ষিত বেকার শ্রেণী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই সমস্যার সুরাহা করতে পারে। দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন তিনি চেয়েছিলেন। রোমান অক্ষরে এদেশের মুদ্রণকে উৎসাহ দান ও জনপ্রিয় করে তোলারও তিনি সমর্থক ছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পর এই বিষয়টির রূপায়ণে তিনি উদ্যোগী হন।

প্রাথমিক শিক্ষাকালে পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বস্তুচেতনাই তাঁর মতে অধিক প্রয়োজন— সেজন্যে চাই হাতেকলমে শিক্ষার প্রচলন। শিক্ষকদের প্রধান গুণ

হল দরদ ও ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি উপাদান : ১. শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ; ২. শিক্ষার উপযুক্ত প্রণালী এবং ৩. শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক।[৩৬]

ছাত্রজীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অভারতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠালে তাদের স্বাভাবিক মনের বিকাশ ব্যাহত হয়। ইংরেজ শিক্ষকদের দিয়ে এদেশে বিদ্যালয় পরিচালনার প্রচেষ্টা সেই কারণে ক্ষতিকর। দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি লিখেছেন : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপায় শৈশবাবস্থায় ভারতীয় ছেলেদের উপর জোর করিয়া ইংরাজী শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়া নয়, বরং তাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনিতে হইবে ; তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বিচার করিতে পারিবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ'।[৩৭]

তরুণ ও যুবকদের দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিকল্পে সুভাষচন্দ্র তাদের জন্যে নানাধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনে বিশেষ উৎসাহী ও যত্নবান হয়েছিলেন।

সাত : গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র

গান্ধী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবে পারম্পর্যের অভাব দেখা যায়। কখনও তিনি গান্ধীকে জাতির জনক হিসাবে তাঁর আশীর্বাণী চেয়েছেন—কখনও বা গান্ধীর দ্বারা ভারতের 'salvation' হবে না বলে তাঁকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি। পার্থক্য কেবল ভিন্ন পথে তাঁরা একই লক্ষ্যে পৌছতে চেয়েছিলেন। উভয়েরই প্রেরণার উৎস ছিল গীতার বাণী। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবত্তায় উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। উভয়েই মনে করতেন যে প্রেমই আধ্যাত্মিক মূল্য-বোধের মর্মকথা। এই আধ্যাত্মিক মানবতাবোধেই দুজনের মিল লক্ষণীয়। ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার সমন্বয়ে দুজনেই সামাজিক পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের সমন্বয়ী আদর্শ কেবল রূপায়ণের ভিন্ন পথ খুঁজেছে।[৩৮]

সত্যের প্রতি গান্ধীর অবিচল নিষ্ঠা ক্লান্তিবিহীন প্রয়াস ও মানবিক হৃদয়বত্তার উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র প্রণতি জানান। কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ও

দেশের জনজাগরণে গান্ধীর অবদানকে সুভাষচন্দ্র অস্বীকার করেন নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালেও তিনি গান্ধীকে ভারতের সর্বোত্তম নেতা বলে অভিহিত করেন।[৩৯] এমনকি ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপনের সময়েও গান্ধী প্রবর্তিত কর্মপন্থা অনুসরণের সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করেছিলেন।[৪০]

এতৎসত্ত্বেও তিনি গান্ধীবাদীতে পরিণত হন নি। এর কারণ যত না দার্শনিক তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাবহারিক রাজনীতি। গান্ধী প্রদর্শিত কর্মপন্থা মনঃপূত না হওয়ার কারণস্বরূপ সুভাষচন্দ্র বলেছেন :

১. চালকের চেয়ে চালিতের চরিত্রই শক্তির মান নির্ধারণ করে। বহু নেতাই গান্ধীর চেয়ে অনেক কম সংখ্যক অনুগামী নিয়ে সফল হয়েছেন।

২. গান্ধী দেশের লোকের মন বুঝতেই ব্যস্ত। বিদেশীদের মন বোঝার চেষ্টা করেন নি। তাদের কাছে তাঁর যুক্তিভাবনা অবোধ্য।

৩. সব তাস ফেলে খেলার মতো নীতি এক্ষেত্রে অচল। ইংরেজের সঙ্গে রাজনীতির কূটনৈতিক চাল চালা দরকার।

৪. গান্ধী আন্তর্জাতিক অস্ত্র-প্রয়োগে অক্ষম হয়েছেন। অহিংসার পথে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক প্রচারকর্ম অপরিহার্য।

৫. পরস্পরবিরোধী স্বার্থের নিষ্ফল ঐক্যসাধন প্রচেষ্টা গান্ধীর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। রাজনীতির লড়াইয়ে সেটা শক্তির পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধে চাই বিপ্লবী ও জঙ্গিমনোভাবাপন্ন কর্মিদল, যারা যে-কোনও কষ্টস্বীকার করতে প্রস্তুত।

৬. গান্ধীর মধ্যে দ্বিমুখী ভূমিকা তাঁর ব্যর্থতার শেষ কারণ। একদিকে তিনি পরাধীন জনগণের অধিনায়ক ; অপরদিকে তিনি এক নতুন আদর্শ নিয়ে সকলের ধর্মগুরু হয়েছেন ; ফলে কারোও সঙ্গে বোঝাপড়া করতে তিনি অপারগ।[৪১]

বাস্তববাদী হওয়ার দরুন সুভাষচন্দ্র গান্ধীর নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদকে মেনে নিতে পারেন নি। মনে করতেন রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে অহেতুক নৈতিক মাপকাঠিতে ধোঁয়াটে করে তোলা হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র আশু কার্যকারিতার দৃষ্টিতে রাজনীতিকে নিছক পাওনাগণ্ডা আদায়ের একটা পন্থা হিসাবে দেখতেন। তাঁর মতে গান্ধীবাদ শুধু একটি পথই বাতলেছে, সেটি হল সত্যাগ্রহ— তার মধ্যে না আছে কোনও সুস্পষ্ট সমাজদর্শন, না-কোনও পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মপন্থা।

গান্ধীর জ্ঞানতত্ত্ব অযুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। ঈশ্বরের সদিচ্ছায় বিশ্বাসী গান্ধী ভাবতেন 'one step is enough for me'। গান্ধীর দৃষ্টিতে শুভ লক্ষ্যে পৌছতে হলে মাধ্যমটাও সৎ (means justifies the end) হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্র দেশের আশু লক্ষ্যবস্তু অনুযায়ী এক যুক্তিনির্ভর চিত্র কল্পনা করেন এবং তাকে আয়ত্ত করার তাগিদে যে কোনও মাধ্যম (end justifies the means) অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

গান্ধীর 'intuition' ও 'inner voice' সুভাষচন্দ্রের কাছে বোধগম্য হত না। রাজনৈতিক শক্তিসঞ্চয় ও কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগই ছিল তাঁর কর্মসূচীর অঙ্গ। গান্ধীবিরোধী স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠাকে সুভাষচন্দ্র যুক্তিসম্মত প্রতিক্রিয়ারূপে দেখেছিলেন। দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ ও মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক কার্যধারা যুক্তিবিহীন গান্ধীবাদী নেতৃত্বে প্রভাবিত হয়েছে। যুক্তিবাদী কিছু মানুষ গান্ধী বিরোধী হলে কি হবে, অসীম শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগে বিগলিত জনসাধারণ গান্ধীর সম্মোহনে আচ্ছন্ন।[৪২]

সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সমালোচনা করে বলেছেন যে জেনেই হোক বা না জেনেই হোক গান্ধী ভারতীয়দের এক মস্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকেন। এদেশে সাধুসন্ন্যাসীদের উপর লোকের অগাধ ভক্তি। সন্ন্যাসীদের মত বেশভূষা ধারণ করায় গান্ধী অপরিসীম সমর্থন ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছেন। মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির পরিবর্তে তাদের ভাবাবেগ ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা যুক্তিহীন রাজনৈতিক পন্থা ছাড়া আর কিছু নয়।[৪৩]

অবিসংবাদী নেতা হিসাবে গান্ধী নানা মত ও সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সম্প্রীতি সাধনে তৎপর থাকতেন এবং তাদের সংঘর্ষকে প্রশমিত করতেন। তিনি একাধারে জমিদারের প্রতিনিধি, আবার কৃষকেরও প্রতিভূ ছিলেন—পুঁজিপতিরাও তাঁকে নেতা মনে করত, আবার শ্রমিকেরাও তাঁকে নেতারূপে বরণ করে। সুভাষ-চন্দ্র শ্রেণীসংঘর্ষ না চাইলেও নির্বিত্ত বনাম বিত্তবানদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ধনী ও বিত্তবানেরা ইংরেজের সঙ্গে যে আঁতাত করতে পারে তাঁর সে-আশঙ্কার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই গান্ধীর নেতৃত্বে পরস্পরবিরোধী দল ও মতের সমন্বয়-প্রচেষ্টাকে তিনি এক মস্ত গোঁজামিল বলে মনে করতেন। এবং সে-কারণেই দেশের পরিবর্তনকামী সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রয়োজন বহু পূর্বেই অনুভব করেছিলেন। গান্ধীর

প্রভাবমুক্ত এই দলই দেশের মুক্তি সাধন করবে। তাঁর মতে 'India's salvation will not be achieved under his (গান্ধীর) leadership'।[৪৪]

কেবল অহিংস পন্থা আঁকড়ে থাকলে স্বরাজ আসবে না বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। অহিংস সত্যাগ্রহ জনচেতনাকে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু একমাত্র তার সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব। অহিংস কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের জন্য হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র দুটি অতিরিক্ত পন্থা সংযোজন করতে চেয়েছিলেন : ১. কূটনীতি ; ২. আন্তর্জাতিক প্রচার অভিযান। এবিষয়ে বহু পূর্বে গুরু দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। গান্ধী দেশেই সুসংগঠিত কার্যধারা বজায় রাখা এবং উৎকৃষ্ট কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন।

অহিংসা গান্ধীনীতির মূলকথা। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় অহিংসা সময়বিশেষের একটি পন্থামাত্র। গান্ধীর দৃষ্টিতে সত্য ও অহিংসা ব্যতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়— অহিংসাকে জীবনের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করলে সত্য ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা হবে সর্বত্র। অন্যদিকে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে ঘাতপ্রতিঘাতের আশ্রয়ে ইতিহাস এগিয়ে চলে এবং চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই প্রেম অবিরাম আত্মপ্রকাশ করে— সেখানে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে কোনও সীমারেখা টানা যায় না। চিরন্তনের মাপকাঠিতে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন আপেক্ষিক। প্রগতির বিধান তথা বিশ্বজীবনের ধর্ম ও বিবর্তনের ধারায় হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন মীমাংসিত হয়। এবিষয়ে হেগেলীয় চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

গান্ধীর বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি, আধুনিক শিল্পোন্নয়নের পরিবর্তে খাদি ও কুটির শিল্প, অছিবাদ ইত্যাদি সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন নি। সুভাষচন্দ্র কুটিরশিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পের আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধী সমুদয় বিষয়কেই তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। সুভাষচন্দ্র দেখেছেন আশু সমস্যা ও বাস্তব কার্যকারিতার দিক থেকে।

আট : সুভাষচন্দ্র ও ফ্যাসিবাদ

সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ফ্যাসিবাদী প্রভাব সুপরিস্ফুট। তবুও তাঁকে পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ আছে। বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা। সেজন্যে সম্ভাব্য যে কোনও পথেই যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্বের দরবারে দেশের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জানাবার জন্য সদাই তিনি চিন্তা করতেন। বহির্ভারতে এবিষয়ে সহানুভূতিশীল বন্ধু তিনি খুঁজেছিলেন এবং শেষাবধি একথা তিনি উপলব্ধি করেন যে বাইরের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া দেশের মুক্তি সাধিত হবে না। সকল পথই যখন দেখেছিলেন রুদ্ধ তখন তিনি ফ্যাসিস্টদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন। তবে একথাও প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দেবার আগে তিনি সোভিয়েত সাহায্যের প্রত্যাশা করেন ; এমনকি যুদ্ধে পরাজয়ের পরও তিনি সোভিয়েত দেশে চলে যাবার কথা চিন্তা করেছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে কোন 'ইজম' অপেক্ষা দেশের মুক্তিই ছিল প্রধান ও একমাত্র প্রশ্ন।

বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও তার আক্রমণাত্মক রূপের পরিচয় ঘটে বহু পরে। একথার আভাস পাওয়া যায় পরবর্তীকালের নানা উক্তি এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে।[৪৫] তার আগে সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠন ও প্রবণতা দেখা দরকার। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিয়মানুবর্তিতা ও ফৌজি রীতিনীতির অনুরাগী ছিলেন। হেগেলের দর্শন থেকে উত্তরকালে সমষ্টিবাদী চিন্তা আহরণ করেন। সীমিত সময়ে কার্যসিদ্ধি ও দেশের পুনর্গঠনের জন্য তিনি লৌহকঠোর ব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্রের উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন। সে ব্যাপারে মুসোলিনিকে তাঁর আদর্শ মনে হয়েছিল। গান্ধী ইতালিতে মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করায় সুভাষচন্দ্র খেদ প্রকাশ করেন। ফ্যাসিস্টদের দ্রুত দেশোন্নয়নের প্রয়াস তাঁকে একদিকে যেমন মুগ্ধ করেছিল তেমনি ইংরেজের সঙ্গে তাদের বৈরিতাও তাঁকে ফ্যাসিস্টদের অনুরাগী করে তোলে। জওহরলাল লিখেছেন : '**He did not approve of any step being taken by the Congress which was anti-Japanese or anti-German or anti-Italian...We passed many resolutions and organized many demonstrations of which he did not approve during the period of his Presidentship...**'।[৪৬]

সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদী প্রবণতার সমর্থনে নীচের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষণীয় :

এক : 'Superman-এর যে-রূপ জার্মাণ দার্শনিক Nietzsche (নীটশ) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনও মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন— কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষ্য জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই'। ('নূতনের সন্ধান'। পৃ ৯০-৯১)

দুই : 'আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective সাধনা বা সমষ্টিগত সাধনা ; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা— সে সাধনার কোনও সার্থকতা নাই।...আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে— ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে— মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য্য— এক সুরে বাঁধা হইবে।' ('নূতনের সন্ধান'। পৃ ৮২-৮৩)

তিন : 'অরাজকতা দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য মধ্য ভিক্টোরিয় গণতন্ত্র নয়, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার।' (সাম্যবাদী সংঘের কার্যক্রম। সংখ্যা ৮)।

চার : 'সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা চলবে না।' (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ২৩)

পাঁচ : 'ভারতবর্ষের রোগ একটা নয়। তার এত রকমের রাজনৈতিক ব্যাধি একমাত্র একজন নির্মম ডিক্টেটরই সারাতে পারে।' (হিউ টয়। 'ব্যাঘ্রকেতন'। পৃ ৮৪)

ছয় : 'মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ষোল আনা আন্তর্জাতিক। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক নাই। এক্ষেত্রে বরং ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদের সঙ্গে সুভাষের সাদৃশ্য আছে।' (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৪০)

সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদে যে-অরুচি ছিল তারও সমর্থনে নানা যুক্তি ও উক্তি দেখানো যায় :

এক : 'হিটলারবাদের আমি বিরোধী, তা' সে হিটলারতন্ত্র কংগ্রেসের মধ্যেই থাকুক বা অন্য দেশেই থাকুক। আমার মনে হয়, হিটলারবাদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো সমাজতন্ত্র।' (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৩২)

দুই : 'দূর প্রাচ্য থেকে জাপান পাশ্চাত্ত্য শক্তিকে তাড়াতে চায়। কিন্তু এই

পাশ্চাত্ত্য তাড়ানো কি বিনা সাম্রাজ্যবাদ করা চলে না? চীনের মত প্রাচীন সভ্য একটা জাতকে আক্রমণ না করলেই চলতো না? না, না, জাপানের কৃতিত্বের যতই প্রশংসা করি না কেন, আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ চীনের এই বিপদের সময়ে চীনেরই কাছে যাবে।' (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৪০)

তিন: দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে ফ্যাসিস্ট শিবিরে সাহায্যের আশায় যোগ দেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরূপ সুবিধা গ্রহণ নতুন কিছু নয়। স্টালিনও হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। জার্মানিতে কমিউনিস্টরাও হিটলারকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল সোসাল ডেমোক্র্যাটদের প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্যে।[৪৭] কমিউনিস্ট চীনও ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

চার: সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ফ্যাসিবাদী উগ্রতা অনুপস্থিত। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে চিরকাল নিন্দা করেছেন—ফ্যাসিস্টরা উগ্রতর সাম্রাজ্যবাদী। তাছাড়া তিনি তাদের জাতিশ্রেষ্ঠতা তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের জন্যে চিরকাল তাঁর মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছে।

পাঁচ: বৈষ্ণব প্রেম ও প্রীতির ভাবধারায় প্রভাবিত সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদী দর্শনের প্রত্যয়ে অধিনেতার ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতিতত্ত্ব নিশ্চয় গ্রহণ করতেন না। তাদের দর্শন ও রাজনীতির বহু মৌলিক বিষয় তাঁর মধ্যে অবর্তমান ছিল। সাময়িক প্রয়োজনের তাড়নায় তিনি তাদের অনুকরণে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন ও তাদের কিছু রীতিনীতি অবলম্বন করেছেন।

ব্রিটেনে ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র কিংবা ফরাসিদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে তিনি অনাস্থা প্রকাশ করেন। তিনি ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু গুণ দেখেছিলেন; এবং কমিউনিজমের মধ্যেও অনুরূপ কিছু গুণ প্রত্যক্ষ করে উভয়ের সমন্বয়ে এক স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করেন। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের এই সমন্বয়চিন্তা বেশ গোলমেলে। কারণ তাদের মূলগত দার্শনিক প্রভেদ।

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র ও জার্মান নাৎসিদের ন্যাশন্যাল সোসালিজমের মধ্যে কিছুটা মিল আছে। সুভাষবাদী মতবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা অনিল রায় সাম্যবাদী সংঘের কার্যক্রম আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'এই সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম থেকে দেখা যায় সুভাষ তথাকথিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। ফ্যাসীবাদ ও মার্কসবাদের সাংগঠনিক নীতির মধ্যে দুটি বিষয়ে খুব মিল আছে। এরা উভয়েই স্বৈরতান্ত্রিক (authoritarian) বা সমগ্রতান্ত্রিক (totalitarian) রাষ্ট্রে বিশ্বাসী।

তাছাড়া রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আর্থিক পরিকল্পনা এদের দুয়েরই সমাজগঠনের ভিত্তি। সুভাষ এই দুটিই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া জাতীয়তাবাদ সুভাষের মূলতন্ত্র। এক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদের সঙ্গে আংশিক মিল রয়েছে সুভাষবাদের। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদও সুভাষের মৌলিক নীতি; এদিক দিয়ে মার্কসবাদের সঙ্গেও মিল রয়েছে সুভাষের। উপরের প্রগ্রামে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটার উল্লেখ নেই। কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, জনতার পূর্ণ আর্থিক মুক্তি, এবং কিষাণ মজুরদের পক্ষেও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা এই কার্যক্রমে রয়েছে। ফ্যাসীবাদ ও মার্কসবাদের সঙ্গে সুভাষের সাদৃশ্য থাকলেও গুরুতর পার্থক্যও রয়েছে। সুভাষের জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই-ই নানা বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায় একেবারে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত'।[৪৮]

নয় : সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়বাদ

'ন্যাশনাল সোসালিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়ই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিত' বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। বহু পূর্বেই তিনি বলেছিলেন যে 'পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করে আমাদের নূতন একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভব করতে হবে'।[৪৯] এ-চিন্তার তত্ত্বগত যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেন: 'বিবর্তনের একেবারে শেষস্তরে এসে না পৌছালে কিংবা বিবর্তনকে একেবারে অস্বীকার না করলে, একথা বলবার কোনও যুক্তিই নেই যে আমাদের সামনে কেবল দুটি বিকল্প ও দুটি পথই মাত্র আছে, তার মধ্যেই বেছে নিতে হবে। হেগেলীয় বা বার্গসোনীয় বা অন্য কোনও ধরনের বিবর্তনই মানি না কেন, কোনও ক্ষেত্রেই একথা মনে করবার কারণ নেই যে সৃষ্টি শেষ হয়ে এসেছে। সকল দিক বিবেচনা করে এই মতই স্বীকার করতে হয় যে বিশ্ব ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে কম্যুনিজম ও ফ্যাসীজমের একটা সমন্বয়সৃষ্ট হবে'।[৫০]

ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের কল্যাণকর বিষয়গুলির তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে 'দুটি ব্যবস্থাই গণতন্ত্রবিরোধী অথবা একনায়কত্ববাদী। দুটি ব্যবস্থাই পুঁজিবাদবিরোধী। কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান ...ন্যাশন্যাল সোসালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিধানে এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়েছে'। ফ্যাসিবাদে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক

কাঠামোর সংস্কার সাধন না হওয়ায় ঐ ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি ছিল। অপরদিকে কমিউনিজমের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কমিউনিজমে জাতীয়তাবাদের স্থান নেই, ধর্মের কদর নেই, শ্রমিক ছাড়া অন্য শ্রেণীর মানুষের গুরুত্ব নেই ও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকেই শুধুমাত্র গ্রহণ করায় তাতেও তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। তাই তিনি ঐ দুটির নিষ্কর্ষ সমন্বিত করে তাঁর সাম্যবাদী বা সমন্বয়ী রাষ্ট্রদর্শন প্রচার করেন। তত্ত্বগতভাবে তিনি এই মতবাদের সমর্থনে বলেছেন: 'ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব, মহত্তর কোনও সমন্বয়ের মধ্যেই তার নিবৃত্তিসাধন করতে হবে। দ্বন্দ্বনীতি সেই কথাই বলে। এ যদি না করা হয় তো, মানবপ্রগতি রুদ্ধস্রোত হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষে তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার জন্যই চেষ্টা করা যাবে'।[৫১]

সুভাষবাদী সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনিল রায় লিখেছেন: 'ফ্যাসীবাদের একটা মূল উপাদান হলো জাতীয়তাবাদ। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করেছেন। এটাই সুভাষী সাম্যবাদের অন্যতম সমন্বয়।' প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সুভাষবাদী চিন্তাকে তিনি আরও বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে: 'সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ হলো ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নব সমাজতন্ত্রবাদ। একদিকে গান্ধীবাদের আতিশয্য, অন্যদিকে মার্কসবাদের আতিশয্য। এই দুই মতবাদের বাইরে তিনি তৃতীয় মতবাদ 'সমাজতন্ত্রের' পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রও ভারতবর্ষের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল তত্ত্বের উপরেই এই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হবে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য দিকের সমন্বয়ই এযুগের কালধর্ম। সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ সেই আদর্শের বাহক এবং সেই সমন্বয়েরই ধারক'।[৫২]

সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় রাজনীতির দ্বান্দ্বিক বিচারবিশ্লেষণ ও বামপন্থী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেসকে তিনি পাঁচমিশালী মতের এক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে দেখেছেন। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি আদর্শকে সামনে রেখে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনার জন্যে তিনি একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বামপন্থী দলের প্রয়োজন বহু আগেই অনুভব করেছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই তার

প্রগতিবাদী বামপন্থী বিভিন্ন দলগুলিকে একটি দলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসী হন এবং কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচীকেও মেনে নেন। তিনি বলেছিলেন : 'The Forward Block will function as an integral part of the Congress. It will accept the present constitution of the Congress— its creed, policy and programme. It will cherish the highest respect and regard for Mahatma Gandhi's personality and complete faith in his political doctrine of non-violent non-co-operation'।[৫৩]

কথাটি বলেছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর। ত্রিপুরীতে সভাপতিপদে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন বটে, কিন্তু তাঁর সমর্থকেরা এ. আই. সি. সি.-তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি এবং হাই কম্যাণ্ডের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। সেজন্যেই মূলতঃ এই দলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তিনি দুটি কর্তব্য স্থির করেন— প্রথমতঃ কংগ্রেসের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি ও দ্বিতীয়তঃ আমূল পরিবর্তনের দাবিতে দেশব্যাপী গণসংগ্রামের প্রস্তুতি। সেজন্যে ছাত্র ও যুব সংগঠন, ভলাণ্টিয়ার দল, কিষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এই কাজে লাগাতে চান।

সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী ঐক্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকও ক্রমে কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে একটি পার্টিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অসম্মতি সত্ত্বেও নিখিল ভারত দিবস অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করায় সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও কার্যকলাপ হয়ে দাঁড়ায় আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তিনি বলেন : 'দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের যে সম্পর্ক, বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পর্কও ঠিক তা-ই। দার্শনিক ভাষায় বলা যায়, ফরওয়ার্ড ব্লককে গান্ধীপন্থীদের 'প্রতিক্রিয়া' (antithesis) বলে গণ্য করা যেতে পারে।' ব্লকের ভূমিকা সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা ও প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি বলেন : The role of the Forward Block in Indian history is not that of His Majesty's opposition. We have seen remarks to the effect that the aim of the Forward Block is merely to ginger up the present policy and programme of the Congress. There could be no greater misunderstanding than this. The Block stands for something positive and dynamic'।[৫৪]

ব্লকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৯ সালের মে মাসে এবং ১৯৪০ সালের জুন মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই দলকে একটি পার্টি বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আপসহীন সংগ্রাম এবং সংগ্রামোত্তর কালে সামাজিক পুনর্গঠনই হয় তার আদর্শ: ১. পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম; ২. সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র; ৩. দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ব্যাপক শিল্পোৎপাদন; ৪. উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ; ৫. ধর্মোপাসনার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; ৬. সকলের জন্য সমান অধিকার; ৭. ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা; ৮. স্বাধীন ভারতে নববিধান গঠনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার-নীতির প্রয়োগ।[৫৫]

দশ : উপসংহার

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্রের মনে এক তীব্র অবসাদ দেখা দিয়েছিল। রাজনীতির দলাদলি ও নোংরামি তাঁর মনে সৃষ্টি করে তিক্ত বীতস্পৃহা। সেই সময়ে তিনি লিখেছিলেন: **Owing to the morally sickening atmosphere of Tripuri, I left that place with such a loathing and disgust for politics as I have never felt before duriug the last 19 years... I began to ask myself again and again what would become of our public life when there was so much of vindictiveness even in the highest circles...At times the call of the Himalayas became insistent, I spent days and nights of moral doubts and uncertainties. Then slowly a new vision dawned on me and I began to cover my mental balance'**।[৫৬]

রাজনীতিতে এ-ধরনের অনাসক্তি ও বীতস্পৃহা কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই দেখা যায় নি। বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যেই এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। রাজনীতিকে এদেশে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে না দেখাই তার কারণ। রাজনৈতিক আন্দোলনে

যুক্তি ও নীতির পরিবর্তে আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং স্বাধীন চিন্তার পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে। জাতি, ধর্ম, প্রদেশ, ভাষা ইত্যাদির বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ মনোভাবে উদারনীতি ও মানবতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ হয়নি। কায়েমীস্বার্থের হাতে রাজনীতি হয়েছে খেলার বস্তু। যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র দেশের এই প্রবণতা থেকে নিষ্কৃতি পান নি। চিন্তার সীমা ও স্ববিরোধ থাকায় তাঁর সংবেদনশীল মানবদরদী উদার মন বিষাক্তচক্রে আবর্তিত হয়ে তীব্র জ্বালা ও গভীর ব্যথায় কেবলই ক্রুদ্ধ গর্জন করেছে।

দেশকে স্বাধীন দেখাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। স্বাধীন না হলে দেশের দুর্গতি দূর হবে না। সেজন্যে ধৈর্যহারা হয়ে তিনি যে-কোনও পথই অনুসরণ করতে কৃতসংকল্প হন। শেষাবধি কিছুটা অনভিপ্রেত পথেই তাঁকে পা বাড়াতে হয়। তিনিও যেমন চরমপন্থা চেয়েছিলেন, দেশের প্রতিকূল পরিবেশও পাকে-চক্রে তাঁকে সেইদিকে যেতে বাধ্য করে। তাই সুভাষচন্দ্রের এক ও অদ্বিতীয় বন্ধু দিলীপ কুমার রায় সখেদে লিখেছেন: 'So, Subhas was a victim of a conspiracy of forces which, by exploiting his heart-sickness, induced him to seek a kind of catharsis through adventure. I do not suggest that his decision had been right, for I cannot but think that he should have remained here and faced the music... rather than shake hands with the contaminating Fascists'।[৫৭]

ভারতীয় জনমনের প্রাণপ্রতিম সুভাষচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদের এক নিষ্ঠাবান পূজারী। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূলাধার ছিল দেশভক্তি। তাঁর রচনাদির মধ্যে জাতীয়তাবাদই বারংবার ও বৃহদাকারে ফুটে উঠেছে। দেশের সর্বাত্মক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাকেও তিনি বিষনজরে দেখতেন। জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ প্রবৃত্ত না হলেও তিনি জাতির উপর এক পরম সত্তা আরোপ করেছেন— সমষ্টিকে ব্যষ্টির উপর স্থান দিয়েছেন— এমন এক দেশে যেখানকার ধমনীতে ধর্মের উন্মাদনা, সামন্ততন্ত্রী ঐতিহ্য ও যূথবাদী মনের শোণিতধারা প্রবল।

ভারতের রাষ্ট্রদর্শনে গান্ধী, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা মানবেন্দ্রনাথের মতো সুভাষচন্দ্রের স্থায়ী ও মৌলিক কোনও অবদান নেই। তিনি তত্ত্বকথার চেয়ে কাজেই বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী মূলতঃ

বিশ্লেষণমূলক ও সমকালীন সমস্যার পৃষ্ঠপটে রচিত। গান্ধী ও অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের মতো তিনি অর্থনৈতিক সমস্যার উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্যে প্ল্যানিং-এর আবশ্যকতা অনুভব করেন। দেশের সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারাবদলের চিন্তায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বলে মনে করা যায়।/

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সুভাষচন্দ্র তাঁর চিন্তার অসংগতি ও পরস্পর-বিরোধিতা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত ছিলেন। সেজন্যে নিজের মতামতের পরিবর্তনও করেন। ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ম্লান হয়ে যায় যখন তিনি তার আক্রমণাত্মক রূপ প্রত্যক্ষ করেন। বস্তুতঃ তাঁর কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা কতটা নির্ভুল ও ভারতের মত দেশেও তা প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রভুত্ববিস্তারী ও একনায়কতন্ত্রী প্রণালী উক্ত দুটি সমাজব্যবস্থারই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের মত অনুন্নত দেশে তো বটেই, এমনকি আজকের দিনে কোনও দেশের পক্ষেই তা আদৌ কল্যাণকর নয়। মানুষের সহজাত যুক্তিবাদী চিন্তা ও সমাজচেতনার বিকাশ, বিকেন্দ্রিক প্রশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতাই ভারতীয় জনগণকে নবজীবনে বলীয়ান করবে। পরম অধিনেতার ইচ্ছাধীনে ও ফৌজি দলের সাহায্যে মানুষের উপর যে-কোনও সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেবার রীতি ও নীতি আজকের দিনে একেবারেই পরিত্যাজ্য। হিংসা ও জাতি-বিদ্বেষ কোনক্রমেই সমর্থনীয় নয়। অবশ্য তার একটা পরিসীমা আছে। অন্য রাষ্ট্র ভারত আক্রমণ করলে তখন আর নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না; তবে আন্তর্দেশিক কলহের নিষ্পত্তি—সম্প্রীতি ও যুক্তির সাহায্যে হওয়াই সব সময়ে বাঞ্ছনীয়। তার পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রী সার্বিক দেশের অনুকরণ শুধু অর্থহীনই নয়, রাজনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিবর্তনেরও পরিপন্থী।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের তিনি ছিলেন অন্যতম। পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য তিনি নিজের জীবনাহুতি দিয়েছেন। রাষ্ট্রদর্শন ও তত্ত্ব-আলোচনায় তাঁর অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক না হলেও সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ, সমাজবাদ ও সমন্বয়বাদী চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণমূলক ও মননোদ্দীপক হিসাবে অবশ্যই মূল্যবান।

নির্দেশিকা

১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ ৭৮।

২. হিউ টয়। 'ব্যাঘ্রকেতন'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৩।

৩. অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃঃ ৪০।

৪. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৩৫।

৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৩৬।

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৩৪।

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৩৪।

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৩৬।

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৩২।

১০. Subhas Chandra Bose. *Crossroads*. 1962, p. 174.

১১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৩৩।

১২. সুভাষচন্দ্র বসু। 'নূতনের সন্ধান'। ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৮০।

১৩. Subhas Chandra Bose. *Selected Speeches*. 1962, pp. 31-32.

১৪. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964, p. 372.

১৫. Subhas Chandra Bose. *Crossroads*. 1962, p. 272.

১৬. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964, p. 11.

১৭. *Ibid.*

১৮. *Ibid.* p. 20.

১৯. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৪।

২০. সুভাষচন্দ্র বসু। 'নূতনের সন্ধান'। পৃ ৫৯।

২১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১২৮-১২৯।

২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৫৩-৫৪।

২৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৭৩।

২৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৯২।

২৫. Subhas Chandra Bose. *Selected Speeches*. 1962, p. 33.

২৬. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি-সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩, পৃ ১০৫।

২৭. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964, p. 295.
২৮. Subhas Chandra Bose. *Crossroads*. 1962, pp. 174-177.
২৯. *Ibid* p. 253.
৩০. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964, pp. 314-315.
৩১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩, পৃ ৬০।
৩২. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964, p. 298.
৩৩. *Ibid*. pp. 456-457.
৩৪. সুভাষচন্দ্র বসু। 'নূতনের সন্ধান'। পৃ ১১৪।
৩৫. Subhas Chandra Bose. *Selected Speeches*. 1962, pp. 35-36.
৩৬. সুভাষচন্দ্র বসু। 'তরুণের স্বপ্ন'। ১৩৬৫, পৃ ৫৭ ৬০।
৩৭. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। পৃ ৩০।
৩৮. সমর গুহ। 'নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা'। পৃ ১৭০।
৩৯. Subhas Chandra Bose. *Selected Speeches*. 1962, pp. 100-101.
৪০. *Ibid*. p. 114.
৪১. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964, p. 295.
৪২. *Ibid*. pp 113-114.
৪৩. *Ibid*. pp. 93, 114.
৪৪. *Ibid*. p. 298.
৪৫. *Ibid* pp. 392-394.
৪৬. Jawaharlal Nehru. *The Discovery of India*. 1956, p. 447.
৪৭. *Encyclopaedia Britannica*. 1960. (*'International'*)
৪৮. অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৩৪।
৪৯. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি-সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩, পৃ ১০৬।
৫০. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle ; 1920-42*. p. 313.
৫১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি-সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩, পৃ ১০৬-১০৭।
৫২. অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৪৪।

৫৩. Subhas Chandra Bose. *Selected Speeches*. 1962, p. 114.

৫৪. Subhas Chandra Bose. *Crossroads*. 1962, p. 253.

৫৫. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩, পৃ ৯০।

৫৬. Modern Review. April, 1939.

৫৭. Dilip Kumar Roy. *Netaji : The Man*. 1966, p. 151.

মানবেন্দ্রনাথ রায় ॥ ১৮৮৭-১৯৫৪

এক :

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এদেশে যে-মানবতন্ত্রী নবজাগরণের ধারা বয়ে এসেছে তার চরিত্র মূলতঃ আধ্যাত্মিক। পরবর্তীকালে মানবতাবাদকে সর্বাংশে ইহমুখীন এবং নিখাদ বস্তুবাদী ব্যঞ্জনা দিয়েছেন মানবেন্দ্রনাথ। তাঁর দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রচিন্তা আধ্যাত্মিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। দর্শনের কেন্দ্র থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির সমন্বিত সাধনায় তিনি এক অভিনব ও অনন্যসাধারণ পথ অনুসরণ করেছেন। এযাবৎকাল আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠপটে নৈতিকতাকে বিচার করা হয়েছে; মানবেন্দ্রনাথ সে-ক্ষেত্রে মানুষের সহজাত যুক্তিবোধসাপেক্ষ নৈতিকতার কথা বলেছেন। রামমোহনের আরোহী বিচারপদ্ধতি, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিশ্বজনীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী দর্শনে।

পশ্চিমের সংস্পর্শেই এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়। তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেশের জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার আবেগ অংকুরিত হয়েছিল; সেই আবেগ যতই পরিবর্ধিত হতে থাকে ততই পশ্চিমের প্রতি একটা অনীহার ভাব দেখা দেয়। পরাধীনতাজনিত ইংরেজবিদ্বেষ ক্রমে পশ্চিমী বিদ্বেষের পথ অনুসরণ করে আধুনিক সভ্যতার বিদ্বেষে পরিণত হয়। দেশের সনাতন ঐতিহ্যের গৌরবে জাতীয় ঐক্যসাধন এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করা হয়তো সহজ; কিন্তু তাতে দেশের বিকাশ যথোচিত পরিপূর্তি লাভ করে না; কারণ স্বাধীনতার অর্থ যদি সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় তাহলে শুধুমাত্র দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সনাতন ধারাকে আঁকড়ে থাকলে চলে না। চাই রেনেসাঁসের সঠিক উপলব্ধি— অর্থাৎ সমগ্র মানবসমাজের অতীত সংস্কৃতির যা কিছু বর্তমান বিকাশের অনুকূল তারই উদ্ধার ও গ্রহণ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে মানুষের ঐহিক উন্নতি ও ব্যক্তির বিচিত্র সৃষ্টিসত্তার অবাধ উন্মেষসাধন। বাঙালী রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে এই অবিমিশ্র চেতনা রামমোহনের পর উনিশ শতকে নব্যবঙ্গ দল, অক্ষয়কুমার ও কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখা যায় এবং বিশ

শতকে সেই চেতনা রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তায় রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তা-নায়কের মধ্যে পারম্পর্যের অভাব ও বিরোধ থাকলেও তাঁদের অনেকেই বুদ্ধির চর্চা, মুক্ত জীবনের সাধনা ও মানবতন্ত্রী আদর্শের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু এ-শতকে ভারতীয় সাধনায় বিশ্বের সকল স্থান ও কাল থেকে মানুষের বিকাশোপযোগী উপকরণ আহরণের মধ্যে দিয়ে দেশের মননজীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার কাজে কেবল দুজনই তৎপর হয়েছেন, একজন রবীন্দ্রনাথ এবং অপরজন মানবেন্দ্রনাথ। এই দুজনকেই যথার্থ বিশ্বনাগরিক হিসাবে অভিহিত করা যায়। দুজনেই জাতীয়তাবাদকে অব্যর্থ ভাষায় নিন্দা করেছেন। মানবতা-বাদকে দুজনে ভিন্নভাবে বিচার করে থাকলেও দুজনেরই চোখে মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি এবং উভয়েরই রাষ্ট্রতত্ত্ব মূলতঃ নীতিনির্ভর।

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তায় মানবেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি কিছুটা বিতর্কমূলক। কারণ প্রথমতঃ, জাতীয় ভাবধারায় তাঁর মন গঠিত হয় নি এবং তাঁর মানসিক গঠনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবই ছিল অধিক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কর্মক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বহুদেশিক ছিল যে তাঁকে কোনও দেশ বা জাতির গণ্ডিতে ফেলা যায় না; বস্তুতঃ অনুরূপ কর্মক্ষেত্র ইতিহাসে আর কোনও মনীষীর জীবনে দেখা যায় না। তাহলেও মানবেন্দ্রনাথের ধমনীতে বাঙালী তথা ভারতীয় শোণিতধারাই ছিল প্রবহমান। ভারতেই তাঁর জন্ম ও মৃত্যু; জীবনের মাত্র ষোল বছর (১৯১৫-৩০) তাঁর বহির্বিশ্বে কাটে। সে-সময়েও স্বদেশের মুক্তির ভাবনা তাঁর মনে অণুক্ষণ বিরাজ করত। এদেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বের চিন্তার ভাণ্ডারে ভারতীয় অবদানকে তিনি স্বকীয় মৌল বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও মননধারা মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিবর্তিত হয়। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদের মধ্যে দিয়ে ক্রমে তিনি নবমানবতাবাদে উপনীত হন। শেষোক্ত পর্যায় তাঁর আজীবনকাল অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনন্য জ্ঞানেরই পরিণতি। ভূমণ্ডলের উভয় গোলার্ধে পরিব্যাপ্ত কর্মজীবনে রুশ, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিস, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় মানবেন্দ্রনাথের কমপক্ষে শতাধিক গ্রন্থ বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়। বাংলায় তিনি কিছু লেখেন নি। কারাজীবনে লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার

পাণ্ডুলিপি এখনও অমুদ্রিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর কর্মজীবন ও ভাবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুতি সম্ভব নয়। নিজের জীবনকথা তিনি সামান্যই বলে গিয়েছেন। শেষ জীবনে লেখা তাঁর *Memoirs* থেকে কর্মজীবনের প্রথম দিকে স্বদেশে বিপ্লব ঘটানোর জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা, মেক্সিকোর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের (সংক্ষেপে কমিণ্টার্ন) যোগদানের পর গোড়ার দিককার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বহু রাষ্ট্রনেতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বৈপ্লবিক কর্মে আত্মগোপন করে থাকার জন্যে তিনি কয়েকটি নাম গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬) তাঁর মানবেন্দ্রনাথ রায় নামকরণ করেন।[১] নরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন যাজক ও সংস্কৃত পণ্ডিত। যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ কৈশোরেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সে-সময়ে বিবেকানন্দ, রামতীর্থ ও দয়ানন্দের চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করে। বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু মডারেটদের আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে সশস্ত্র বিপ্লবসাধনই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই সাভারকর ও অরবিন্দের আদর্শে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়; যুগান্তর দলের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯১৫) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অস্ত্র-সংগ্রহের তাগিদে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই বিপ্লবীরা তৎকালে রাজনৈতিক ডাকাতিতে লিপ্ত হতেন। ১৯০৭ সালে নরেন্দ্রনাথ এক রেলস্টেশনে ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত হন। অপরিণত বয়সদৃষ্টে বিচারক সেই অভিযোগ অবিশ্বাস করে তাঁকে রেহাই দেন। এরপর অনুরূপ অভিযোগে কয়েকবার গ্রেপ্তার হন এবং প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীনে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীগণসহ তিনি কুড়ি মাস কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পরে পুনরায় গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা ডাকাতি মামলায় দীর্ঘদিন বিচারাধীনে নিঃসঙ্গ কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাজীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর মনে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। মুক্তির পর তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন। পদব্রজে দেশভ্রমণে বেরিয়ে তিনি বহু সাধুসন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে আসেন। কিন্তু তাতে তাঁর মনের প্রকৃত তৃষ্ণা মেটে না। দেশের মুক্তির তাগিদে তিনি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন।

বিশ্ব মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) বেধে যাবার পর যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যুগান্তর দল সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁর প্রধান সহকর্মী নরেন্দ্রনাথকে জার্মানদের সহায়তায় বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্যাটাভিয়া থেকে সুন্দরবনে অস্ত্র আমদানি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি দূর প্রাচ্যে পাড়ি দেন। উদ্দেশ্য ছিল চীনের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্ত্র আমদানি করা। সেই সময়ে রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫) ও সান-ইয়াৎ-সেনের (১৮৬৬-১৯২৫) সঙ্গে সংযোগ ঘটে। জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ ঘুরে শেষাবধি তিনি তাঁর কাজে ব্যর্থ হন। চীনে কিছু সময় পুলিশের হাজত-বাসেও কাটে; কারাদণ্ড এড়াবার জন্য তিনি পরিশেষে গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপত রায় ও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময়ে মানবেন্দ্রনাথ লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে বহুবিধ অমূল্য গ্রন্থরাজির আস্বাদ পান। কিন্তু সেখানে তিনি বেশী দিন থাকতে পারেন নি। সেখানকার সরকার তাঁকে সে-দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। শেষে মেক্সিকোয় তিনি আশ্রয় নেন।

মেক্সিকোতেই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেখানকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবেশ করে ক্রমে তিনি মেক্সিকোর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে জারের কিছু জহরত বেচার জন্য রাশিয়া থেকে মাইকেল বোরোদিন (১৮৮৪-১৯৫৩) মেক্সিকোয় এসেছিলেন। তিনিই মানবেন্দ্রনাথকে মার্কসবাদে দীক্ষা দেন। সময়ের হেরফেরে সাত বছর পরে চীনদেশে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার উপদেষ্টা এই গুরুরই কর্মপদ্ধতি সংশোধনের জন্য কমিণ্টার্ন থেকে মানবেন্দ্রনাথকে হ্যানকৌতে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবার এই বোরোদিনই বুখারিনের সহায়তায় মানবেন্দ্রনাথকে স্টালিনের রোষানল থেকে রক্ষা করে রাশিয়া থেকে পালাতে সাহায্য করেন। মেক্সিকোয় মানবেন্দ্রনাথ রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের সভাপতিমণ্ডলী এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হয়েছিলেন এবং তাসখন্দে প্রাচ্যের বিপ্লবীদের (Toilers of the East) জন্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে পেট্রোগ্রাডে কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেনিনের আমন্ত্রণে মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকো থেকে সেই অধিবেশনে

যোগদান করেন। এই অধিবেশনেই মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেনিনের ইতিহাস-বিখ্যাত বিতর্ক ঘটে। ঔপনিবেশিক ও অনুন্নত দেশগুলিতে কমিণ্টার্নের ভূমিকাই ছিল তার মূল আলোচ্য বিষয়।

লেনিনের 'Thesis on the national and colonial questions'-এর মূল-প্রস্তাবের প্রথম বাক্যটি সংশোধিত আকারে চূড়ান্ত প্রস্তাবে রূপায়িত হয় এই বলে : **'The Communist International must be ready to establish temporary relationships and even alliances with the bourgeois democracy of the colonies and backward classes'** ।[২]

লেনিন মনে করতেন যে পৃথিবীর বুকে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন আধিপত্য করবে ততদিন পরাধীন দেশের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির সর্বহারা আন্দোলনের মৈত্রীর সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমোক্ত বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিস্টরাও হাত মেলাবে। লেনিনের থিসিস মানবেন্দ্রনাথ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। তিনি দেখেছিলেন যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে রণবিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সেখানকার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে কিছু সুযোগসুবিধা দিয়ে তাদের আনুকূল্য অর্জন করেছে। উক্ত অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ একটি পালটা থিসিস উপস্থাপিত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ রাখলেও কমিউনিস্টদের কাজ হবে যুগপৎ নীচে থেকে (**from below**) কৃষক ও শ্রমিকদের গণপঞ্চায়েতের (অনেকটা সোভিয়েত ধরণের) মধ্যে দিয়ে আসন্ন বিপ্লবে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত করা। পরাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তি অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; সেজন্যে অনুন্নত পরাধীন দেশের বিপ্লবের উপর ইউরোপের বিপ্লব নির্ভরশীল। প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : **'Two distinct movements which grow farther apart each day are to be found in the dependent countries. One is the bourgeois democratic nationalist movement, with a programme of political independence under the bourgeois order. The other is the mass struggle of the poor and ignorant peasants and workers for their liberation from all forms of exploitation'** ।[৩]

লেনিনও মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে ঔপনিবেশিক দেশগুলি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তা ও অখণ্ডনীয় যুক্তি লেনিনের সপ্রশংস স্বীকৃতি অর্জন করে। উক্ত অধিবেশনে লেনিন ও মানবেন্দ্রনাথ উভয়ের থিসিসই একত্রে গৃহীত হয়।[৪]

মানবেন্দ্রনাথের বহুবিধ মৌলিক চিন্তার একটি হল তাঁর ঔপনিবেশিক তত্ত্ব। কমিণ্টার্নে সেই তত্ত্বকে তিনি বারংবার বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। ১৯২২ সালে কমিণ্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেসে তাঁর যুক্তিই মেনে নেওয়া হয়েছিল এই বলে : 'The dominant classes in the colonies and the semicolonial countries are unable and unwilling to lead the struggle against imperialism as this struggle is converted into a revolutionary mass movement'।[৫]

১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কমিণ্টার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজের মিতালি পরিণত রূপ নিতে চলেছে, কারণ : 'The Indian bourgeois knows better than anyone else that the true reason of the discontent of the masses is rooted in the economic relations and not in the national sentiment...the masses rise not against the national exploitation but against the class exploitation which comes from the capitalists and landlords'।[৬]

ইংরেজের ঔপনিবেশিক নীতির ক্রমান্বয় পরিবর্তন ও বিশেষ করে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোগতি সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *India in Transition* গ্রন্থে (১৯২২) তুলে ধরেন। তাতে তিনি বিস্তর তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, তার ফলে ইংরেজরা উপনিবেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি আস্থা প্রদর্শনস্বরূপ মাথা তোলবার সুযোগসুবিধা দেবে। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার 'Indian Industrial Commission' গঠন করেন এবং সে-সময়ে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। তাই তিনি লিখেছেন : 'The object behind this remarkable change of policy on the part of British Imperialism was to split the revolutionary

movement by making it clear to the bourgeoisie that it was no longer impossible for it to realise its ambitions under British rule'।[৭]

তবে মানবেন্দ্রনাথ একথা মনে করেন নি যে জাতীয়তাবাদী উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীকে ইংরেজ চিরতরে হাত করে নিতে পারবে। বরঞ্চ তাঁর মতে: 'The more the British Government makes concessions to the Indian bourgeoisie the more ambitious the latter becomes. It knows quite well that it is necessary to make compromises with the imperial capital, till the time comes when it will be in a position to openly contend for the right of monopoly of exploitation with the foreigner. But it also knows that the British Imperialism cannot be overthrown without the help of the masses'।[৮]

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য জনগণকে কংগ্রেসের ভিতর টানবে। ইংরেজকে তাড়াতে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বটে, কিন্তু ভারতের প্রকৃত মুক্তি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল; বিশেষ করে এইজন্যে যে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজের সঙ্গে শেষাবধি হাত মেলাবে। তাই ১৯২৩ সালে মানবেন্দ্রনাথ বার্লিনে তাঁর সদর দপ্তর থেকে ভারতে তাঁর সহকর্মীদের কৃষক ও শ্রমিকদের পার্টি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রগতিবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগে এই বেআইনি বিপ্লবী পার্টির কর্মপন্থা হয়েছিল: 'gradually to develop the Workers and Peasants Party into a real Communist Party by means of ideological education and political training connected with action'।[৯]

১৯২৬ সালে ভারতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনে মানবেন্দ্রনাথের এই চিন্তা আরও দৃঢ় হয়েছিল। হোম রুল আন্দোলন ও স্বরাজ্য দলের বৈপ্লবিক অস্তিত্বের সেইসময়ে অবসান ঘটে। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে ইংরেজ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে আরও আধিপত্যের সুযোগ দেয়।

লেনিনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের দ্বিমত ছিল না যে পুঁজিবাদের অন্তিম পরিণতি ঘটে সাম্রাজ্যবাদে; এবং ঔপনিবেশিক মুক্তি-সংগ্রাম একাধারে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিলুপ্তি সাধনের অনুকূলে একটি মস্ত পদক্ষেপ। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি

একথাও মনে করতেন যে বিশ শতকের পূর্বার্ধে প্রাচ্যের দেশগুলির শ্রেণী সম্পর্ক অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের প্রতীচ্যের শ্রেণী-সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয় নয়; সেজন্যে প্রাচ্যের মুক্তি-সংগ্রামী শ্রেণী-নেতৃত্বের চরিত্র ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। *India in Transition* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক শ্রেণী-সম্পর্ক ও পরিস্থিতির বিশদ আলোচনা করেছেন। মণ্টেগুর সংস্কার প্রয়াস ও সমসাময়িক নিয়মতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের চরিত্রের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। চরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে মানবেন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাসম্পন্ন সনাতন সংস্কারবাদীরূপে দেখেছিলেন। বিকল্প রাষ্ট্রদর্শন হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ সে-সময়ে মার্কসবাদী আদর্শকে তুলে ধরেন।

প্রগতিশীল ভারতীয় জনশক্তি ক্রমেই জেগে উঠছে বলে তিনি উক্ত গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। সেই জনশক্তিই চাইছে মান্ধাতা আমলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। সমকালীন ভারতীয় গণঅভ্যুত্থানের ভিতরে মানবেন্দ্রনাথ শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিপ্লবী সম্ভাবনা দেখতে পান। তিনি লিখেছেন যে উদীয়মান দেশীয় পুঁজিবাদী শক্তি দেশের কৃষি সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করছে; ফলে কৃষকেরা একাধারে দেশীয় ও বিদেশী শোষকদের হাতে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। জমিতে নিয়োজিত বিপুল পুঁজির একচেটিয়া স্বত্ব পুঁজিপতিদের হাতে থাকায় গ্রামবাসী ও কৃষিজীবীরা নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এদিকে দেশের শিল্পোন্নয়নে বিলম্বের ফলে শহরবাসী ও শ্রমিকের সংখ্যা ও শক্তি প্রায় নগণ্য, ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি— উৎপাদনে যন্ত্রশিল্পেরও বিস্তার ঘটে নি—শিল্পোৎপাদন অপেক্ষা বাণিজ্যেই পুঁজির অধিক প্রবণতা; অথচ ভারতের ভবিষ্যৎ ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উপর নির্ভর করছে। তাতে শ্রমিক বা সর্বহারাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিদেশী শাসকেরা আরও বোঝাপড়ার মধ্যে আসতে চাইবে। কাজেই ভারতের মুক্তি সাধনে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে হবে।

১৯২৩ সালে প্রকাশিত *India's Problem and its Solution* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ তদানীন্তন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন। তখন তিনি পুরোপুরি মার্কসবাদী। গান্ধীর মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের তিনি সমালোচনা করেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেসের (১৯২১) সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে সংগ্রামী শক্তির প্রতিকূলে বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষণের পরাকাষ্ঠারূপে প্রতিপন্ন হয়।

বার্দোলি তালুক কংগ্রেসে (১৯২২) গৃহীত গান্ধীর গঠনমূলক সংগ্রামনীতিরও তিনি সমালোচনা করেন। এই সময়ে তিনি দেশবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষের ভিত্তিতে গণচেতনা ও সংগ্রাম সৃষ্টির জন্যে একটি গণদল গঠনের আহ্বান জানান এবং বিক্ষোভ, ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে জনশক্তিকে জাগ্রত ও সংহত করার নির্দেশ দেন। শ্রেণী-সংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী শ্রেণীসচেতন পুরোগামী সম্প্রদায় (class conscious vanguard) সেইসব তৎপরতায় নেতৃত্ব যোগাবে। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথ তখন চেয়েছিলেন 'militant action of the masses'। তাছাড়া কতকগুলি ধোঁয়াটে আবেগসর্বস্ব আদর্শে জনশক্তিকে সঠিক পথে চালনা করা যায় না। সংগ্রামী জনগণের সামনে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা দরকার। অসহযোগ আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবাবেগ যতই থাকুক না কেন বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কোনও পরিচয় নেই তাতে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে আহমেদাবাদ কংগ্রেস (১৯২১) হবার আগে মানবেন্দ্রনাথ মস্কো থেকে একটি আদর্শ কর্মপন্থা প্রেরণ করেন। সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মপন্থাটির মূল বিষয় ছিল: 1. Complete National Independence ; Separation from the British Empire ; 2. Establishment of a Democratic Republic based upon universal Suffrage ; 3. Abolition of Landlordism ; 4. Reduction of land rent and indirect taxation ; higher incidence of gradual income tax ; 5. Modernisation of agriculture with state aid ; 6. Nationalisation of public utilities ; 7. Industrialisation of the country with state aid ; 8. Eight-hour day and minimum wage।[১০]

১৯২৩ সালে প্রকাশিত *One year of Non-Co-operation* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর গণঅভ্যুত্থান প্রয়াসের সমালোচনা প্রসঙ্গে তার লাভ ও ক্ষতির দিকগুলি বিশ্লেষণ করেন। লাভের দিক সম্পর্কে তিনি বলেন: ১. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থে জনশক্তির বোধন ও ব্যবহার ; ২. কংগ্রেসের ঐক্য সাধন ; ৩. রাজশক্তির নিপীড়ন থেকে গণশক্তিকে রক্ষার নিমিত্ত অহিংসার ধ্বনি তোলা ; ৪. অসহযোগ কর্মপন্থার মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন ও কর প্রদানে অস্বীকার।

ক্ষতির দিকগুলি সম্পর্কে বলেন: ১. জনসমর্থন অর্জনকল্পে উপযোগী অর্থ-

নৈতিক পথপ্রদর্শনে গান্ধীর ব্যর্থতা ; ২. গান্ধীবাদে শোষক ও শোষিত, জমিদার ও কৃষক, মালিক ও শ্রমিককে সমন্বিত করার অর্থহীন প্রয়াস ; ৩. রাজনীতিতে ধর্মের প্রবর্তন— আধ্যাত্মিকতার বেদীমূলে রাজনৈতিক গতিশীলতাকে অবরোধ ; ৪. প্রগতিবিরোধী চরকাতত্ত্বের প্রবর্তন ; ৫. গান্ধীবাদ দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত ও সংস্কারপন্থী— তাতে বিপ্লবের স্থান নেই—বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীর বারংবার দেখাসাক্ষাৎ তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচায়ক।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত *Future of Indian Politics* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে একটি জনগণের পার্টি (People's Party) গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। স্বরাজ্য দলের বিলোপ, দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং রাজনীতির পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে গান্ধীর আত্মনিয়োগের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দেশের সংগ্রামী শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তাঁর প্রস্তাবিত সেই পার্টির নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণীর অধীনে রাখার কথা বলা হলেও অন্যান্য শ্রেণী যথা বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, কৃষক, ছোটখাট ব্যবসায়ী প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। তার কর্মপন্থা অনুযায়ী বিপ্লবীদের কাজ হবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবে উপযোগী করে তোলা। প্রস্তাবিত পার্টিরই হবে এই কাজ। তাঁর দৃষ্টিতে স্বরাজ্য দল সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে পড়ে। দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে জনসাধারণের স্বার্থ ও কর্তৃত্বাধীনে আনাই ছিল তাঁর অভিমত। বিলাতি ধাঁচের লেবার পার্টি গঠনের তিনি বিরোধী ছিলেন। গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পার্টির কাঠামো সম্পর্কে তিনি বলেন : **'A democratic Party of the People with a programme of Revolutionary Nationalism (complete independence, establishment of a republic government, radical agrarian reforms, advanced social legislation etc.) will bind together all the oppressed classes of contemporary Indian Society, namely the petty bourgeoisie, peasantry and the proletariat'**।[১১]

কমিণ্টার্ন থেকে বহিষ্কারের পূর্বে মানবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কমিণ্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর চীন বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ। এই সময়ে চীনদেশে বিপ্লব চলেছিল। কমিউনিস্টদের সাহচর্যে কুওমিন্টাং দল ছিল বিপ্লবের পরিচালক। দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐ দল দুটি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ; পুঁজিপতি,

মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক এই চারটি শ্রেণী সেই সংগ্রামী আন্দোলনে যুক্ত হয়।

চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিন্‌টাং-এর ঐক্যের পিছনে ছিল কমিণ্টার্নেরই নির্দেশ। সে-সময়ে কমিণ্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে মাইকেল বোরোদিনকে বিপ্লবের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শদানের জন্য চীনে পাঠানো হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সামরিক উপদেষ্টারূপে জেনারেল ব্লুচার। ১৯২৬ সালে কমিউনিস্ট-কুওমিন্‌টাং ঐক্যে ভাঙন ধরে। ঐ বছর মার্চ মাসে চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেন। তখনও তর্ক চলেছিল কমিউনিস্টরা কুওমিন্‌টাং-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকবে কিনা? কমিণ্টার্নে এবিষয়ে বাদবিতণ্ডার ঝড় বয়ে চলে। চীন থেকে আসছিল পরস্পরবিরোধী নানা সংবাদ। শেষে স্থির হয় যে কুওমিন্‌টাং থেকে কমিউনিস্টরা বেরিয়ে আসবে; তবে তার বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিতালি বজায় রাখবে। তবুও অবস্থার উন্নতি হয় না। নভেম্বরে কমিণ্টার্নের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠক বসে। তাতে সমগ্র পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটে একটি নতুন নীতি নির্ধারিত হয় এবং সেই নীতিকে কার্যকর করার জন্যে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে চীনদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। তিনি তখনও কমিণ্টার্নের প্রেসিডিয়াম ও চীন কমিশনের সদস্য। চীনের অভিজ্ঞতা মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সুবিপুল গ্রন্থ *Revolution and Counter-Revolution in China* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি কমিণ্টার্নের নব প্রস্তাবিত কর্মপন্থা গ্রহণ করে নি। স্বভাবতঃই তাদের পক্ষে কমিণ্টার্নের প্রতিনিধি মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার ও সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। এমনকি কমিণ্টার্নের পূর্বপ্রেরিত প্রতিনিধি ও একদা দীক্ষাগুরু বোরোদিনের সঙ্গেও তাঁর মতভেদ প্রকট হয়ে পড়ে। চীন সে-সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি স্বতন্ত্র প্রশাসনে খণ্ডিত। বোরোদিন চেয়েছিলেন কুওমিন্‌টাং-এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সহযোগে দ্বিতীয়বার উত্তর চীনে পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হওয়া এবং তদবধি মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত **'Agrarian Revolution'**-কে স্থগিত রাখা। মানবেন্দ্রনাথ সেই অভিযান-পরিকল্পনার অপরিণামদর্শিতা উপলব্ধি করে সহকর্মীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন: **'Right now we have only to cope with Chiang Kai-Shek. But we are running from him into unknown territories, where in all probability we will have to encounter manymen like him...**

The Chinese Revolution will either win as an agrarian revolution or it will not win at all'।[১২]

বোরোদিন ও চৈনিক কমিউনিস্ট নেতাদের বিরোধিতা করে তিনি একটি বিকল্প কর্মপন্থা উপস্থাপিত করেন: '...an organisation, concentration and consolidation of revolutionary forces by (1) pressing the agrarian revolution, (2) establishing peasant power in the villages, (3) creating a revolutionary army that would not be merely a creature of land-owning generals'।[১৩]

১৯২৭ সালের মে মাসে হ্যানকৌতে অনুষ্ঠিত চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে এই মতবিরোধের একটা নিষ্পত্তি হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও বাদানুবাদের পর মানবেন্দ্রনাথের অভিমত গৃহীত হয়। কিন্তু তখনও কিছু সংখ্যক সদস্যের মনে চাষীমজুরের স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের ফল হিসাবে কুওমিন্টাং-এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিচ্ছেদবেদনা কাটে না। ইতিমধ্যে নানা জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু কমিউনিস্টরা নিষ্ক্রিয় থাকে। কুওমিন্টাং-এর বামপন্থী প্রগতিশীল সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্মমভাবে কৃষক বিদ্রোহ দমন করে। মানবেন্দ্রনাথ তখনও কমিউনিস্টদের মতিগতি ফেরাবার শেষ চেষ্টা করেন। বিফল হয়ে উপায়ান্তর না দেখে তিনি মস্কোয় স্টালিনের পরামর্শ চান। স্টালিন টেলিগ্রাম করে রায়ের কর্মপন্থা সমর্থন করেন। বামপন্থী কুওমিন্টাং-এর নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্টদের কৃষক বিদ্রোহের জন্যে অভিযুক্ত করে এবং দক্ষিণপন্থী চিয়াং-কাই-শেকের সঙ্গে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে নিয়ে কমিউনিস্ট নিধন শুরু করে দেয়। জুলাই মাস নাগাদ কমিউনিস্টরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মানবেন্দ্রনাথ ও বোরোদিনকে ফিরে যাবার জন্যে মস্কো থেকে নির্দেশ আসে। মস্কোয় ফিরে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সদর দপ্তর বার্লিনে চলে যান। সেখানেই জার্মান ভাষায় চীন সম্পর্কে পূর্বোক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে হিটলারের বহ্ন্যুৎসবে সে-গ্রন্থের অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়।

চীন বিপ্লবের ব্যর্থতা পরোক্ষে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কমিণ্টার্নের বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। চীন থেকে ফেরার পর বছর দেড়েক কেটে যায়। চৈনিক ব্যর্থতার সঙ্গে নিজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় স্টালিন মানবেন্দ্রনাথকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন নি। তাছাড়া মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছিল অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। চীনের ব্যাপারে মানবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন স্টালিন তাঁকে সমর্থন করবেন, কিন্তু

ট্রটস্কির বলবৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি প্রকাশ্যে কিছু তুলতে চান নি। স্টালিনের দর্শন না পেয়ে ও তাঁর হাবভাব সুবিধাজনক নয় বুঝে মানবেন্দ্রনাথ গোপনে বার্লিন চলে যান।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে মস্কোয় কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস বসে। অসুস্থতা ও অস্ত্রোপচারের জন্য মানবেন্দ্রনাথ সে-অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। চীনের বিষয় নিয়ে মানবেন্দ্রনাথকে না ঘাঁটিয়ে তাঁর 'Decolonisation Theory'-কে বিকৃত অর্থে দাঁড় করিয়ে তাঁকে চিরাচরিত ভাষায় 'renegade' বলে অভিহিত করা হয়। ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস কমিণ্টার্ন অনুসৃত পূর্বের যুক্তফ্রণ্ট নীতি বর্জন এবং উগ্র বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে। মানবেন্দ্রনাথ ভারত ও অন্যান্য অনগ্রসর দেশের পটভূমিকায় ঐ নব্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। জার্মানিতে কমিণ্টার্নের সরকারি নীতির বিপক্ষ গোষ্ঠীর মুখপত্রে মানবেন্দ্রনাথের স্বাধীন মতামত প্রকাশিত হওয়ায় তিনি কমিণ্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন। এখানেই তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁকে কমিউনিস্টরা তখন শুধু পরিত্যাগ ও একঘরেই করল না—উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে শুরু করল কুৎসার অভিযান।

মানবেন্দ্রনাথের আশা ছিল কমিণ্টার্ন একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মীদের ফেরার পথ খুলে দেবে। ১৯৩৫ সালে কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে পুনরায় কর্মপন্থার হেরফের হয় এবং শেষাবধি মানবেন্দ্রনাথের পূর্ব প্রস্তাবিত নীতিই গৃহীত হয়। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য-দের ফিরে যাবার আহ্বান জানানো হয় না।

মানবেন্দ্রনাথ নিষ্ক্রিয় রইলেন না। ১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। তার আগে সাইমন কমিশনের ভারত পর্যটন কালে তিনি গণপরিষদ গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন (১৯২৭)।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট চক্রান্তরূপে অভিহিত মীরাট ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৯) দেশের বিপ্লবী কর্মীরা অনেকেই কারারুদ্ধ হন। বিদেশে থাকায় এই চক্রান্তের প্রকৃত নায়ক মানবেন্দ্রনাথকে তখন ধরা যায় নি। দেশের রাজনীতির আবহাওয়া ছিল খুবই মন্দা। সেই সময়ে বন্ধুদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ইউরোপ থেকে ১৯৩০ সালে গোপনে তিনি ভারতে চলে আসেন। বিভিন্ন ছদ্মনামে তিনি দেশের সর্বত্র ঘুরে জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ

করেন। ১৯৩১ সালে জওহরলালের সভাপতিত্বে করাচী কংগ্রেসে প্রথম আমূল পরিবর্তনকামী একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের পিছনে মানবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

১৯৩১ সালের ২১শে জুলাই বহু অন্বেষিত এই 'mystery man'-কে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। ১৯৩৬ সালে কারামুক্তির পর মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসের বিস্তর কর্মী তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসকে বিপ্লবী আদর্শে সক্রিয় ও গণতান্ত্রিক করে তোলার প্রয়াসী হন এবং 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া' (বর্তমানে 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' নামে পরিবর্তিত) পত্রিকা বের করেন। তাঁর সঙ্গে ক্রমে গান্ধীর বিরোধ দেখা দেয়। গান্ধীনীতিকে তিনি কায়েমী পুঁজিবাদী শোষণের প্রচ্ছন্ন পন্থারূপে দেখেছিলেন। তাঁর মতে কংগ্রেসী নেতৃত্বের অসারতা এবং গান্ধীর আধিপত্য কংগ্রেসকে যেন একটা কাটুনি সংঘে পরিণত করেছে এবং গান্ধীর অহিংস নীতি দেশের বৈপ্লবিক উদ্দীপনার প্রতিকূল। সত্যাগ্রহের আধ্যাত্মিক ও দিব্য প্রত্যয় মানবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন নি।

১৯৩৯ সালে তিনি কংগ্রেসের ভিতরে 'লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' নামে একটি উপদল গঠন করেন এবং বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। ফৈজপুর কংগ্রেসে (১৯৪০) সভাপতি নির্বাচনের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় তিনি মৌলানা আজাদের কাছে পরাজিত হন। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবর্গের আমূল মতপার্থক্য দেখা দেয়। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে বিরোধের ফলেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' গঠন করেন। সেই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনরূপে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের ঈপ্সিত গতিপথ ও শ্রেণী-সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Scientific Politics* গ্রন্থে ফরাসি বিপ্লবে জ্যাকোবিন-দের ভূমিকা এদেশে অনুসরণের সুপারিশ করেন। ফরাসি বিপ্লবে জ্যাকোবিনদের ভূমিকা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, এবং তাদের সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পুরোগামী বলা হয়। বিপ্লবের মার্কসবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী ভারতে প্রথমে একবার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তারপরে প্রস্তাবিত প্রলেটারিয়েট বিপ্লবের পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে মানবেন্দ্রনাথ এক স্বতন্ত্র পথের নির্দেশ দেন— তাকে তিনি 'বিশ

শতকের জ্যাকোবিনিজম' নামে অভিহিত করেন। তাতে বলা হয়: ১. ভারতীয় বিপ্লব সর্বশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে, কেবল মুষ্টিমেয় প্রলেটারিয়েটের নেতৃত্বে নয়; ২. ভারতীয় বিপ্লব প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং পরে প্রলেটারিয়েট বিপ্লব না হয়ে দুইয়েরই সংমিশ্রণে সোসালিস্ট বিপ্লব হওয়াই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়। মার্কসবাদী হয়েও সে-সময়ে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসীয় চিন্তাকে যে নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি এই বিশ্লেষণই তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রুশ বিপ্লবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে মার্কসের অবরোহী পদ্ধতিতে স্থিরিকৃত প্রণালী অনুযায়ী রুশ বিপ্লব ঘটে নি। আকস্মিক ও ঘটনাচক্রে রুশবিপ্লব সাফল্য লাভ করে। সেখানে সর্বহারা বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতির পূর্বেই বিপ্লব ঘটায় তা মার্কসবাদী প্রণালী অনুসরণ করে নি। *Russian Revolution* (1949) গ্রন্থে এবিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মানবেন্দ্রনাথ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নিঃশর্তে সমর্থনের আহ্বান জানান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিছক একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ হিসাবে দেখেন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে বিপর্যয়কারী সেই যুদ্ধ বিশ্বইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেবে। বিশ্বব্যাপী সেই সর্বনাশা যুদ্ধকে তিনি আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধরূপে অভিহিত করেন। কোনও দেশ বা জাতিকে তিনি শত্রুরূপে দেখেন নি—দেখেছিলেন ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী এক মতবাদ—সে-মতবাদ হল ফ্যাসিবাদ। তাঁর মতে ফ্যাসিবাদের জয় হলে মানব সভ্যতারই হবে চরম বিনাশ। তিনি আরও বলেছিলেন যে ফ্যাসিবিরোধী সেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদও তার শক্তি হারাবে এবং যুদ্ধোত্তরকালে পরাধীন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা অনিবার্য-ভাবেই আসবে। *India and War* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও প্রস্তুতির জন্য তিনি কৃষি-বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ চাষীরা যে জমিতে লাঙল দেয় সেটা তাদের নিজস্ব এ-বিশ্বাস জন্মালে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশরক্ষায় উদ্যোগী হবে। তাছাড়া জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনমানের উন্নতি সাধনের জন্য চাই দেশের যথোচিত শিল্পোন্নয়ন। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় দেশীয় পুঁজিপতিরা ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে না। জনস্বার্থের

উপযোগী সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাঁর পার্টি *People's Plan* (১৯৪৪) নামক একটি পরিকল্পনা প্রচার করে। সেই সময়ে ভারতীয় পুঁজিপতিরাও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে। 'বোম্বাই প্ল্যান' নামে খ্যাত সেই পরিকল্পনাকে মানবেন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী একচেটিয়া স্বত্বের ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনকে মানবেন্দ্রনাথ নিন্দা করে বলেন যে জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতিবিদ্বেষে এমনই জর্জর যে তাঁরা বোঝেন নি ইংরেজ পরাজিত হলে ফ্যাসিবাদ দুনিয়ায় আধিপত্য করবে। কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে তিনি ফ্যাসিবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষ-শক্তির (Axis Powers) পক্ষে অনুকূল আচরণে তাঁরা সে-কথাই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া হয়। তিনি দেখান যে রণক্ষেত্র যতদিন দূরে ছিল ততদিন ভারতীয় পুঁজিপতিরা যুদ্ধে মাল সরবরাহ করে দু-হাতে পয়সা লুটেছে, আর রণক্ষেত্র যখন ঘরের পাশে এগিয়ে এসেছে তখন তারা আপৎকালীন অধিক ত্যাগ ও ক্ষতির ভয় এবং বিজেতাদের সম্ভাব্য প্রতিশোধের আশঙ্কায় যুদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে কংগ্রেসের পিছনে অবিলম্বে স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন জানায়। নিরক্ষর, মূঢ়, ধর্মান্ধ দেশবাসীর আবেগ ও উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের কাজ হাসিলে তৎপর হয়। মানবেন্দ্রনাথ ভারতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া চরিত্র উদঘাটনে তৎপর হন। তাঁর মতে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে তোয়াজ করে প্রতিবিপ্লবের পথ সুগম করে দেয়।

মানবেন্দ্রনাথ জাতীয় সরকারের পরিবর্তে জনগণের সরকার দাবি করেন। জাতীয়তাবাদের জিগিরকে তিনি কৃত্রিম ও সর্বনাশা বলে মনে করতেন। কৃত্রিম এই কারণে যে ভারত প্রকৃতপক্ষে দুটি—একটি ধনিকের, অপরটি দরিদ্রের। বুর্জোয়া নেতৃত্বে জাতীয় স্বাধীনতায় দরিদ্রের কোনও উন্নতি হবে না, হবে মুষ্টিমেয় ধনিকের। জাতি প্রত্যয় গ্রহণ করলে জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব এসে পড়ে। জাতীয়তাবাদের কৃত্রিমতায় ভারতীয় ঐক্যের বিনাশ ও দেশবিভাগের উদ্যোগ হবে অনিবার্য।

বিশ্বমহাযুদ্ধের গতি ক্রমেই মিত্রপক্ষের অনুকূল হয়ে ওঠায় মানবেন্দ্রনাথের পূর্বপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হয় যে যুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশ ছেড়ে চলে যাবেই। কারণ দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করাই হল

তার চারিত্রিক লক্ষণ ; রাজনৈতিক শাসন তার লক্ষ্য নয় ; বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের শিল্পবাণিজ্যের বিপর্যয় ও বিপুল দায়দেনা তাকে শক্তিহীন করে দেয়। পরিত্যক্ত শাসনক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিবর্তে যাতে জনগণের হাতে আসে তাই মানবেন্দ্রনাথ সেদিন ভারতের বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানান এবং জনস্বার্থের উপযোগী *Constitution of Free India* (1944) নামে একটি খসড়া সংবিধান প্রচার করেন। মানবেন্দ্রনাথের আহ্বানে কোনও বামপন্থী দলই সেদিন কর্ণপাত করে নি। যুদ্ধোত্তর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্রনাথের পার্টি এককভাবে ভারতের সর্বত্র শক্তিশালী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জাতীয়তা, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক নিশ্চেতনার সুযোগে কংগ্রেস ও লীগই সেই নির্বাচনে জয়ী হয়। তাদেরই সম্মতিতে দেশকে দুভাগ করে ইংরেজ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়ে চলে যায়।

বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই মানবেন্দ্রনাথের ভাবজীবনে চলেছিল এক বিরাট আলোড়ন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কী লিবা-র‍্যালিজম, কী মার্কসিজম কোনটিতেই মানুষ নিরঙ্কুশ মুক্তির আস্বাদ পায় নি—সংসদীয় গণতন্ত্র ও শ্রেণী একনায়কত্ব দুই-ই অচল। ফ্যাসিস্টদের মতো কমিউনিস্ট দেশেও রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিসত্তা উৎসর্গীকৃত হয়েছে। পরিশেষে তিনি যে মৌল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার সঙ্গে এযাবৎকাল অনুসৃত মার্কসবাদী দর্শনের অসংগতি ফুটে ওঠে। মার্কস-উত্তর শতাব্দীকালে সম্প্রসারিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তিনি প্রমাণ করে দেখান যে মার্কসবাদ অসম্পূর্ণ ও সে-কারণে বর্তমানে অনুপযোগী। মার্কসবাদের বিরোধিতার পরিবর্তে মার্কসীয় দর্শনকে অতিক্রম করে মানবেন্দ্রনাথ 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' নামে এক নব্যদর্শনের প্রবর্তন করেন—যার মূল বিষয়-বৈশিষ্ট্য হল তিনটি : যুক্তি, নীতি ও মুক্তি। নতুন ইতিহাসতত্ত্ব ও দার্শনিক পৃষ্ঠপটে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমবায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং শ্রেণী ও পার্টির আধিপত্যমুক্ত সমাজের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মূল বক্তব্য তিনি দেরাদুন নিদাঘ শিবিরে (১৯৪৬) উপস্থাপিত করেন। মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের এই বার্ষিক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে একটি অনন্য নিদর্শন। রাজনীতিকে যুক্তিবিবর্জিত চিন্তা ও মেঠো বক্তৃতার আবেগ থেকে উদ্ধার করে বিচারবিতর্কের মাধ্যমে বিজ্ঞাননির্ভর করার সাধনা এদেশে

মানবেন্দ্রনাথের একক বৈশিষ্ট্য। সেই বছরেই তিনি দেরাদুনে 'ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্পাদনায় *Marxian Way* (পরে *Humanist Way*) নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাইশটি সূত্রে বিধৃত 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' দর্শনের প্রয়োগকালে অনুভূত হয় যে প্রকৃত গণতন্ত্রী সমাজে পার্টি রাজনীতির প্রথা অচল। গতানুগতিক পার্টি-প্রথার মধ্যে দিয়ে মানবতন্ত্রী দর্শন ও রাজনীতির আন্দোলন সম্ভব নয়। কারণ তাতে পার্টির আধিপত্য ও ক্ষমতাদখলই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে শুভলক্ষ্যে পৌঁছনোর তাগিদে অশুভ পথ অনুসরণেও আপত্তি থাকে না। ফলে সমাজ ও সাধারণ মানুষেরই হয় অকল্যাণ ও অধোগতি। তাই ১৯৪৮ সালের শেষ অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' ভেঙে দেওয়া হয়। সেই থেকে ঐ দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কোনওরূপ সাংগঠনিক নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ না থেকে নানাভাবে সর্বক্ষেত্রে বহুমুখী কর্ম-তৎপরতার মধ্যে দিয়ে উক্ত আদর্শের প্রচারে উদ্যোগী হন। অনুরূপ প্রচেষ্টা যাতে অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে তিনি আন্তর্জাতিক সংযোগেরও সূচনা করেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু (১৯৫৪) হওয়ায় জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজকে মানবেন্দ্রনাথ সুসম্পূর্ণ করে রেখে যেতে পারেন নি।

দুই : ইতিহাসচিন্তা

ইতিহাসকে মানবেন্দ্রনাথ মানুষের চিরন্তন মুক্তি-সংগ্রামরূপে দেখেছেন। তাঁর মতে মনুষ্যজীবনের সারবত্তা হল মুক্তির সন্ধান। পৃথিবীর বুকে মনুষ্যজীবনের উৎপত্তিকাল থেকেই মানুষ প্রথমে জৈব অস্তিত্বের তাগিদে পারিপার্শ্বিকের আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার জন্যে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে; সেই জৈব সংগ্রাম-প্রবণতার ফলে মানুষ ক্রমে অজ্ঞানতার বন্ধন ছিন্ন করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে— মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় সাধনার পিছনে আছে তার সেই মুক্তির প্রেরণা— পশ্চাতে ঐশ ও আধ্যাত্মিক কোনও নির্দেশ নেই।[১৪]

মানুষকে তিনি নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিশ্বের অঙ্গরূপে বিচার করেছেন। নিশ্চেতন

বিশ্ব হতে ক্রমবিবর্তনের আশ্রয়ে অবশেষে মানুষের মনোজগতের বিকাশ-প্রক্রিয়ায় একটি জৈব-বিবর্তন ঘটেছে ; জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি ও উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকলেও পরিণামে চেতনা এক স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা অর্জন করেছে। পরিচিন্তন মানুষের একটি জৈব ক্রিয়া হলেও, চিন্তা ও চেতনা সামাজিক বিবর্তন-নির্ভর না হয়ে নিজ পথে অগ্রসর হয়েছে— বস্তুতঃ পরিচিন্তন ও সমাজ-বিবর্তন যুগপৎ সমান্তরাল ধারায় বিকশিত হয়— একের দ্বারা অপরে প্রভাবিত হয়েছে। সমাজ-বিবর্তন নিয়মনির্দিষ্ট হলেও সমাজের স্রষ্টা হল মানুষ এবং সমাজ-বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য মানুষ বিপ্লবের সাহায্য নেয়। চিন্তার বিকাশ সমাজ ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ নয়।[১৫]

মুক্তি ও সামাজিক অধিকার অর্জনের অন্তরায় অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করাই বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানুষের সহজাত সম্ভাবনার বিকাশে বাধাস্বরূপ যে-কোনও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করাই বিপ্লবের আদর্শ। ইতিহাসের যাত্রাপথে দেখা যায় অনেক সময়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও সৃষ্টিশীল সত্তার প্রতিকূলতা করে। জৈব অস্তিত্বের সংগ্রাম-প্রক্রিয়ায় ক্রমবিকশিত প্রগতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিপ্লবের সাহায্যে ঐ সব অন্তরায়গুলিকে অপসারণের প্রেরণা যোগায়। নতুন দর্শনের আলোয় মানুষ নতুনতর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

মুক্তি ও সৃজনীশক্তির আবেগসম্পন্ন মানুষের মনোভাবকে মানবেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লব সেই অর্থে রোমান্টিক এবং যুক্তিসম্মতও বটে। যুক্তিপ্রবণতা মানুষের সহজাত একটি জৈব ধর্ম। যুক্তিনির্ভর মন থেকেই মুক্তির আবেগ ও ন্যায়পরায়ণতা উদ্ভূত হয়। ন্যায়নীতির পিছনে মানবেন্দ্রনাথ কোনও আধ্যাত্মিক অথবা দিব্য কারণের পরিবর্তে যুক্তিপ্রবণতাকেই উৎসরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। মানবেন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিপ্লবের প্রত্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিবহ ও নীতিসম্মত।

বস্তুবাদী মানবেন্দ্রনাথের কাছে বৈদান্তিক ভাববাদ যে গ্রহণযোগ্য ছিল না সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। শংকর ও রামানুজের ভাববাদকে তিনি মধ্যযুগীয় বদ্ধধারণাপ্রসূত এবং যুক্তিবিরোধী সূক্ষ্ম যুক্তিজাল (scholasticism) বলে অভিহিত করেছেন। মুক্তিপিয়াসী বৌদ্ধ মতবাদকে খর্ব করার জন্য ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের উত্থান ঘটে। বৌদ্ধধর্মে তিনি বৈপ্লবিক সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে বৌদ্ধরা পরাশ্রিত বিলাসব্যসন পরিহারের মনোবৃত্তি নিয়ে উন্নত ও উজ্জ্বল

জীবনযাত্রার পথ অনুসরণ করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রয়াসকে দমন করে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় আধিপত্য অর্জন করে।[১৬] প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যে তখনকার মুনি-ঋষি পরিবেষ্টিত সমাজজীবনে কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক মনোভাবই শুধু বিরাজ করত। তাঁর মতে তা সত্ত্বেও তখনকার সমাজে সাধারণ মানুষেরও একটা বিশেষ স্থান ছিল, যারা ঐহিক জীবনাচারকেই প্রাধান্য দিত। ভারতীয়দের মনে সাধারণতঃ আর্য রক্তের গরিমা সম্পর্কে তিনি বলেন যে নৃতাত্ত্বিক বিচারে ভারতীয়দের সঙ্গে অনার্যদেরই মিল বেশি এবং আর্যদের আবির্ভাবের পূর্বে এখানকার অনার্য সভ্যতা অনেক বেশি উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। সে-সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।[১৭]

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পশ্চাতে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবের প্রচলিত ব্যাখ্যা খণ্ডন করে তিনি দেখিয়েছেন যে জেনোয়াতে ব্যবসাবাণিজ্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হলেও সেখানে রেনেসাঁসের চিন্তাশীল কোনও মানুষের উত্থান ঘটে নি, সেখানে মানবতন্ত্রী সাধনারও কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। একথা সেই যুগের শেষাশেষি ভিনিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অথচ যে-ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁসের মনীষী-বর্গের জন্ম হয়েছিল, সেখানে ব্যবসাবাণিজ্যের তেমন বিকাশ হয় নি। সুতরাং বলা যায় রেনেসাঁসে উদ্ভূত মানবতাবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া অভ্যুন্নতির কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল না। তাই এ-যুগের একদল ঐতিহাসিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ারূপে অভিহিত করেছেন। মানবেন্দ্রনাথের মতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রেরণার উৎস ছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাংস্কৃতিক আদর্শ। সে-আদর্শ ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ—তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে তিনি আধুনিক সভ্যতা তথা মুক্তির দর্শন ও বস্তুবাদের বোধনরূপে দেখেছেন; রেনেসাঁস থেকেই পেয়েছেন তাঁর প্রেরণা।[১৮]

তিন : দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

দর্শন সাধারণতঃ দু-শ্রেণীতে বিভক্ত; একটি ভাববাদী, অপরটি বস্তুবাদী। ভাববাদী দার্শনিকেরা মূলতঃ কল্পনাপ্রবণ; তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষার

দিকে যান নি। বস্তুনিরপেক্ষ ভাববাদী দর্শনকে অধিবিদ্যা (metaphysics) বা আধ্যাত্মিকতার গোত্রে বিবেচনা করা যায়। বস্তুবাদী দর্শনে বস্তুকেই (matter) সব কিছুর অগ্রবর্তী বলে মনে করা হয়। বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) বিচারপ্রসঙ্গে বস্তুবাদীরা আবার দু-শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বিশ্লেষণপদ্ধতি যান্ত্রিক (mechanistic) এবং অপরশ্রেণীর পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক (dialectical)। যান্ত্রিক বিশ্লেষণে বলা হয়ে থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বজগৎ নির্দিষ্ট নিয়মে সরল কার্যকারণ ধারায় এগিয়ে চলে; তার সব রহস্য অজ্ঞেয় নয়; কিন্তু তা জানা সময়সাপেক্ষ। এই বিশ্লেষণভঙ্গীর উৎপত্তি হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস, ডিমোক্রিটাস ও জিনোর চিন্তায়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে মার্কসের চিন্তায়। তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের চিন্তা থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে law of opposites, law of negation এবং law of transformation-এর প্রত্যয় অনুযায়ী জগতের যাবতীয় বিষয় অন্তর্বিরোধের ফলে নয় (thesis), প্রতিনয় (antithesis) ও সমন্বয়ের (synthesis) প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়। মানবেন্দ্রনাথ যখন মার্কসবাদী ছিলেন তখন দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করতেন। পরবর্তীকালে উক্ত পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে প্রথমোক্ত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আস্থা স্থাপন করেন।

ভারতের আধুনিক চিন্তানায়কদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথই একমাত্র নিখাদ বস্তুবাদী ছিলেন। বস্তুবাদকে তিনি সর্বার্থে একটি দর্শন হিসাবে বিচার করেছেন। তাঁর মতে দর্শন বলতে বস্তুবাদকেই বোঝায়— কারণ দর্শন বিজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। বিজ্ঞান বিরহিত দর্শনচিন্তা অধিবিদ্যারই নামান্তর। বস্তুবাদ সম্পর্কে 'খাও-দাও ফুর্তি কর'— প্রচলিত স্থূল ও বিকৃত এই ধারণার তিনি নিন্দা করেছেন।[১৯]

বস্তু সম্পর্কে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় বস্তুবাদের উপযুক্ত নামকরণের প্রশ্ন একদিন দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন। কারণ তথাকথিত বস্তুই চূড়ান্ত বাস্তব সারবত্তা নয়। তাঁর কথায়: 'Matter as classically conceived, is not the ultimate physical reality; but that does not prove that ultimate reality as known today is immaterial or mental or spiritual'।[২০]

মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদী দর্শনকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করেছেন। বস্তুবাদে ভাব ও বুদ্ধির অনুপ্রবেশ সাধন করে তিনি এক যুগান্তকারী পথ রচনা

করেছেন। তাঁর মতে : '...materialistic conception of history must recognise the creative role of intelligence. Materialism cannot deny the objective reality of ideas.... They are biologically determined ; priority belongs to the physical being, to matter... once the biologically determined process of ideation is complete ideas are formed, they continue to have an autonomous existence, an evolutionary process of their own, which runs parallel to the physical process of social evolution'। [২১]

সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় ভাব ও চিন্তার ভূমিকাকে যথোচিত স্থান দেবার জন্য বস্তুবাদকে তিনি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতীন্দ্রিয় ভাববাদ তাঁর কাছে যে পরিত্যাজ্য তা বলাই বাহুল্য। শারীরবিদ্যার নবতম আবিষ্ক্রিয়ার আলোকে তিনি দেখিয়েছেন যে পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। পরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও physico-chemical substance-এ গঠিত দেহের বিকারেই তিনি প্রাণের সন্ধান দর্শিয়েছেন। জৈব বিবর্তনধারায় প্রাণ ও মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থায় পরিচিন্তন এক বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা অর্জন করেছে।

চিন্তা মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া ; কিন্তু তা স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয়। পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে না। উভয়ের যুগপৎ ও সমান্তরাল গতি ইতিহাসের জৈব প্রক্রিয়ার (organic process) বিচারপদ্ধতি সৃজন করেছে। জড় ও চেতনাকে মানবেন্দ্রনাথ অদ্বয় (monistic) সত্তায় সমন্বিত করেছেন ; পক্ষান্তরে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে তা দ্বৈতরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। স্টালিনের ব্যাখ্যানুসারে : 'Marxist materialist philosophy holds that matter, nature, being, is an objective reality existing outside and independent of our mind'।[২২]

বস্তুবাদী দর্শনকে মার্কস সমাজ ও ইতিহাসে প্রয়োগ করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে উৎপাদন-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আশ্রয়ে উদ্ভূত শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রতিফলনস্বরূপ রাষ্ট্র ও সমাজচেতনা গড়ে ওঠে। মার্কসের কথায় : 'The mode of production of material life determines the social, political and intellectual life process in general. It is not

the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness'।[২৩]

মানবেন্দ্রনাথের মতে বস্তুবাদের এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ একদেশদর্শিতার সামিল— কারণ তাতে চিন্তন-প্রক্রিয়ার গুরুত্বকে উপেক্ষা করে তাকে কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবিম্বরূপে দর্শানো হয়েছে। চিন্তন ও অর্থনৈতিক সমাজকাঠামোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক যেটুকু আছে সেটা এই অর্থেই যে 'action is always motivated by ideas'। ইতিহাসকে মানবেন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ছকেবাঁধা অপরিহার্য ঘটনা-পরম্পরা হিসাবে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসের পথ রচনায় সৃজনশীল মানুষের ভূমিকাই প্রধান। মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদে চিন্তন 'objective reality' হিসাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইতিহাস বিশেষতঃ সমাজেতিহাস চিন্তনের দ্বারাই নির্দেশিত। তাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা ভুল। তাঁর মতে ইতিহাস নির্দেশিত— কিন্তু সেই নির্দেশ্যবাদের কারণ শুধু একটিই নয়— অনেক আছে।[২৪]

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর বস্তুবাদী মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনার বহু পূর্বেই চিন্তা তথা ভাববিপ্লব অগ্রণী হয়েছে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : '...at no point of history, ideas were divinely inspired. From any point of their history, ideas can be traced back to their biological origin, which is embodied in the background of physical universe'।[২৫]

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Science and Philosophy* গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বকে বস্তুবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক প্রমুখ পদার্থবিদদের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা বস্তু সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা ভেঙে দিয়েছে। Reality-র ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক প্রণালীই একমাত্র পথ নয় বলে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ন্যায়-বৈশেষিকের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ উত্তরকালে ঘটে।

নবমানবতাবাদ

মানবেন্দ্রনাথের আজীবনকাল অর্জিত অনন্য অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত পরিণতি হল তাঁর 'নবমানবতাবাদ' দর্শন। স্বাধীন চিন্তার নিরঙ্কুশ প্রকাশে তিনি

বিশ্বাসী ছিলেন। মূলতঃ এই কারণেই তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কমিণ্টার্নে অবস্থানকালের শেষ পর্যায়ে এই নব্যজীবন-দর্শনের বীজ তাঁর মনে অংকুরিত হয়েছিল।

মানবতা কথাটি নতুন নয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং এদেশের বৈষ্ণব ও সন্ত দার্শনিকদের চিন্তায় এ-আদর্শের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। তার আলোচনা অন্য পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে করা হয়েছে। একমাত্র মানবেন্দ্রনাথই এদেশে আধুনিক-কালে মানবতাবাদকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের ব্যক্তিত্বের ও সৃজনশীলতার প্রতিকূল সমুদয় বাধা অপসারিত করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষের সৃষ্টিসত্তা মুক্তি পেয়েছে, বিদূরিত হয়েছে যাবতীয় কুসংস্কারমূলক ভ্রান্তি ও ভীতি। অতীন্দ্রিয় চিন্তার আধিপত্য ও আধ্যাত্মিকতার শৃঙ্খল থেকেও মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। উদারতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে মার্কস বুর্জোয়া মনোভাব বলে বর্জন করেন। মানবেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুসারে নীতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাঁর মতে মানবসভ্যতার সামনে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সুরাহা হতে পারে একমাত্র মানবতন্ত্রী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে। আশু কার্যকারিতা (pragmatism) ও সুবিধাসন্ধানী চিন্তার প্রাবল্যে মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধ উন্মেষিত হচ্ছে না, ফলে সারা বিশ্বেরই নৈতিক ধারা নিম্নখাতে প্রবহমান; বাস্তবে নৈতিক মূল্যবোধ আজ বিলীয়মান।

মানবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনভিপ্রেত ও নৈরাশ্যজনক এই গতিকে রোধ করতে চাইছেন; অন্বেষণ করছেন স্থায়ী ও কল্যাণকর পরিবেশ। ভারতে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক পথে অতীন্দ্রিয় শুভশক্তির বোধন চেয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের উদ্‌গাতা— তাঁর কাছে অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক পথের অনুসরণ অচিন্তনীয়; তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞানের আশ্রয়ে যুক্তিমুখী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। তাঁর মতে মানুষের যুক্তিপ্রবণতা ঐশ ইচ্ছায় উদ্ভুত হয় নি— হয়েছে জৈব বিবর্তনধারায়। সহজাত যুক্তিবোধই মানবতন্ত্রী যুক্তিতত্ত্বের ভূমিষ্ঠভূমি— বিবেক যুক্তিরই বিম্ব। আধ্যাত্মিকতার পরিমিশ্রণহীন এবং স্বভাবগত যুক্তিবোধসাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের উপর মানবেন্দ্রনাথের 'নবমানবতাবাদ' দর্শন প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি-স্থিতির বস্তুবাদী

ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র যুক্তিনির্ভর মানবতন্ত্রী নীতিতত্ত্বে আলোকিত পথই মানুষের নিকট অনুসরণীয়।[২৬]

বিবর্তনতত্ত্বের সাহায্যে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, বিশ্ব-বিবর্তনের শেষ ধাপ হয়েছে মানুষ; নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বিশ্বজগতের সে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ বিশ্বজগতের কোলেই যুক্তিপ্রবণ মানুষের জন্ম। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যেন যুক্তিবহ সুশৃঙ্খল জগতেরই এক প্রতিধ্বনি। যুক্তিপ্রবণতা আধ্যাত্মিক বা দিব্য কোনও সত্তা নয়—বিবর্তনধারার শেষ পর্যায় মাত্র; এই যুক্তির ভূমিতেই হয় নীতির জন্ম। সামাজিক সামঞ্জস্য এবং সহিষ্ণুতার তাগিদেই মানবমনে নীতিবোধ উন্মেষিত হয়।[২৭]

মানুষ বিশ্বচরাচরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই মানবিক সত্তায় ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে বিমূর্ত ব্যঞ্জনা আরোপ করা অসঙ্গত। 'নবমানবতাবাদ' দর্শনে মানুষই সব কিছুর একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত; মানুষের মধ্যে কোনও ঐশ সত্তার স্বীকৃতি নেই তাতে। আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে মানুষকে বিমূর্ত কল্পনায় বিশ্বাতীত মহত্ব দান করা হয়। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে প্রাকৃতিক বিবর্তনের অংশ হিসাবে জৈব দৃষ্টিতে মানুষ বিবেচিত হয়েছে। কি ইউরোপ কি ভারতের পূর্বতন মানবতাবাদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের 'নবমানবতাবাদ' দর্শনের এইটাই মৌল পার্থক্য। তাঁর দর্শন সম্পূর্ণরূপে মানুষের জ্ঞান ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত—তার পৃষ্ঠপট একাধারে বস্তুবাদী ও গতিসম্পন্ন। সর্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক এই দর্শন মানুষের সৎ, শুভ ও সৃজনশীল জৈবধর্মে আস্থাবান—তার ভিতর শাস্ত্রীয় নির্দেশ অথবা পরম বৈভব বলে কিছু নেই। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে পার্থক্যের চিহ্নস্বরূপ 'New' কথাটি যুক্ত করেছেন এই বলে যে তাতে মানুষকে নতুনভাবে দেখা হয়েছে—যে-দেখার পিছনে আছে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মনোভাব। জীববিদ্যার আধুনিকতম আবিষ্কারে মনুষ্য-প্রকৃতির নতুন রূপ নির্ণীত হয়েছে। তাতে একথা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে বিশ্ব-বিবর্তনধারায় উদ্ভূত জীবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হল মানুষ। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব কোনও বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় শক্তি থেকে অর্জন করে নি—করেছে তার সহজাত সৃজনীশক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে জেনে ও জয় করে। প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে নিয়ন্ত্রিত হলেও সে প্রকৃতিতে নিমজ্জিত নয়। প্রকৃতির মধ্যেও যেমন নিয়মশৃঙ্খলা আছে তেমনি মানুষের সহজাত স্বভাবেও অনুরূপ নিয়মানুবর্তিতা থাকায় মানুষ মূলতঃ যুক্তিবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। জৈব বিবর্তনধারাতেই মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে তার সহজাত

গুণগুলি অর্জন করেছে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই দর্শনকে নবতম জ্ঞানের সমন্বয় স্বরূপ অতিরিক্ত 'Integral' শব্দটি দিয়েও তার পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন।[২৮]

নবমানবতাবাদ দর্শন দূরকল্পী (speculative) অথবা কারণ বিচারপূর্বক কার্য নির্ণায়ক পদ্ধতির (deductive) পরিবর্তে ঐতিহাসিক বিবর্তনে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত। এই দর্শনের মর্ম হল যুক্তি, নীতি ও মুক্তি। স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বিশ্বনিয়ন্ত্রক (logos) শক্তিরূপে যুক্তির প্রত্যয় এই দর্শনের পরিপন্থী। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে মানুষের অবস্থানকে আশ্রয় করেই যুক্তির উদ্ভব ঘটে। মানুষ মূলতঃ যুক্তিবাদী জীব হলেও অনেক সময়ে তার অপরিশীলিত আদিম মনোবৃত্তি ফুটে ওঠে। সেজন্যে চাই মানবমনের যথোচিত কর্ষণ। তাঁর নীতিতত্ত্ব স্বজ্ঞা সঞ্জাত যেমন নয়, তেমনি তা বিশ্বাতীত পরম সত্তার অভিব্যক্তিও নয়। মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ থেকেই নীতিনিষ্ঠা গড়ে ওঠে। তার লক্ষ্য সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন। মানবেন্দ্রনাথ যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিতত্ত্বে প্রবেশ করেছেন। কোনও অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগ বা শাস্ত্রীয় নির্দেশ তাঁর দর্শনে অবর্তমান।

'নবমানবতাবাদ' দর্শনে যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মার প্রত্যয় অথবা জগতের ইষ্টহেতুক পরিণামবাদ তাতে নেই। 'আত্মা' শব্দটি মানবমনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসেও রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তির দাবি ঘোষিত হয়েছিল। 'নবমানবতাবাদ' যুক্তি, নীতি ও মুক্তি এই তিন মূল্যবত্তার ভিত্তিতে সমন্বিত। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জৈব সংগ্রামেই মুক্তির প্রত্যয় নিহিত। মুক্তিই মানুষের অবাধ বিকাশ ও সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড। মুক্তি আর মোক্ষ এক কথা নয়। ধরা-ছোঁয়ার এই পৃথিবীতেই মুক্তি চাই। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বহির্বন্ধন সত্ত্বেও আত্মা সদাই মুক্ত এ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কোনও সাদৃশ্য নেই। তেমনি পূর্বনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সমন্বয়-প্রত্যয়ও যথার্থ মুক্তির পরিপন্থী ; পরমকারণজনিত উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) ও এমনকি মার্কসের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যবাদেও মুক্তি অনুপস্থিত। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মুক্তি মানুষের একটি দিব্যসত্তা। মানবেন্দ্রনাথের মতে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন তত্ত্বানুসারে অস্তিত্বের সংগ্রাম ও আত্মসংরক্ষণেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।[২৯] মুক্তির আবেগ সমাজ ও সভ্যতার গতিসঞ্চারক।

মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বে মুক্তিকে জৈব বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে, বিমূর্ত মানসের বিশ্বাতীত বিষয়রূপে নয়। মুক্তির আবেগ প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে। মান্ধাতা আমলের আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করলে মানুষের আত্মিক মুক্তি ঘটবে ; মুক্তি অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপাদান অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তিময় সম্ভাবনার উপলব্ধি। আত্মিক বন্ধনমুক্ত মানুষই কেবল নতুন ও স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তি একমাত্র সংস্কারমুক্ত মানুষের উপর নির্ভর করে। মানবেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্ব তাঁর বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বেরই অঙ্গ। তাঁর সকলকথার মূলে একটি সুর সদাই যেন অনুরণিত— সেটি হল আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েদখানা থেকে মানবতার মুক্তিসাধন। মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব মুক্তির তিন প্রধান স্তম্ভ।[৩০]

'নবমানবতাবাদ' সার্বভৌম মানুষের জয়গান করেছে। মানুষের সেই মৌল সত্তা হরণ করার কোনও অধিকারই সমাজের নেই। এই দাবি কোনও কাব্যিক ভাবাবেগ কিংবা অতীন্দ্রিয় আবেগ সম্ভূত নয়। তা হল সামাজিক ও জৈব বিবর্তন সম্পৃক্ত মানবমনের চরমোৎকর্ষের উপাদান। মানবতা এখন এক সংকটের সম্মুখীন ; ব্যষ্টিকে সমষ্টিতন্ত্রের দানব গ্রাস করতে চলেছে ; ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্তমিত। আর্থিক সংকটমুক্তি মানবতার প্রয়োজনে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণে এখন ব্যক্তিমানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

'নবমানবতাবাদ'-এর আদর্শ যে বিশ্বজনীন সেকথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তাবাদ সমাজ-বিবর্তনের একটি নীচের পর্যায়মাত্র— শেষ ও সর্বোন্নত পর্যায় নয়। মূলতঃ জাতিবিদ্বেষে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ যে প্রতিক্রিয়াশীল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই ; তার দীর্ঘস্থায়িত্ব ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণের অন্তরায়। জাতীয়তা-বাদের পরিবর্তে চাই বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মানুষে-মানুষে সাহচর্যপূর্ণ সৌহার্দ্যের কথা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মতো মানবেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিমানুষের মনই হল উন্নত সমাজ, বৈশ্বিক মৈত্রী ও মুক্ত বিশ্বের বনিয়াদ। এই আদর্শে পৌঁছনোর জন্য সর্বাগ্রে চাই মুক্তির আদর্শ ও প্রগতির মন্ত্রে দীক্ষা। 'নবমানবতাবাদ' এই মুক্ত ও মিত্রতাবদ্ধ বৈশ্বিক সংঘের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। মানবেন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে যে-বিশ্বসংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন সেখানে দেশগত সীমানার প্রশ্ন গৌণ— পুঁজিবাদী, ফ্যাসিবাদী, সাম্রাজ্য-বাদী, সাম্যবাদী প্রভৃতি সকল রাষ্ট্রই ক্রমে একদিন বিশ শতকের নবজাগ্রত

মানুষের তাড়নায় লুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতাকে তিনি ভিন্নার্থে বিচার করেছেন। আন্তর্জাতিকতার প্রত্যয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বতন্ত্রই থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্র গঠন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে একত্রীকরণের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। তিনি চেয়েছেন বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে আত্মিক বন্ধনে সংযুক্ত মানবসমাজ।[৩১]

মানবেন্দ্রনাথের মতে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একমাত্র উপায় হল মানুষের মননশীলতার নবজাগরণ, আর সেইসঙ্গে মানবতাবাদের মৌল আদর্শের রূপায়ণ।

—

চার : রাষ্ট্রদর্শন

সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে চুক্তিতত্ত্বের পরিবর্তে জৈব প্রয়োজন ও স্বার্থের তাড়নায় এবং পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার তাগিদে সমাজবন্ধনের উদ্ভব হয়েছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩২] সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি; তার পিছনে কোনও ঐশ নির্দেশ নেই। ব্যক্তিমানুষই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উৎস। বিবর্তনধারার প্রথমাবস্থায় জৈব অস্তিত্বের জন্য মানুষ সংগ্রাম করে এসেছে; ক্রমে বুদ্ধি, চেতনা, সৃজনীশক্তি প্রভৃতি মানবিক সত্তার বিকাশে সেই সংগ্রামের মান ও ধারা বিকশিত ও উন্নত হয়। জৈব প্রয়োজন নিবৃত্তির পরে অপরের মানবিক সত্তার স্ফূরণ অব্যাহত রেখে ব্যক্তিমানুষ নিজ সত্তার পরিপূর্তির জন্য সমাজবন্ধনের তাগিদ অনুভব করে। ব্যক্তিমানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীন প্রয়াসের সঙ্গে সুষম সমাজব্যবস্থার কোনও বিরোধ নেই। যে-সমাজে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা অবর্তমান সেখানে সমাজবদ্ধতার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের তারতম্য হেতু বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেজন্যে সর্ববিধ বৈষম্য দূর করে একের দ্বারা অপরের পীড়ন ও পদানত রাখার অবকাশ নির্মূল করাই রাষ্ট্রের কাজ।

মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিপ্রবণতায় মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলেছেন যে শুভ ও সুন্দর সমাজ তার অধিবাসীদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যেক্ষেত্রে সেইবোধের অভাবে সমাজে মালিন্য ফুটে ওঠে সেখানে

আইনের সাহায্যে সুরাহা হয় না। চাই মানুষের চেতনা ও শুভবুদ্ধির উন্মেষ।[৩৩]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক কী তা নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। এই দুটি মতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রতত্ত্বের যা কিছু আলোচনা হয়ে থাকে। প্রথম মতানুসারে সমাজের অস্তিত্বকে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়; তদনুযায়ী ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ এবং সমাজে সে বাস করে মাত্র। সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি বজায় রাখা এবং তার জীবনাচার নিরূপণই এই মতানুসারীদের লক্ষ্য। যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং ঐশ ইচ্ছায় বিশ্বচরাচর ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁরাও সমাজকে ব্যক্তির উপর স্থান দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় মতানুসারে মানুষই সমাজের স্রষ্টা; সেজন্যে সমাজের উপরে অধিষ্ঠিত মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। মানুষ নিজের সুখসুবিধার তাগিদে সমাজ সৃষ্টি করেছে; তাই সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব কিছু বিষয়কে ব্যক্তিমানুষের জীবন ও প্রয়োজনের দিক থেকে নিরূপিত করাই কাম্য। শেষোক্ত মতের সমর্থক মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে (Individualism) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত করেছেন।

তাঁর মতে জৈব বিবর্তনধারায় উদ্ভূত ও বিকশিত আদিম মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে সমবায়ী সম্পর্কে সংঘবদ্ধ উপায়ে যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমাজবদ্ধ হয়। চুক্তি করে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেনি, করেছে জৈব তাড়নায়। প্রশ্ন হতে পারে যে সেই জৈব তাড়নার ভিত্তিভূমি বা প্রকৃতি কী ছিল; অর্থাৎ মানবজীবনের প্রাথমিক ও চরম লক্ষ্য কী? তদুত্তরে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন প্রথমাবস্থায় আদিম মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে যান্ত্রিক সামঞ্জস্য ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (mechanical adjustment and natural selection) প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল;[৩৪] ক্রমে উন্নত পর্যায়ে এসে ইচ্ছা ও বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় যান্ত্রিক সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বুদ্ধির সাহায্যে জীবন সংগ্রামের পথনির্বাচন করে। ক্রমে তার পিছনে বিচার ও বিবেকবোধ সৃষ্ট হওয়ায় মানুষের মনে নীতিবোধের উন্মেষ ঘটে। মানুষের পূর্বাপর জীবনসংগ্রামের পিছনে আছে সর্ববিধ প্রতিকূলতা থেকে মুক্তির বাসনা। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই সমাজসৃষ্টির

প্রকৃত উৎস। জৈব বিবর্তনধারাতেই ক্রমে মানুষের মন বুদ্ধি, চেতনা এবং বহুবিধ সৃষ্টির সম্ভাবনায় ভরে ওঠে। সমাজ ও তার অঙ্গ রাষ্ট্রের কাজ হল প্রথমতঃ মানুষের জৈব অস্তিত্বকে যথোচিত বজায় রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষের মননশীল বিকাশ ও বিচিত্র সৃষ্টিসত্তাকে যাবতীয় বাধাবিপত্তি থেকে রক্ষা করা। সমাজে পরস্পরবিরোধী নানা মত ও দ্বন্দ্বের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল সামঞ্জস্য বিধান করা, কারও অবদমন নয়। জীবতত্ত্ব অনুসারে যদি একথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয় যে মানুষ মূলতঃ যুক্তিপ্রবণ তাহলে মুক্তির ধারক ও পরিপোষক সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই প্রবণতার উন্মেষসাধন; সেই কারণে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও কোনও বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না।[৩৫]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি গণতন্ত্রের বনিয়াদ বলে মনে করতেন। শুধু পরিবারেই নয়— সমাজে সবার আগে ব্যক্তির স্থান ও অধিকার বর্তায়। তিনি বলেন যে সমাজের উৎপত্তি ব্যক্তিমানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সংঘবদ্ধতার তাগিদেই ঘটে। তাই তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন।

জাতীয়তাবাদ

মানবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে একটি 'antiquated cult' হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় মানুষের গোষ্ঠীমন এক সময়ে ঐ আবেগ অর্জন করে। গোষ্ঠীমন নিশ্চল নয়, তারও আছে বিকাশ ও পরিবর্তন। বিগত দু-শতক যাবৎ সামাজিক আবেগের আবর্তনকেন্দ্র ছিল জাতীয়তাবাদ। সেটা চিরন্তন নয়। মানবসমাজের বিবর্তনধারায় একটি স্তরে জাতীয়তাবাদ প্রগতিমূলক ছিল— কিন্তু এখন তা অচল ও নিষ্প্রয়োজন। নতুনতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ক্রমবিস্তৃত হয়ে সমগ্র মানবসমাজে লীন হয়ে গেছে।

জাতীয়তাবাদের উৎস হল হৃদয়াবেগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজ্ঞান-সম্মত সমাজদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। জাতীয় স্বাধীনতার তাগিদে মানুষের মনে অন্ধ দেশহিতৈষা ও জাতিবিদ্বেষ দেখা দেওয়ায় স্বাধীন চিন্তাশক্তিও লুপ্ত হয়ে গেছে। জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিসাধন উপেক্ষিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ সমষ্টিবাদী। তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নগণ্য।

'জাতি' শব্দটিতে আধ্যাত্মিক পরমত্ব আরোপ করা হয়— যার বেদীমূলে নিজেকে আহুতি দেওয়া মনুষ্যজীবনের এক পরম আদর্শ। জাতীয়তাবাদেই ফ্যাসিবাদের বীজ নিহিত থাকে। জাতীয়তাবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ বলেন: '...human being of flesh and blood, must sacrifice everything to make the nation great and glorious. That is the essence of Nationalism...The nation could not claim an undivided loyalty unless Nationalism was of the order of monotheistic religion: there can be no other God, and nobody can claim any share in the sacrifice'।[৩৬]

পরমত্বের ব্যঞ্জনায় দেশ ও জাতিকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়। তার অধিবাসীদের একমাত্র আনুগত্য হল ধোঁয়াটে আবেগসর্বস্ব এই 'জাতি' প্রত্যয়ের কাছে। ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট 'জাতি' প্রত্যয় সমষ্টিবাদী হতে তাই বাধ্য। ভারতের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় অসহিষ্ণুতা, একাধিপত্য ও একনায়কত্বের প্রবণতা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

বৈজ্ঞানিক রাজনীতি

প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয়তাবাদী, তারপর হন মার্কসবাদী। এই সময় থেকেই তাঁর মনে র‍্যাডিক্যালিজমের চিন্তাধারা দেখা দেয়; সেই চিন্তা উত্তরচল্লিশে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। পরিশেষে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয় বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। *Scientific Politics* গ্রন্থের (১৯৪৭) ভূমিকায় তিনি বলেছেন: 'Seven years ago, I still spoke as an orthodox Marxist criticising deviations from, or faulty understanding of the pure creed. Nevertheless, the tendency to look beyond Communism was already there in a germinal form. While still speaking in terms of class struggle, I laid emphasis on the cohesive factor in social organisation. Already then I appreciated Marxism as something greater than the ideology of a class. I understood it as the positive outcome of earlier intellectual efforts to evolve a philosophy which could harmonise the processes of physical nature,

social evolution and the will and emotions of individual man'।[৩৭]

ঐ গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে রাজনীতির পশ্চাতে একটা সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থাকা আবশ্যক। রাজনীতিকে বিজ্ঞানাশ্রয়ী করাই ছিল তাঁর সাধনা। তবে হব্‌স, স্পিনোজা প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক রাজনীতি থেকে তাঁর চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁরা চাইতেন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাত্র; হব্‌সের মতে জাগতিক গতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত আচরণকে একটা জ্যামিতিক ছকে বিচার-বিশ্লেষণই হল রাজনীতির কাজ। মানুষের ক্রিয়াকলাপকে স্পিনোজাও জ্যামিতিক প্রণালীতে বিশ্লেষণের প্রয়াসী হন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ সামাজিক দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রয়োগবিধি নির্ধারণ করেন। বৈজ্ঞানিক রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: '...it (philosophy) is the sum total of the entire human knowledge which makes some sense out of politics and which induces noble and pure, detached and unselfish men and women to take to politics as a profession. Their political activity is motivated by the realisation that there are laws governing human life, as they govern the physical universe'।[৩৮]

সেইসঙ্গে তিনি একথাও অনুভব করেছেন যে, রাজনীতিকে যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত করে তুলতে হলে কমিউনিজম ও ন্যাশন্যালিজমের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে হবে।[৩৯]

বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিক এবং পরবর্তীকালের স্পেনসার, হোয়াইটহেড প্রমুখ দার্শনিকদের মতো মানবেন্দ্রনাথও এই মত পোষণ করতেন যে, দর্শন বিজ্ঞানেরই নিষ্কর্ষ। অধিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদসাপেক্ষ অতীন্দ্রিয় ভাববাদের পরিবর্তে একমাত্র বিজ্ঞানের সমন্বয়েই তিনি আস্থাবান ছিলেন। বিশ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি রাজনীতিকে বিজ্ঞাননির্ভর আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে দর্শনের কাজ যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে সমন্বিত করা, তেমনি রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হওয়া উচিত বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা।

ব্যাবহারিক দিক থেকে বিচার করে তিনি বলেছেন যেহেতু কর্ম চিন্তার অনুগামী, সেজন্যে রাজনৈতিক কর্মের পিছনেও সুসংবদ্ধ চিন্তার প্রয়োজন আছে।

the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness'।[২৩]

মানবেন্দ্রনাথের মতে বস্তুবাদের এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ একদেশদর্শিতার সামিল— কারণ তাতে চিন্তন-প্রক্রিয়ার গুরুত্বকে উপেক্ষা করে তাকে কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবিম্বরূপে দর্শানো হয়েছে। চিন্তন ও অর্থনৈতিক সমাজকাঠামোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক যেটুকু আছে সেটা এই অর্থেই যে 'action is always motivated by ideas'। ইতিহাসকে মানবেন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ছকেবাঁধা অপরিহার্য ঘটনা-পরম্পরা হিসাবে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসের পথ রচনায় সৃজনশীল মানুষের ভূমিকাই প্রধান। মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদে চিন্তন 'objective reality' হিসাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইতিহাস বিশেষতঃ সমাজেতিহাস চিন্তনের দ্বারাই নির্দেশিত। তাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা ভুল। তাঁর মতে ইতিহাস নির্দেশিত— কিন্তু সেই নির্দেশ্যবাদের কারণ শুধু একটিই নয়— অনেক আছে।[২৪]

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর বস্তুবাদী মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনার বহু পূর্বেই চিন্তা তথা ভাববিপ্লব অগ্রণী হয়েছে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : '...at no point of history, ideas were divinely inspired. From any point of their history, ideas can be traced back to their biological origin, which is embodied in the background of physical universe'।[২৫]

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Science and Philosophy* গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বকে বস্তুবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক প্রমুখ পদার্থবিদদের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা বস্তু সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা ভেঙে দিয়েছে। Reality-র ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক প্রণালীই একমাত্র পথ নয় বলে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ন্যায়-বৈশেষিকের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ উত্তরকালে ঘটে।

নবমানবতাবাদ

মানবেন্দ্রনাথের আজীবনকাল অর্জিত অনন্ত অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত পরিণতি হল তাঁর 'নবমানবতাবাদ' দর্শন। স্বাধীন চিন্তার নিরঙ্কুশ প্রকাশে তিনি

বিশ্বাসী ছিলেন। মূলতঃ এই কারণেই তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কমিণ্টার্নে অবস্থানকালের শেষ পর্যায়ে এই নব্যজীবন-দর্শনের বীজ তাঁর মনে অংকুরিত হয়েছিল।

মানবতা কথাটি নতুন নয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং এদেশের বৈষ্ণব ও সন্ত দার্শনিকদের চিন্তায় এ-আদর্শের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। তার আলোচনা অন্য পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে করা হয়েছে। একমাত্র মানবেন্দ্রনাথই এদেশে আধুনিক-কালে মানবতাবাদকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের ব্যক্তিত্বের ও সৃজনশীলতার প্রতিকূল সমুদয় বাধা অপসারিত করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষের সৃষ্টিসত্তা মুক্তি পেয়েছে, বিদূরিত হয়েছে যাবতীয় কুসংস্কারমূলক ভ্রান্তি ও ভীতি। অতীন্দ্রিয় চিন্তার আধিপত্য ও আধ্যাত্মিকতার শৃঙ্খল থেকেও মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। উদারতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে মার্কস বুর্জোয়া মনোভাব বলে বর্জন করেন। মানবেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুসারে নীতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাঁর মতে মানবসভ্যতার সামনে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সুরাহা হতে পারে একমাত্র মানবতন্ত্রী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে। আশু কার্যকারিতা (pragmatism) ও সুবিধাসন্ধানী চিন্তার প্রাবল্যে মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধ উন্মেষিত হচ্ছে না, ফলে সারা বিশ্বেরই নৈতিক ধারা নিম্নখাতে প্রবহমান; বাস্তবে নৈতিক মূল্যবোধ আজ বিলীয়মান।

মানবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনভিপ্রেত ও নৈরাশ্যজনক এই গতিকে রোধ করতে চাইছেন; অন্বেষণ করছেন স্থায়ী ও কল্যাণকর পরিবেশ। ভারতে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক পথে অতীন্দ্রিয় শুভশক্তির বোধন চেয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের উদ্‌গাতা— তাঁর কাছে অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক পথের অনুসরণ অচিন্তনীয়; তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞানের আশ্রয়ে যুক্তিমুখী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। তাঁর মতে মানুষের যুক্তিপ্রবণতা ঐশ ইচ্ছায় উদ্ভূত হয় নি— হয়েছে জৈব বিবর্তনধারায়। সহজাত যুক্তিবোধই মানবতন্ত্রী যুক্তিতত্ত্বের ভূমিষ্ঠভূমি— বিবেক যুক্তিরই বিম্ব। আধ্যাত্মিকতার পরিমিশ্রণহীন এবং স্বভাবগত যুক্তিবোধসাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের উপর মানবেন্দ্রনাথের 'নবমানবতাবাদ' দর্শন প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি-স্থিতির বস্তুবাদী

ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র যুক্তিনির্ভর মানবতন্ত্রী নীতিতত্ত্বে আলোকিত পথই মানুষের নিকট অনুসরণীয়।[২৬]

বিবর্তনতত্ত্বের সাহায্যে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, বিশ্ব-বিবর্তনের শেষ ধাপ হয়েছে মানুষ; নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বিশ্বজগতের সে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ বিশ্বজগতের কোলেই যুক্তিপ্রবণ মানুষের জন্ম। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যেন যুক্তিবহ সুশৃঙ্খল জগতেরই এক প্রতিধ্বনি। যুক্তিপ্রবণতা আধ্যাত্মিক বা দিব্য কোনও সত্তা নয়— বিবর্তনধারার শেষ পর্যায় মাত্র; এই যুক্তির ভূমিতেই হয় নীতির জন্ম। সামাজিক সামঞ্জস্য এবং সহিষ্ণুতার তাগিদেই মানবমনে নীতিবোধ উন্মেষিত হয়।[২৭]

মানুষ বিশ্বচরাচরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই মানবিক সত্তায় ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে বিমূর্ত ব্যঞ্জনা আরোপ করা অসঙ্গত। 'নবমানবতাবাদ' দর্শনে মানুষই সব কিছুর একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত; মানুষের মধ্যে কোনও ঐশ সত্তার স্বীকৃতি নেই তাতে। আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে মানুষকে বিমূর্ত কল্পনায় বিশ্বাতীত মহত্ব দান করা হয়। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে প্রাকৃতিক বিবর্তনের অংশ হিসাবে জৈব দৃষ্টিতে মানুষ বিবেচিত হয়েছে। কি ইউরোপ কি ভারতের পূর্বতন মানবতাবাদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের 'নবমানবতাবাদ' দর্শনের এইটাই মৌল পার্থক্য। তাঁর দর্শন সম্পূর্ণরূপে মানুষের জ্ঞান ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত —তার পৃষ্ঠপট একাধারে বস্তুবাদী ও গতিসম্পন্ন। সর্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক এই দর্শন মানুষের সৎ, শুভ ও সৃজনশীল জৈবধর্মে আস্থাবান— তার ভিতর শাস্ত্রীয় নির্দেশ অথবা পরম বৈভব বলে কিছু নেই। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে পার্থক্যের চিহ্নস্বরূপ 'New' কথাটি যুক্ত করেছেন এই বলে যে তাতে মানুষকে নতুনভাবে দেখা হয়েছে— যে-দেখার পিছনে আছে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মনোভাব। জীববিদ্যার আধুনিকতম আবিষ্কারে মনুষ্য-প্রকৃতির নতুন রূপ নির্ণীত হয়েছে। তাতে একথা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে বিশ্ব-বিবর্তনধারায় উদ্ভূত জীবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হল মানুষ। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব কোনও বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় শক্তি থেকে অর্জন করে নি— করেছে তার সহজাত সৃজনীশক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে জেনে ও জয় করে। প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে নিয়ন্ত্রিত হলেও সে প্রকৃতিতে নিমজ্জিত নয়। প্রকৃতির মধ্যেও যেমন নিয়মশৃঙ্খলা আছে তেমনি মানুষের সহজাত স্বভাবেও অনুরূপ নিয়মানুবর্তিতা থাকায় মানুষ মূলতঃ যুক্তিবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। জৈব বিবর্তনধারাতেই মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে তার সহজাত

গুণগুলি অর্জন করেছে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই দর্শনকে নবতম জ্ঞানের সমন্বয় স্বরূপ অতিরিক্ত 'Integral' শব্দটি দিয়েও তার পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন।[২৮]

নবমানবতাবাদ দর্শন দূরকল্পী (speculative) অথবা কারণ বিচারপূর্বক কার্য নির্ণায়ক পদ্ধতির (deductive) পরিবর্তে ঐতিহাসিক বিবর্তনে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত। এই দর্শনের মর্ম হল যুক্তি, নীতি ও মুক্তি। স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বিশ্বনিয়ন্ত্রক (logos) শক্তিরূপে যুক্তির প্রত্যয় এই দর্শনের পরিপন্থী। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে মানুষের অবস্থানকে আশ্রয় করেই যুক্তির উদ্ভব ঘটে। মানুষ মূলতঃ যুক্তিবাদী জীব হলেও অনেক সময়ে তার অপরিশীলিত আদিম মনোবৃত্তি ফুটে ওঠে। সেজন্যে চাই মানবমনের যথোচিত কর্ষণ। তাঁর নীতিতত্ত্ব স্বজ্ঞা সঞ্জাত যেমন নয়, তেমনি তা বিশ্বাতীত পরম সত্তার অভিব্যক্তিও নয়। মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ থেকেই নীতিনিষ্ঠা গড়ে ওঠে। তার লক্ষ্য সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন। মানবেন্দ্রনাথ যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিতত্ত্বে প্রবেশ করেছেন। কোনও অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগ বা শাস্ত্রীয় নির্দেশ তাঁব দর্শনে অবর্তমান।

'নবমানবতাবাদ' দর্শনে যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মার প্রত্যয় অথবা জগতের ইষ্টহেতুক পরিণামবাদ তাতে নেই। 'আত্মা' শব্দটি মানবমনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসেও রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তির দাবি ঘোষিত হয়েছিল। 'নবমানবতাবাদ' যুক্তি, নীতি ও মুক্তি এই তিন মূল্যবত্তার ভিত্তিতে সমন্বিত। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জৈব সংগ্রামেই মুক্তির প্রত্যয় নিহিত। মুক্তিই মানুষের অবাধ বিকাশ ও সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড। মুক্তি আর মোক্ষ এক কথা নয়। ধরা-ছোঁয়ার এই পৃথিবীতেই মুক্তি চাই। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বহির্বন্ধন সত্ত্বেও আত্মা সদাই মুক্ত এ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কোনও সাদৃশ্য নেই। তেমনি পূর্বনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সমন্বয়-প্রত্যয়ও যথার্থ মুক্তির পরিপন্থী ; পরমকারণজনিত উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) ও এমনকি মার্কসের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যবাদেও মুক্তি অনুপস্থিত। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মুক্তি মানুষের একটি দিব্যসত্তা। মানবেন্দ্রনাথের মতে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন তত্ত্বানুসারে অস্তিত্বের সংগ্রাম ও আত্মসংরক্ষণেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।[২৯] মুক্তির আবেগ সমাজ ও সভ্যতার গতিসঞ্চারক।

মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বে মুক্তিকে জৈব বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে, বিমূর্ত মানসের বিশ্বাতীত বিষয়রূপে নয়। মুক্তির আবেগ প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে। মান্ধাতা আমলের আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করলে মানুষের আত্মিক মুক্তি ঘটবে; মুক্তি অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপাদান অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তিময় সম্ভাবনার উপলব্ধি। আত্মিক বন্ধনমুক্ত মানুষই কেবল নতুন ও স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তি একমাত্র সংস্কারমুক্ত মানুষের উপর নির্ভর করে। মানবেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্ব তাঁর বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বেরই অঙ্গ। তাঁর সকলকথার মূলে একটি সুর সদাই যেন অনুরণিত— সেটি হল আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েদখানা থেকে মানবতার মুক্তিসাধন। মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব মুক্তির তিন প্রধান স্তম্ভ।[৩০]

'নবমানবতাবাদ' সার্বভৌম মানুষের জয়গান করেছে। মানুষের সেই মৌল সত্তা হরণ করার কোনও অধিকারই সমাজের নেই। এই দাবি কোনও কাব্যিক ভাবাবেগ কিংবা অতীন্দ্রিয় আবেগ সম্ভূত নয়। তা হল সামাজিক ও জৈব বিবর্তন সম্পৃক্ত মানবমনের চরমোৎকর্ষের উপাদান। মানবতা এখন এক সংকটের সম্মুখীন; ব্যষ্টিকে সমষ্টিতন্ত্রের দানব গ্রাস করতে চলেছে; ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্তমিত। আর্থিক সংকটমুক্তি মানবতার প্রয়োজনে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণে এখন ব্যক্তিমানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

'নবমানবতাবাদ'-এর আদর্শ যে বিশ্বজনীন সেকথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তাবাদ সমাজ-বিবর্তনের একটি নীচের পর্যায়মাত্র— শেষ ও সর্বোন্নত পর্যায় নয়। মূলতঃ জাতিবিদ্বেষে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ যে প্রতিক্রিয়াশীল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; তার দীর্ঘস্থায়িত্ব ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণের অন্তরায়। জাতীয়তা-বাদের পরিবর্তে চাই বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মানুষে-মানুষে সাহচর্যপূর্ণ সৌহার্দ্যের কথা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মতো মানবেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিমানুষের মনই হল উন্নত সমাজ, বৈশ্বিক মৈত্রী ও মুক্ত বিশ্বের বনিয়াদ। এই আদর্শে পৌঁছনোর জন্য সর্বাগ্রে চাই মুক্তির আদর্শ ও প্রগতির মন্ত্রে দীক্ষা। 'নবমানবতাবাদ' এই মুক্ত ও মিত্রতাবদ্ধ বৈশ্বিক সংঘের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। মানবেন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে যে-বিশ্বসংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন সেখানে দেশগত সীমানার প্রশ্ন গৌণ— পুঁজিবাদী, ফ্যাসিবাদী, সাম্রাজ্য-বাদী, সাম্যবাদী প্রভৃতি সকল রাষ্ট্রই ক্রমে একদিন বিশ শতকের নবজাগ্রত

মানুষের তাড়নায় লুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতাকে তিনি ভিন্নার্থে বিচার করেছেন। আন্তর্জাতিকতার প্রত্যয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বতন্ত্রই থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্র গঠন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে একত্রীকরণের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। তিনি চেয়েছেন বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে আত্মিক বন্ধনে সংযুক্ত মানবসমাজ।[৩১]

মানবেন্দ্রনাথের মতে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একমাত্র উপায় হল মানুষের মননশীলতার নবজাগরণ, আর সেইসঙ্গে মানবতা-বাদের মৌল আদর্শের রূপায়ণ।

চার : রাষ্ট্রদর্শন

সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে চুক্তিতত্ত্বের পরিবর্তে জৈব প্রয়োজন ও স্বার্থের তাড়নায় এবং পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার তাগিদে সমাজবন্ধনের উদ্ভব হয়েছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩২] সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি; তার পিছনে কোনও ঐশ নির্দেশ নেই। ব্যক্তিমানুষই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উৎস। বিবর্তনধারার প্রথমাবস্থায় জৈব অস্তিত্বের জন্য মানুষ সংগ্রাম করে এসেছে; ক্রমে বুদ্ধি, চেতনা, সৃজনীশক্তি প্রভৃতি মানবিক সত্তার বিকাশে সেই সংগ্রামের মান ও ধারা বিকশিত ও উন্নত হয়। জৈব প্রয়োজন নিবৃত্তির পরে অপরের মানবিক সত্তার স্ফুরণ অব্যাহত রেখে ব্যক্তিমানুষ নিজ সত্তার পরিপূর্তির জন্য সমাজবন্ধনের তাগিদ অনুভব করে। ব্যক্তিমানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীন প্রয়াসের সঙ্গে সুষম সমাজব্যবস্থার কোনও বিরোধ নেই। যে-সমাজে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা অবর্তমান সেখানে সমাজবদ্ধতার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের তারতম্য হেতু বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেজন্যে সর্ববিধ বৈষম্য দূর করে একের দ্বারা অপরের পীড়ন ও পদানত রাখার অবকাশ নির্মূল করাই রাষ্ট্রের কাজ।

মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিপ্রবণতায় মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলেছেন যে শুভ ও সুন্দর সমাজ তার অধিবাসীদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যেক্ষেত্রে সেইবোধের অভাবে সমাজে মালিন্য ফুটে ওঠে সেখানে

আইনের সাহায্যে সুরাহা হয় না। চাই মানুষের চেতনা ও শুভবুদ্ধির উন্মেষ।[৩৩]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক কী তা নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। এই দুটি মতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রতত্ত্বের যা কিছু আলোচনা হয়ে থাকে। প্রথম মতানুসারে সমাজের অস্তিত্বকে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়; তদনুযায়ী ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ এবং সমাজে সে বাস করে মাত্র। সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি বজায় রাখা এবং তার জীবনাচার নিরূপণই এই মতানুসারীদের লক্ষ্য। যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং ঐশ ইচ্ছায় বিশ্বচরাচর ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁরাও সমাজকে ব্যক্তির উপর স্থান দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় মতানুসারে মানুষই সমাজের স্রষ্টা; সেজন্যে সমাজের উপরে অধিষ্ঠিত মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। মানুষ নিজের সুখসুবিধার তাগিদে সমাজ সৃষ্টি করেছে; তাই সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব কিছু বিষয়কে ব্যক্তিমানুষের জীবন ও প্রয়োজনের দিক থেকে নিরূপিত করাই কাম্য। শেষোক্ত মতের সমর্থক মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে (Individualism) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত করেছেন।

তাঁর মতে জৈব বিবর্তনধারায় উদ্ভূত ও বিকশিত আদিম মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে সমবায়ী সম্পর্কে সংঘবদ্ধ উপায়ে যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমাজবদ্ধ হয়। চুক্তি করে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেনি, করেছে জৈব তাড়নায়। প্রশ্ন হতে পারে যে সেই জৈব তাড়নার ভিত্তিভূমি বা প্রকৃতি কী ছিল; অর্থাৎ মানবজীবনের প্রাথমিক ও চরম লক্ষ্য কী? তদুত্তরে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন প্রথমাবস্থায় আদিম মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে যান্ত্রিক সামঞ্জস্য ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (mechanical adjustment and natural selection) প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল;[৩৪] ক্রমে উন্নত পর্যায়ে এসে ইচ্ছা ও বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় যান্ত্রিক সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বুদ্ধির সাহায্যে জীবন সংগ্রামের পথনির্বাচন করে। ক্রমে তার পিছনে বিচার ও বিবেকবোধ সৃষ্ট হওয়ায় মানুষের মনে নীতিবোধের উন্মেষ ঘটে। মানুষের পূর্বাপর জীবনসংগ্রামের পিছনে আছে সর্ববিধ প্রতিকূলতা থেকে মুক্তির বাসনা। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই সমাজসৃষ্টির

প্রকৃত উৎস। জৈব বিবর্তনধারাতেই ক্রমে মানুষের মন বুদ্ধি, চেতনা এবং বহুবিধ সৃষ্টির সম্ভাবনায় ভরে ওঠে। সমাজ ও তার অঙ্গ রাষ্ট্রের কাজ হল প্রথমতঃ মানুষের জৈব অস্তিত্বকে যথোচিত বজায় রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষের মননশীল বিকাশ ও বিচিত্র সৃষ্টিসত্তাকে যাবতীয় বাধাবিপত্তি থেকে রক্ষা করা। সমাজে পরস্পরবিরোধী নানা মত ও দ্বন্দ্বের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল সামঞ্জস্য বিধান করা, কারও অবদমন নয়। জীবতত্ত্ব অনুসারে যদি একথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয় যে মানুষ মূলতঃ যুক্তিপ্রবণ তাহলে মুক্তির ধারক ও পরিপোষক সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই প্রবণতার উন্মেষসাধন; সেই কারণে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও কোনও বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না।[৩৫]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি গণতন্ত্রের বনিয়াদ বলে মনে করতেন। শুধু পরিবারেই নয়— সমাজে সবার আগে ব্যক্তির স্থান ও অধিকার বর্তায়। তিনি বলেন যে সমাজের উৎপত্তি ব্যক্তিমানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সংঘবদ্ধতার তাগিদেই ঘটে। তাই তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন।

জাতীয়তাবাদ

মানবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে একটি 'antiquated cult' হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় মানুষের গোষ্ঠীমন এক সময়ে ঐ আবেগ অর্জন করে। গোষ্ঠীমন নিশ্চল নয়, তারও আছে বিকাশ ও পরিবর্তন। বিগত দু-শতক যাবৎ সামাজিক আবেগের আবর্তনকেন্দ্র ছিল জাতীয়তাবাদ। সেটা চিরন্তন নয়। মানবসমাজের বিবর্তনধারায় একটি স্তরে জাতীয়তাবাদ প্রগতিমূলক ছিল— কিন্তু এখন তা অচল ও নিষ্প্রয়োজন। নতুনতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ক্রমবিস্তৃত হয়ে সমগ্র মানবসমাজে লীন হয়ে গেছে।

জাতীয়তাবাদের উৎস হল হৃদয়াবেগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজ্ঞান-সম্মত সমাজদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। জাতীয় স্বাধীনতার তাগিদে মানুষের মনে অন্ধ দেশহিতৈষা ও জাতিবিদ্বেষ দেখা দেওয়ায় স্বাধীন চিন্তাশক্তিও লুপ্ত হয়ে গেছে। জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিসাধন উপেক্ষিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ সমষ্টিবাদী। তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নগণ্য।

'জাতি' শব্দটিতে আধ্যাত্মিক পরমত্ব আরোপ করা হয়— যার বেদীমূলে নিজেকে আহুতি দেওয়া মনুষ্যজীবনের এক পরম আদর্শ। জাতীয়তাবাদেই ফ্যাসিবাদের বীজ নিহিত থাকে। জাতীয়তাবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ বলেন: '...human being of flesh and blood, must sacrifice everything to make the nation great and glorious. That is the essence of Nationalism...The nation could not claim an undivided loyalty unless Nationalism was of the order of monotheistic religion: there can be no other God, and nobody can claim any share in the sacrifice'।[৩৬]

পরমত্বের ব্যঞ্জনায় দেশ ও জাতিকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়। তার অধিবাসীদের একমাত্র আনুগত্য হল ধোঁয়াটে আবেগসর্বস্ব এই 'জাতি' প্রত্যয়ের কাছে। ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট 'জাতি' প্রত্যয় সমষ্টিবাদী হতে তাই বাধ্য। ভারতের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় অসহিষ্ণুতা, একাধিপত্য ও এক-নায়কত্বের প্রবণতা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

বৈজ্ঞানিক রাজনীতি

প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয়তাবাদী, তারপর হন মার্কসবাদী। এই সময় থেকেই তাঁর মনে র‍্যাডিক্যালিজমের চিন্তাধারা দেখা দেয়; সেই চিন্তা উত্তরচল্লিশে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। পরিশেষে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয় বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। *Scientific Politics* গ্রন্থের (১৯৪৭) ভূমিকায় তিনি বলেছেন: 'Seven years ago, I still spoke as an orthodox Marxist criticising deviations from, or faulty understanding of the pure creed. Nevertheless, the tendency to look beyond Communism was already there in a germinal form. While still speaking in terms of class struggle, I laid emphasis on the cohesive factor in social organisation. Already then I appreciated Marxism as something greater than the ideology of a class. I understood it as the positive outcome of earlier intellectual efforts to evolve a philosophy which could harmonise the processes of physical nature,

social evolution and the will and emotions of individual man'।[৩৭]

ঐ গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে রাজনীতির পশ্চাতে একটা সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থাকা আবশ্যক। রাজনীতিকে বিজ্ঞানাশ্রয়ী করাই ছিল তাঁর সাধনা। তবে হব্‌স, স্পিনোজা প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক রাজনীতি থেকে তাঁর চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁরা চাইতেন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাত্র; হব্‌সের মতে জাগতিক গতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত আচরণকে একটা জ্যামিতিক ছকে বিচার-বিশ্লেষণই হল রাজনীতির কাজ। মানুষের ক্রিয়াকলাপকে স্পিনোজাও জ্যামিতিক প্রণালীতে বিশ্লেষণের প্রয়াসী হন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ সামাজিক দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রয়োগবিধি নির্ধারণ করেন। বৈজ্ঞানিক রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: '...it (philosophy) is the sum total of the entire human knowledge which makes some sense out of politics and which induces noble and pure, detached and unselfish men and women to take to politics as a profession. Their political activity is motivated by the realisation that there are laws governing human life, as they govern the physical universe'।[৩৮]

সেইসঙ্গে তিনি একথাও অনুভব করেছেন যে, রাজনীতিকে যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত করে তুলতে হলে কমিউনিজম ও ন্যাশন্যালিজমের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে হবে।[৩৯]

বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিক এবং পরবর্তীকালের স্পেনসার, হোয়াইটহেড প্রমুখ দার্শনিকদের মতো মানবেন্দ্রনাথও এই মত পোষণ করতেন যে, দর্শন বিজ্ঞানেরই নিষ্কর্ষ। অধিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদসাপেক্ষ অতীন্দ্রিয় ভাববাদের পরিবর্তে একমাত্র বিজ্ঞানের সমন্বয়েই তিনি আস্থাবান ছিলেন। বিশ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি রাজনীতিকে বিজ্ঞাননির্ভর আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে দর্শনের কাজ যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে সমন্বিত করা, তেমনি রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হওয়া উচিত বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা।

ব্যাবহারিক দিক থেকে বিচার করে তিনি বলেছেন যেহেতু কর্ম চিন্তার অনুগামী, সেজন্যে রাজনৈতিক কর্মের পিছনেও সুসংবদ্ধ চিন্তার প্রয়োজন আছে।

কার্যতঃ রাজনীতি স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী বাউণ্ডুলেদের মেঠো বক্তৃতা হিসাবে পরিগণিত। অনেকের দৃষ্টিতে রাজনীতি একটা নোংরা বিষয়। তিনি এই মনোভাবের দুটি কারণ দেখিয়েছেন: ১. যেহেতু সমাজের সমগ্র পরিবেশই কলুষিত, তাই তার অন্যতম অঙ্গ রাজনীতিও দূষিত হয়ে পড়েছে ; ২. রাজনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে না দেখার ত্রুটি।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদর্শনের প্রয়োজন স্বীকৃত হলেও তা যথোচিত পালিত হয় না। কার্যকারিতার দিক থেকে বা সুবিধাবাদী আচরণের ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থেকে যায়।[৪০]

মানবেন্দ্রনাথ এই সুবিধাবাদী রাজনীতির নিন্দা করেছেন। তিনি চেয়েছেন তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামঞ্জস্য ; দর্শনকে অধিবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় চিন্তার কুক্ষি থেকে মুক্তি দিতে। তাহলেই তাঁর মতে বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হবে। তাঁর কাছে রাষ্ট্রবিদ একজন বিজ্ঞানী, যাঁর দৃঢ় প্রত্যয় থাকা দরকার যে জাগতিক প্রক্রিয়া অতিপ্রাকৃত কোনও সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—সমাজ ও ইতিহাসের রূপকার হল মানুষই স্বয়ং। সামাজিক বিবর্তন-ধারায় বহু কিছু রীতি-নীতি রচিত হয়েছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিমূর্ত (abstract) বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের তাগিদেই রচিত। সেগুলি যখন অচল প্রতিপন্ন হয় তখন স্বতঃই তার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তার আগে এইটুকু আত্মপ্রত্যয় থাকা চাই যে ঈপ্সিত পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতা আছে একমাত্র মানুষেরই—এবং সে-বিশ্বাস অর্জন একমাত্র বিজ্ঞাননির্ভর দর্শনেই সম্ভব। এই বিশ্বাস দৃঢ় হলে রাজনীতিতে মানুষের রুচি দেখা দেবে ; রাজনীতি হবে হৃদয়গ্রাহী এবং স্বাধীন মনোভাবাপন্ন মানুষ নিঃস্বার্থ মনে রাজনীতিতে অংশ নেবে। রাজনীতিকেরা সুবিধাবাদ ত্যাগ করে কার্যকারিতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তত্ত্ব ও তার সঠিক প্রয়োগে উৎসাহী হবে।[৪১]

ব্যাবহারিক দিক থেকে রাজনীতির কাজ অনেকের মতে ক্ষমতা দখল করা, যার উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা ; স্পষ্টতঃই এ-প্রত্যয় দুটি পরস্পরবিরোধী। কার্যতঃ ক্ষমতা দখল দুভাবে সম্ভব—একটি যেন-তেন প্রকারেণ এবং অপরটি জ্ঞানের হাতিয়ার অবলম্বন করে। মানবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পন্থার অনুরাগী ছিলেন।[৪২]

তাঁর মতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বিশ্বপরিবেশকে যেমন জয় করেছে তেমনি সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে সে সমাজের গঠন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়েছে। সত্য সদাই জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সত্যানুসন্ধান প্রকারান্তরে

কর্মক্ষেত্রে সার্থক পরিণতি লাভ করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে কথাটির উপযোগিতা এই যে সত্যের খাতিরে রাজনৈতিক কাজে ফলাফল উপেক্ষা করে মানুষ নির্ভয়-চিত্তে সত্যের উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়। সত্য নিচ্ছিদ্র ও অখণ্ডনীয়। প্রাত্যহিক জীবনে চিন্তা ও কাজের মধ্যে চাই সত্যের প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শকেই মানবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

নীতিগত দৃষ্টিতে জ্ঞান নিরপেক্ষ— অর্থাৎ জ্ঞানের সৎ ও অসৎ দুরকম ব্যবহারই হতে পারে। রাজনীতিকে সুখবহ করে তুলতে হলে তাই শুধু জ্ঞান-নির্ভর সত্য নয়— তাতে নীতিরও সংযোগ চাই। আবার রাজনীতির লক্ষ্য (end) কেবল শুভ হলেই চলবে না— পদ্ধতির (means) সঙ্গেও তার সামঞ্জস্য থাকা চাই। এখানে মার্কসের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মার্কস মনে করতেন সামাজিক বিবর্তনধারা নিয়মনির্দিষ্ট এবং স্বভাবতঃই তা প্রগতিশীল ; সেই প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে-কোনও পন্থার অবলম্বন নীতিসঙ্গত (end justifies the means)। মার্কস শ্রেণীহীন সুস্থ সমাজ গড়তে চেয়েছেন— এটা যে শুভ তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনে তিনি নীতিকে করেছেন আপেক্ষিক ; ফলে লক্ষ্য ও লক্ষ্যাভিমুখী পথের মধ্যে অসংগতি থেকে গিয়েছে।[৪৩]

মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে সংগতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে তিনি যথার্থ মানবিক মঙ্গলবিধানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর সঙ্গে গান্ধীর পার্থক্য এই যে তিনি গান্ধীর মতো বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় উৎসে নীতিতত্ত্বের সন্ধান করেন নি ; বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিতে জৈব যুক্তিপ্রবণতার উপর মানবেন্দ্রনাথ তাঁর নীতিতত্ত্বকে স্থাপন করেছেন।

তাঁর মতে সামাজিক সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতা ও সমবায়ী সম্পর্কের কার্যকারিতা স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। রাজনীতিকে মানবেন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক শ্রেণী-সম্পর্কিত কাঠামোর ছায়ারূপে দেখেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে রাজনীতি সমাজের সুসংবদ্ধতা ও সৌষ্ঠবসাধনের একটি বিজ্ঞানবিশেষ।

মানবতাবাদী রাজনীতি

বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত ধারায় যেমন নবমানবতা দর্শনের উদ্ভব হয়েছে তেমনি সুগঠিত গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রিক পরিশাসন ও পার্টিবিহীন রাজনীতি উক্ত দর্শনের সামাজিক বিষয়রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে।

মানবেন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই সুগঠিত গণতন্ত্রের (organised democracy) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি অশেষ। দুটি নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকালে ভোটদাতা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে থাকে। সংকটাবস্থায় সাংবিধানিক আইনকানুনও মানুষকে নিরাপত্তার আশ্বাস জানায় না। তাই মানবেন্দ্রনাথ সুগঠিত গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, যেখানে শীর্ষাসীন 'Leviathan' মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না। স্থানিক গণসমিতিই হবে যাবতীয় বিধিব্যবস্থার নিয়ন্তা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচকেরা মূঢ় ও অসহায়। একমাত্র সুগঠিত গণতন্ত্রই রাষ্ট্রশক্তিকে যথাযথরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রাভিগতার বিরুদ্ধে তিনি মানুষকে সতর্ক করে দেন। তিনি এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনা করেছেন যেখানে মানুষের যুক্তিবোধ, জ্ঞানশক্তি ও কর্মনৈপুণ্য ব্যক্তির মুক্তি, সামাজিক মঙ্গল তথা মানব-প্রগতিকে বেগবান করে তুলবে।[৪৪]

কেন্দ্রাভিগ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধী মানবেন্দ্রনাথ চাইতেন সর্বাত্মক বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা। তাঁর মতে কেন্দ্রাভিগতায় মানুষের কর্মোদ্যম ও স্বাধিকার খর্ব হয়। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দেশব্যাপী সংগঠন ও আর্থিক শক্তির সাহায্যে দেশকে কেন্দ্রাভিগতার পথেই ঠেলে দেয়। রুশ দেশে সোভিয়েত প্রথা প্রবর্তিত হলেও সেখানকার monolithic কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রাভিগ আধিপত্যে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বজ্রকঠিন ব্যবস্থায় আবদ্ধ। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক অধিকার থাকলেও পার্টিশক্তিই সে-দেশকে কেন্দ্রাধীনে একই সুর ও ছন্দে চলতে বাধ্য করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মর্মই এই যে তাতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার বজ্রআঁটুনিকে শিথিল করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেজন্যে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকল্পে প্রারম্ভিক নীতিস্বরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতাই হবে মৌল আদর্শ। একনায়কতন্ত্র, ফৌজি নিয়মনিগড় ও সংঘবদ্ধ দাপট থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। সে-কাজকে সফল করে তুলতে হলে চাই গণ-উদ্যম।[৪৫]

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গৌণ ও নিষ্প্রয়োজন। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকল্পে রাষ্ট্রশক্তির দখল ছাড়া গত্যন্তর নেই এই মনোভাব থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রতিশ্রুত সামাজিক

বিপ্লব রাষ্ট্রশক্তি দখল সত্ত্বেও অসাধিত থেকেছে। কাজেই সেটা লক্ষ্যে পৌঁছনোর একমাত্র পথ নয়। তিনি মনে করতেন যে কলকারখানা বা ক্ষেতখামারে সমাজ-বিপ্লবের কার্যক্রম পার্টিবাজী ও ক্ষমতাদখল প্রচেষ্টা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ।

মানবেন্দ্রনাথের সুগঠিত গণতন্ত্রের আদর্শ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে পার্টি-বিহীন রাজনৈতিক প্রত্যয়ে। তাঁর মতে পার্টি-প্রথায় গণতন্ত্রী আদর্শ স্ববিরোধী হতে বাধ্য। কারণ পার্টি বলতে জনসাধারণের একটি অংশকেই মাত্র বোঝায়; অথচ গণতন্ত্র সমগ্র জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। কাজেই অংশ যেমন সমগ্রের সমতুল্য হতে পারে না, তেমনি পার্টি-গণতন্ত্রও অসম ও স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। পার্টি-সরকারের পরিচালনা জনসাধারণের জন্য হতে পারে, জন-সাধারণের দ্বারা নয়। পার্টি-সরকার যদি গণতান্ত্রিক আখ্যা পায় তাহলে সহৃদয় স্বেচ্ছাচারিতাও (benevolent despotism) সেই গণতন্ত্রের নামান্তর।[৪৬]

বিশাল দেশে পরিশাসন প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয় না; প্রতিনিধিত্ব-মূলক অর্থাৎ জনসাধারন কর্তৃক নির্বাচিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির মনোনীত ব্যক্তিরা জনসাধারণের হয়ে সরকার পরিচালনা করে। ফলে জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা কতিপয় রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। সেইসব নেতারা জনগণের প্রতি অনুগত না হয়ে নিজ নিজ পার্টির কাছে অনুগত থাকেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকর নয়, বিশেষ করে যেক্ষেত্রে জনসাধারণ অশিক্ষিত। সেজন্যে জনসাধারণকে recall, referendum ইত্যাদি সুবিধাও দেওয়া হয় না। জনসাধারণের অভিভাবকরূপে বৃহত্তম পার্টি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের শাসনকার্য নির্বাহ করে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত থাকে; সেখানে তারা সত্যিই বড় অসহায়।

উপরন্তু পার্টি-রাজনীতি ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, পার্টি-গুলি চায় ক্ষমতা দখল। তাই তারা নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যে-কোনও দ্বন্দ্বেরই একটা নিজস্ব ধারা থাকে—যেখানে নীতির স্থান শূন্য। সেই দ্বন্দ্বমুখর পথে যেতে গিয়ে পার্টিগুলিকে ধাপ্পাবাজি, ঘুষ, দুর্নীতি, জোচ্চুরি, গুণ্ডামি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়। জনসাধারণের পশ্চাৎপদতা ও অশিক্ষাই রাজ-নীতিকদের শ্রেষ্ঠ মূলধন। পার্টির আদর্শ ও পার্টির নেতারা সর্বক্ষেত্রে মন্দ না হলেও মূলতঃ পার্টি-রাজনীতি এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত পরিশাসন-

ব্যবস্থার গলদ এই অনভিপ্রেত পথকে প্রশস্ত করে তোলে। তাই মানবেন্দ্রনাথ পার্টিবিহীন রাজনীতির পথ উদ্ভাবন করেছেন।[৪৭]

তাঁর দৃষ্টিতে পার্টি মাত্রেই মূলতঃ সমষ্টিবাদী ; পার্টির কার্যক্রমে শ্রেণী, জাতি, দেশ, ধর্ম ইত্যাদি যূথবাদী আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে ; সেখানে ব্যষ্টির স্থান নগণ্য। পার্টি-রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান মানুষকে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ তিনি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন— যে-শিক্ষা মানুষের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, যথোচিত সমাজচেতনা এবং মানবিক বিকাশসাধনে সক্ষম।

পার্টি-প্রথায় উপর থেকে সবকিছু আরোপ করা হয়। জনসাধারণ পার্টির হাতে পুতুল হয়ে থাকে। মানবেন্দ্রনাথ স্থানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত গণ-সমিতির ভিত্তিতে নীচে থেকে উপরে বিন্যস্ত কাঠামোর সাহায্যে যাবতীয় নীতি-নির্ধারণ ও পরিশাসনের প্রস্তাব করেছেন। স্থানিক গণতন্ত্রের আদর্শেই তিনি রাষ্ট্রকাঠামোর এক সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। স্থানিক সংগঠনের অন্যতম কাজ হবে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের চিত্তবৃত্তিকে পরিশীলিত করা এবং জনজীবনকে যথোচিত পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা। অন্যান্য কাজের সঙ্গে স্থানীয় নাগরিকদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সক্রিয় চেতনার চাই উন্মেষ সাধন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিশাসনকর্মে যাতে নির্বাচকদের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সজাগ দৃষ্টি থাকে তার অনুকূল ব্যবস্থা রাখা চাই। প্রয়োজনে প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনা (recall) ও গণভোটের (referendum) সুযোগ থাকা চাই। নির্বাচনে স্থানিক সমিতিই প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অথবা পার্টিবিশেষের প্রার্থী মনোনয়ন-প্রথা নির্বাচনের মানদণ্ড হবে না। জনসাধারণ দলীয় রাজনীতির সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ইচ্ছা ও আত্মনির্ভরতায় সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রার্থীদের সরাসরি নির্বাচিত করার সুযোগ পাবে। স্থানিক কর্মপদ্ধতি ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবিক মূল্যে নিরূপিত হবে। পার্টি-প্রথার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুফল হল নির্বাচক-মণ্ডলীর চেতনা ও মননশক্তির বিকাশ। প্রস্তাবিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বয়স্ক প্রতি ব্যক্তিরই থাকবে প্রত্যক্ষ সংযোগ। এই প্রণালীর সঠিক রূপায়ণ ও সাফল্য নীতিনিষ্ঠ ও উন্নত মননশীল ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। স্থানিক সমিতির কাজ হবে মানুষের যুক্তি ও নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলে জন-কল্যাণকর কাজে নিরন্তর নিযুক্ত থাকা। মুক্ত ও মননশীল মানুষের এই সংগঠন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে।[৪৮]

সুগঠিত গণতন্ত্রের আশু রূপায়ণের সম্ভাবনা যে নেই সে-সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অন্তর্বর্তীকালীন এক সহজসাধ্য পন্থা দর্শিয়েছেন— যেসময়ে বর্তমান ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে। তখন একটি রাজ্য পর্ষদের উপর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সুস্থ সমাজ-গঠনের সর্ববিধ বিধিব্যবস্থা রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান উক্ত পর্ষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। পর্ষদের অধ্যক্ষ তদতিরিক্ত আরও কিছু কর্মকুশল নির্দলীয় ব্যক্তিকে পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করবেন।[৪৯]

ফ্যা সি বা দ স ম্প র্কে ম নো ভা ব

ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কাজে ও কথায় মানবেন্দ্রনাথই সর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ইউরোপের একদল রাষ্ট্র-দার্শনিক মনে করেন যে ফ্যাসিবাদের কোনও দার্শনিক বনিয়াদ নেই। ম্যাকাইভার, মেয়ার, ল্যাস্কি, নিউম্যান প্রমুখ দার্শনিকেরা ফ্যাসিবাদের দর্শনগত অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে হেগেলের 'machpolitic' প্রত্যয় ও রাষ্ট্রের আধিপত্য, নীটশের অতিমানব প্রত্যয় ও কান্টের নীতিতত্ত্ব থেকে ফ্যাসিবাদ তাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহ করেছে মাত্র। এবং মার্টিন লুথারের রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ প্রত্যয় এই মতবাদকে পুষ্ট করেছে।

মানবেন্দ্রনাথের মতে ফ্যাসিবাদের একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক বনিয়াদ আছে। কমিউনিজমের নিছক বিরোধী শক্তি হিসাবে তার উৎপত্তি ঘটে নি। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Fascism* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল পূর্বেই তার দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল। জাগতিক ন্যায়নীতি, বিচারবিবেক ও মুক্তির আবেগকে বর্জন করে ফ্যাসিবাদ দিব্য প্রেরণার আশ্রয় নেয়। রেনেসাঁসের আমলে মানুষ যে-রাজনৈতিক মুক্তি ও চিন্তার অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ পায় তা হরণ করার জন্যেই এই দর্শনের উদ্ভব ঘটে। যুক্তিবোধ ও স্বাধীন চিন্তা থেকে মানুষকে প্রতি-নিবৃত্ত করে ঐশ্বরিক অছিলায় আত্মত্যাগে ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ক্রীড়নক-রূপে বিশেষ অভিসন্ধিমূলক কাজে মানুষকে প্রবৃত্ত করানোই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের অভীপ্সা ও আদেশরূপেই (Contemplation of God) হিংসা ও বর্বরতা ঘটে চলে। ফ্যাসিবাদী অধিনায়কের দৃষ্টিতে 'জনগণ রাষ্ট্রের কাছে

অনুগত, রাষ্ট্রের আনুগত্য আমার কাছে এবং আমিই ঈশ্বরের প্রতিভূ'। এখানে হিন্দু অবতারবাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সকলকে বঞ্চিত করে মৌরসিস্বত্ব ভোগ করেন যে ফ্যাসিস্ট নেতা তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এবং এক মহামানব বিশেষ।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক দার্শনিক পদ্ধতিকে বিকৃতরূপে প্রয়োগ করে ইতালির ফ্যাসিবাদী মতবাদের দর্শনগুরু যোভানি জেন্তিলে বলেন: 'God and thought (respectively) represent the two opposite poles of life, both necessary and both essential, yet opposed to and contradictory to each other'।[৫০] তাঁর মতে ঈশ্বর ও মানুষ হল: 'Flexible unity in the eternal movement of self-realisation—a living and therefore restless unity, always dissatisfied with itself'।[৫১]

মানবেন্দ্রনাথের মতে এই চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের মিল সুস্পষ্ট। তিনি বলেন: 'What is mysticism after all, but mental confusion which takes refuge in obscurantism to reject experimentally demonstrated scientific truths and rationally established philosophical concepts? Fascist philosophy as expounded by Gentile is a classical specimen of mysticism'।[৫২]

অতীন্দ্রিয়বাদীরা মনে করেন ঐশ ইচ্ছায় মানুষ চিন্তা করে, এবং কাজ করে; তার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই। হেগেলীয় প্রভাবে অংকুরিত ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মূল্যবত্তার আশ্রয় নেয়। তদনুযায়ী অন্যের সার্বভৌমতার স্বীকৃতি আত্মহত্যার সামিল। যাকিছু আধ্যাত্মিক তার অস্তিত্ব স্বাধীন, কিন্তু সবকিছুই আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের অধীন।

ফ্যাসিবাদী চিন্তার অন্যতম প্রবর্তক নীটশের গুরু ছিলেন শোপেনহাওয়ার, যিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ভারতের সনাতন ভাবধারায়। মানবেন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ফ্যাসিবাদের পক্ষে যথেষ্ট উর্বর। ভারতীয় অধিবিদ্যার ও ফ্যাসিবাদের উৎস একই স্থানে, যেখানে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির অগম্য অতীন্দ্রিয় সত্তা চরম ও পরম জ্ঞানরূপে বিবেচিত। জীবনবিমুখ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে স্থূল বস্তুবাদ ফ্যাসিবাদে সমন্বিত হয়েছে। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ অবদান বের্গসঁ-র এবং তাঁর শিষ্য জর্জ সোরেলের। ফ্যাসিবাদী দর্শনের দ্বৈত প্রক্রিয়ায় একদিকে বিরাজ করেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বয়ং এবং অপরদিকে তাঁরই একমাত্র প্রতিভূ এক

মহামানব; তিনি রাষ্ট্রের রক্ষক ও পালনকর্তা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তাঁর সকল কাজের পিছনে থাকে দিব্য আদেশ ও অনুমোদন। মহামানব-তত্ত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মুসোলিনি, হিটলার প্রমুখ রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা। বিগত দিনের দেব দ্বিজ ও রাজার স্থান নিয়েছেন আধুনিক যুগের বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐসব ডিক্টেটরেরা। ফ্যাসিবাদী দর্শনের প্রেরণায় তাঁদের আচরণে হিংসা, বর্বরতা, নিপীড়ন, অত্যাচার প্রভৃতি যাবতীয় অমানুষিক সত্তা পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। এঁদের আদর্শে রাষ্ট্রই হল সব, মানুষ কেবল তার খেলার পুতুল। ভন প্যাপেনের ভাষায় : **The function of woman is to bear children to be soldiers. There is no more glorious ideal life than to die on the field of battle.** রণাঙ্গণে বীরের মৃত্যুতেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। ফ্যাসিবাদীরা ধনতন্ত্র-বাদের সমালোচনা করে— শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার জন্যে নয়; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারনৈতিকতার বিরুদ্ধার্থে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে ফ্যাসিস্টরা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রেরও বিরোধী। তাদের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের জিগির সোনার পাথর বাটির মতো।

ভারতের বহু রাষ্ট্রনেতার আদর্শ ইতালির জাতীয়তাবাদী দার্শনিক মাৎ-সিনিকেও মানবেন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের পুরোধারূপে দেখিয়েছেন। মাৎসিনি ধর্মের যূপকাষ্ঠে নীতিকে উৎসর্গ করার পক্ষপাতী ছিলেন; স্বাধীনতার নামে তিনি চেয়েছেন দাসত্বেরই পুনর্বহাল; সেখানে মানুষের দায়দায়িত্ব আছে অনেক, নেই কেবল অধিকার।[৫৩] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও ফ্যাসিবাদী চিন্তা ও আচরণ প্রবল বলে তিনি ঐদলের তীব্র সমালোচনা করেন।

অধুনা কমিউনিজমের সঙ্গে ফ্যাসিজমের আংশিক সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো মানবেন্দ্রনাথও প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে বস্তুবাদী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বহুলাংশে অচল মার্কসীয় তত্ত্বের প্রতি কমিউনিস্টদের অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য শাস্ত্রে অনুরক্তির সামিল; ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদ, সর্বহারাদের একচেটিয়া বিপ্লবী চেতনা ও একনায়কত্ব ছাড়াও কমিউনিস্টদের উদারতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে অনাস্থা ফ্যাসিস্টদেরই সমগোত্রে তাদের নিয়ে গেছে; শ্রেণী ও দলের একনায়কত্বে বিশ্বাসী কমিউনিস্টদের চিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নেই; ফ্যাসিস্টদের মতো যূথবদ্ধ, রাষ্ট্রসর্বস্ব ও ফৌজি (collective, totalitarian and regimented) সমাজব্যবস্থায় মানুষের সহজাত মৌলিক সত্তা মুক্তির আবেগ, সৃষ্টির প্রয়াস এবং যুক্তির প্রতি নিষ্ঠাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে।[৫৪]

মানবেন্দ্রনাথ ও ল্যাস্কি ফ্যাসিবাদকে প্রতিবিপ্লবের আধার এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী এক শক্তিরূপেও প্রত্যক্ষ করেন। মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার মুমূর্ষু পুঁজিপতিরা আত্মরক্ষার জন্যে ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নেয়। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে তোলার তাগিদে জার্মানিকে মধ্যযুগে ফিরে যেতে হয়। প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হরগৌরী মিলন ঘটে ফ্যাসিবাদের রঙ্গমঞ্চে। মধ্যযুগীয় চিন্তা ও পূর্বের লুপ্ত সাংস্কৃতিক ধারাকে ফ্যাসিবাদ পুনরুজ্জীবিত করে। মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ও পরিণতি সাম্রাজ্যবাদী পথে যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ে তখন তা ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নেয়।[৫৫] ধনতন্ত্রবাদের শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজোন্নতি শিথিল হয়ে যায়। মানুষ হয়ে পড়ে নিঃস্ব ও নিঃসহায়। দুর্বল হীনবীর্য মানুষের কাছে ফ্যাসিবাদ টোটালিটারিয়ান জাতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে; এবং এমন এক রঙীন স্বপ্ন দেখায় যেটা সাধারণতঃ তাদের আয়ত্তের অতীত। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দাপটে লোকে যতই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে ফ্যাসিবাদী শাসনতন্ত্র ততই ধোঁয়াটে ভাবাবেগ ও উন্মাদনার সাহায্যে নিজ শক্তি বর্ধন করে; Struggle for existence তত্ত্বের সাহায্যে উগ্র জাত্যভিমানকে খুঁচিয়ে তোলা হয়; জাতির আধিপত্য ও অগ্রাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হিটলারী প্রণালীতে নৃতত্ত্বকে রাজনৈতিক ব্যাঞ্জনা দান করা হয়।[৫৬]

পাঁচ : আর্থনীতিক চিন্তা

মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদী দর্শন সম্পৃক্ত আর্থনীতিক চিন্তাও যথেষ্ট অভিনব। দর্শন ও রাজনীতির মতো অর্থনৈতিক বিষয়েও তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর চিন্তা প্রধানতঃ সমসাময়িক ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োজনের পৃষ্ঠপটে উদ্ভূত। অর্থনীতি সম্পর্কে মৌল চিন্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় তাঁর অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে তৃতীয় পথস্বরূপ সুগঠিত গণতন্ত্রের পথ উদ্ভাবন করেছেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি ধনতন্ত্র ও

সমাজতন্ত্রের কোনোটিকেই না নিয়ে তৃতীয় বিকল্পস্বরূপ সমবায় অর্থনীতির পথ রচনা করেছেন। দর্শন ও রাজনীতির মতো অর্থনৈতিক বিষয়েও তাঁর মুক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি বলেন; 'The economy of the new society also requires to be clearly defined. It will be planned with the purpose of promoting the freedom and well-being of the individual. It will, on the one hand, eliminate production for profit and, on the other hand, avoid unnecessary concentration of control. It will not allow individual freedom to be jeopardised by considerations of technical efficiency. As such, the economy will be neither capitalist nor socialist, but co-operative'।[৫৭]

তাঁর আর্থনীতিক চিন্তাভাবনার আনুপূর্বিক একটি রেখাচিত্র আঁকা যাক। দেশের প্রাক-স্বাধীন কালে গঠিত তাঁর আর্থনীতিক চিন্তা স্বভাবতই কার্যকারিতার দিক থেকে দানা বাঁধে। মার্কসবাদী জীবনে মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রভাবাধীনে থাকলেও ঐ-সময়কার চিন্তায় তাঁর স্বাধীন মনের পরিচয় বহু সূত্রে ফুটে ওঠে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তিনি যে ভিন্ন দিকের নিশানা দেন তা আজও অনুসরণীয়।

তাঁর মতে ভারতের শিল্পোন্নয়নকে যথার্থ কার্যকর করে তুলতে হলে কৃষিরই উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া চাই। কৃষিনির্ভর দেশের গরিষ্ঠ জনসংখ্যা অনুন্নত থাকলে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রারম্ভিক পদক্ষেপস্বরূপ তিনি দুটি পন্থার উল্লেখ করেন: 'Firstly, labour must be released from the primitive social function of producing food for a bare existence. For that purpose, it must be freed from the bondage of decayed feudal relations. And secondly, it must be more fruitfully employed through the introduction of modern means of production both in agriculture and industry'।[৫৮]

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনকল্পে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কর্তৃক রচিত *People's Plan* (1944) গ্রন্থে এই কথাটিকে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা এই চিন্তার প্রভাবে অনেকাংশে ফলদায়ক হয়েছিল। প্রাক-স্বাধীন কালে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি-

বিদরা মনে করতেন যে ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটলেই তার অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা হবে। তাই তাঁরা জাতীয় শিল্পকে বিদেশী আমদানির হাত থেকে সংরক্ষণের জন্য উপযোগী বিধিব্যবস্থা চাইতেন। তাতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের কায়েমী স্বার্থে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে বলে মানবেন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি' গঠনের সময়ে দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও ভারী শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। তারই রেশ টেনে পরবর্তীকালে ভারতীয় পুঁজিপতিরা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' রচনা করে।

মানবেন্দ্রনাথ কৃষিকে অগ্রাধিকার দিলেও শিল্পোন্নয়নকে উপেক্ষা করেন নি। তবে তাঁর শিল্পনীতির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন ; প্রশ্নটিকে তিনি নিছক মূলধনের বিনিয়োগ ও মুনাফার দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর মতে জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ও অধিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে শিল্পোন্নয়ন হওয়া উচিত ; শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান তিনটি : 'Firstly, an abundant supply of labour ; secondly, accumulated wealth could be converted into productive capital ; and thirdly, a sufficiently large internal market'।[৫৯]

ভারতে প্রথম দুটির অভাব নেই। তৃতীয়টি আছে সুপ্ত অবস্থায়। দেশবাসীর জীবনমানের উন্নতিসাধন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ; তাই দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহির্বাজারে পণ্য রপ্তানি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্যে দরকার উৎপাদনকে আশু ভোগ্যবস্তুর চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করা এবং সেইসঙ্গে মুনাফার নিয়ন্ত্রণ। *People's plan*-এ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য থাকা চাই। চাহিদার পশ্চাদ্‌ভূমি হল দেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জনসংখ্যা। গরিষ্ঠ জনসংখ্যা পশ্চাৎপদ থাকলে শিল্পোন্নয়ন হবে নিষ্ফল। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় কৃষিকে অবহেলা করে শিল্পকে অনর্থক প্রাধান্য দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট ঘটেছে।

অন্যদেশের অনুকরণে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথ ভারতের প্রকৃত সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে স্বতন্ত্র নীতি-নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় গোষ্ঠীই মনে করে যে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতি নির্মূল করার একমাত্র উপায় বুঝি দ্রুত শিল্পোন্নয়ন।

প্রভেদ এই যে প্রথম গোষ্ঠী চায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও মোটা মুনাফার অঙ্ক; পক্ষান্তরে রাষ্ট্র বা সমাজের মালিকানায় শিল্পোন্নয়ন হল দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কাম্য।

মানবেন্দ্রনাথ দেশের দ্রুত বর্ধমান জনসমস্যাকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। প্রস্তাবিত ভারী শিল্পের বিস্তারে কৃষি থেকে বড় জোর কোটি খানেক উদ্বৃত্ত মানুষের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। কিন্তু কৃষিকে অবহেলা করার ফলে খাদ্যের অনটন ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে শিল্পের উৎপন্ন বস্তু লোকের ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদার অভাবে জমে থাকবে। মুনাফার হ্রাস ঘটলে পুঁজিপতিরা উৎপাদন কমাবে। সেই অবস্থাই ভারতে এখন দেখা দিয়েছে। দেশীয় শিল্পকে বাঁচানোর জন্যে সরকার এগিয়ে আসে; সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বাড়ে। সীমিত মুনাফা, মালের কাটতি না হওয়া ইত্যাদি অছিলায় ভারতীয় মূলধন সংকুচিত হয়েছে; তাই প্রস্তাব উঠেছে আরও বিদেশী মূলধন আমদানি করার। বলা বাহুল্য বিদেশী মূলধন মানে মার্কিন মূলধন ও সেইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব-বিস্তারের সম্ভাবনা।[৬০]

অপরদিকে সমাজতন্ত্রীরা চাইছেন শিল্পের জাতীয়করণ। শিল্পে অনুন্নত দেশে এই নীতি বিপজ্জনক। মার্কস ধনতন্ত্রবাদের সংকট সীমানায় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে বলেছিলেন; তার প্রধান পরিপূরক হল উন্নত শিল্প ও পরিণত শ্রমিক শ্রেণী। অনুন্নত দেশের শ্রমিক শ্রেণী জীবিকায় অর্ধ-কৃষক। কাজেই অধুনা সমাজতন্ত্রীদের মনোভাবের সঙ্গে মার্কসের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মিল নেই।[৬১]

ভারী শিল্পের আশু প্রবর্তনের মতো প্রচলিত আর একটি ধারণা এই যে কৃষিকার্যে যান্ত্রিক আধুনিকীকরণ কৃষিসমস্যার সমাধান করবে। এবিষয়েও মানবেন্দ্রনাথ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে এদেশে কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। তাতে বেকার সমস্যাকে অনর্থক বাড়িয়ে তোলা হবে। যেদেশে জনসংখ্যা অল্প অথচ কর্ষণীয় জমি বিশাল সেখানেই যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ভারতে জমির অনুপাতে চাষীর সংখ্যা অধিক। যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটলে বর্তমান কৃষিজীবী জনসংখ্যার শতকরা দশ জনকে দিয়ে সমগ্র কাজ করানো যাবে। ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে তখন সর্বোন্নত শিল্পেও নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া কৃষিতে বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহারসূত্রে বিদেশী সাহায্য বা মূলধনের প্রয়োজন হবে অনিবার্য।[৬২]

মানবেন্দ্রনাথের মতে অত্যধিক জনসংখ্যা ও খণ্ড-খণ্ড কৃষিক্ষেত্র এদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে টুকরো-টুকরো জমি-

গুলিকে একত্র করা, সার হিসাবে গোময় ব্যবহার ও পুকুর, ইঁদারা ইত্যাদির সাহায্যে সেচব্যবস্থার কার্যকারিতায় তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে যন্ত্রের চেয়েও বেশি প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস ও উন্নত পদ্ধতি। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের সুবিধার্থে রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হওয়া দরকার। স্থানীয় চাহিদা ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে ছোট ছোট শিল্প, পশুপালনের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিস্তার হওয়া উচিত।[৬৩]

মোটের উপর কৃষিনির্ভর ভারতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনমান উন্নয়নের প্রধান উপায় কৃষির যথোচিত উন্নতি সাধন। তাতে মানুষের ভাতকাপড়ের সমস্যা যেমন একদিকে মিটবে, অপরদিকে তেমনি শিল্পে উৎপন্ন মালের সম্ভাব্য বাজারও প্রসারিত হবে।

নবমানবতাবাদী অর্থনীতিতে পরিকল্পিত উদ্যমকে বর্জন করা হয় নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারি আধিপত্য, কেন্দ্রাভিগ আমলাতন্ত্র ও শোষণে আবদ্ধ থাকে। অথচ তারই বিনিময়ে মানুষকে দিতে হয় এক মস্ত মূল্য—তা হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। সেজন্যে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন: 'State ownership and planned economy do not by themselves end exploitation of labour ; nor do they necessarily lead to an equal distribution of wealth...planned economy under political dictatorship disregards individual freedom on the pleas of efficiency, collective effort and social progress. Consequently a higher form of democracy in the socialist society, as it is conceived at present becomes an impossibility. Dictatorship defeats its professed end'।[৬৪]

নবমানবতাবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের লক্ষ্য মানুষের ব্যবহার, মুনাফা নয়। তেমনি অর্থনৈতিক সাম্যের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণও তার অভিপ্রায় নয়। এই ব্যবস্থায় সমবায় সংগঠনের ব্যাপক বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যৌথ কৃষিকর্ম, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি কাজ চলবে। বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকবে এবং সেগুলি নীচে থেকে উপরে ক্রমান্বয়ে পিরামিড আকারে বিন্যস্ত হবে। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার পরিচালক হবে এই সমিতিগুলি: 'It will consist of a network of consumers' and producers'

co-operatives and the economic activities of the society shall be conducted and co-ordinated by the people through these institutions. The co-operative economy shall take full advantage of modern science and technology and effect equitable distribution of social surplus through universal social utility services'।[৬৫]

অর্থনৈতিক মুক্তি না ঘটলে মানুষের গণতান্ত্রিক আচরণতো দূরের কথা তার মনুষ্যত্বের উন্মেষও যে অসম্ভব তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নিষ্কর্ষে রচিত সমবায়ী পদ্ধতিতে মানুষের বৈষয়িক উন্নয়ন সাধিত হবে। Managerial Socialism-এর মতো Managerial Democracy-ও তাঁর আদর্শের পরিপন্থী। তিনি চেয়েছেন গাছের ডগার পরিবর্তে গোড়ায় বারি সিঞ্চন করতে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসনের মতো অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকেও তলা থেকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সমবায়ী অর্থনীতির যে-চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার রূপায়ণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেশব্যাপী স্থানিক গণসমিতিগুলির উপর নির্ভর করবে। স্থানিক সমিতির অবর্তমানে সমবায় সমিতিই তার কর্মভার বহন করবে।

ডিকলোনিজেশন থিওরি

মানবেন্দ্রনাথের বহু কিছু মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিপ্রসূত চিন্তার মধ্যে তাঁর যুগান্তকারী 'ডিকলোনিজেশন থিওরি' তাঁকে বিশ্বের রাজনীতির ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ১৯২০ সালে কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কিত মতভেদ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অবধি এই তত্ত্বের সুর বিস্তারিত।

লেনিনের সঙ্গে উক্ত বিতর্কে মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী কোনও বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে না। লেনিন ও মানবেন্দ্রনাথ উভয়ের ভিন্ন দুটি থিসিস সেই কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল। তখন থেকে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায় এই তত্ত্বটি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে।

'ডিকলোনিজেশন' কথাটি প্রথমে নিকোলাই আইভানোভিচ বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮) ব্যবহার করেছিলেন এবং বহু বিতর্কিত এই বিষয়ে একটি কমিশন

দায়িত্ব চীন থেকে ফেরার পর মানবেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয়। পরে উৎসাহ থিতিয়ে যাওয়ায় সে-প্রস্তাব কমিণ্টার্নে উত্থাপিত ও গৃহীত হয় নি। কিন্তু তারই ভিত্তিতে মানবেন্দ্রনাথকে '**lackey of imperialism**' আখ্যা দিয়ে কমিণ্টার্ন থেকে অপসারিত করা হয়।

তত্ত্বটি আলোচনার পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় তার সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। লেনিন তাঁর ***Imperialism : the highest stage of capitalism*** গ্রন্থে বলেছেন যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর শিল্পে উন্নত দেশগুলি উদ্বৃত্ত মূলধন অধিক মুনাফার জন্যে উপনিবেশে বিনিয়োগ করে, যেখানে মূলধন অপ্রতুল, জমির দাম সস্তা, শ্রমমূল্য নিম্ন এবং কাঁচামাল সুলভ।[৬৬] সেদিক থেকে দেখলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অর্থনৈতিক মুনাফার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে শাসনাধিকার বজায় রাখে— রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্যে নয়।

ডিকলোনিজেশন তত্ত্বের সারাংশ এই যে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের উদ্বৃত্ত মূলধনের রপ্তানি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে ; যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও দায়দেনার ফলে ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ; পণ্যের বহির্বাজার ক্রমেই বেহাত হতে শুরু করে ; আভ্যন্তরীণ শিল্পবাণিজ্যকে গুছিয়ে তোলাই তখন এক মস্ত দায় হয়ে দাঁড়ায় ; যুদ্ধের দরুন দেনাও তখন বিপুল , বাণিজ্যিক এই শূন্যতা অর্থাৎ রপ্তানিযোগ্য মূলধনের অভাব মেটাবার জন্যে ব্রিটেন ভারতীয় পুঁজিপতিদের নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা দিতে শুরু করে— যাতে ভারতীয়দের মূলধনে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয় রোধ করা যায়। সেজন্যে ক্রমে ভারতে অবাধ বাণিজ্যের পরিবর্তে শিল্পের সংরক্ষণ, আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের স্থান পূরণ করে ভারতীয় পুঁজিপতিরা। মানবেন্দ্রনাথের ***Our Differences*** গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ভারতে ইংরেজের তদানীন্তন রাজনৈতিক নীতি ও মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষণীয়। মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে রপ্তানিযোগ্য মূলধনের অভাবে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে শাসন-ক্ষমতা দখল করবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী। তাই তিনি মনে করেছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার কোনও সম্ভাবনা নেই, একদিন যেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রবল ছিল। তিনি লিখেছেন : '**No**

compromise (however far-reaching) between the Indian bourgeoisie and the British Imperialists will give real freedom to the Indian people'।[৬৭]

ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয়দের সঙ্গে একটা রফা করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার এবং ১৯২২ সালের পর থেকে ফিসক্যাল, কারেন্সি, ইণ্ডাষ্ট্রি, এগ্রিকালচার প্রভৃতি বিষয়ক কমিশন নিয়োগ, সাইমন কমিশন প্রেরণ (১৯২৭), রাউণ্ড টেবল বৈঠকের ব্যবস্থা ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করে। অন্যদিকে তেমনি ভারতে ১৯২০-২১ সালের পর থেকে বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম বানচাল হয়ে যাওয়া, বয়কট নীতির ক্রমিক বর্জন, স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবি প্রভৃতি বিষয় তখনকার ক্রমবর্ধমান ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতালিপ্সা ও জনবিরোধী মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিবাদের মধ্যে এই বোঝাপড়ার সময়ে কোনও সংঘাত যে ছিল না তা নয়—তবে সেটা ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে অধিক সুযোগসুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যই প্রণোদিত ছিল। ক্রমিক পর্যায়ে এভাবে সুযোগসুবিধা পাওয়ায় ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বৈপ্লবিক কর্মপন্থার বিরোধিতা করে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনের আদর্শে মানবেন্দ্রনাথ সে-সময়ে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র উদঘাটিত করে দেন এবং চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসকে গণআন্দোলনের উপযোগী করে তোলার প্রয়াসী হন। মানবেন্দ্রনাথের এ-তত্ত্ব ভারতীয় অবস্থার পটভূমিকায় রচিত হলেও অনুরূপ সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানবেন্দ্রনাথ এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন যে ঐ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়—ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ ; ফ্যাসিবাদ বনাম গণতন্ত্র তথা মানব সভ্যতার আত্মরক্ষার যুদ্ধ। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি জয়ী হলে মানব সভ্যতার হবে চরম বিনাশ ; অপরদিকে ফ্যাসিবাদের পরাজয় শুধু যে তার সমাধি রচনা করবে তাই নয়—উপরন্তু দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও সমাধি রচিত হবে। তার অর্থ নৈতিক শক্তি হবে খর্ব এবং রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত মূলধন থাকবে না। ফলে ব্রিটেনকে তার উপনিবেশগুলি ছেড়ে চলে যেতে হবে। ফ্যাসিবিরোধী সেই মহাযুদ্ধে তিনি মিত্রশক্তিকে সমর্থনের জন্যে কংগ্রেস ও দেশবাসীকে আহ্বান জানান। মানবেন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী গণিতের মত নির্ভুল প্রমাণিত হয়। যুদ্ধনীতিসূত্রেই তাঁকে

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তাঁকে উপহাস করেছিল তখনকার বামপন্থী দলগুলি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রদত্ত মানবেন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা তাই স্মরণীয় : 'The British are quitting India neither under the pressure of the Congress resolution nor for any particular goodness of heart. They simply do no longer possess the power, financial as well as military, to hold this country. Since they can no longer rule, they have no other alternative than to quit. The already shaken foundation of British Imperialism has been blasted by the war'।[৬৮]

ছয় : শিক্ষাচিন্তা

সাধারণ অর্থে মানবেন্দ্রনাথ শিক্ষাবিদ ছিলেন না এবং কোনও শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন নি। সেই দিক থেকে কোনও শিক্ষাতত্ত্বও উপস্থাপিত করেন নি। কিন্তু তাঁর চিন্তায় শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্লেটোর আদর্শে শিক্ষাকেই তিনি গণতন্ত্রের বনিয়াদ বলে মনে করতেন। তিনি চাইতেন শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তুলতে। কারণ শিক্ষকদের উপরেই আজকের অপরিণত তরুণ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু শিক্ষকেরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত ও যত্নবান নন। আত্মশক্তি ও সামর্থ্যেও তাঁদের বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। গতানুগতিক ধারায় তাঁরা ছোটদের কলের পুতুলে পরিণত করেন ; ফলে তাদের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনসত্তা বিকশিত হয় না। মানুষ গড়ার এই মহান কারিগর সম্প্রদায়কে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ও সচেষ্ট করে তোলাই ছিল মানবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য। কার্যত সারা জীবনে তিনি তাই করেও এসেছেন। কমিণ্টার্নের অধীনে তাসখন্দে প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা, দেরাদুনে বার্ষিক রাজনৈতিক শিবিরের আয়োজন, রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তার পরিচায়ক। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় জীবন অতিবাহিত করলেও শিক্ষকতার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ও প্রবণতা ছিল।

ব্যক্তিত্বের যথোচিত উন্মেষসাধনই তাঁর মানবতন্ত্রী শিক্ষার আদর্শ— নিছক অক্ষরাশ্রয়ী লেখাপড়া নয়। স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে মানুষের সৃজন-সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশ ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা। তাঁর ভাষায় : 'Education for democracy does not consist in teaching just reading and writing, but in making the people conscious of their humanness, to make them conscious of their right to exist as human beings, in decency and dignity. Education means to help them to think, to apply their reason'।[৬৯]

মানবতন্ত্রী জীবনাচারের বনিয়াদ হল শিক্ষা। বিজ্ঞানের আলোয় একথা প্রমাণিত যে মানুষ মাত্রেই যুক্তিপ্রবণ ও মননশীল চিন্তাশক্তির অধিকারী। দীর্ঘ অনভ্যাস এবং সামাজিক ধারায় ও প্রথায় মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারও বিচারক্ষমতা আছে; জ্ঞানবিদ্যার একচেটিয়া অধিকারীদের সাহায্য ছাড়াও সাধারণ মানুষ ভালমন্দ, উচিতানুচিতের তারতম্য নিরূপণে সক্ষম। সমান সুযোগ পেলে রুগ্ন ও পঙ্গু মানুষ ছাড়া সবাই একই সম্ভাবনার অধিকারী। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণগত তারতম্য যাই থাকুক না কেন সকলেরই মধ্যে আছে মৌল মানবিক সত্তা যার সাহায্যে সকলেই আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের গৌরব অর্জন করতে পারে। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তার সুযোগ যে অবর্তমান সে-কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন : 'Education as a precondition of democracy is not just primary education; it is not even the conventional higher or scientific education. It is the process of raising the intellectual and cultural level of a people. So long as it cannot be maintained on the strength of scientific knowledge that every man, by virtue of being a human being, is capable of rising to the highest heights of human attainments, a humanist philosophy cannot be propounded, a humanist social doctrine cannot be advanced, a humanist political practice will not be possible'।[৭০]

ছাত্ররা স্কুলকলেজে যায় প্রধানতঃ অর্থকরী শিক্ষার তাগিদে। তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গেই নাগরিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে

তাদের অবহিত করা যায় ; তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও আত্ম-সম্ভাবনার চেতনা জাগিয়ে তোলার সেটাই প্রকৃষ্ট সময়।

পূর্বতন মানবতাবাদী শিক্ষায় কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। পক্ষান্তরে মনুষ্য-প্রকৃতি ও বিশ্বতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে রচিত নবমানবতা দর্শন সঠিক বিজ্ঞানচর্চার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে ; বলা বাহুল্য প্রচলিত অর্থে নয়। মানবেন্দ্রনাথের মতে : 'Scientific knowledge as learned in schools and colleges is not enough to make a Humanist. You may learn something about physics and yet not be a scientist. There may be even recognised scientists who have not necessarily imbibed the scientific spirit. Knowledge in our days has become departmentalised. But true scientific knowledge presupposes an understanding and co-ordination of all the departments of science'।[৭১]

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অক্ষরজ্ঞান্ ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় উন্নত দেশেও গণতন্ত্র নিরাপদ হয় নি। তার কারণ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতা। কোনও সরকারই চায় না যে জনসাধারণ নিজ সম্ভাবনায় ও চেতনায় স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবোধে বিকশিত হয়ে উঠুক। সরকারি রীতিনীতি ও ক্রিয়া-কলাপের নির্বিচার ঐকতান সৃষ্টিই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ; ফৌজি নিয়মনিগড়ে ছোটবেলা থেকেই মানুষের মন গঠিত হয়। তাই শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপকে মানবেন্দ্রনাথ বিপজ্জনক বলে মনে করেছেন। কারণ : 'Democracy will not be possible until people are taught to remember precisely their critical faculties which governments naturally fear, and apply them for the administration of their community. And this is not taught under government-sponsored systems of national education'।[৭২]

মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন ইট কাঠ বালির মতো উপাদানের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় সামাজিক ইমারত নির্মাণে সহায়তা করে। কিন্তু গৃহনির্মাণের প্রধান উপাদান স্বরূপ সামাজিক সিমেন্ট যুগিয়ে থাকেন শিক্ষকেরা। অথচ শিক্ষকেরাই সমাজে সবচেয়ে বেশি অনাদৃত ; তাঁরা না পান যশের ভাগ, না পান ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক। তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষকেরাই সমাজের প্রকৃত

স্থপতি। সমাজ একদিন তাদের যথোচিত মানমর্যাদা দিতে বাধ্য হবে; শিক্ষক সম্প্রদায়কে নিজেদের সামাজিক ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়েই তা অর্জন করতে হবে। সে-ভূমিকা কলের পুতুলস্বরূপ আগামী দিনের নাগরিক সৃষ্টি করা নয়; মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক চেতনার উন্মেষসাধন ও তার ভিত্তিতে জীবনাচারের নিশানা জানানোই শিক্ষকদের সামাজিক ভূমিকার আদর্শ।[৭৩]

বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বাধ্যতামূলক হওয়ার সঙ্গেই সরকারি আধিপত্য দেখা দেয়। বর্ণপরিচয়ের আগেই ছোটরা শেখে বিশেষ কোনও ছবি বা পতাকাকে সেলাম জানাতে; নির্ধারিত পাঠ্য-বইয়ের বাইরের গ্রন্থজগৎ অগম্য। এ-ধরণের শিক্ষার ফল হয়ে দাঁড়ায় চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা, অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নির্বিচার আনুগত্য। কাজেই সার্বিক (totalitarian) রাষ্ট্রেতো বটেই, অনুন্নত দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাতেও মানুষের রুদ্ধ চিন্তাশক্তি ও মননশীলতা সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা অথবা অজ্ঞাতসারে যেখানে এই ধরণের অবস্থা বিরাজ করে সেখানে মানুষের সহজাত যাবতীয় সত্তার উন্মেষ ও গণতন্ত্রী চেতনা সঞ্চারকল্পে ব্যক্তিবিশেষের স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। তাই তিনি সরকারি শিক্ষার সঙ্গে বেসরকারি ব্যবস্থার সংস্থান থাকা আবশ্যক বলে মনে করতেন। তাতে হয়তো অর্থের অনটন দেখা দেবে। সেজন্যে চাই সহৃদয় বিত্তবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। এ বিষয়ে অনেক সময়ে তাঁদের খেয়ালখুশি ও উদ্ভট মনোভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বেসরকারি ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সেইসব লোকের উপর যাঁরা উপলব্ধি করেন যে সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান ব্যক্তিমানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠায় নির্ভরশীল, যার ভিত্তি হল নতুন আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা।[৭৪] মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সুগঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানিক গণ-সমিতিই মানুষের স্বাধীন শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

সাত : মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথ

মূলত মার্কসের ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ মানবেন্দ্রনাথ মার্কস-উত্তর বিশ্বে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব বিকাশের আলোয় মার্কসীয় দর্শনের বহুবিধ ত্রুটি ও অনুপযোগিতা উপলব্ধি করেন। বিরোধিতার পরিবর্তে তিনি মার্কসবাদকে অতিক্রম করে 'নবমানবতাবাদ' দর্শনে উপনীত হন। মার্কসের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হয় নি। সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মার্কসকে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারূপে অভিহিত করেছেন।[৭৫] এবং মার্কসকে মূলত মানবতার পূজারী ও মুক্তির অনুরাগী হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে মার্কসীয় চিন্তাতেই নবমানবতাবাদের বহু উপকরণ ইতস্তত নিহিত রয়েছে। মার্কসবাদকে মানবেন্দ্রনাথ নবরূপ দিয়েছেন এই বলে: **'Freed from the falacy of economic determinism, the humanist, libertarian, moralist spirit of Marxism will go into the making of the new faith of our time'**।[৭৬]

মার্কসবাদের অধিকাংশ তত্ত্বকে তিনি হয় পরিবর্তন নয়তো বর্জন করেছেন। মার্কসের সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল কী কী বিষয়ে তার সামান্য আলোচনা করা যাক:

ইতিহাসতত্ত্ব

মানবেন্দ্রনাথের মতে মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব নির্ভুল নয়। কারণ তাতে সমাজ-বিকাশের প্রক্রিয়ায় মানবমনের ভূমিকাকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ইতিহাসকে শুধুমাত্র বস্তুবাদী বিষয়মুখিতার দ্বারা বিশ্লেষণ করা অর্থহীন। সমাজবিকাশের পিছনে মানুষের মন ও বুদ্ধির স্থান এবং তার পুঞ্জীভূত ক্রিয়াক্ষমতা নগণ্য নয়। মার্কসের ইতিহাসতত্ত্বে চেতনাকে জড়ের বিকার ও তার পশ্চাদগামী মনে করা হয়। মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদকে নতুনরূপে দেখেছেন—তাতে বস্তু ও ভাব উভয়েরই স্থান সমান। প্রাকৃতিক ও জৈব বিবর্তনধারায় ভাবের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর দ্বিমত নেই। তবে তাঁর মতে নিজরূপ পরিগ্রহ করে ভাব একটা নিজস্ব বিবর্তনপথে অগ্রসর হয়। বিষয়টি তিনি তাঁর *Reason Romanticism and Revolution* নামক যুগান্তকারী গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বস্তু ও ভাব সম্পর্কে লিখেছেন: **'Philosophically, the materialist conception**

of history must recognise the creative role of intelligence. Materialism cannot deny the objective reality of ideas...they are biologically determined ; priority belongs to the physical being, to matter, if the old fashioned term may still be used. But once the biologically determined process of ideation is complete, ideas are formed, they continue to have an autonomous existence, an evolutionary process of their own, which runs parallel to the physical process of social evolution. The two parallel processes, ideal and physical, compose history'।[৭৭]

মানবীয় বিবর্তনের নির্দিষ্ট কোনও ক্ষেত্রে ভাবের গতি ও ঐতিহাসিক ঘটনার কারণযুক্ত (causal) সম্পর্ক দেখা যায় না। ইতিহাসকে মার্কস যে অর্থ-নৈতিক নির্দেশ্যবাদী প্রত্যয়ে (Economic Determinsm) বিশ্লেষণ করেন মানবেন্দ্রনাথ তা বর্জন করেছেন। তাঁর মতে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য খোঁজার আদিম প্রবৃত্তির পিছনে অর্থনীতি অপেক্ষা জীববিত্তাই প্রযোজ্য। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় মানুষ যে-সংগ্রাম সর্বপ্রথম শুরু করেছিল সেটা ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে ; তখন তার আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ ছিল জৈবতাড়না প্রসূত। বস্তুবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় আদিম মানবমনের প্রতি বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি ; পরেও মানুষ অনেক কিছুতে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে যা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে বিশ্লেষিত হয় নি। তাই অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদকে বস্তুবাদী দর্শনে অঙ্গীভূত করা যায় না। তাঁর কথায় : 'Economic determinism in social evolution and cultural history does not necessarily follow from Materialism ...it is an error to conceive Historical Determinism as purely economic. History is determined, but there are more than one determining factor...Determinism is inherent in Materialism. But Economic Determinism, being a dualist concept, cannot be necessarily related to Materialism'।[৭৮]

বস্তুবাদী হয়েও ভিন্ন নির্দেশ্যবাদ গ্রহণ করা যায়। যেমন রাষ্ট্রশক্তির নির্দেশ্য-বাদ, জলবায়ুর নির্দেশ্যবাদ, শারীরতাত্ত্বিক নির্দেশ্যবাদ—যা নিঃসন্দেহে বস্তু-ভিত্তিক। কাজেই বস্তুবাদী দর্শনে অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ আদৌ অপরিহার্য নয়।

দর্শন

মার্কসের দ্বান্দ্বিক (Dialectic) বস্তুবাদী বিচারপদ্ধতিকে মানবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ভাববাদী এবং তা তর্কশাস্ত্রের যুক্তিজাল-মাত্র। বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অপেক্ষা যান্ত্রিক (Mechanistic) বিশ্লেষণ পদ্ধতি অধিক উপযোগী। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস ও দর্শনের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ ও দ্বান্দ্বিক বিচার পদ্ধতি দ্বারা মার্কস ঈশ্বরকে হটিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন বটে, কিন্তু সমগ্র বিচারে মানুষ উৎপাদনকারীর পরিবর্তে উৎপাদনকলে পরিণত হয়েছে। প্রগতির প্রবক্তা মার্কস তাঁর দর্শনে উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) সঞ্চারিত করেছেন।[৭৯]

বস্তু সম্বন্ধে মার্কসের ধারণা তাঁর পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে অচল হয়ে গিয়েছে। জড় ও চেতনার দ্বৈত অস্তিত্ব প্রত্যয় বর্তমানে অপসারিত হয়েছে। শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্বের মাঝে সেতুবন্ধ রচিত হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ জড় ও ভাবের অদ্বয় প্রত্যয়ে নতুন দৃষ্টিতে বস্তুবাদকে দেখেছেন; তাকে তিনি 'Physical Realism' বলে উল্লেখ করেছেন।[৮০]

মার্কসীয় দর্শনে নীতিতত্ত্ব উপেক্ষিত হয়েছে বলে মানবেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মার্কসের দৃষ্টিতে নীতি আপেক্ষিক; সংগ্রামকালে মানুষ তার নৈতিক আচরণকে খাপ খাইয়ে নেয়; স্থায়ী ও চিরন্তন বলে কিছু নেই। তদনুসারে মনুষ্যপ্রকৃতিকে ছাঁচে ঢালা যায়। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদীদের মতো বিশ্বাস করতেন যে মনুষ্যচরিত্রে বহু কিছু গুণ আছে যা চিরন্তন। মানবমনের স্থায়ী প্রবণতাগুলির স্বীকৃতি ব্যতিরেকে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও রীতিনীতি গড়া যায় না। তাঁর মতে অধিকার ও দায়িত্ববোধের পশ্চাদ্ভূমি হল দৃঢ় ও স্থায়ী মূল্যবোধ। উৎপাদক শক্তি-নিচয়ের অধীনে (মার্কসীয় মতানুসারে) মানুষকে শৃঙ্খলিত রাখলে তার স্বাধিকার ও সৃজনসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়; নৈতিক চেতনা অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় উদ্ভূত হয় না।[৮১] মানবেন্দ্রনাথের নীতিতত্ত্বে মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। মার্কসীয় দর্শনে মানুষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। মার্কস যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিতে নীতিতত্ত্বকে বিচার করেছেন মানবেন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে মানুষের কতকগুলি স্থায়ী নৈতিক মূল্যবত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাষ্ট্রতত্ত্ব

মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রেণী-সংগ্রামেরও মানবেন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে শ্রেণী-সংগ্রাম মার্কসবাদের যুক্তিবিমুখ এক অন্তর্বিরোধ। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় প্রগতি ও সভ্যতার পথ রচিত হয়; শ্রেণী-সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীদ্বয়ের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তারপর গড়ে উঠবে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা। এই বিশ্লেষণ যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সামাজিক গতি নিশ্চল হয়ে পড়বে। কারণ তখন অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজে সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি থাকবে না।[৮২]

মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মাঝখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ও সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধিই পেয়েছে—মার্কসের মতানুসারে তারা লুপ্ত হয়ে যায় নি; ধনিকদের শোষণে নিষ্পিষ্ট হলেও তারা সর্বহারাদের মধ্যে অঙ্গীভূত হয় নি; বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য বৃদ্ধিই করেছে। মার্কস মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ তারাই করেছে সবচেয়ে বেশি, তারাই যুগিয়ে থাকে মননশীল ও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব।[৮৩] মানবেন্দ্র-নাথের দৃষ্টিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী আছে; বিশেষ কোনও শ্রেণীর একনায়কত্ব কাম্য নয়। শ্রেণী-সংগ্রাম ও সামাজিক সংঘাত ছাড়াও সমাজের ভিতরে সমন্বয় ও অচ্ছেদ্য বন্ধনও আছে; তাই দেখা যায় সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীভিত্তিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি।

বিপ্লবতত্ত্ব সম্পর্কেও মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। মার্কস দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য হল যে বিপ্লবের পশ্চাতে মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সৃজনশীল এক রোমাণ্টিক আবেগ থাকে। সকলের সমষ্টিগত আবেগ বিপ্লবের পথে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পিছনে থাকে সামাজিক নবরূপায়ণের সৃজনধর্মী আদর্শ। মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্বের এটা একটা স্ববিরোধ যে সামাজিক বিবর্তনকে ছককাটা পথে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও সেই বিবর্তন প্রসূত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বস্তুবাদী নির্দেশ্যবাদের সঙ্গে পরম-কারণবাদী বিপ্লবের সঙ্গতি নেই। মার্কসের বিপ্লবতত্ত্ব শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থ নৈতিক

তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। মানবেন্দ্রনাথ বিপ্লবকে মানুষের সর্ববিধ বন্ধনমুক্তির দিক থেকে দেখেছেন।[৮৪]

প্রচলিত বৈপ্লবিক কর্মপন্থা অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কেও মানবেন্দ্রনাথ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বর্তমানে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৮৫] কমিউনিস্টরা পশ্চাৎপদ নিপীড়িত বিশেষ কোনও শ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রাম করে, যাদের অর্থনৈতিক দুর্গতিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু সকল শ্রেণীর মানুষের যুক্তিসম্মত শুভচেতনার ভিত্তিতে বিপ্লবের পথ রচিত হয় না। মানবেন্দ্রনাথের মতে নতুন জীবনদর্শনের আলোকে বিপ্লবের নিশানা দেখানো দরকার, যেখানে সর্বহারা শ্রেণীই শুধু নয়, সকল শ্রেণীর মানুষ একে অপরকে পদানত না করে সর্ববিধ প্রতিবন্ধকতা (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক) থেকে মুক্ত হয়ে স্বীয় সম্ভাবনার বিকাশসাধনে সমান সুযোগ পাবে। বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি রচিত হবে সংশ্লিষ্ট দেশ ও তার অবস্থা অনুযায়ী।

মানুষের সমস্যাকে মানবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব কিংবা বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের সংঘাতরূপে দেখেন নি। তাঁর কাছে গণতন্ত্র বনাম ফৌজি একনায়কতন্ত্র, সর্বগ্রাসী যূথবাদী জাতি বা শ্রেণী বনাম মুক্তিকামী ব্যক্তি-মানুষের বিরোধই বৃহদাকারে প্রতিভাত হয়েছে।

রাষ্ট্রের বিলুপ্তিও মার্কসবাদী রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম এক প্রধান অঙ্গ। মার্কস বলেছেন সর্বহারা একনায়কত্বে সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না; রাষ্ট্র নিপীড়নকারী একটি যন্ত্রবিশেষ। কী ভাবে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে এবং তার পরবর্তীকালের অবস্থাই বা কী হবে সে-সম্পর্কে মার্কস সবিস্তারে কিছু বলেন নি। মানবেন্দ্রনাথ মার্কসের এই চিন্তাকে অলীক কল্পনা বলে মনে করেন। বিরোধী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্যে ডিক্টেটরি শাসনের প্রশ্ন থাকবেই। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তার অবলুপ্তি অসম্ভব ও অকার্যকর।[৮৬]

মার্কস উদারতন্ত্রীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে গ্রহণ করেন নি। এটি মানবেন্দ্রনাথের নব্যদর্শনের একটি অঙ্গ।

অর্থনীতি

মার্কসের দৃষ্টিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের (Surplus Value) উৎপাদন পুঁজিবাদের একটি প্রধান লক্ষণ। বস্তুত উৎপাদক অর্থাৎ শ্রমজীবীরা উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে শুধু যে

পুজিবাদী সমাজেই বঞ্চিত হয় তা নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এই উদ্বৃত্ত মূল্য একটি সামাজিক উদ্বৃত্ত— তারই উপর নির্ভর করে সমাজের অগ্রগতি। উদ্বৃত্ত ব্যতিরেকে রাশিয়ার দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হত না। উদ্বৃত্ত মূল্যই হল মূলধনের উৎস। মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি না পেলে উৎপাদনের সমৃদ্ধি ঘটে না। মার্কস মনে করতেন শ্রমিকদের বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত মূল্য সঞ্চিত হয়; অতএব সমাজতন্ত্রে ঐ উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকেরা পেলে তার যথোচিত নিষ্পত্তি হবে। তাঁর ভাষায় 'expropriation of expropriators' হওয়া চাই। কার্যত রাশিয়ায় তা ঘটে নি। সেজন্যে মনে হতে পারে যে রাশিয়াতে 'Revolution Betrayed' হয়েছে; এখন সেখানে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র চলেছে। মানবেন্দ্রনাথ এ-কথার বিরোধিতা করে বলেছেন যে উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা লেনিন ও ষ্টালিনের দূরদর্শিতায় সংশোধিত হয়েছে।[৮৭]

আট : গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ

মার্কসীয় পথ পরিমার্জনা করে যেহেতু মানবেন্দ্রনাথ বিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, পার্টি-হীন রাজনীতি, সত্য, নৈতিকতা ও মানবতার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন সে-হেতু তাঁকে অনেকেই গান্ধীবাদী চিন্তার অনুসারী বলে মনে করেন। কিন্তু সেটা ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। কারণ গান্ধীর ও মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শ তথা উভয়ের মানবতন্ত্রী দর্শনের মধ্যে রয়েছে এক দুস্তর ব্যবধান। উভয়ের দার্শনিক চিন্তার পশ্চাৎপট সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী।

গান্ধীদর্শন ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও জীবন সম্পর্কে বিশ্বাতীত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীর সত্য ও নীতির উৎস মনুষ্যচরিতে নিহিত নয়; অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবিক শক্তিই হল তার উৎস। মানুষের স্থান সেখানে গৌণ। দিব্য ইচ্ছা ও আদেশ থেকে গান্ধীবাদ প্রেরণা সঞ্চার করেছে। স্বভাবতই গান্ধীর সমাজদর্শনও সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির নিগড়ে আবদ্ধ। গান্ধীর অনুগামী বিনোবা ভাবে যে-দলবিহীন রাজনীতির কথা বলেছেন তাও সেই শক্তিতেই অনুপ্রাণিত।

গান্ধী রাজনীতিকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সত্য অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক— সেখানে একমাত্র 'ঈশ্বরই সত্য'। তাই যুক্তির পরিবর্তে তিনি স্বজ্ঞার (Intuition) সাহায্যে সত্যের সন্ধান করেছেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি যে 'সত্যাগ্রহ' পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন স্বভাবতই যুক্তি সেখানে অনুপস্থিত। গান্ধীর যুক্তিনিরপেক্ষ নীতিনির্ভর রাজনীতিকে যুক্তিবাদী (Rational) বলা যায় না।

গান্ধীর দর্শন মূলত জীবনবিমুখ। জীবনের উপভোগ সেখানে উপেক্ষিত। কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর জীবননির্বাহ, পার্থিব সুখ ও ভোগে নিস্পৃহা এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিম্নমানের সরল জীবনই ছিল তাঁর আদর্শ— এমনকি মননশীল (intellectual) জীবনযাপনেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী দর্শন সর্বার্থে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-দর্শনে মানুষকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়— তার সত্য ও নীতিতত্ত্ব মানুষের সহজাত যুক্তিপ্রবণ মনেই নিহিত— তাতে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক শক্তির কোনও স্থান নেই। এবিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যুক্তিপ্রবণতাকে সর্বোপরি স্থান না দেওয়ায় গান্ধীবাদে মানুষ হয়েছে খর্ব এবং মানুষকেই একমাত্র সত্যরূপে ঘোষণা না করায় মানুষের আত্মপ্রত্যয়ও বিনষ্ট হয়েছে। দুটি বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথের মতবাদ রচিত— সেজন্যে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও তাঁদের বৈপরীত্য সুপরিস্ফুট। মানবেন্দ্রনাথ চাইতেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যেটা গান্ধীর দিব্য অভীপ্সা বা গুরুবাদী বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত। মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিমানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করেছেন; পক্ষান্তরে গান্ধীর অছিবাদে (Trusteeship) ব্যক্তিমানুষের অধিকার অপহৃত হয়েছে। গান্ধীর পার্টিহীন রাজনীতি তাই গণতান্ত্রিক নয়। রাষ্ট্রে ব্যক্তিমানুষকে শক্তিশালী করার জন্যে মানবেন্দ্রনাথ পার্টিহীন রাজনীতির পথে অগ্রসর হয়েছেন।

গান্ধী আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী, তাই আধুনিক সবকিছুই তাঁর কাছে বিসবৎ পরিত্যাজ্য। গান্ধী জাতীয়তাবাদকে বর্জন না করেও বিশ্বজনীনতাকে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতো জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বৈশ্বিক মানব সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রচার করেছেন।

নয় : রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বা যোগাযোগের কথা জানা যায় না। উভয়ের কর্মক্ষেত্র এবং দার্শনিক চিন্তার পৃষ্ঠপট ভিন্ন হলেও সামাজিক বিচারবিশ্লেষণের মধ্যে দুজনের বিস্তর মিল দেখা যায়।

রবীন্দ্রদর্শনের ভিত্তিভূমি আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ; মানবেন্দ্রনাথের দর্শন সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা লাভ করেন ; পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথের মনে ভারতের প্রাচীনত্ব অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য দর্শনই অধিক প্রতিফলিত। উভয়ের দৃষ্টিতেই রাজনীতি ও নৈতিকতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দর্শন আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় রচিত হলেও সেখানে দিব্য আদেশাধীনে মানুষকে না রেখে তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'-চিন্তায় রাষ্ট্র ও সমাজের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সমাজদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— রাষ্ট্রের কাজ কেবল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, বিভিন্ন সামাজিক কর্মতৎপরতার মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্যবিধানও তার কাজ। প্রাচীনকালে এখনকার মতো সমাজের এত জটিলতা ছিল না বলেই হয়তো জনজীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ ; কিন্তু বর্তমান সমাজ নানাভাবেই এত জটিল হয়ে পড়েছে যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপরিহার্য বলেই মানবেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রকে অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ অনাবশ্যক অগ্রাধিকার কিছু দিতে চান নি।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের গণসমিতির পরিপূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের সক্রিয় উদ্যম ও সৃজনীশক্তির অবাধ বিকাশ চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লী পঞ্চায়েতগুলিকে কিছুটা পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়তে চেয়েছিলেন। সে-বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ অনেকটা সোভিয়েত ধাঁচের পিরামিড আকারে ক্রমবিন্যস্ত এবং সুসংবদ্ধ গণসমিতির কাঠামোকে পরিশাসনের ভিত্তিরূপে কল্পনা করেন।

অর্থনৈতিক বিষয়েও দুজনের মিল যথেষ্ট। দুজনেই ছিলেন সমবায় প্রথার সমর্থক। আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সমালোচনা করলেও মানবেন্দ্রনাথ তা করেন নি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী উভয়েই ছিলেন নিখাদ বৈশ্বিক মনোভাবাপন্ন।

জাতীয়তাবাদের উপর উভয়েই তীব্র কশাঘাত করেছেন। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন উত্তরকালে তার কিছুটা দার্শনিক সামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মানবেন্দ্রনাথের রচনায়।

দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংকীর্ণতা এবং চিন্তাহীনতাকে দুজনেই তীব্র সমালোচনা করেন। চিন্তায় ও ব্যবহারে উভয়েই ছিলেন আধুনিকতার পক্ষপাতী।

দশ : উপসংহার

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা আবহমানকাল যাবৎ মূলত আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা থেকে প্রাণরস সঞ্চয় করে এসেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বস্তুবাদী চিন্তার উৎকর্ষ দেখা গেলেও তা জনমানসে স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি লাভ করে নি। আধুনিক কালেও এদেশের চিন্তানায়কদের প্রেরণার উৎস হয়েছে গীতা ও উপনিষদ। এ-যুগের ভারতীয় সাধনায় তাই বস্তুবাদী মানবেন্দ্রনাথও একজন নিঃসঙ্গ পথিক।

রামমোহনের বিশ্বজনীন আদর্শের শ্রেষ্ঠ পরিণতি দেখা যায় মানবেন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দর্শনে। উনিশ শতকে নবাগত পশ্চিমী চিন্তার প্রভাবে বুদ্ধির স্বাধীন চর্চা, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবতন্ত্রী জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ ডিরোজিও, নব্যবঙ্গদল, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বে এদেশে যে স্বল্পকালীন রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল প্রায় শতাব্দীকাল পরে প্রকারান্তরে তারই সূত্র ধরে যেন মানবেন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছেন।

অপরিণত প্রথম জীবনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসবৈরাগ্য থেকে ক্রমে তিনি বস্তুবাদী জীবনে প্রবেশ করেন; পর্যায়ক্রমে জাতীয়তাবাদ পরিহার করে বিশ্বজনীন আদর্শে আকৃষ্ট হন, মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব কাটিয়ে নবমানবতা দর্শন উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই মানসিক বিবর্তনের পিছনে দুটি আবেগ নিয়তই প্রেরণা সঞ্চার করত। একটি হল মুক্তির আদর্শ এবং অপরটি হল সত্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যের সন্ধান পরিশেষে তাঁর নব্যদর্শনে সমন্বিত হয়েছে। এই দুটি প্রবণতার জন্যে তাঁকে আজীবনকাল অনেক ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করতে হয়েছে; তাঁর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, সেইসঙ্গে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে অশেষ কুৎসা।

এই দুটি আবেগের তাড়নাতেই তিনি প্রথমজীবনে সন্ত্রাসবাদী হয়েছিলেন। পরে সেই আদর্শের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে উচ্চতর মানবিক আদর্শ ও মুক্তির প্রেরণায় মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন। মার্কসীয় দর্শনেও মুক্তি ও সত্যের বিশেষ স্থান খুঁজে পান নি। এ-ধরণের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত হতাশায় ও নৈরাশ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু তা না করে তিনি আজীবনকাল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যাবহারিক দিকের প্রতি লক্ষ রেখেই যুক্তির দর্শন রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথ উভয়েরই দর্শনচিন্তা বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বে (materialistic cosmology) প্রতিষ্ঠিত। উভয়ের অন্তর্বর্তীকালে বৈজ্ঞানিক বিকাশ তাঁদের চিন্তার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে। মার্কসের আমলে পদার্থবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের ছিল শৈশব অবস্থা। পূর্বতন ভাববাদী দার্শনিক ধারাকে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে মার্কস ভাবকে বস্তুর নিছক প্রতিফলনরূপে বিশ্লেষণ করেন। মার্কসের দৃষ্টিতে মানুষ অর্থনৈতিক নির্দেশনায় ইতিহাসের অমোঘ লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে। ফলে মানুষের কোনও স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকে না; মুক্তির প্রয়োজন ঘটে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে; নৈতিকতাও তাই সেই শ্রেণীস্বার্থের বিচারে আপেক্ষিক মাত্র; ইতিহাসের নির্দেশে যুক্তির সীমানাও সুচিহ্নিত; স্বাধীনসত্তা-বিহীন ব্যক্তিমানুষ এই দৃষ্টিতে নিতান্তই অসহায়।

মানবেন্দ্রনাথ মার্কসের পূর্বকালীন ভাববাদী দর্শন গ্রহণ করেন নি; আবার মার্কসের বস্তুবাদও তাঁর কাছে স্থূল বলে মনে হয়েছে। চিন্তনকে তিনি বস্তুর নিছক প্রতিফলনস্বরূপ বিচার করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে যুক্তি ও নীতিসম্মত চিন্তার উৎস হল physical reality। তাঁর মতে চিন্তাশক্তির পিছনে যেমন বিশ্বাতীত কোনও দিব্য নির্দেশ নেই, তেমনি মানুষের পরিচিন্তন লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলচিত্রের মতো নিষ্ক্রিয় একটি প্রতিফলনমাত্র নয়— অর্থাৎ, ভাব ও বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়, কোনোটিই কারো অগ্রবর্তী নয়। বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে নৈসর্গিক গতির যান্ত্রিক বিশ্লেষণভঙ্গী (mechanistic methodology) মানবেন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ এবং নৈতিকতা অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। এ-দৃষ্টি মূলত বস্তুবাদী। মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ। যেহেতু প্রকৃতির গতিপথ যান্ত্রিক নিয়মে নির্দিষ্ট সেই কারণে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা

নিয়মনির্দিষ্ট। প্রকৃতির ধারায় যেমন এক শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য আছে মানুষের অস্তিত্বেও তেমনি এক মৌল শৃঙ্খলা আছে।

মানুষের যুক্তিপ্রবণতার নিশ্চয়তা প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলায় সুচিহ্নিত। যুক্তি নিয়মশৃঙ্খলিত প্রাকৃতিক পরিবেশেরই যেন এক প্রতিধ্বনি। যুক্তিপ্রবণতা অর্জন সাপেক্ষ নয়—মানুষের তা একটা জৈব ধর্ম। যুক্তিবোধের তাগিদেই মানুষ নীতিনিষ্ঠ এবং মুক্তির পিয়াসী হয়। কাজেই যুক্তি নীতি ও মুক্তির আবেগ মানুষের একটা জন্মগত ধর্ম। তাই থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সারা বিশ্বের মানুষ একই মানবিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় নিখিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি। মানুষের নৈতিক আচরণের পিছনে কোনো আধ্যাত্মিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র উৎস। নীতিনির্ভর সমাজদর্শনই বর্তমান সভ্যতার সংকট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে মানবেন্দ্রনাথের নব্যদর্শনে বস্তু অপেক্ষা ভাবেরই বেশি আতিশয্য এবং ব্যাবহারিক দিক থেকে তা অকার্যকর। তাতে মনুষ্যপ্রকৃতির শুভসত্তার প্রতি অতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; মনুষ্যপ্রকৃতির দুর্বলতা ও পরিবেশের প্রতিকূলতাকে যথোচিত বিবেচনা করা হয় নি। বস্তুত মানবেন্দ্রনাথ নিজেও এ-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। জলটুঙ্গির ঘরে বসে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে তিনি এই দর্শন উদ্ভাবন করেন নি। অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বাস্তব বিশ্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহযোগে তাঁর নব্যদর্শন রচিত হয়েছে। সারা জীবনের অনুপম অভিজ্ঞতাই মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাঁর অটল আস্থা সৃষ্টি করে।

ইতিহাসে আর কোনো দার্শনিকের জীবনে এত বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা দেখা যায় না। অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা ছাড়া বাকি মহাদেশগুলির অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তিনি পান নি। কিন্তু রাশিয়ায় তাঁকেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। গণিত ও পদার্থবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের বিতর্কের কথা জানা যায়।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে মানবেন্দ্রনাথের মননশীলতা ছিল বিশ্লেষণ মূলক; দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন কোনও পথ তিনি সৃষ্টি করেন নি। এ-কথা যে নিতান্তই ভুল তা তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি গ্রন্থই প্রমাণিত করে। *Reason,*

Romanticism and Revolution এবং *Materialism* নামে দুটি যুগান্তকারী গ্রন্থ তাঁর মৌলিক চিন্তার পরিচয় বহন করে। 'Philosophical Consequences of Modern Science' নামে অমুদ্রিত বিশাল পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার বিস্তৃততর পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। পূর্বতন চিন্তাধারার বিশ্লেষণের সঙ্গেই তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অভিনব দার্শনিক ধারার সূত্রপাত করেছেন। অবশ্য তাঁর চিন্তার কয়েকটি বিষয়ে অধিকতর বিশ্লেষণ ও বিস্তৃতিসাধনের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ গবেষকদের উপর নির্ভর করছে।

ভারতীয় ভাবধারায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যূথবাদী মনোভাব প্রবল। বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবোধ ও নৈতিকতার পরিসর সংকীর্ণ। মানবেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী দর্শন ও নীতিনিষ্ঠ রাষ্ট্রচিন্তায় স্বভাবতই দেশবাসী আকৃষ্ট হয় নি। অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি সমসাময়িক প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত কর্ণপাত করেন নি। তাঁর 'ডিকলোনিজেশন থিওরি' এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও ভারতের স্বাধীনতার অনিবার্যতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অনেকে উপলব্ধি করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতির যতই নির্ভুল বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকুন না কেন সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় তিনি সফল হন নি। কারণ অবস্থাটা তাঁর আয়ত্তের অতীত ছিল। চিকিৎসক রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করলেও রোগীর সহযোগিতার অভাবে অনেক সময়ে চিকিৎসার বিধান নিষ্ফল হয়। কঠিন রোগেও যেমন মানুষ তাগাতাবিজ ও টোটকা চিকিৎসার ভরসায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাতে নিশ্চেষ্ট থাকে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মানুষ ভাবাবেগ, অন্ধবিশ্বাস এবং অভ্যাসাশ্রয়ী দৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত না হওয়ায় বৈজ্ঞানিক রাজনীতিও নিষ্ফল হয়।

একমাত্র মানবেন্দ্রনাথই গান্ধীনীতির কাছে কোনো দিন নতি স্বীকার করেন নি। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব অপরিসীম। তাঁকে অস্বীকার করে ভারতীয় রাজনীতিতে টিঁকে থাকা কঠিন। মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর শক্তিকে উপেক্ষা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের উন্নত রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত তাঁর চিন্তা ও সাধনা এদেশের অপরিণত ও সংকীর্ণ রাষ্ট্রচেতনার পক্ষে অনুপযোগী প্রতিপন্ন হয়। জনচিত্তে সুলভ প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে কিছুটা আপস করে নিলে হয়তো তাঁকে কোনঠাসা হতে হত না। তিনি সর্টকাট পথেও যেমন বিশ্বাসী ছিলেন না, তেমনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে আপসের

সেতুবন্ধ রচনারও বিরোধী ছিলেন। আশু কার্যকারিতার দৃষ্টিতে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধাবাদী পন্থায় তাঁর রুচি ছিল না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর সর্বাপেক্ষা অভিনবতা হল দলীয় রাজনীতি বর্জন। তিনি অনুভব করেন দলীয় রাজনৈতিক প্রথায় দলের সদস্যদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামত উপেক্ষিত হয় দলেরই নির্দিষ্ট আদর্শের স্বার্থে। তাছাড়া কী ডিক্টেটরি, কী পার্লামেণ্টারি প্রথায় সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার কোনো প্রত্যক্ষ সংবাদ থাকে না। মানবেন্দ্রনাথ প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য পরিপূরকস্বরূপ স্থানিক সমিতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষই সার্বভৌমত্বের আধার ও উৎস। সে-সত্তা হস্তান্তরিত করা যায় না। প্রতিটি ভোটদাতা বা নাগরিকের দলনিরপেক্ষ শিক্ষা ও চেতনা গড়ে উঠলে তারা আর দলীয় রাজনীতির খেলার পুতুল হয়ে থাকবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাতেও কি শক্তিশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাববিস্তার ও অধিপত্য বজায় রাখার সম্ভাবনা নির্মূল হয়?

তিনি দার্শনিক বা ভাববিপ্লবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন; যাতে মানুষ আত্মবিশ্বাস ও অসীম সৃজনসত্তার চেতনায় শক্তিসম্পন্ন হতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুর আশু পরিবর্তনের তাগিদে ক্ষমতা দখলকেই একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করা অর্থহীন। রাজনৈতিক বিষয়ে মানুষের অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গী ও নিশ্চেতন মনোভাবের কারণ হল যথোচিত রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব। রাজনৈতিক শিক্ষায় তিনি চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তিবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমন্বিত মানবতন্ত্রী আদর্শসঞ্চারের প্রয়োজন অনুভব করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রশ্ন আজও বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি। মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী রাষ্ট্রদর্শনে এদুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবিচার থেকে মুক্তি পায় নি। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অনুপস্থিত। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা হরণ নয়, জীবনের অবাধ বিকাশ ও পরিপূর্ণতার পথে সর্ববিধ প্রতিবন্ধকতা থেকে ব্যক্তিমানুষের মুক্তিই হল আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার মানদণ্ড।

পূর্বতন সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে উগ্র মনোভাবের ফলে মানবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথোচিত উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। এর কারণ হয়তো কবির আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতালিতে একসময়ে তাঁর মুসোলিনির আতিথ্য-গ্রহণ। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের বহু পূর্বে দেখা দিয়েছিল কবির যুক্তিবাদী রাষ্ট্রচিন্তা—

বিকেন্দ্রিত শাসনকাঠামো এবং সরকারি প্রশাসনের সমান্তরাল ধারায় স্বদেশী সমাজগঠনের পরিকল্পনা। জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে, সমবায় অর্থনীতির প্রচারে ও শিক্ষায় গুরুত্বদানের বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী বলা যায়। কবি যখন মার্কসবাদের সমালোচনা করেন তখন মানবেন্দ্রনাথ একজন নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী ছিলেন। কবির সান্নিধ্যে না এলেও মানবেন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিকে তাঁর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে উভয়েই জাতীয়তাবাদের অকুণ্ঠ সমালোচনা করেছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সেই আবেগের এখনও কিছুটা প্রয়োজন আছে। যুক্তি ও নৈতিকতার প্রভাবে অপরের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের কাছে নতিস্বীকার করা যায় না। ভারতভূমিতে সম্প্রতিকালে দুটি দেশের সশস্ত্র আক্রমণ তার আবশ্যকতা প্রমাণ করে।

গান্ধীর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিগত পার্থক্য থাকলেও দলীয় রাজনীতির অবসান, বিকেন্দ্রিত প্রশাসন, লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাবহারিক দিক থেকে উভয়ের মিল অনস্বীকার্য। দৃষ্টিগত ত্রুটি সত্ত্বেও আন্দোলন, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধী কৃতকার্য হয়েছেন; মানবেন্দ্রনাথ হন নি। মানবেন্দ্রনাথের ছিল স্বচ্ছ চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী; পক্ষান্তরে গান্ধী ছিলেন সর্বাত্মক আন্দোলন ও সংগঠনশক্তির অধিকারী। তত্ত্বগত চিন্তা ও আলোচনায় মানবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি; ফলে তাঁর সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা দুর্বল থেকে যায়। অপরদিকে আন্দোলন, সংগঠন ইত্যাদি কাজে সময় অতিবাহিত হওয়ায় দার্শনিক ও তত্ত্বগত বিষয়গুলিকে তিনি বিস্তারিত করার অবকাশ পান নি।

মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল বলে মনে হয়। কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টবিরোধী সবাই তাঁকে সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের উপর তাঁর চিন্তার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁরই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন দল এবং জননেতা ক্রমে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের রাজনৈতিক ধারায় এখন এক সংকট দেখা দিয়েছে। সে-সংকটের কারণ সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাব্য সংঘর্ষ নয়। সে-সংকট মুক্তি ও মানবতার। কালোপযোগী এক সমাজদর্শনের সাহায্যেই তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। যুক্তি নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত মানবেন্দ্রনাথের সমাজদর্শন মননশীল মানবসমাজের কাছে

একটি পথের সন্ধান দিয়েছে। সে-পথ উপযোগী ও কার্যকর কি-না তা ইতিহাসেই প্রমাণিত হবে।

নির্দেশিকা

১. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' । ১৩৬৩, পৃ ৬৫৮।

২. V. I. Lenin. *Selected Works.* Moscow, 1947, vol. 2, p. 658.

৩. Quoted in : Robert C. North & Xenia J. Eudin. *M. N, Roy's Missoin to China.* California University, 1963, p. 13.

৪. এ. রেজনিভক। "জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে লেনিন", 'সোভিয়েত সমীক্ষা'। বর্ষ ২, সংখ্যা ৩৮, ৩১ জুলাই, ১৯৬৭, পৃ ৩৯।

৫. Quoted in : North and Eudin. *M. N. Roy's Mission to China.* 1963, p. 17.

৬. *Ibid.* pp. 17-18.

৭. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* Geneve, 1922, pp. 33-35, 37.

৮. *Ibid.* p. 40

৯. Nripendra Nath Mitra, ed. *Indian Annual Register.* 1929, p. 65. (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী)

১০. M. N. Roy. *Future of Indian Politics.* London, 1926, p. 49.

১১. *Ibid.* p. 117.

১২. Quoted in : North and Eudin. *M.N. Roy's Mission to China.* 1963, p.

১৩. *Ibid.*

১৪. M. N. Roy. *New Humanism.* 1953, p. 39.

১৫. M. N. Roy. *Reason Romanticism and Revolution.* 1955, vol. 2, p. 309.

১৬. M. N. Roy. *From Savagery to Civilisation.* 1940, p. 14.

১৭. M. N. Roy. *Memoirs*. 1964, pp. 549-551.

১৮. Phillip Spratt and M. N. Roy. *Beyond Communism*. 1947, pp. 61-62.

১৯. M. N. Roy. *Materialism*. 1941, p. 5.

২০. *Ibid*. (footnote)

২১. M. N. Roy. *Reason Romanticism and Revolution*. vol. 1, p. 11.

২২. J. Stalin. 'Dialectical and Historical Materialism', in *Selected Works of Karl Marx*. Moscow, 1946, vol. 2, p. 75.

২৩. Karl Marx. *Selected Works*. Moscow, 1946, vol. 1, p. 300.

২৪. M. N. Roy. *Reason Romanticism and Revolution*. vol. 1, p. 13.

২৫. Phillip Spratt and M. N. Roy. *Beyond Communism*. 1947, p. 61.

২৬. M. M. Roy. *New Humanism*.1943, p, 103.

২৭. *Ibid.*

২৮. *Ibid*. p, 105.

২৯. M.N. Roy. *Reason, Romanticism and Revolution*. vol. 2, p. 288.

৩০. *Ibid*. p. 307.

৩১. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953, p. 37.

৩২. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. 1960, p. 34.

৩৩. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953, pp. 106-107.

৩৪. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. 1960, p. 34.

৩৫. *Ibid*. pp. 33-40.

৩৬. Phillip Spratt and M. N, Roy. *Beyond Communism*. 1947, p. 132.

৩৭. M. N. Roy. *Scientific Politics*. 1947, p. vii.

৩৮. *Ibid*. p. 55.

৩৯. M. N. Roy. *New Orientation*. 1946, p. 56.

৪০. M. N. Roy. *Scientific Politics*, 1947, pp. 16-17.

৪১. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. 1960, pp. 184-185.

৪২. *Ibid*. pp. 62-63,

৪৩. M. N. Roy. *New Humanism.* 1953, pp. 34-35.

৪৪. *Ibid.* pp. 44-45.

৪৫. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties,* 1960, p. 195.

৪৬. *Ibid.* p. 95.

৪৭. *Ibid.* p. 70.

৪৮. *Ibid.* p. 97.

৪৯. M. N. Roy. *New Humanism.* 1953, pp. 46-47.

৫০. M. N. Roy. *Fascism ; Its Philosophy, Professions and Practice.* 1938. p. 5.

৫১. *Ibid.*

৫২. *Ibid.*

৫৩. M. N. Roy. *Materialism.* 1951, p. 237.

৫৪. M. N. Roy. *Reason, Romanticism and Revolution.* vol. 2, p. 249.

৫৫. M. N. Roy. *Communist International.* 1943, p. 60.

৫৬. M. N. Roy. *Fascism ; Its Philosophy, Professions and Practice.* 1938, p. 73.

৫৭. M. N. Roy. *New Humanism.* 1953, p, 75.

৫৮. M. N. Roy. *Indian Labour and Post-War Reconstruction.* 1943, pp. 7-8.

৫৯. *Ibid.* p. 23.

৬০. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties.* 1960, p. 159.

৬১. *Ibid.* p. 160.

৬২. *Ibid.* p. 161.

৬৩. *Ibid.* p. 163.

৬৪. M. N. Roy. *New Humanism,* 1953. pp. 56-57.

৬৫. *Ibid.* p. 75.

৬৬. V. I. Lenin. *Selected Works.* Moscow, 1947, p. 674.

৬৭. M. N. Roy and V. B. Karnik. *Our Differences,* 1938, p. 48.

৬৮. Phillip Spratt and M. N. Roy. *Beyond Communism.* 1947, p. 87.

৬৯. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. 1960, p. 121.

৭০. *Ibid*. p. 118.

৭১. *Ibid*. p. 136.

৭২. *Ibid*. p. 59.

৭৩. M. N. Roy, 'Education of the Educators', *The Radical Humanist*. 25 January, 1965, p. 37.

৭৪. *Ibid*. p. 38.

৭৫. M. N. Roy. *Reason, Romanticism and Revolution*. vol. 2, pp. 259, 219.

৭৬. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953, pp. 18-19.

৭৭. M. N. Roy. *Reason, Romanticism and Revolution*, vol. 1, p. 11.

৭৮. *Ibid*. p. 10.

৭৯. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953, pp. 16-17.

৮০. M. N. Roy. *Reason, Romanticism and Revolution*, vol. 2, pp. 304-305.

৮১. *Ibid*. pp. 212-213.

৮২. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. 1960, pp. 25-26.

৮৩. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953, pp. 26-31.

৮৪. M. N. Roy, *Politics, Power and Parties*. 1960, p. 153.

৮৫. M N. Roy, *New Humanism*. 1943, p. 31.

৮৬. M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. 1960, p. 73.

৮৭. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953, p. 25.

গ্রন্থপঞ্জি

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ ও রচনাদির পরিমাণ সামান্য নয়। আয়তনবৃদ্ধির ভয়ে কেবল একটি নির্বাচিত তালিকা এখানে সংকলিত হল। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে 'নির্দেশিকা'য় যে-সব রচনার উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সেগুলি বর্জিত হল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পুস্তকের প্রকাশস্থান উল্লেখ করা হয় নি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত। 'রামমোহন ও ইঙ্গ-ভারতীয় আইন', তত্ত্বকৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

অন্নদাশঙ্কর রায়। রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬২

অম্লান দত্ত। 'বাংলায় উনিশশতকের নবজাগরণ', দ্বন্দ্ব, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৫৭

অরবিন্দ পোদ্দার। উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, ১৯৫৫

—বঙ্কিম-মানস, ১৯৬০

অরুণ ভট্টাচার্য, সম্পাদিত। সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

অসিতকুমার ভট্টাচার্য। বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, ১৯৬৪

কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

কিশোরীচাঁদ মিত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কর্তৃক অনূদিত ও কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৬২

কৃষ্ণকুমার মিত্র। আত্মচরিত, ১৯৩৭

কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী, ১৯৩৪

গৌতম চট্টোপাধ্যায়। রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন, ১৯৬৭

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

নরহরি কবিরাজ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা, ১৯৬১

নির্মলকুমার বসু। গণতন্ত্রের সঙ্কট, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

নীহাররঞ্জন রায়। 'গণতন্ত্রের হিসাব-নিকাশ', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩২

নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৩ খণ্ড, ১৯৬১-৬৮

পুলিনবিহারী সেন, সম্পাদিত। রবীন্দ্রায়ণ, ২ খণ্ড, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

প্যারীচাঁদ মিত্র। ডেভিড হেয়ার, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং সুশীলকুমার গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৬৪

প্রবোধরঞ্জন গুহঠাকুরতা। যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়, ১৯৫৮

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। রামমোহন প্রসঙ্গ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

বন্দে আলি খাঁ। 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের একটি নতুন মূল্যায়ন', দেশব্রতী। ১৫, ২২ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮

বসুধা চক্রবর্তী। মানবতাবাদ, ১৯৬১

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। আমার আত্মকথা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

বিনয় ঘোষ। 'বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎসভার দান', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬২, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

—বিদ্রোহী ডিরোজিও: নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর জীবনচরিত: ১৮০৯-১৮৩১, ১৯৬১

বিনয়কুমার সরকার। হিন্দুরাষ্ট্রের গঠন, ১৯২৬

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, ১৯৫৩

মন্মথনাথ ঘোষ। মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর, ১৯৬৩

মোহিতলাল মজুমদার। বাংলার নবযুগ, ১৮৭৯ শকাব্দ

যোগানন্দ দাস। বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

যোগেশচন্দ্র বাগল। জাগৃতি ও জাতীয়তা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

—বাংলার নব্য সংস্কৃতি, ১৯৫৮

—ভারতের মুক্তিসন্ধানী, ১৯৫৮

—মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

রামগোপাল সান্ন্যাল। কৃষ্ণদাস পালের জীবনী, ১৮৯০

শিবনাথ শাস্ত্রী। আত্মচরিত, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯৫৭

শিবনারায়ণ রায়। মৌমাছিতন্ত্র, ১৯৬০

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সুনীলচন্দ্র সরকার। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা, ১৯৬৪

সুপ্রকাশ রায়। ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১৯৬৬

সুশোভন সরকার। 'অর্থনীতিচর্চায় রামমোহন', তত্ত্বকৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

স্বদেশরঞ্জন দাস। মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন, ১৯৬৫
হক্সলি, অলডস। 'শিক্ষাশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ', পরিচয়, বৈশাখ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ১৯৬১
—জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ বা ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধপন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা, ১৯৫৭

Ahmad, Qeyamuddin. *The Wahabi Movement in India*, 1966
Aiyar, S. P., & R. Srinivasan, ed., *Studies in Indian Democracy*, Bombay, 1965
Andrews, C. F. & Girija K. Mukherjee. *The Rise and Growth of Congress in India, 1832-1920*, Meerut, 1967
Aurobindo. *The Renaissance in India*, Pondicherry, 1951
—*The Riddle of this World*, Pondicherry, 1951
—*War and Self-determination*, Pondicherry, 1962
Bagal, Jogesh Chandra. *History of the Indian Association, 1876-1951*, 1953
—*Peasant Revolution in Bengal*, 1953
Basu, Narayani. *Political Philosophy after Hegel and Marx*, 1956
Besant, Annie, *The Future of Indian Politics : a contribution to the understanding of present-day problems*, Adyar, 1922
Bhattacharyya, A. K. 'Akshay Dutt: Pioneer of Indian Rationalism', *The Rationalist Annual*, London, 1962
Bhattacharya, G.P. *M.N. Roy and Radical Humanism*, Bombay, 1961
Bose, Nemai Sadhan. *The Indian Awakening and Bengal*, 1960
Bose, Nirmal Kumar, *Modern Bengal*, 1959
Caveeshar, Sardul Singh. *India's Fight for Freedom : a critical survey of the Indian National Movement since the advent of Mahatma Gandhi in the field of Indian Politics*, Lahore, 1936
Chakravarti, Satis Chandra, ed., *The Father of Modern India : Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations, 1933*, 1935

Chanda, Ramaprasad & Jatindra Kumar Majumdar, ed., *Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy.*, v. 1, 1791-1830, 1938

Chatterjee, Dilip Kumar. *C. R. Das and Indian National Movement : a study in his political ideals*, 1965

Chattopadhyay, Goutam, ed., *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century : selected documents*, 1965

Chirol, Valentine. *India*, London, 1930

Chunder, Bholanath. *Raja Digambar Mitra, C. S. I. : his life and career*, 1893

Communists Challenge Imperialism from the dock. Meerut Communist Conspiracy Case, 1929-1933 : the general statement of 18 Communist accused ; introd. by Muzaffar Ahmad, 1967

The Congress and the National Movement : from a Bengali standpoint. Written under the direction of Reception Committee of 43rd Session of the Indian National Congress, 1928

Das, A. C. *Sri Aurobindo and some modern problems*, 1958

Das, Ramyansu Sekhar. *M. N. Roy the Humanist Philosopher*, 1956

Dasgupta, Shakti. *Tagore's Asian outlook*, 1961

Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*, London, 1961, 3v.

—*Rabindranath ; the poet and the philosopher*, 1948

Datta, K. K. *Renaissance, Nationalism and Social Changes in Modern India*, 1965

Desai, A. R. *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay, 1959

Dhar, Niranjan. *The Political Thought of M. N. Roy, 1936-54*, 1966

—'Swamiji's Role', *The Radical Humanist*, V. 31, No. 45, 19 November, 1957

Doctor, Adi H. *Anarchist Thought in India*, Bombay, 1964

Dutt, Romesh Chunder. *Cultural Heritage of Bengal*, 1962

Ganguli, B. N. *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory*, Bomboy, 1965

Ghosal, U. N. *A History of Indian Political Ideas : the ancient period and the period of transition to the middle ages*, Madras, 1966.

—*A History of Indian Public Life*, Bombay, 1966, 2 v

Ghose, Sankar. *The Western Impact on Indian Politics*, 1885-1919, Bombay, 1967

Ghosh, Manmathanath. *The Life of Grish Chunder Ghose ; the Founder and first Editor of the 'Hindoo Patriot' and 'The Bengalee'*, Calcutta, 1911

Ghosh, Pansy Chaya. *The Development of the Indian National Congress*, 1892-1909, 1960

Heimsath, Charles H. *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, 1964

Karunakaran, K. P. *Religion and Political Awakening in India*, Meerut, 1965

Kling, Blair B. *The Blue Mutiny : the Indigo Disturbances in Bengal*, 1859-1862, Pennsylvania, 1966

Mackenzie Brown, D. *The White Umbrella : Indian political thought from Manu to Gandhi.*, California, 1958

Majumdar, Jatindra Kumar. *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India : a selection from records*, 1775-1845, 1941

—*Indian Speeches and Documents on British Rule*, 1821-1918, 1937

Majumdar, R. C. *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, 1960

—*History of the Freedom Movement in India*. 1962-63, 3 v.

—*The Sepoy Mutiny and the Revolt of* 1857, 1963

Mody, Homi. *Sir Pherozeshah Mehta : a political biography*, Bombay, 1963

Mozoomdar, Protap Chunder. *Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, 1891

Mukerji, D. P. *Diversities : essays in economics, sociology and other social problems*. Bombay, 1958

Mukherjee, Haridas and Uma Mukherjee *Bande Mataram' and Indian Nationalism*, 1906-1908, 1957

—*The Growth of Nationalism in India :* 1857-1905, 1957

—